ডানা

বনফুল

পরিবেশক ঃ
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

প্রথম প্রকাশ : প্রথম খণ্ড ১৯৪৮
দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫০
তৃতীয় খণ্ড ১৯৫৫

স্বত্বাধিকারী :
অভিযান গোষ্ঠীর পক্ষে সচিব,
বিদ্যানন্দ চৌধুরী,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

প্রকাশক :
শ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ :
ইন্দ্রনাথ দাশ
কো - আপারেটিভ প্রেস,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় :
কম্পু - কালার,
৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা

(লেসার কম্পোজ)
ইলেক্ট্রো গ্রাফিক্স
২২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা - ৭৩

(প্রচ্ছদ মুদ্রণ)
টাইপো গ্রাফিকস আর্ট
পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৯

(লেমিনেশন)
চৌধুরী কনসা
৫৭/২ই, কলেজস্ট্রীট কলিকাতা - ৭৩

প্রচ্ছদ : সমর মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু

॥ ডানার রৌদ্রের গন্ধ ॥

আঙ্গিক নিরীক্ষা ও আঙ্গিক সিদ্ধির পক্ষে বনফুলের সব থেকে বড় সহায় ছিল গদ্যে এবং কবিতায় তাঁর সমানাধিকার। আরো একটু স্পষ্ট করে বললে বোধকরি এ কথাই বলতে হয় তাঁর অন্তর্জগত আর বহির্জগতের আনাগোনায় প্রধান সেতু হয়েছে তাঁর কবিতা। গদ্যের প্রান্তরে পর্যটন করতে করতে তিনি কখনো কবিতার ফুল ফুটিয়েছেন, লতা দুলিয়েছেন, কখনো বা কবিতার আলোয় গদ্যময় প্রান্তরকে আলোকিত করে তুলেছেন। প্রথমটির উদাহরণ 'তৃণ খণ্ড'। দ্বিতীয়টির উদাহরণ 'মৃগয়া'। আমরা জানি তিরিশের দশকে আবির্ভূত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রূপ রসিকতায়, তথা 'ফর্ম্'-সচেতনতায় বনফুল অনন্য। তাঁর কোনো দুখানা বই এক ফর্মের নয়। 'স্থাবরে', 'জঙ্গমে', 'রাত্রি'তে 'মৃগয়া'য়, 'সে ও আমি'-তে ও 'ডানা'-য় প্রভৃত রূপভেদ। এই রূপাবলোকন ও রূপ সিদ্ধি বনফুলের প্রতিভার প্রধান অভিজ্ঞান। কোথায় কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে, কোথায় ফুলের বনে কাঁটা—বনফুলের সারা জীবনের গদ্য-পদ্যের উভচারিতায় তারই সন্ধান। তাঁর রূপান্বেষার মূল কথাও এখানে। এর মধ্যে 'ডানা' উপন্যাসটি আবার একটু আলাদা মনোযোগ দাবি করে। প্রথমেই একটা প্যারাডক্স লক্ষণীয়। ডানা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছিল। অচিরকালের মধ্যে দেখা গেল, সে যত না আশ্রয়প্রার্থী তার থেকেও বেশি সে আশ্রয়দাত্রী। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় নায়িকার নামটি। ডানা কারো কোথাও নাম হয় বলে আমরা এতাবৎ জানিনি শুনিনি। কিন্তু 'ডানা' শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় একটি প্যারাডক্স অনুষঙ্গে জেগে ওঠে—আকাশ এবং নীড়। ডানার সমগ্র অস্তিত্বে আকাশ এবং নীড়ের পরস্পর প্রাতিমুখ্য। ডানার মূল নাম কিন্তু Diana—ছেলেবেলায় এক মেম নার্স-এ নাম রেখেছিল। ডায়েনা গ্রীক পুরাণোক্ত দেবী। অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডায়েনা। কাব্যে তার শবরীরূপ বর্ণিত আছে। যুগ যুগ ধরে এই ডায়েনাই বোধ হয় ডানা মেলে উড়ে আসছে মৃত্যু পরিকীর্ণ পৃথিবীর দিকে। ডায়েনা মূল—ডানা ফুল। ডানা প্রাণীণ ধারায় সবাইকে সঞ্জীবিত করছে। কবি বলছেন—এই ডায়েনাই বোধহয় আমাদের দেশের অনন্ত যৌবনা উর্বশী। মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে বারবার প্রাণ লক্ষ্মীর মূর্ত প্রতীক রূপে। এইখানে উর্বশীর উপমানটি তাৎপর্যপূর্ণ। সেই দেবলোকনন্দিতা নারী কোনো বন্ধনে বন্দী নয়। সে অবন্ধনা। এই উপন্যাসে বকুলবালা বা রত্নপ্রভার পাশে ডানাকে রাখলে ডানার স্বরূপের আভাস মেলে। বকুলবালা বা রত্নপ্রভা নারীত্বের পরিচিত সংজ্ঞার্থের যে সীমারেখা তার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে। ডানা তা নয়। 'জঙ্গম' উপন্যাসে বনফুল বেলাকে পরিকল্পনা করেছিলেন আধুনিক নারীর পুরুষ নিরপেক্ষ স্বাধীনতা-সাধনার প্রতিমা রূপে। এদেশে ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক আধুনিক পরিবেশে নারী তার দেহাধীন নিয়তিকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই সে য়ুরোপে চলে গেল। সে সংগ্রামী। ডানা সংগ্রামী নয়। সে সন্ধিৎসু। কিসের সন্ধান তার? সে প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে একটা কথা জানা খুবই প্রয়োজনীয়। বৈজ্ঞানিকের অনুবীক্ষণে কি তাকে পাওয়া যাবে? কবির কল্পনায় কি তার ঠিকানা মিলবে? কবি আকাশ প্রিয়, তাই পাখিদের আকাশ বিহারে তিনি খুঁজে পান তাঁর নিজের অনুসন্ধানী আকুলতার প্রতিচ্ছায়া। দূরবীন তাঁর দিগন্ত অন্বেষার প্রতীক। আবাবিল পাখি দেখে তাঁর মনে হয়, 'কি চায় কি চায় ঠিকানা না পায়'। ডানার কথা মনে পড়ল। ও

মেয়েটিও তো অতিথি এদেশে। ওর মনও কি চঞ্চল হয়ে ওঠেনি এই আবাবিলদের মত? হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। পাখিদের জগতে চঞ্চলতা। খঞ্জন, ফুলকি, কাদাখোঁচা, আবাবিল, উৎক্রোশ, সকলেই যেন উন্মনা, অস্থির, কি যেন খুঁজছে সবাই। কবি ভাবেন এর মধ্যে ডানাই কি একমাত্র স্থির? কি খুঁজছে ও? কাকে খুঁজছে? কিভাবে খুঁজছে? ওর কালো চোখের দৃষ্টিতে যে আলোর ঝলক দেখেছিলেন সেদিন, তা ভাষা-ভরা কিন্তু তার অর্থ কি?

ডানা নিজেই কি তা জানে। অন্তত তখনই কি জানে? এই গদ্যে পদ্যে মেশানো অপরূপ এবং অভিনব উপন্যাসে ডানার অনুসন্ধেয় হল তার নিজের মন। লক্ষণীয় ডানার কোনো ইতিহাস আমরা তেমন করে জানি না। সকলে প্রতিক্রিয়ান্বিত তার প্রভাবে—সে নিজে কতটা প্রতিক্রিয়ান্বিত—সেটাই তো ডানার কাহিনী।

'তৃণখণ্ডে' যে কবি প্রকাশোন্মুখ, 'নির্মোক'-এও যে কবিসত্তা সক্রিয়, 'ডানা' উপন্যাসে তা সকল সামাজিক, ব্যক্তিক সমস্যাভার থেকে ছুটি নিয়ে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে দিগন্ত সন্ধানী। তাঁর প্রথম পর্বের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'নির্মোক'। নির্মোক শব্দটি বলে দিচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নির্মোক খুলে দেওয়া তাঁর লক্ষ্য। 'অগ্নি' এবং 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাসের অভিঘাতে স্পৃষ্ট এক পরিবার মুখ্য হয়েছে। কিন্তু 'ডানা' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রচনা। 'রাত্রি' উপন্যাসের নায়িকা রহস্যময়ী বটে—কিন্তু অন্য চরিত্রগুলির উপর তার প্রতিক্রিয়া সেখানে আসল কথা। ডানা কিন্তু নিজেই স্বয়ম্ভর চরিত্র। নামটি সুন্দর কিন্তু অলোকসম্ভব। আমাদের জীবন বহু অসঙ্গতিতে পূর্ণ। এখানে অহরহই আমরা দেখি 'ছ্যাকরা গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দের সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বরকে পাল্লা' দিতে হয়। ডানার নামে লেখা কবিতাটি এখানে উল্লেখ্য। তার আগে ট্রেনের জানালার ধারে বসা বিস্রস্ত-কেশা ডানাকে দেখে কবি বলেছেন, 'তোমাকে ভিড়ের মধ্যে দেখলে ঠিকমতো দেখা হয় না। মনের সঙ্গে চোখের ঝগড়া চলতে থাকে খালি।' তারপরে হঠাৎ বলেছেন ঃ

'তুমি যদি আমার মেয়ে হতে, বেশ হত তা'হলে—ভারি খুশি হতাম।'

'কেন?'

'অসঙ্কোচে আদর করতে পারতাম। আদর করে যা বলতাম তা বেমানান হত না। এখন কিছু বললে তুমি চটে যাবে, লোকে শুনলেও ছি ছি করবে।'

'কেন, কি বলতে চান?'

কবি পকেট থেকে খাতা বের করে পড়তে লাগলেন ঃ

তুমি সুন্দরী, মন্দার মালা
তুমি কর্পূরলতা,
দিবসের আলো, রাতের আঁধার
যাচে তব সখ্যতা।

ব্যাকরণে ভুল যা হল তা উপেক্ষণীয়। আসল কথাটিই আসল কথা। কবির জন্য ডানা আম কাটছে। কবি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

'কি দেখছেন অমন এক দৃষ্টে?'

'মেয়েকে, মাকে'।

ডানা চোখ তুলে চাইল। কবি দেখলেন চোখে যে হাসি চিক্‌চিক্ করছে তাতে আর শঙ্কার ছায়া নেই। তা প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ।

কবি ভেবেছিলেন মেয়েটি ওখানে এসেছে প্রারব্ধের মানে অদৃশ্য টানে। 'যুক্তিরতো কোনো প্রয়োজন নেই আমার। আমি মেনে নিতে চাই ওতেই আমার তৃপ্তি। একটা অদৃশ্য টানে মেয়েটি এখানে এসেছে—এইটা ভেবেই আমার সুখ।' কিন্তু আমাদের জানা আছে ডানার ভিতরে একটা অস্থির অনুসন্ধান চলছে।

ডানাকে কেউ কিন্তু ধরতে পারল না। সকলেই তাকে লোকায়তে বাঁধতে চেয়েছে—এমন কি লুব্ধ দরিদ্রমনা রূপচাঁদবাবুও তাকে দেখে ইংরেজি কবিতা মুখস্থ বলেছে। ডানার প্রকৃত পরিচয় এখানে যে সে নিজেও কিছু একটা খুঁজছে, তা বোধ হয় সে নিজেও জানত না। অদ্ভুত এই চরিত্র কল্পনা—সে দুর্বোধ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। ডানার সঙ্গে সম্পৃক্ত যাঁরা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের ডানাকে জানাবার বিষয় তাঁদের অন্বিষ্ট। বৈজ্ঞানিকের বিশ্বরহস্য, কবির আনন্দ অন্বেষা, রূপচাঁদ বাবুর সম্ভোগ সন্ধান—সবই বুঝলাম। কিন্তু ডানা কী খুঁজছে? ডানা 'সে ও আমি'র সে নয়, 'অগ্নি'র অন্তরা নয়, 'রাত্রি'র রাত্রি নয়। ডানা দেশ কালে স্পষ্ট রেখায় ধৃত এক আত্মসচেতন মেয়ে। ঘটনাসঙ্কুল ডানার জীবনে প্রোফেসর চৌধুরী এসেছিল, ভাস্কর বসু এসেছিল। দুজনের সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা দু রকম। কিন্তু তার ভেঙে-চুরে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া জীবনের বর্তমান অবস্থায় আর কোনো অনুভূতি নেই কিন্তু সে সত্যই অসাড় নয়। সমস্ত শোক, সমস্ত বিপদ, সমস্ত ঝঞ্ঝার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি ক্ষতে প্রলেপ দেয়, ক্ষতিকে পূর্ণ করে, শোকের তীক্ষ্ণতাকে রূপান্তরিত করে সান্ত্বনার প্রশান্তিতে, সে প্রাণশক্তি তার অন্তরেও কাজ করে চলছিল অগোচরে। সেই প্রাণশক্তির বলেই সে এক সদর্থক বৈরাগ্যে বলতে পারল 'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোনোখানে।' এখানে 'ডানা'র উদ্দেশ্যে লেখা কবির কবিতাটি এবং ডানার কবিতাটি পড়ার প্রতিক্রিয়া অবশ্য স্মরণীয় ঃ

> পাখীর ডানা আছে, তুমিও ডানা
> আকাশে উড়িবার নাই তো মানা
> কিন্তু জানি তুমি উড়িবে না গো,
> মনে মনে তারই দরশ মাগো
> যাহার বাজারেতে অনেক দাম
> স্বর্ণপিঞ্জর যাহার নাম
> হারেম বলে কেউ, কেউ বা ঘর
> সবাই চেনা শোনা নাইক পর,
> তাহারই নিরাপদ কোমল কোলে
> জানি গো জানি তব হৃদয় দোলে,
> অজানা আকাশেতে দেবে না হানা
> যদিও নাম তব শ্রীমতী ডানা।

কবিতাটি পড়তে পড়তে ডানার কাছে তার নামরূপ ও স্বরূপের ভেদ ভঞ্জন হয়ে গেল। প্রথমটা সে আরক্তিম হয়েছে এই ভেবে কবিতাটিতে বুঝি তার অবচেতনের ছায়া পড়েছে। 'অজানা আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাহস তার আছে কি? সহসা মনে হল, আছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে অজানা পথেই তো চলছে। শুধু সে কেন, সকলেই। মাতৃগর্ভ

থেকে মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, অজানা জগতেই এসে অবতীর্ণ হয় সে। তারপর প্রতি মুহূর্তে তার অভিযান চলে অজানাকে জানবার, অনায়ত্তকে আয়ত্তে আনবার'। এই চিন্তাকে অনুসরণ করে ডানা কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারল না। বোধহয় ডানায় ঠিক ভাবে হাওয়া তুলতে পেরেছিলেন সন্ন্যাসী। একমাত্র তিনি ডানার কাছে কিছু চাননি। সেদিক থেকে বিজ্ঞানীর নিরঞ্জন জ্ঞান সাধনা আর সন্ন্যাসীর আত্ম জ্ঞান সগোত্র না হয়েও সাধর্ম্যযুক্ত হতে পারত। ডানাকে শেষ দেখা গেল গৈরিক পরিহিতা। যাবার আগে, সে সব পাখিকে পক্ষিনিবাস থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তার পাওয়া টাকা সে তার বন্ধুদের ডানা মেলার আনুকূল্য করার জন্য দিয়ে গেছে।

সে স্বাধীনতা চেয়েছিল। সে-স্বাধীনতা তাকে কেউ দেয়নি সে অর্জন করে নিয়েছে। সে স্বাধীনতার শিক্ষা তাকে হয়তো দিয়েছেন সন্ন্যাসী—একমাত্র তিনিই তার কাছে কিছু চাননি, কিছু না। যে কিছু চায় না, এক সচেতন নারীর অধিমানস তার মন্ত্রেই দীক্ষিত হয়। তখন সে বোঝে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই। তখন সে বলে 'আনন্দে আছি।' আনন্দ তো সুখ নয়। সন্ন্যাসী ডানাকে বলেছিলেন, 'প্রভাতের সূর্যোদয় যে দেখেনি তাকে বর্ণনা করে তা বোঝানো অসম্ভব। তোমার রাত্রি শেষ হলে নিজেই তুমি প্রত্যক্ষ করে তা বুঝতে পারবে একদিন। সে উপলব্ধি এ জন্মে হতে পারে, জন্ম-জন্মান্তর অপেক্ষা করতে হতে পারে তার জন্য। কারো বক্তৃতা শুনে তাড়াহুড়ো করে তা হবে না। কাছে বা দূরে সে প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য। তোমাকে যেতে হবে সেখানে'। সম্পূর্ণ রিক্ত না হয়ে বোধ হয় সেখানে যাওয়া যায় না। ডানা তাই গেল।

'ডানা' উপন্যাসের সমাপ্তি প্রসঙ্গে, তথা উপন্যাসের সামগ্রিক কাঠামো বিষয়ে দুকথা বলা দরকার। উপন্যাসের দুরকম সমাপ্তি হয়। এক সংবৃত সমাপ্তির উপন্যাস—Closed ending ; দুই বিবৃত সমাপ্তি—Open ending। প্রথমোক্ত ধরনের উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিজ্ঞতার বৃত্তটি সম্পূর্ণ বলে মনে হবে। দ্বিতীয়োক্ত ধরনের উপন্যাসে তা মনে হবে না। তলস্তয়ের আনা কারেনিনা প্রথমোক্ত ধরনের, রেসারেক্‌সন দ্বিতীয়োক্ত ধরনের। ডানা কাউকে কোথাও পৌঁছে দিল না, শুধু সকলের যে অর্থে হোক, তাকে পরাতে চাওয়া বাঁধন, এবং তাদের পরতে চাওয়া বাঁধন কেটে দিল। সে নিজেও কোন বাঁধনকে মেনে নিল না। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ দামিনীকে যা বলেছিল, 'ডানা'-র সন্ন্যাসী ডানাকে তাই যেন বলেছেন। শচীশ বলেছিল, 'তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে ; আমরা বদ্ধ, সেজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।' সন্ন্যাসী যেন ডানাকে কবিরের ভজন থেকে—কীট কে পগ নেবর বাজে সোভী সাহেব সুনতা হৈ—ছোট্ট কীটের চরণেও যে নূপুর বাজে তাও তিনি শুনতে পান, এই ভাবটুকু নিয়ে বলেছিলেন, 'মাটির ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবাই প্রত্যাশাভরে তাঁরই জন্য সেজে বসে আছে। দাদু বলেছেন : 'আকাশ ভরে বিরাজিত স্বামী, তাই সবুজ পট্টবসন পরে ধরিত্রী সেজে রয়েছে।' 'আমার মিলন লাগি' গানে যে মিলনের কথা ডানা সেই মুক্তি, যার নামান্তর মহামিলন, তার ঠিকানা পেয়ে গেল। ডানা চলে গেল ॥

কবি এবং বৈজ্ঞানিক বেরিয়েছেন পরিভ্রমণ করতে। সঙ্গে আছেন বন্ধু রূপচাঁদ মৌলিক। রূপচাঁদ কবিও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, অথচ উভয় জগতেই গতিবিধি আছে কিঞ্চিৎ। উভয় জগতেরই রূপ রস গন্ধ তাঁকে আকুল করে। কিন্তু মাত্রা হারিয়ে ফেলেন না তিনি কখনও। বিদগ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু তাল-বোধ আছে। অর্থাৎ আত্মহারা হন, কিন্তু ঠিক সময়ে আপিস যেতে ভুল হয় না। সেদিন তিন বন্ধু বেরিয়েছিলেন পক্ষী পর্যবেক্ষণে। শুধু তাই নয়, মনস্থ করেছেন, বরাবরই বেরুবেন যতদিন না পক্ষী-পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। বাতুল বৈজ্ঞানিক প্রলুব্ধ করেছেন কবিকে, এবং এই দুই উন্মাদকে সামলাবার জন্যে বেরিয়েছেন রূপচাঁদ। তিনজনেরই পকেটে দূরবীন। কবির মনশ্ছন্দবীণ অবিরাম-গুঞ্জরিতভাব, বৈজ্ঞানিক সর্বদা চকিতদৃষ্টি একাগ্র, রূপচাঁদ স্থির-মস্তিষ্ক বস্তুতান্ত্রিক।

কবির মনে কবিতা জাগছিল।

নির্মল নীল শীতের আকাশ, ঝলমল করে সোনালি আলো,
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে
কোথা তুমি ওগো, ঢাল গো ঢাল—
মরকত মণি কি আবেগে দেখ চুম্বিছে নীলকান্তরে।
যব-গম-ছোলা-মটর-মহিমা
ছাড়ায়ে যেতেছে উপমার সীমা
ধরার ধূসর ধূলি উজলিয়া
সবুজের শিখা উঠেছে জ্বলিয়া
প্রাণের দীপালী জ্বলে জ্বলজ্বল কি চঞ্চল অশান্ত রে।
কোথা তুমি ওগো, ঢাল গো ঢাল,
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে
নির্মল নীল শীতের আকাশে ঝলমল করে সোনালি আলো।

"শুনুন।"

কবি বৈজ্ঞানিকের দিকে ফিরে চাইলেন। দেখলেন, তিনি একটা ঝোপের পাশে গুঁড়ি মেরে ব'সে আছেন। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আবার। ডেকেই দূরবীন লাগালেন চোখে। তারপর চুপি-চুপি বললেন, "বারবেট একটা, আস্তে আস্তে আসুন। ওই যে, এই দিকটায় ঘুরে আসুন, ওই দেখুন।"

তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ ক'রে কবিও লাগালেন দূরবীন। পাখি দেখা গেল না, কিন্তু বটের পাতাগুলো কি অপরূপ। এমন ক'রে আর কোনও দিন দেখা হয় নি তো।

"উড়ে গিয়ে ওই নিমগাছটায় বসল গিয়ে। আসুন, এই দিক দিয়ে যাওয়া যাক।"

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে প্রায় দৌড়ে ছুটলেন বৈজ্ঞানিক নিমগাছটার দিকে। কবিও ছুটলেন।

'কুড় কুড় কুড় কুড় কুড়, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক।'

ডেকে উঠল পাখিটা।

"ওইটেই ডাকছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার ডাক তো। নাম কি ওর?"

বৈজ্ঞানিক আস্তে আস্তে আর একটু এগিয়ে একটা ঝোপের ধারে গুঁড়ি মেরে ব'সেছিলেন। কবিও এগুলেন সেদিকে।

"ওর নামটা কি?"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস ক'রে তর্জন ক'রে উঠলেন, "চুপ, কথা বলবেন না।"

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ব'সেছিলেন তিনি। হঠাৎ কবির দিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বললেন, "নীচের দিকের ওই ছোট্ট ডালটা বেঁকে আছে, ওর ওপরে দেখুন।"

কবি দূরবীন লাগালেন, কিন্তু পাখি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন রুক্ষমাথা ময়লা-কাপড়-পরা একটা বুড়ি, হেঁট হয়ে কাঠ কুড়োচ্ছে।

"উড়ে গেল আবার। দেখতে পেলেন?"

"না।"

"ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটায় বসল। চলুন, যাওয়া যাক।"

"কি নাম পাখিটার?"

"ইংরেজীতে বলে-বারবেট। অনেক রকম বারবেট আছে। এ অঞ্চলে আর এক বারবেট আছে, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কপারস্মিথ। বৈজ্ঞানিক নাম Xantholaema Haemucephala। বাংলা নাম বসন্তবউরি। সবুজ রঙ, তার ওপর হালকা সাদার ডোরা কাটা বুকের কাছটায়। ছোট পাখিটার মাথায় আর বুকে লাল। বড়টার মাথার রঙ তামাটে। ছোট পাখিটার অনেকগুলো দেশী নাম আছে—গয়লাবুড়ি, ভগীরথ, কলাপাখি, জোকারে পাখি। ওই শুনুন, ছোট পাখিটা মানে, গয়লাবুড়ি ডাকছে।"

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্—'

"কাঁসারিরা বাসন তৈরি করবার সময় যেমন শব্দ করে অনেকটা সেইরকম, নয়?"

'কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক।'

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্।'

বন-বাদাড় ভেঙে হনহন ক'রে এগিয়ে চলেছেন বৈজ্ঞানিক। কবি চলেছেন পিছু পিছু। তাঁর মনে কবিতা জাগছে।

গাছের ডালে সবুজ পাতার ফাঁকে
গয়লাবুড়ি থাকে।
পরনে তার সবুজ ডুরে
গান করে সে মিষ্টি সুরে
আকাশ জুড়ে গানের ছবি আঁকে।
প্রবীণ বুড়ি নয় সে মোটে
ছোট্ট পাখি কি ছটফটে

সহজ চোখে যায় না দেখা তাকে,
ফুড়ুৎ ক'রে পালায় উড়ে
সুর ঢালে সে আকাশ জুড়ে
পালিয়ে বেড়ায় বনের আঁকে বাঁকে।
মাথায় বুকে লালের টিকা
জ্বলছে যেন অগ্নি-শিখা
স্বপ্ন যেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
ও ভগীরথ, কি সুর হেনে
কোন্ গঙ্গা আনবে টেনে
সারাটা দিন ডাকছ তুমি কাকে!

চলতে চলতে কবি আর একবার দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখি দেখা গেল না, দেখা গেল সেই বুড়িটাকে। নোংরা বুড়ি। দারিদ্র্যজীর্ণ। দেখে মায়া হয়, কিন্তু বড় বেমানান। এখানে ও কেন? মহত্ত্ব যেখানে বিগলিত হয়ে পড়ছে শত ধারায়, সেইখানে গিয়ে ও স্নান করে আসুক। রূপের আসরে ওকে মানাচ্ছে না একটুও।

নিমডালে ঝরিতেছে সবুজের ঝরনা
বলে যেন, সর্ না, ওরে বুড়ি সর্ না।
না যদি সরিস্ তবে
চল্ সেই উৎসবে
ছুটে চল্ সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।

ফুল যেথা ফুটে আছে
থরে থরে কাননে
হাসি করে ঝিকি-মিকি
নয়নে ও আননে
যেথা জোনাকির ঝাঁকে
পরীরা লুকিয়ে থাকে
দারিদ্র্যে করে যারা
বিচিত্র-বর্ণা
ছুটে চল সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।

বুড়ি মিলিয়ে গেল, নিমগাছ মিলিয়ে গেল, সহসা কবির অন্তর জুড়ে বেজে উঠল নতুন একটা সুর। সেই চিরন্তন না-পাওয়ার সুর, অন্তরের অন্তস্থল থেকে কারণে অকারণে যা উৎসারিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ওগো,
ওগো আগুন, ওগো আমার শিখা,
অন্তরালে লুকিয়ে আছ কোথা
সরাও সখি, সরাও যবনিকা।

আবছায়াতে লুকিয়ে থেকে থেকে
সবার চোখে বেড়াও দেখে দেখে
সবার সুরে আমায় ডেকে ডেকে
ভোলাও শুধু নিপুণ চতুরিকা।
ভুলছি আমি দুলছি নানা দোলায়
বাসছি ভাল নতুন ক'রে রোজই
কিন্তু সখি এরই মধ্যে জেনো
মনে মনে চলছে তোমার খোঁজই
ভুলি নি তো সেই কত কাল আগে
রাঙিয়েছিলে আমায় রাঙা ফাগে
যদিও আজ স্বপন সম লাগে
রক্ত-রঙে মর্মে আছে লিখা
সরাও সখি, সরাও যবনিকা।

একটা আমগাছের ডালে পরগাছা হয়েছিল। লাল লাল তার পাতা। সেইটে কবির চোখে পড়ল হঠাৎ। উৎসুক উন্মুখ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই দিকে, মনে হ'ল, আকাঙ্ক্ষিতাকে পাওয়া যাবে বুঝি ওই বর্ণোৎসবের মাঝখানে।

"ওদিকে কি দেখছেন, এই দিকে আসুন। পাখিটা উড়ে গিয়ে আবার কাঁঠালগাছটায় বসেছে। এইবার দেখা যাবে বোধ হয়।...দেখুন দেখুন দেখুন, দেখতে পেলেন?"

এক ঝাঁক ছোট্ট পাখি উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে বসল দূরের আমগাছটায়।

"মিনিভেট।"—উদ্ভাসিত মুখে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। তারপর ঘাসের উপরেই ব'সে পড়লেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। কবির দিকে আবার ফিরে চাইলেন। দৃষ্টি উৎফুল্ল।

"মিনিভেট। বাংলা নাম সয়ালী, এগুলো ছোট সয়ালী। অনেকগুলো এসে বসেছে, দেখতে পাবেন এখনই। ওই গাছটার ওপরই ফোকাস করুন। উড়লেই দেখবেন পেটের নীচে ডানার নীচে টুকটুকে লাল। পিঠের ওপরটা কালচে গোছের, মানে—গ্রেইশ ব্রাউন, দেখুন ভাল ক'রে।"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে আমগাছের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"দেখেছি। বাঃ, চমৎকার তো! কি নাম বললেন?"

"সাত সয়ালী।"

"পছন্দ হ'ল না, আমি ওর নাম দিচ্ছি আলতা-পরী—"

কবি আবার চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "চলুন, এবার বারবেটটাকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।"

দুজনে এগুলেন আবার কাঁঠালগাছের দিকে।

কবি গুনগুন করছিলেন মনে মনে—

শীতের মাসে গোপন পথে
আসলো কি ফাগুন
ডালিম-ফুলী আলতা-পরী
ছাই-চাপা আগুন।

"বসে পড়ুন ওইখানে। ওই তালগাছটার দিকে কাঁঠালগাছের যে ডালটা বেঁকে রয়েছে, ওইখানে ব'সে আছে বসন্ত-বউরি। ভারি অস্থির পাখি—ওই জায়গাটায় ফোকাস ক'রে থাকুন, দেখতে পাবেন।"

বসবার স্থানটা অবশ্য ভাল ছিল না। বড্ড ঢালু। বাঁ দিকে খেজুরগাছের ঝোপ একটা, বৈজ্ঞানিক নির্বিকারচিত্তে তার পাশেই ব'সে পড়েছিলেন। দামী প্যাণ্টটা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল ছিল না। কবিরও মনে বিকার নেই, কিন্তু বসবার সুবিধা পেলেন না ব'লেই দাঁড়িয়ে দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখিটা উড়ে গেল। বৈজ্ঞানিক চ'টে উঠলেন।

"বলছি, ব'সে পড়ুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভয়ানক চালাক পাখি, কেউ দেখছে ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে তক্ষুনি উড়ে পালাবে। আবার গিয়ে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটায় বসল। চলুন, আবার যেতে হবে অনেকটা।"

চলতে লাগলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, এই ফাঁকে কবিকে মিনিভেট সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করলে সময় কাটবে।

বললেন, "দেখুন, ওই যে মিনিভেটগুলো দেখলেন, ওগুলোর মেয়ে আর পুরুষ কিন্তু একরকম নয়। পুরুষদের যেমন ডানা আর পেটের নীচে লাল, মেয়েদের তেমনই আবার হলদে।"

কবি উত্তর দিলেন, "আমার কারবার পাখির রূপ নিয়ে, মেয়ে-পুরুষ নিয়ে নয়। ব্যাকরণ নিয়ে আমি তত মাথা ঘামাই না। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে আমি বলব—

আলতা-পরী আলতা-পরী
রঙ্গনিপুণ রঙ্গিণী
সঙ্গে ক'রে বেড়াও নিয়ে
বাসন্তী-রঙ সঙ্গিনী।"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন, কবিও হাসলেন। ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তাঁরা।

"চমৎকার দেখা যাচ্ছে এইবার। লাগান, লাগান, দূরবীন লাগান, বাঃ!"

কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখতে পেলেন এইবার।

"দেখেছি। বারবেট? উঁহু, ভাল নাম তো নয়। তবে একে পরীও ঠিক বলা চলে না। অনেকটা চক্রবর্তী-চক্রবর্তী ভাব। ওর উচ্ছ্বসিত স্বর শুনলে মনে হয়, কোনও কলস্বরা কিশোরী বুঝি। তবে রঙ আছে গায়ে। পিঠটা সবুজ, মাথাটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না—হ্যাঁ, দেখেছি এইবার, তামাটে। আবার ঘুরে বসল, বুকটা দেখা যাচ্ছে, মাথারই মত প্রায়। চোখে হলুদ চশমা, ঠোঁটও হলদে...উড়ে পালাল..."

বাহিরে প্রবীণ চক্রবর্তী
অন্তরে তুমি কিশোরী কলস্বরা
গানের তুবড়ি আকাশে ছোটাও
সুরের ফুলকি ওড়ে গিটকিরি-ভরা
উৎসের মত শূন্যে ছড়ায়ে পড়ে
সবুজ পুচ্ছ পাতার আড়ালে নড়ে।
হলুদ রঙের চশমা দেখিয়া চোখে

কে বুঝিবে তুমি চঞ্চলা চতুরিকা
মর্ত্যে থাকিয়া বিহর স্বর্গলোকে
অন্তর ভরি সুর-স্বপনের শিখা
অতি অপরূপ ছদ্মবেশের তলে
ঊর্ধ্বমুখেতে রঙিন আলোতে জ্বলে।

কবি কবিতা ভাঁজছিলেন মনে মনে, আর বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছিলেন, "এই বারবেটগুলো কোথায় বাসা বাঁধে জানেন তো? গাছের ডালে গর্ত ক'রে। ওদের গায়ে অত রঙ, ডিমগুলো কিন্তু সাদা হয়...ওই দেখুন দেখুন দেখুন—"

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক হলুদ রঙের পাখি উড়ে গেল।

"বান্‌টিং—"

"বাংলা নাম কি?"—কবি জিজ্ঞেস করলেন।

"জানা নেই। শীতকালে এরা এ দেশে আসে দলে দলে। ধানক্ষেতে জোয়ারিক্ষেতে বাজরাক্ষেতে দলে দলে নামে। খুব ফসল নষ্ট করে এরা। কিন্তু চমৎকার দেখতে। গাছপালার ওপর যখন দল বেঁধে বসে, তখন সবুজের মাঝখানে হলুদের সে যে কি অদ্ভুত শোভা হয়। এদের দুটো জাত সাধারণত দেখা যায়, এক জাতের মাথাটা কালো আর এক জাতের মাথাটা লাল, বুঝলেন, কিন্তু এদের সোনার মত হলুদ রঙটাই এদের বৈশিষ্ট্য। ছোট পাখি, আমাদের চড়ুইপাখির মত।"

কবি বললেন, "এরাই সোনাপাখি নয় তো? ঠাকুরমার কাছে ছড়া শুনতাম—

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়লো
বর্গী এল দেশে
সোনাপাখিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।"

"ঠিক বলেছেন, এরা সোনাপাখিই।"

বৈজ্ঞানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন একবার কবির মুখের দিকে।

"তা হতে পারে, ঠিক বলেছেন। ওই দেখুন, আর একদল উড়ে যাচ্ছে, সেই দলটাই বোধ হয়।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সোনার মেঘ উড়ে যাচ্ছে যেন একটা।

সোনার স্বপন নামছে নাকি
মর্ত্যভূমে
তাই কি ধরা অর্ঘ্য সাজায়
সবুজ ধানে যব-গোধুমে
নীল আকাশে আত্মহারা তাই কি রবি
তাই কি জাগে কবির চোখে রূপের ছবি
গাছের ডগায় নদীর চড়ায়
মায়ের মুখের মধুর ছড়ায়
শিশুর ঘুমে?

"চমৎকার, না?"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

কবি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সোনার মেঘ উড়ে চ'লে গেল দৃষ্টির ওপারে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওদের ডিমও খুব সুন্দর শুনেছি। ফিকে সবুজ রঙের, মিউজিয়মে দেখেছি একবার।"—এই পর্যন্ত ব'লে বৈজ্ঞানিকের খেয়াল হ'ল, "রূপচাঁদকে তো দেখছি না! কোথা গেল সে?"

এদিক ওদিক চেয়ে কবি বললেন, "তাই তো কোথা গেল?"

"চলুন দেখি।"

দুজনে বেরুলেন রূপচাঁদের খোঁজে।

"ওগুলোকে চেনেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, ছাতারে।"

"হিন্দী নাম কাচবাচিয়া, কেউ কেউ সাতভাইও বলে, কিন্তু যেরকম কচবচ করে সর্বদা, ইংরেজী সেভেন সিস্টার্স নামটাই বেশি লাগসই ব'লে মনে হয়, কি বলেন? কিন্তু ভারি মিল আছে ওদের নিজেদের মধ্যে, বাজে ছোঁ মেরে যদি নিয়ে যায় একটাকে, বাকিগুলো পালিয়ে যায় না, বাজের পিছু পিছু ছোটে, অনেক সময় ছাড়িয়েও আনে। এমনও দেখা গেছে যে, ওদের দলকে যখন খাঁচার মধ্যে বন্দী ক'রে রাখা যায়, তখন একটাকে ছেড়ে দিলে সেটা আবার ফিরে আসে খাঁচার মধ্যে। পরস্পর খুব ভাব, দুপুরে গাছতলায় দেখবেন, এ ওর মাথা খুঁটে দিচ্ছে। এদের নিয়ে আপনারা কবিতা লেখেন না, কিন্তু যাদের নিয়ে লেখেন, তাদের সঙ্গে এদের খুব নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, চাতক আর বউ-কথা-কও তেমনিই ডিম পাড়ে এদের বাসায়। এদের ডিম দেখলে কিন্তু কবিত্ব জাগবে আপনার মনে। পাখির ডিম নিয়ে আমি যে প্রবন্ধটা ফেঁদেছি, তাতে—দেখুন দেখুন, একটা ফড়িং ধরেছে। পোকা খুব খায়, ফল পেলেও ছাড়ে না—"

বৈজ্ঞানিক ছাতারে প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে চলেছিলেন। কবির মনে কিন্তু একটি কথাই কেবল আটকে গিয়েছিল, ওদের মধ্যে ভারি ভাব এবং এইটেকেই কেন্দ্র ক'রে মনের মধ্যে গুনগুন করছিল দুটো লাইন—

নিজেদের মাঝে এত স্নেহ আছে নাকি
ধরার ধূলার ধূসরবরণ পাখি?

হঠাৎ রূপচাঁদকে দূরে গেল দেখা।

একা নয়, সঙ্গে একটি মেয়েও রয়েছে। আর একটু কাছে আসতে দেখা গেল, মেয়েটি তরুণী। আরও একটু কাছে গিয়ে নজরে পড়ল, একটা ঘড়া বসানো রয়েছে মাটিতে।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি?"

স্মিতমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রূপচাঁদ উত্তর দিলেন, "রস।"

"কি রস?"

"মধুর।"

তারপর আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে বললেন, "জিরেন কাটের খেজুর-রস। সব যোগাড় ক'রে তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম। পেয়ালা তিনটে গেল কোথায়?"

দেখা গেল, এই বনের মধ্যে রূপচাঁদ তিনটে কাচের পেয়ালাও যোগাড় করেছেন।

মেয়েটির দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আপনিই পরিবেশন করুন তা হ'লে।"

মেয়েটি খুব সপ্রতিভভাবে মাথা নেড়ে ঘড়া থেকে রস ঢালতে লাগল পেয়ালায়। বৈজ্ঞানিক চোখে দুরবীন লাগিয়ে কি যেন একটা দেখছিলেন, এসব দিকে লক্ষ্যই ছিল না তাঁর। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অপরিচিতা মেয়েটির দিকে। লাবণ্যময়ী তরুণী।

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
রঙিন স্বপনলোকে মন যেন ঘুরে মরে
ঘুরে ঘুরে বারে বারে কারে চায়!

রঙ জাগে ফুলে ফুলে প্রভাতের আলোকে
রঙ জাগে পাখিদের পালকে
আকাশের নীলে আর মাঠ ভরা সবুজে
রঙের তুফান জাগে,—তবু যে

কিছুতে ভরে না মন, আরও চাই আরও চাই—
বাকি যেন আছে কিছু কি যেন কি মেলে নাই
তাই কি উঠিল ফুটি রূপসীর আঁখি দুটি
শ্যামল বনের পটভূমিকায়!

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
কি যেন কি পাই নাই কি যেন কি বাকি আছে
ঘুরে ফিরে বারে বারে মন গায়!

"নিন।"

কবি আত্মস্থ হলেন। দেখলেন ফেনায়িত রসের পেয়ালা তুলে ধরেছে সে। কবির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "খুঁজতে বেরিয়েছিলাম পাখি, পেয়ে গেলাম সাকী।"

মেয়েটি হাসলে একটু—ম্লান বিষণ্ণ হাসি, কবির মনে হ'ল।

বৈজ্ঞানিক চোখ থেকে দুরবীন নামিয়ে সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, "বাঃ, সাদা-পেট ফিঙে দেখেছি একটা। দেখবেন ওই দুরের আমগাছটায় নীচু ডালে ব'সে আছে, ওদিকে নয়, এই দিকে, চলুন, আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক বরং, এখান থেকে দেখতে পাবেন না আপনি, চলুন।"

"রসটা খেয়ে যান।"

"ও ধন্যবাদ—দিন।"

এক নিশ্বাসে ঢকঢক ক'রে রসটা খেয়ে ফেললেন বৈজ্ঞানিক। পেয়ালাটা মাটিতে নামিয়ে কবির দিকে চেয়ে বললেন, "চলুন, সাদাপেট ফিঙে চট ক'রে দেখা যায় না। রূপচাঁদ, যাবে নাকি?"

রূপচাঁদ একটি গাছের গুঁড়ির উপরে ব'সে তারিয়ে তারিয়ে চুমুকে চুমুকে রস খাচ্ছিলেন। বললেন, "তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি।"

২

বৈজ্ঞানিকের নাম অমরেশ সেনগুপ্ত। বৈজ্ঞানিক হবার যোগ্যতা আছে। সুযোগও ঘটেছে। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, ধনী শ্বশুরের একমাত্র জামাই। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রীও আছে একটা—জীব-বিদ্যা বিষয়ে। সাধারণ লোক হ'লে চাকরি করতেন। অমরেশের পক্ষে চাকরি যোগাড় করা শক্তও হ'ত না খুব। অমরেশ কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তি। চাকরির ঘানিতে ঘুরে বাঁধা-মাপের বরাদ্দ জ্ঞান-তৈলটুকু নিষ্কাশন ক'রে তৃপ্ত থাকবার মত মন তাঁর নয়। প্রকৃতির বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। জ্ঞান আহরণ করতে চান। উৎসুক উৎকর্ণ আছেন সর্বদা। থাকা সম্ভব হয়েছে, কারণ অর্থাভাব নেই। পিতৃকুল শ্বশুরকুল—উভয়কূল থেকেই তাঁর তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ এসে জুটেছে, তা অনায়াসেই অনর্থ সৃষ্টি করতে পারত, যদি অমরেশ সাধারণ লোক হতেন। তিনি যা করতে চাইছেন, তা-ও অবশ্য সনাতন মল্লিকের মতে অনর্থক। তিনি মফস্বলে নিজেদের জমিদারিতে একটা চিড়িয়াখানা বানাতে চান। তাতে জীবিত এবং মৃত নানারকম পাখি থাকবে। তাঁর ধারণা, এ দেশে পক্ষীবিষয়ে সম্যক গবেষণা এখনও হয় নি। বিদেশী সাহেবেরা চাকরি করবার ফাঁকে ফাঁকে যিনি যতটুকু পেরেছেন ক'রে গেছেন। উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও অনেক কিছু করা দরকার। এমন অনেক ছোট পাখি তিনি দেখতে পাচ্ছেন, যাদের শ্রেণী ঠিকমত নির্দিষ্ট হয় নি এখনও। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি সম্বন্ধেও সব তথ্য পুরো জানা যায় নি ব'লে তার বিশ্বাস। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, এই সব বিষয়ে আলোকপাত করবেন। পাখিদের নতুন নতুন শ্রেণী আবিষ্কার করবেন—তাঁদের ঠোঁট, পালকসংখ্যা, পায়ের গড়ন প্রভৃতি থেকে। কলকাতা থেকে সম্প্রতি এসে পারিপার্শ্বিকতা কেবল পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি আজকাল। ঠিক কোন্ রাস্তাটা ধরবেন ঠিক হয় নি এখনও, মাথার মধ্যে নব নব প্রেরণা ভিড় করছে কেবল। আর একটা সুবিধে হয়েছে—ছেলেপিলে হয় নি। তৃতীয় সুবিধে—স্ত্রী রত্নপ্রভাও অসাধারণ মহিলা। অত্যন্ত কুৎসিত। কালো রঙ, বলিষ্ঠ গঠন। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ফজলি আম। খুব কম কথা বলে। চোখ দুটি বেশ বড় বড়। সেই চোখ দুটি কখনও কুঞ্চিত কখনও বিস্ফারিত ক'রে মনোভাব প্রকাশ করে সে। কথা ক্বচিৎ বলে। যখন বলে, তখনও শোনা যায় না ভাল ক'রে। কণ্ঠস্বর ধরা, ভাঙা ভাঙা। মনে হয়, সর্দি হয়েছে। লেখাপড়া জানে না বিশেষ। অমরেশের কার্যকলাপ নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে সে। খামখেয়ালী দামাল ছেলের দুরন্তপনা উপভোগ করেন যেমন স্নেহময়ী জননী, রত্নপ্রভাও তেমনই উপভোগ করে উদ্দামপ্রকৃতি স্বামীর শিশুসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু নীরবে। কথার কলরবে বা কচকচিতে অমরেশের শান্তি বিঘ্নিত করে না কখনও। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সে খুবই সচেতন। অমরেশের মত বিদ্বান রূপবান স্বামীর সহধর্মিণী হবার মত কি-ই বা তার আছে। সে কেবল প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে চলেছে, অমরেশের যাতে কোনও রকম কষ্ট না হয়। খাবার, বিছানা, বই, যন্ত্রপাতি, পাখিগুলি, এই সবের সুনিপুণ তদারক ক'রে অমরেশের খামখেয়ালী ছন্নছাড়া জীবনকে কথঞ্চিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রয়াস পায় সে। ক্রীতদাসীর মত সেবা করে। কিন্তু বাইরে থেকে ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেয় না যে, সে ক্রীতদাসী। তার কালো কালো মাংসল মুখখানি দেখলে মনে হয়, খুব গম্ভীর রাশ-ভারী লোক সে। সে যে মনে মনে অত কুণ্ঠিত ভীরু, বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। অমরেশও মনে মনে তাকে ভয় করেন। শুধু তাই নয়, রত্নপ্রভার বুদ্ধি যে তাঁর চেয়ে অনেক কম, এ কথা অমরেশ যেন মানেনই না মনে হয়। পক্ষীতত্ত্ববিষয়ক নানা বক্তৃতা অসঙ্কোচে তিনি ক'রে যান রত্নপ্রভার

কাছে। রত্নপ্রভাও গম্ভীরমুখে শোনে ব'সে ব'সে। সেদিন যেমন হচ্ছিল। রত্নপ্রভা গম্ভীরমুখে ব'সে সুপুরি কুচিয়ে যাচ্ছিল, আর অমরেশ ব'লে চলেছিলেন অনর্গল।

"দেখ, ভাবছি, আরও কতকগুলো রেডস্টার্ট ধরব। ধ'রে তাদের পায়ে ছোট ছোট লোহার রিঙ পরিয়ে দেব। ওদেশে আজকাল অ্যালুমিনিয়মের রিঙ পরায়, কিন্তু এখানে তো তা পাওয়া যাবে না। লোহার রিঙই পরাব। দোয়েলগুলোর পায়ে যেমন পরিয়েছিলাম। রেডস্টার্টগুলোর পায়েও পরাতে হবে। কেন বুঝতে পেরেছ?"

রত্নপ্রভা বললে, "তুমি যে দোয়েল পাখির জীবনচরিত লিখবে বলেছিলে, তার কি হ'ল?"

অমরেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য। আমাদের দেশী পাখিদের জীবনের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ক'রে তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে তাঁর। দোয়েল নিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাধনাটাকে কিছুতেই একাগ্র রাখতে পারছেন না এবং এজন্য নিজেই তিনি মনে মনে সচেতন হয়ে আছেন। রত্নপ্রভাও সেটা লক্ষ্য করেছে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি। স্কুলের ছেলেরা পড়ায় অবহেলা ক'রে শিক্ষকের কাছে যেমন নানা ছুতো দেখায়, অমরেশের উত্তরটা অনেকটা সেইরকম শোনাল।

"শীতকালে দোয়েল পাখির দেখাই পাচ্ছি না যে। ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। মাঝে মাঝে দেখতে পাই এক-আধ বার। যখন যতটুকু দেখছি, টুকে রাখছি। শীতকালে উইন্‌টার ভিজিটারদের নিয়ে আলোচনা করলে ক্ষতি কি। কি বল?"

ধরাগলায় রত্নপ্রভা বললে, "তা বেশ তো"—ব'লে গম্ভীরভাবে সুপুরি কুচিয়ে যেতে লাগল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আবার বৈজ্ঞানিক,—"ওই রেডস্টার্টগুলো থাকে হিমালয় অঞ্চলে। শীতকালে এই দিকে চ'লে আসে। এখানে ওদের ধ'রে যদি পায়ে রিঙ পরিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে ওরা যখন আবার হিমালয়ে ফিরে যাবে, তখন চেনা যাবে ওদের। তখন যদি আমরা ও অঞ্চলে যাই, কিংবা কোন লোক রাখি ওদের লক্ষ্য করবার জন্যে, তা হ'লে বোঝা যাবে, ওরা ঠিক্ কখন ফেরে, এ দেশ থেকে ও দেশে যেতে ওদের কত সময় লাগে। এই টাইম ফ্যাক্‌টারটা খুব দরকারি, বুঝলে? তারপর জানতে হবে, কেন ওরা ফেরে? হিমালয় থেকে অবশ্য পালিয়ে আসে শীতের চোটে। শীতকালে খাদ্যাভাবও ঘটে। কিন্তু ডিম পাড়বার জন্যে সেখানে আবার ফেরে কেন? এ হতে পারে, গরম দেশে ওদের ডিম ফোটে না ভাল ক'রে। আমাদের দীঘিচকের কাছে যে বিঘে দশেক বাগানটা আছে, হরিশবাবু সেটা বন্দোবস্ত নিতে চাইছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, দেব না। ওটা সমস্তটা জাল দিয়ে ঘিরে ওর মধ্যে শতখানেক রেডস্টার্ট আটকে রাখতে চাই। দেখি, ওরা এ দেশে ডিম পাড়ে কি না! বুঝলে, করব কি, খানিকটা ছ'কে রেখেছি, এই দেখ।"—প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বার ক'রে রত্নপ্রভাকে বোঝাতে লাগলেন তিনি, কি ভাবে বাগানটাকে ঘিরতে হবে। রত্নপ্রভাও এমন গম্ভীরভাবে ঝুঁকে দেখতে লাগল, যেন সে বড় ইঞ্জিনীয়ার একজন।

বাইরে ডাক শোনা গেল, "অমরবাবু বাড়ি আছেন?"

কবির কণ্ঠস্বর।

"কে, আনন্দবাবু নাকি? আসুন, ভেতরে আসুন।"

সুপুরির সরঞ্জাম নিয়ে রত্নপ্রভা অন্তঃপুরের দিকে চ'লে গেল।

কবি ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বারান্দায়।

"আরে মশাই, এ কি রক্তারক্তি কাণ্ড! ছি ছি, করেছেন কি!"

বেরিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"ও, ওটা! একটা রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট করেছি—"

"কেন?"

"দেখতে চাই, ওর সেক্স অর্গ্যানস্‌ ঠিক পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা!"

"তা দেখবারই বা দরকার কি?"

"তা হ'লে অনেক কথা বলতে হয়। ভেতরে আসুন।"

"আহা, অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে কি করেছেন বলুন দেখি? কি নাম বললেন?"

"রেডস্টার্ট—হিন্দী নাম থিরথিরা। ল্যাজটা ওর থরথর ক'রে কাঁপে সাইড টু সাইড। সাধারণত পাখিরা ল্যাজ ওপরের দিকে খাড়া ক'রে তোলে, যেমন দোয়েল—এদের ল্যাজ পাশাপাশি কাঁপে। তাছাড়া এরা বুক-ডন দেয় এমন সুন্দর—"

"কিন্তু ওর লিঙ্গ নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন আপনি?"

"বলছি, বসুন না।"

দুজনে ঘরের মধ্যে এসে বসলেন।

শুরু করলেন অমরবাবু।

"পাখিরা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়, জানেন তো! হিমালয় থেকে এ দেশে অনেক পাখি চ'লে আসে শীতকালে। আবার শীত শেষ হ'লে তারা ফিরে যায় হিমালয়ে, সেইখানেই তাদের জন্মভূমি। সেইখানে গিয়েই তারা বাসা করে, ডিম পাড়ে বাচ্চা হয়। শীতের দেশের পাখি এ দেশে কক্‌খনও ডিম পাড়ে না, এই একটা মজা। ডিম পাড়বার সময় হ'লে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে আবার স্বদেশে ফিরে যায় সব। কেন ফিরে যায়, কি ক'রে ফিরে যায়, এটা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা মস্ত গবেষণার বিষয়। গড়উইন ব'লে এক পাগলা বিশপের অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনি বলতেন, পাখিরা চাঁদে যায়। গিল্‌বার্ট হোয়াইটের মত বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করতেন যে, শীতকালে সোয়ালোরা পুকুরে কাদার নীচে চ'লে যায়। এসব কথা কিন্তু বিশ্বাস করে না কেউ আজকাল। আজকালকার থিয়োরি হচ্ছে যে পাখিরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়, তার কারণ, পাখির ভিতরে এবং বাইরে দুজায়গাতেই আলো আছে। দিন যত বড় হতে থাকে পাখিদের গায়ে আলো তত বেশি লাগে। সেই আলোর প্রভাবে তাদের সেক্স অর্গ্যান্‌স পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তারা স্বদেশে ফিরে যায়। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে যে স্টেরাইল পাখিদের ফিরে যাবার তাগিদ থাকে না। এ-ও দেখা গেছে যে, যখন তারা শীতের দেশ থেকে এ দেশে আসে তখন তাদের সেক্স্‌ অর্গ্যান্‌স খুবই অপরিপুষ্ট, তারপর কিছুদিন তাদের এভিয়ারিতে কৃত্রিম আলোতে রেখে এবং আলোর পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রমাণ করেছেন একজন যে, তাদের সেক্স্‌ অর্গ্যান্‌স পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। এরও অবশ্য নানা ব্যতিক্রম দেখা গেছে পরে, আমি তাই দেখছিলাম যে, এই রেডস্টার্টটার সেক্স্‌ অর্গ্যান্‌স কি রকম। কয়েকটা রেডস্টার্ট ধরেওছি। তাদের আলট্রাভায়োলেটে এক্‌স্‌পোজ ক'রে দেখব কি দাঁড়ায়।"

"কি দাঁড়ায় তা তো একজন বৈজ্ঞানিক দেখেছেন বললেন, আবার কেন?"

"বিজ্ঞানে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। প্রত্যেক জিনিসটি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়—"

বৈজ্ঞানিক স্মিতমুখে চাইলেন কবির দিকে।

"পরীক্ষা ক'রে জানতে চান, এক-জাতের পাখি শীতকালে আর এক দেশে যায় কেন?"

"হ্যাঁ।"

"সেইজন্যে অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে একাক্কার করেছেন?"

"নিশ্চয়। তাতে ক্ষতি কি?"

"আমি জানি, কেন যায়।"

"জানেন?"

কৌতূহলভরে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি।

"কেন, বলুন তো?"

"টানে।"

"টানে? হোয়াট ডু ইউ মীন? কিসের টানে?"

"প্রাণের টানে। অনবরত টানাটানি চলছে, দেখতে পাচ্ছেন না? শুধু পাখি কেন, যখন যেদিকে বেশি টান পড়ে, তখন সেই দিকে সবাই চ'লে যাই আমরা। চেয়ে দেখুন, বিশ্ব জুড়ে অবিরাম এই টানাটানি চলেছে। দিন।"

"কি?"

"কাগজ পেন্সিল।"

"কি হবে?"

"দিন না।"

কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন কবি। বৈজ্ঞানিক বেরিয়ে গেলেন তাঁর ব্যবচ্ছেদিত রেডস্টার্টটার তদারক করতে। অনেক কিছু করতে হবে তাঁকে এখন। ওভারি দুটোকে ফ্রিজ্ ক'রে মাইক্রোটোম দিয়ে কেটে মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে। সেগুলোর ফোটো তুলে রাখতে হবে। তা ছাড়া দুটো ছোট ছোট ঘরে দু দল রেডস্টার্ট রেখেছেন, এক দলকে রেখেছেন অন্ধকারে, আর এক দলকে আলট্রাভায়োলেট আলোর মধ্যে। সেগুলোর খবর নিতে হবে একবার। পাখিগুলোকে খেতে দিয়েছে কি না, কে জানে! চাকরগুলো মাইনে নেয় একগাদা কিন্তু কাজ কিছু করে না। প্রথমত জানে না, দ্বিতীয়ত জানতে চায় না। ভারি ফাঁকিবাজ সব। মুন্সিটা পাখির খাবার এনেছে কি না তারও ঠিক নেই। বীট্‌ল্ সেদিন চিনিয়ে দিয়েছেন তাকে। রেডস্টার্টগুলো বীট্‌ল্ খেতে খুব ভালবাসে। গুটিপোকাও খুব খায়, ফড়িং হলেও চলে, নিদেনপক্ষে পিঁপড়ে। কিন্তু খুঁজে আনে তবে তো....। এই দেশে পাখি পোষার এই এক মহাঝঞ্ঝাট, বাজারে পয়সা ফেললে তাদের খাবার কিনতে পাওয়া যায় না। ও দেশে যায়। এ দেশে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে, ছাতু খাওয়ান। আশ্চর্য এদের বুদ্ধি! পাখি কি মানুষ যে, ছাতু খাবে!

হনহন ক'রে গেলেন তিনি বাগানের পিছন দিকটায়। সেখানে তক্তা, কাচ, লোহার জাল, সুতোর জাল, তাঁবু প্রভৃতি নানা সরঞ্জামের সহায়তায় বাগানের দুটো অংশ গাছপালা সমেত ঢেকে বিরাট দুটো খাঁচায় পরিণত করেছেন। অন্ধকারের ভিতর যে রেডস্টার্টগুলোকে রেখেছেন, সেখানটা সম্পূর্ণ ঢাকা আছে প্রকাণ্ড একটা তাঁবুতে। তার ভিতর কম-পাওয়ারের একটা ইলেকট্রিক লাইট আছে, খাবার দেওয়ার সময় সেটা জ্বালা হয় কেবল। সেইখানটায় গেলেন তিনি আগে। কান পেতে রইলেন তাঁবুর বাইরে। অতি সন্তর্পণে। বাসর-ঘরেও অত সন্তর্পণে লোকে আড়ি পাতে না। 'হুইট...হুইট...হুইট' ওই যে ডাকছে! বড় করুণ ব'লে মনে হ'ল। খেতে পায় নি নাকি? আহা, কোন্ সুদূর থেকে এসেছে বেচারারা, কাশ্মীরঅঞ্চলে

হিমালয়ের কাছে বাড়ি ওদের...বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠুর কৌতূহল করুণার্দ্র হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, পাখির ডাক জিনিসটা অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত! আমাদের কথা দিয়ে কিছুতে প্রকাশ করা যায় না তা। 'কুহু' বললেই কি কোকিলের কলকণ্ঠের সবটা বোঝানো যায়? রেডস্টার্টের দুটো 'হুইট' এর মাঝখানে ওই যে কেমন একটু শব্দ আছে, যা তৈলহীন সাইকেলের চাকার শব্দের মত অনেকটা, তা ভাষায় কিছুতেই লেখা যায় না। একই পাখির একই ডাককে আমরা বলছি 'চোখ গেল', সাহেবেরা বলছে 'ব্রেন ফিভার', বেহারীরা বলে 'পিউ কাঁহা', মারহাট্টীরা 'পাওসালা'। অথচ ডাক একই। আচ্ছা, এদেব গলার স্বরের গ্রাফ রাখলে কেমন হয়?...অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। গ্রাফের কথাই ভাবতে লাগলেন। পাখিগুলোকে ধ'রে ধ'রে ফোনোগ্রাফের মত কোন যন্ত্রের সামনে যদি রাখা যায়, কিন্তু তা হ'লে তারা ডাকবে কি? মনের আনন্দে ওরা ডাকে, ধর-পাকড় করলে ডাকবে না বোধ হয়, অবশ্য চেষ্টা করলে ক্ষতি নেই। খুট্ করে শব্দ হতেই বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন মুন্সি দাঁড়িয়ে আছে।

"কি রে, পাখিদের খাইয়েছিস?"

"হাঁ বাবু, কিন্তু কাল থেকে আমি আর পারব না হুজুর। মল্লিকবাবু আজ আমাকে মারবার জন্যে তেড়ে এসেছিলেন। তাঁর বাগানে আমি আর ঢুকব না।"

"তাঁর বাগানে যাস কেন? আমদের নিজেদের কত বড় বাগান রয়েছে—"

"আমাদের বাগানে ছোট ছোট ফড়িং কই?"

"নেই?"

"না।"

হঠাৎ সমস্যাটা খুব জটিল ব'লে মনে হ'ল তাঁর কাছে। তাঁর বাগানে ফড়িং নেই, অথচ মল্লিকবাবু ফড়িং ধরতে দেবেন না, পয়সা দিলে বাজারে ফড়িং পাওয়া যাবে না...মহা মুশকিল তো। পাখিগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে নাকি শেষকালে? না, তাই বা কি ক'রে হয়?...

"আমাদের বাগানে ফড়িং নেই?"

"দুটো চারটে—"

"খুঁজে দেখেছিস ভাল ক'রে?"

"খুব খুঁজেছি হুজুর।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন বৈজ্ঞানিক। আড়চোখে চেয়ে স'রে পড়ল মুন্সি। খামখেয়ালী পাগল লোকে হঠাৎ কখন কি ক'রে বসেন বলা যায় না। অমরবাবু আর একবার কান পেতে শুনলেন। হুইট—হুইট—হুইট—ঠিক ডাকছে। মল্লিক লোকটাকে এখন কি ক'রে বাগানো যায়? লোকটার কেন যে এমন অকারণ রাগ বোঝা শক্ত। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে তাস-পাশার যে আড্ডা বসে, তাতে যোগ দেবার জন্যে দু-একদিন আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু অমরবাবু যান নি। অন্য কোন কারণে নয়, খেলতে পারেন না ব'লে যান নি। একটা কীর্তনের দল এসেছিল একদিন তাঁর বাড়িতে, শুনতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেবারও যান নি। কীর্তন-টির্তন ভালই লাগে না মোটে। মনে হয় মৃদঙ্গ বাজিয়ে অকারণে কতকগুলো লোক হুল্লোড় করছে গানের নাম ক'রে। এই সব কারণেই চটলেন নাকি ভদ্রলোক? হয়তো। অন্যায় কিন্তু—অত্যন্ত অন্যায়। তিনি কি চান, আমি পড়াশোনা পরিত্যাগ ক'রে ভাল না লাগলেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাস খেলব আর কীর্তন শুনব? তা না হ'লে আমার পাখির ফড়িং খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবেন? অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। এই ধরনের চিন্তা করতে করতে

হনহন ক'রে ফিরছিলেন তিনি। আবার এবং ক্রমাগত ভাবছিলেন, মল্লিক লোকটাকে কি ক'রে বাগানো যায়। নানারকম উপায়ের কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু যে মোক্ষম উপায়টি অবলম্বন করলে অবিলম্বে সব ঠিক হয়ে যায়, সেটি ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক তাঁরই কর্মচারী। তাঁদের হরিপুরা জমিদারির ম্যানেজার তিনি। মুন্সি যে বাগানটায় ঢুকতে পায় নি, সেটা অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তিনি—মানে অমরবাবু নিজে যদি একটা চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ করতেন, তা হ'লে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তা লেখবার কল্পনাও করলেন না। মনিবত্বের সুযোগ নিয়ে মল্লিকের বাগানে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোক ঢুকিয়ে ফড়িং সংগ্রহ করবেন, এ তাঁর কল্পনাতীত। মল্লিকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কেবলই ভাবছিলেন, এ রকম করার অর্থটা কি। আমার এই গবেষণাটা যে ঠিক কি জাতীয়, তাই বোধ হয় ধারণা নেই ওঁর। উনি বোধ হয় ভাবছেন, ছেলেখেলা হচ্ছে একটা। পাখিদের এই বার্ষিক গতি-বিধি যে কত রহস্যময়, তা একদিন বুঝিয়ে বললে বোধ হয় আপত্তি করবেন না আর। পাখিরা যে কিসের টানে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চ'লে যায়, তা ঠিকমত নির্ণয় করতে পারলে বিজ্ঞান-জগতে হৈচৈ পড়ে যাবে একটা। এই নিয়ে পৃথিবীর কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামিয়ে সারা হচ্ছেন, কত লোক গবেষণা করার সুযোগই পাচ্ছেন না, আর তিনি তাঁর বাগানে ফড়িং ধরতে দেবেন না, এ কি কথা হ'ল। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বোঝেন নি ভদ্রলোক। কিংবা মুন্সি হয়তো তাঁর বাগানের গাছে-টাছে হাত দিয়েছে। কিছুই বিচিত্র নয়...। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মল্লিক-প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন একেবারে। একটু দূরে ঘাসের উপর পালক প'ড়ে রয়েছে একটা। প্রায় ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন সেটাকে। দোয়েলের পালক। সাদায় কালোয়—এই তো। অনেক রকম পাখির পালক সংগ্রহ করা আছে তাঁর, দোয়েলের পালক পান নি ইতিপূর্বে। তাঁর এই পালক-সংগ্রহটি একটু বিশেষ ধরনের সংগ্রহ। এতে যে সব পালক তিনি রেখেছেন, তা কুড়িয়ে-পাওয়া পালক। পাখি মেরে তার গা থেকে ছিঁড়ে আর এক ধরনের সংগ্রহ আছে তাঁর—প্রাইমারি সেকেণ্ডারি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ ক'রে। কিন্তু এই কুড়িয়ে-পাওয়া পালকের আকর্ষণ অন্য রকম, বিস্ময় আলাদা। নানা পাখির ডিমও সংগ্রহ করেছেন তিনি, কিন্তু এই হঠাৎ-কুড়িয়ে-পাওয়া পালক তাঁকে যত আনন্দ দিয়েছে, তত আর কিছুতে পান নি তিনি। দোয়েলের পালক কুড়িয়ে পান নি তিনি ইতিপূর্বে! মনের আনন্দে ছুটলেন তিনি বাড়ির দিকে। রত্নাকে দেখাতে হবে। ফিরেই কিন্তু কবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কবি যে বৈঠকখানায় বসে আছেন, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি।

"শুনুন।"

"কি?"

"কবিতা। এক দেশ থেকে আর এক দেশে কেন চিরন্তন চলেছে এই যাওয়া-আসা, তারই কবিতা।"

"পড়ুন।"

১

ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে।
তৃষিত ধরণী লক্ষ মুখেতে পান করে সেই আলোক-ধারা

লক্ষ ছন্দে গাহে আনন্দে আপনার মনে পাগলপারা
পাখির পালকে গাছের পাতায়
ঝলকে চমকে পুলকে ব্যথায়
আত্মহারা
অন্ধকারেতে জ্বালায় তারা।

কণায় কণায় তাহার তনুর
সপ্ত বরণ ইন্দ্রধনুর
বর্ণমালা
উজাড় করিয়া হয় যে ঢালা
কেন কে জানে,
ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে।

২

জানি না আবার সূর্য পানে
লক্ষ যোজন দূরের পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে!
শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া ভঙ্গিমা তার কত যে ওঠে
বন-বনান্ত হয় মুখরিত নব নব কত সুরের চোটে
মাটির কালোয় প'ড়ে যায় সাড়া
বন্দী রঙেরা পেয়ে যায় ছাড়া
সবাই ছোটে
লক্ষ বরণ ফুলেতে ফোটে ;
মাটির মানুষ আকাশের দিকে
দু বাহু তুলিয়া রহে অনিমিখে
কি গান গাহে
কিসের আশায় কাহারে চাহে
কেন কে জানে
জ্বলন্ত-শিখা সূর্য পানে
স্নিগ্ধ শ্যামল কোমল পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে।

কবিতা পাঠ ক'রে কবি চেয়ে রইলেন স্মিতমুখে।

বৈজ্ঞানিক কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে তিনি বললেন, "আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে কিন্তু।"

"কি?"

"রবি ঠাকুরের টানে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর 'লিপি' কবিতাটার ভাব চুরি ক'রে ফেলেছি।"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওকে ঠিক চুরি বলে না। কবিতা খুব ভাল হয়েছে আপনার। একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন, কবিতা বিজ্ঞান নয়। আপনি যে টানের গানে উচ্ছ্বসিত, বৈজ্ঞানিকের কাজই সেই টানের কারণ নির্ণয় করা যুক্তি-সহ উপায়ে। সূর্য কেন পৃথিবীর দিকে আলো পাঠায় আর পৃথিবী থেকে আকাশে এত গান গন্ধ গুঞ্জন কেন ওঠে, তার অনেক কারণ বিজ্ঞান বার করেছে, অনেকগুলোর পারেও নি। কিন্তু পারবে একদিন।"

বৈজ্ঞানিকের এই বালক-সুলভ আত্মপ্রত্যয়ে কবির মুখে একটা অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল। প্রতিবাদ করলেন না। কি হবে প্রতিবাদ ক'রে! তাঁর মনে শুধু গুনগুন ক'রে উঠল কবিতার দুটো লাইন।—

কোন্ চতুরিকা কোন্ পথে আসি
ক'রে যায় কত ছলনা
তার কতটুকু জান বল না!

হয়তো ব্যঙ্গোক্তি করতেন একটা। কিন্তু বাধা পড়ে গেল তাতে। দ্বারপ্রান্তে গোটা তিনেক চাকরের আবির্ভাব হ'ল। দুজনের হাতে খাবারের সরঞ্জাম আর একজনের হাতে চায়ের। পিছনে রত্নপ্রভা। তিনি গম্ভীরভাবে দুজনের সামনে খাবার সাজিয়ে দিয়ে পাশের টেবিলটায় দাঁড়িয়ে চা ছাঁকতে লাগলেন, মুখে একটি কথা নেই। ক্ষুধিত বালকের মত খেতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। দুটো রসগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে সেগুলো গিলতে না গিলতেই একটা কচুরিতে লাগালেন কামড়। কবি এ সময়ে খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, এ সময়ে খাওয়া অভ্যাসও নয় তাঁর! কিন্তু এতগুলি রসবস্তুকে অবহেলা করলে রসবোধেরই যেন অপমান করা হবে—এই ধরনের একটা মনোভাব নিয়ে অথচ শিল্পী-জনোচিত সাবধানতার সহিত তিনি অগ্রসর হলেন। রত্নপ্রভা দুজনের সামনে চায়ের পেয়ালা রাখতেই বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল সহসা। চায়ের সঙ্গে স্টোভের এবং স্টোভের সঙ্গে কেরোসিন তেলের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগই সম্ভবত বিস্মৃত-অপনোদনের কারণ হ'ল।

"যাঃ—ছি—ছি! কটা বেজেছে?"

চেয়ার ঠেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং রত্নপ্রভার দিকে চাইতে লাগলেন অপরাধী বালকের মত। বর্ধমানের বাইরে এমন সীতাভোগ কি ক'রে হওয়া সম্ভব—কবি চিন্তা করছিলেন, তাঁর চিন্তাধারা ছিন্ন হ'ল এতে।

"কি হ'ল আপনার আবার?"—একটু বিরক্তকণ্ঠেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

"কেরোসিনের পার্‌মিটের জন্যে একটা লোক পাঠাবার কথা ছিল, ছি ছি, একদম ভুলে গেছি।"

"লোক পাঠিয়ে পার্‌মিট আনিয়ে নিয়েছি আমি।"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভা বললেন।

"তাই নাকি? বাঃ, গোটাচারেক সিঙাড়া দাও তা হ'লে?"

কবিও ব'লে উঠলেন, "ওহো, আমিই বা করছি কি! আমার বাড়িতে কয়লা একেবারেই নেই। আজ উনুন ধরবে না, আপনার কাছে যদি পাওয়া যায় কিছু এই আশায় বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে।"

বৈজ্ঞানিক রত্নপ্রভার দিকে চাইতেই রত্নপ্রভা বললেন, "আমাদের কিছু বেশি কয়লা আছে, আমি দিচ্ছি ব্যবস্থা ক'রে।"—ব'লেই বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

"আনন্দ আছ নাকি?"

"আছি, এস।"

রূপচাঁদ মৌলিক প্রবেশ করলেন। গলায় পাকানো চাদর, বগলে একটি প্যাকেট। এসেই তিনি কবির দিকে এক নজর চেয়ে একটি চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, পাশের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রয়েছে। উঠে গিয়ে নিজেই এক কাপ চা ছেঁকে নিলেন। চায়ে একটা বড়গোছের চুমুক লাগিয়ে কবির দিকে আর এক নজর চেয়ে বললেন, "এরকম ভাবে কতদিন চালাবে বল দিকি আনন্দ?"

"কি রকম ভাবে?"

"পরিবারকে উনুন-গোড়ায় বসিয়ে রেখে কয়লা আনতে যাচ্ছি ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ প্রায় ঘণ্টা দুই আগে, আর এখানে বসে দিব্যি রসগোল্লা ওড়াচ্ছ। তোমার জ্বালায় আমি আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে পারি নি এখনও। পথেই তোমার ঝিয়ের সঙ্গে দেখা, সে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তার মুখেই শুনলুম সব।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! গেলাম বৈজুমলের কাছে। মণ চারেক কয়লা পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। কয়লা নিয়ে ফিরে দেখি, তখনও তুমি ফেরো নি। তখন মনে হ'ল, নিশ্চয়ই পাখির খপ্পরে পড়েছ। বৈজ্ঞানিক মশায়ের সঙ্গে আমারও একটু দরকার আছে, তাই সোজা এখানেই চ'লে এলাম, এখনও বাড়ি ঢুকি নি।"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল শুধু। বস্তুত, কথা বলবার মত অবস্থা তখন তাঁর নয়। শেষ সিঙাড়াটি মুখে পুরে চর্বণ করছিলেন তিনি তখন। কবি স্মিতহাস্যে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ—তোমার কর্তব্য তুমি করেছ, এতে আর বলবার কি আছে!

"ছ'টাকা বারো আনা লেগেছে। ছ'টাকা কয়লার দাম আর বারো আনা কুলি। টাকাটা দিতে ভুলে যেও না। কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা, আমিই আনিয়ে নেব এখন তোমার গিন্নীর কাছ থেকে।"

খানিকটা চা দিয়ে মুখবিবরটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বৈজ্ঞানিক হাঁকলেন, "ওরে, কে আছিস?"

একটা ছোঁড়া চাকর এসে দাঁড়াল।

"আর এক ডিশ খাবার নিয়ে আয়। বল্, রূপচাঁদবাবু এসেছেন।"

"কাজের কথাটা ব'লে নিই আগে"—শুরু করলেন রূপচাঁদ।

"কি কথা?"

"সবজিবাগে নদীর ধারে তোমার যে বাড়িটা প'ড়ে আছে, সেটা দেবে আমাকে?"

"সেটা তো প'ড়ো বাড়ি।"

"একখানা ঘর হ'লেই চলবে। সেই মেয়েটির জন্যে—"

"সে মেয়েটি আছে নাকি এখনও, কে বল তো মেয়েটি?"—কবি ব'লে উঠলেন। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"তা থাকতে পারেন তিনি আপত্তি নেই। তবে—"

একটু ইতস্তত ক'রে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

"তবে আবার কি, খোলসা ক'রেই বল না। শহরের বাইরে তোমার ওই প'ড়ো বাড়িতে

কারও পক্ষে থাকা এমনিতেই শক্ত, তবে মেয়েটি নেহাত নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে—ধর্মশালায় দু' দিনের বেশি তো থাকতে দেবে না।"

"প'ড়ো বাড়ি ব'লেই ওটা বেশি দরকারী আমার কাছে। ওর পাশেই যে বাঁশঝাড়টা আছে। তাতেই কেটুপা (Ketupa) দেখেছিলাম একদিন...ওখানে মাঝে মাঝে যাই আমি রাত্রিবেলা।"

"কেটুপা কি আবার?"

"হুতুম প্যাঁচা।"

রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল বৈজ্ঞানিকের দিকে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক চিকমিক করতে লাগল কেবল।

তারপর বললেন, "বেশ তো, সে যখন দরকার তোমার, যেও।"

"উনি আপত্তি করবেন না তো তাতে?"

"কিছুমাত্র না।"

"মেয়েটি কে, কোথা থেকে এল?"—কবি প্রশ্ন করলেন আবার।

রূপচাঁদ রহস্যময় দৃষ্টি মেলে চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "বার্মা রেফিউজি।"

বৈজ্ঞানিক উঠে গিয়ে দোয়েলের পালকটি তুলে রাখছিলেন তাঁর পালক-সংগ্রহের মধ্যে। রাখতে গিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীলকণ্ঠের পালকটি নূতন ক'রে বিস্মিত করছিল যেন তাঁকে। প্যারাডাইস ফ্লাই-ক্যাচারের ল্যাজের লম্বা পালকটিও ছিল তাঁর সংগ্রহের মধ্যে, সেটির দিকেও স্নেহভরে চাইছিলেন তিনি মাঝে মাঝে। সেই অদ্ভুত সুন্দর পক্ষী-দম্পতিকে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যেন চোখের সামনে—হিন্দী নামটিও চমৎকার—দুধরাজ, সত্যিই যেন রাজারাণী, বাদশা-বেগম বললে আরও ভাল হয়। আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক পালক দেখে যেতে লাগলেন তিনি...ঘুঘু, শকুনি, শিকরে, টিয়া, বটের, তিত্তির...কত রকম পালক...

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "বার্মা রেফিউজি মানে? খুলেই বল না।"

"মানে, জাপানীর ভয়ে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে। রাস্তায় বাপ মা ভাই বোন ম'রে গেছে সব, ডাকাতের হাতে পড়েছিল আসামের জঙ্গলে। এই মেয়েটি পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে কেবল! গায়ের গয়না বিক্রি করতে করতে এতদূরে এসে পৌঁছেছে। রাত্রে জাহাজঘাটে এসে নেবেছিল, তারপর ধর্মশালা খুঁজতে খুঁজতে ভুল রাস্তা ধ'রে শহরের বাইরে গিয়ে পড়ে। তোমরা সকালে যখন পাখি দেখছিলে, তখন আমি খেজুর-রসের চেষ্টায় এগিয়ে দেখি, বাগানের ধারে পুলটার ওপর মেয়েটি ব'সে আছে ম্লানমুখে। বাগানের ও-পাশে শিবু মিস্তির থাকে, তার কাছ থেকে পেয়ালা আনতে যাচ্ছিলাম। ফেরবার মুখে দেখি, তখনও ব'সে আছে মেয়েটি। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় নিলাম। তারপর তো জানই সব—"

কবি বললেন, "আহা, ভারি বিপদে পড়েছে তো মেয়েটি।"

কবির মনটা সত্যই ভারাক্রান্ত হয়ে এল। রূপচাঁদ নিবিষ্টচিত্তে চা খেতে লাগলেন। আর এক ডিশ খাবারও এসে পড়ল।

কবি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কি এখানেই থাকবে নাকি?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না প্রথমটা। মনে হ'ল, এ বিষয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নন তিনি ততটা। কবি কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক।

"মেয়েটি কি এখানেই থাকবে নাকি?"

রূপচাঁদ জবাব না দিয়ে আর পারলেন না।

"কি ক'রে বলব বল?"

"এ দেশে ওর আত্মীয়স্বজন আছে নাকি কেউ?"

"জানি না তো। আমাকে কেঁদে কেটে ধরেছে একটা আশ্রয় যোগাড় ক'রে দেবার জন্যে। চেষ্টা করছি, তারপর কি হয় কে জানে!"

"ওই প'ড়ো বাড়িতে ও একলা থাকতে পারবে?"

"তা কি পারে কখনও!"

"কে থাকবে তা হ'লে ওর সঙ্গে?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না, একমনে কচুরি চিবোতে লাগলেন। কথাটা আরও চাপা প'ড়ে গেল, বৈজ্ঞানিক ফিরে এসে যখন রূপচাঁদের প্যাকেটটা তুলে বললেন, "এটাতে কি?"

"ওটা একখানা শাড়ি"।

"শাড়ি? ও—"

বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল এর বেশি আর অগ্রসর হ'ল না। তিনি প্যাকেটটা টেবিলে রেখে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কবি প্রশ্ন করলেন, "শাড়ি? কার জন্যে শাড়ি কিনলে?"

"শাড়ি আবার কার জন্যে কেনে লোকে। পরিবারের জন্যে। রমেনদের দোকানে দেখলাম টাঙানো রয়েছে, দামটা শস্তা মনে হ'ল, নিয়ে যাচ্ছি, গিন্নীর যদি পছন্দ হয়, রেখে দেওয়া যাবে।"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ ফিসফিস ক'রে বলে উঠলেন, চুপ চুপ, একটা চোরপাখি এসেছে—চেষ্টনাট-বেলিড্ নুটহ্যাচ্। দেখবেন? ওই আমগাছে রয়েছে। গাছের ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়—"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি দূরবীনটা নিয়ে চোখে লাগালেন। কবিও গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। রূপচাঁদ আর একটি কচুরি মুখে পুরলেন।

৩

কবি-গৃহিণী মন্দাকিনী অতিশয় চাঁছা-ছোলা প্রকৃতির লোক। কবিত্ব-টবিত্বর ধার ধারে না বিশেষ। অতিশয় স্বাভাবিক নারী-জীবন যাপন ক'রে থাকেন ভদ্রমহিলা। অনেকগুলি সন্তানের জননী, নানারকম রান্নায় সিদ্ধহস্ত। উলবোনা, সেলাই করাও শিখেছিলেন এককালে ; কিন্তু আজকাল ওসব নিয়ে বসবার সময়ও নেই, পয়সাতেও কুলোয় না। সংসারের ন্যায্য খরচই কুলোতে পারে না, ওসব সৌখিন খরচ করবেন কোথা থেকে! কর্তা 'রিটায়ার' করার পর থেকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ওসব। কবি ছিলেন অধ্যাপক। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শহরে বাড়িখানা আছে, জমি-জমাও আছে কিছু। যা পেন্‌শন পান তাতে কুলিয়ে যায়। কিন্তু কোনক্রমে। সংসারের সমস্ত ভার মন্দাকিনীর উপর। আজকাল ঝি-চাকর পাওয়া যায় না, একা হাতে মন্দাকিনীকেই সব করতে হচ্ছিল এতদিন। বাসন-মাজা, ঘর-নিকানো, রান্না, সাবান-কাচা সমস্তই করছিলেন। সম্প্রতি রূপচাঁদ একটি ঠিকে ঝি যোগাড় ক'রে দিয়েছেন। এত কাজ একা করা সম্ভব হচ্ছিল তার কারণ বাড়িতে এখন লোকজন কম। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠটি ব্যতীত আর সবই কন্যা। তাদের বিয়েও

হয়ে গেছে। সবাই এখন শ্বশুরবাড়িতে। ছেলে মন্টুর বয়স বছর দশেক, মামার বাড়িতে থেকে সে স্কুলে পড়ে। মামীর সে খুব প্রিয়, মামী তাকে ছাড়তে চায় না। উপস্থিত স্বামীকে নিয়েই মন্দাকিনীর সংসার। তবু কিন্তু মন্দাকিনীর অবসর নেই। তিনি সংসারের কাজ নিয়েই থাকেন, ও ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না তাঁর। সংসারকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁর যত ঘোরা-ফেরা। রান্নার অবসরে কখনও ভাঁড়ার গোছাচ্ছেন, কখনও বড়ি দিচ্ছেন, কখনও আচার করছেন, কখনও আমসত্ব। চিনি আজকাল দুর্লভ হয়েছে, চিনি পেলে জ্যাম জেলি করার সখও আছে. তা ছাড়া আছে হাড়-পাঁজরা বের-করা একটি গাই। মন্দাকিনী সখ ক'রে তার নাম রেখেছেন সুন্দরী। দু'বেলায় মেরে-কেটে গরুটি সের খানেক দুধ দেয় কি না সন্দেহ, কিন্তু তাতেই মন্দাকিনী গদগদ। দিবারাত্রি গরুটির সেবা ক'রে চলেছেন। কখনও তাকে ফ্যান খাওয়াচ্ছেন, কখনও নাদা পরিষ্কার করছেন, কখনও জাব মেখে দিচ্ছেন, কখনও গোবর পরিষ্কার করছেন। সুতরাং 'ড্রইং-রুম' বলে যদিও তাঁদের একটি ঘর আলাদা করা আছে এবং সেখানে যদিও মাঝে মাঝে অধ্যাপক মশায়ের বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যাগম-ঘটে, কিন্তু মন্দাকিনীর সেখানে গিয়ে বসবার অবসর নেই। তাঁকে সেখানে মানায়ও না ঠিক। তাঁর বেশবাস কথাবার্তা, হাব-ভাব সমস্তই সেকালে ধরনের। কিছুকাল আগে পর্যন্ত রীতিমত অন্তঃপুরিকাই ছিলেন, অচেনা লোকের সামনে বেরুতেন না। ইদানীং অবশ্য বেরোন, কিন্তু স্বস্তি পান না। কোনও মহিলার সমাগম হ'লে আনন্দবাবুর ডাকাডাকিতে মাঝে মাঝে তাঁকে 'ড্রইং-রুমে' এসে বসতে হয়, কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারেন না তিনি সেখানে। রান্নাঘরে ডালটা চড়িয়ে এসেছেন, না নাড়লে ধ'রে যাবে, কিংবা গোয়ালঘরে সুন্দরীর নাদায় হয়তো জল নেই—এই ধরনের একটা কিছু তাঁর মনে প'ড়ে যায়, আর তখনই তিনি উঠে আসেন। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দিকে ঘটা ক'রে মন দিতে পারেন না তিনি। আনন্দবাবুর দিকে মনোযোগ দেওয়াটাও খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। তিনি স্বামী আছেন আছেন, তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না মন্দাকিনী। তিনি যা রাঁধবেন স্বামীকে তাই খেতে হবে, স্বামী কি খেতে পছন্দ করেন, তা বিচার করবার সময় নেই তাঁর। গেরস্থ ঘরে অত পছন্দ-অপছন্দর বায়নাক্কা তুললে সংসার চালানো যায় না—মন্দাকিনীর এই ধারণা। আনন্দবাবুও এ নিয়ে বকাবকি করেন না আর। যা পান মুখ বুজে খেয়ে নেন। স্ত্রী সম্বন্ধে আনন্দববাুর ধারণা সংস্কৃত-যুগ-ঘেঁষা। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।' পত্নী একটা সামাজিক প্রয়োজন। সৌখিন আসবাবের মত কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার বস্তুও যেমন নয়, অনাদরে আবর্জনার মত আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার জিনিসও নয়। অতিশয় পবিত্র এবং প্রয়োজনীয়। আনন্দবাবু বকাবকি করেন না আর। পেন্‌শনটি পাওয়ামাত্র মন্দাকিনীর হাতে দিয়ে দেন। মন্দাকিনীর ফরমাশ অনুসারেই বাজারের জিনিসপত্র কিনে আনতে হয় তাঁকে। তাঁর যে একটা আলাদা সত্তা আছে, আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, আলাদা জগৎ আছে, তা মন্দাকিনী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন ব'লে মনে হয় না। স্বামী তাঁর জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ , সুতরাং তাঁর জীবন অনুসারেই স্বামীকে চলতে হবে। অন্য রকম যে কিছু হওয়া সম্ভব, তা মন্দাকিনীর কল্পনাতীত। তাঁর সুন্দরী গাই এবং স্বামী আনন্দমোহনকে ঠিক যদিও এক দৃষ্টিতে দেখেন না তিনি, কিন্তু হাবভাব থেকে মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গীটা অনেকটা এক রকমই। তা ব'লে স্বামীকে তিনি যে অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তাও নয়। তাঁর মঙ্গলের জন্য ব্রত-উপবাস করেন, তাঁর শরীর কিসে ভাল থাকবে সেজন্য তাঁর সশঙ্ক চিন্তার অন্ত নেই। তাঁর সম্বন্ধে গৌরব-বোধও আছে যথেষ্ট। তিনি যে কত বড় বিদ্বান অধ্যাপক, কত বড় কবি—এ সম্বন্ধে

মন্দাকিনী খুবই সচেতন। তাঁর প্রতিবেশিনী হালদার-গিন্নীর কাছে অত্যুক্তিপূর্ণ অনেক গল্প করেন তিনি এ নিয়ে। না, স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা নেই মন্দাকিনীর মোটেই। তিনি যেমন মা-ষষ্ঠী মানেন, বারবেলা মানেন, ভূত-প্রেত কবচ-মাদুলি মানেন, স্বামীকেও তেমনি দেবতা ব'লেই মানেন। পায়ে পা ঠেকে গেলে প্রণাম করেন, পাদোদকও খান দরকার হ'লে। যে ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, সেই আনন্দমোহন তরফদার যে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে জন্মজন্মান্তরের জের টেনে এ জন্মেও আবির্ভূত হয়ে তাঁর কপালে সিন্দুর দান করেছেন—এ সম্বন্ধে মন্দাকিনীর কোনও সন্দেহ নেই। আকাশ নীল, বরফ ঠাণ্ডা—এসব যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আনন্দমোহন তরফদারও তেমনই একমাত্র মন্দাকিনী দেবীর প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত—এই তাঁর ধারণা। মন্দাকিনীকে অতিক্রম ক'রে আনন্দমোহনের আর একটা সত্তা থাকা সম্ভব কি না এবং সেটা কি রকম তা নিয়ে তিনি কোনও দিন মাথা ঘামান নি, তাঁর ঘরের চৌকিটা চতুষ্পদ না হয়ে অষ্টপদ হ'লে কি রকম হ'ত তা নিয়ে যেমন তিনি মাথা ঘামান না কখনও।

বলা বাহুল্য, মন্দাকিনী মাথা না ঘামালেও আনন্দমোহনের আর একটা বিশিষ্ট সত্তা ছিল। সেই বিশিষ্ট সত্তার প্রধান লক্ষণ সৌন্দর্য-বোধ, এবং প্রধান আকাঙ্ক্ষা রূপ-পিপাসা। এইজন্যেই তিনি কাব্যচর্চা করেন, এইজন্যেই তিনি পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে মেতেছেন এবং ঠিক এইজন্যেই বার্মা-ফেরত যুবতীটির কালো চোখের চকিত দৃষ্টিতে তাঁর মনের আকাশে যে বর্ণসম্ভার ফুটে উঠল তা সৌন্দর্যে ইন্দ্রধনুকেও ছাড়িয়ে গেল এক নিমেষে।

তাঁর মানসলোকের এই সব খবর মন্দাকিনী কখনও রাখেন নি, রাখবার দরকারই হয় নি তাঁর। স্বামী সম্বন্ধে যে খবরগুলি তিনি জানেন, সেইগুলিই পর্যাপ্ত তাঁর পক্ষে। তিনি জানেন, আনন্দমোহন কাছা-খোলা প্রকৃতির লোক, কিন্তু সর্ববিষয়ে সর্দারি করতে যাওয়া চাই। তিনি জানেন, আনন্দমোহনের ধাতটা কোফো, কিন্তু রাত্রে মাথার দিকে জানালা খুলে শোবার লোভটি প্রচুর। তিনি জানেন, তরকারিতে বেশি মসলা দিলে আনন্দমোহনের পেট খারাপ হয়, কিন্তু আনন্দমোহনের ইচ্ছেটা বাড়িতে রোজই তেল-ঘি-মসলা-ওলা গরগরে তরকারি হোক। তিনি জানেন, আনন্দমোহন বাইরের লোকের কথায় নাচবার জন্যে পা-টি সর্বদা বাড়িয়ে আছেন, অথচ নাচের 'ন' পর্যন্ত জানেন না তিনি। এই 'রিটায়ার' করবার পর সেদিন যেমন হ'ল। নিতাইবাবুর কথায় নেচে পোষ্ট-অফিস থেকে টাকা বের ক'রে শেয়ারে মনোহারী দোকান খুললেন। মন্দাকিনী পইপই ক'রে বারণ করেছিলেন, কিছুতেই শুনলেন না। ফলে টাকাগুলি গেছে। তিনি জানেন যে, আনন্দমোহন যেটি দরকারী কাজ সেটি কিছুতে করবেন না। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে ছাইভস্ম কত কি যে রোজ লিখে যাচ্ছেন পাতার পর পাতা, অথচ সেজো মেয়েটার জ্বর হয়েছে খবর পেয়েও একটি চিঠি লেখেন নি সেখানে। আনন্দমোহন-চরিত্রের এই সব কথা মন্দাকিনী জানেন। রঘুবংশ বিষয়ে তাঁর থীসিস যে বিদ্বৎ-সমাজে কতটা সুখ্যাতি লাভ করেছে, অধ্যাপক হিসাবে তাঁর বিদ্যাবত্তা, তাঁর অধ্যাপনা কৌশল, তাঁর চরিত্রমাধুর্য যে ছাত্র-সমাজকে কত মুগ্ধ ক'রে রেখেছে, তাঁর সৌন্দর্যবোধ, রসোচ্ছলতা, সাবলীল কবিত্বশক্তি যে যে-কোনও কবিযশোপ্রার্থীর ঈর্ষার বিষয়—এসব খবর মন্দাকিনী জানতেন না, জানবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এই বুড়ো বয়সে তাঁর স্বামী যে তাঁর মেয়ের বয়সী কোনও মেয়েকে দেখে আত্মহারা হয়ে পড়তে পারেন—এ কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল মন্দাকনীর পক্ষে। ইদানীং অমরবাবুর পাল্লায় প'ড়ে পাখির হুজুকে মেতেছেন এবং দূরবীন কিনেছেন—এই তিনি জানতেন। এই দুঃসময়ে অত টাকা খরচ ক'রে দূরবীন

কেনাতে আপত্তি ছিল তাঁর। জামাইষষ্ঠীতে ছোট জামাইকে ভাল ক'রে তত্ত্ব দেওয়া হয় নি গেল বছর, এ বছরও যদি না দেওয়া হয়, তা হ'লে কুটুমবাড়িতে আর মান থাকবে না। কিন্তু হুজুকে মাতলে তো ওঁর জ্ঞান থাকে না—দুম ক'রে অত টাকা খরচ ক'রে দূরবীন কিনে বসলেন একটা! দূরবীন দিয়ে কাক আর শালিখ দেখে কার কি হবে? আনন্দমোহন-চরিত্রের যতটুকু তিনি জানতেন, তাতে তাঁর এ আচরণ বেমানান হয় নি কিছু। কিন্তু তিনি দূরবীন দিয়ে পাখি ছাড়া অন্য কিছুও যে দেখছেন, এ তিনি ভাবতেও পারেন নি, কারণ আনন্দমোহন চরিত্রের এ অংশটুকু অজ্ঞাত ছিল তাঁর কাছে। তাই সেদিন যখন বেলা একটা পর্যন্ত আনন্দমোহন বাড়ি ফিরলেন না, তখন এ কথা ভাবা মন্দাকিনীর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, তিনি ওই বার্মা-ফেরত মেয়েটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুপুর রোদে টো-টো ক'রে।

আনন্দমোহন সত্যিই কিন্তু চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। নিজের বাড়ির জন্যে হ'লে খুঁজতেন না, কিন্তু এর জন্যে খুঁজছিলেন। ওই আশ্রয়হীনা মেয়েটির হিতার্থে কিছু একটা কবার জন্যে তাঁর সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। তাঁর মনে হচ্ছিল, করিৎকর্মা রূপচাঁদ নিপুণ দক্ষতা-সহকারে সব ক'রে ফেলছে, তিনি কিছুই পারছেন না, তিনি হেরে যাচ্ছেন। মেয়েটির চোখে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। রূপচাঁদ তার বাড়ি যোগাড় ক'রে দিয়েছে, চৌকি যোগাড় ক'রে দিয়েছে, একটা হোটেল থেকে খাওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছে। দাই কিংবা চাকর যোগাড় করতে পারে নি এখনও। সকালবেলা অমরেশের সঙ্গে পক্ষী-পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে প'ড়ে গেল যে, আগরপুরে তাঁর এক ছাত্র মহেশলাল আছে। মহেশলাল বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তার বাড়িতে তার বিয়ের সময় তিনি গেছেনও একবার। মনে হ'লে, মহেশলাল ইচ্ছে করলে অনায়াসে একটা চাকর যোগাড় ক'রে দিতে পারে। কথাটা যখন মনে হ'ল, তখন অমরবাবু সোচ্ছ্বাসে বক্তৃতা করছিলেন নীলকণ্ঠ পাখির বিষয়ে। বক্তৃতার মাঝখানেই আগরপুর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটা অশোভন হবে বিবেচনা ক'রে আনন্দবাবু বক্তৃতাটা শুনছিলেন। বক্তৃতার দু-চারটে কথা তাঁর মনে আটকেও ছিল। নীলকণ্ঠ পাখি যে ব্যাঙ খেতে খুব ভালবাসে, সাপ পেলেও ছাড়ে না, এ খবর দুটো অদ্ভুত মনে হয়েছিল তাঁর। অমরেশবাবু বলছিলেন, শীতকালে ওর সৌন্দর্য ঠিক বুঝতে পারবেন না। মার্চ মাস পড়লে তখন দেখবেন ওর বাহার। চতুর্দিকে সোরগোল তুলে সঙ্গিনীকে ঘিরে ঘিরে কত রকম কসরৎই যে ও দেখাবে তখন দেখবেন। সোঁ ক'রে আকাশে উড়ে যাবে অনেক দূর পর্যন্ত, তারপর 'ডাইভ' (Dive) করার মত ক'রে সঙ্গিনীর দিকে সোজা নেবে আসবে আবার, উচ্ছ্বসিত কলরবে নীল রঙের বাহার ছড়িয়ে। অমরবাবু আর একটা পাখি দেখিয়েছিলেন শ্রাইক (Shrike), বাংলা নাম ক্যারকাটা। অদ্ভুত ধরনের পাখিটা। ছাই-ছাই রঙ, টেলিগ্রাফের তারের উপর ব'সে ছিল ঘাড় বেঁকিয়ে। শুধু চতুর নয়, পাখিটার ভাবভঙ্গীতে কুটিল ভাবও ফুটে উঠেছিল একটা। কুহু কুহু ক'রে একটা কোকিল ডাকছিল। কবির হঠাৎ মনে হয়েছিল, ক্যারকাটা পাখিটা যেন ঘাড় বেঁকিয়ে মনে মনে বলছে—

ডাকছ ডাকো—কুহু কুহু কুহু
শুনেছি সবুই হুঁ হুঁ—

অমরবাবু পাখির বাসা নিয়েও কি দু-চার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার সব কথায় মন দিতে পারছিলেন না তিনি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, রূপচাঁদের চোখ এড়িয়ে আগরপুরের দিকে

তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে পারলে বাঁচেন যেন তিনি। রূপচাঁদের চোখ-এড়ানো দুঃসাধ্য হয় নি, কারণ আপিসের সময় হতেই রূপচাঁদ চ'লে গেলেন। বেগ পেতে হয়েছিল বৈজ্ঞানিককে নিয়ে। তাঁর বক্তৃতা আর কিছুতেই থামে না। তাঁর বক্তৃতা যে খারাপ লাগছিল তা নয় ; খুবই ভাল লাগছিল, কিন্তু ভাল ক'রে মন দিয়ে শুনতে পারছিলেন না কিছুতে। অদ্ভুত একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন। শীতকালের রোদে আমবাগানটা আশ্চর্যরকম ভাল লাগছিল, ঝোপে-ঝাড়ে গাছের আড়ালে-আবডালে নতুন চেনা পাখিদের আবার দেখতে পেয়ে সমস্ত মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল বার বার, অমরবাবুর উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে বিহঙ্গ জগতের নানা রহস্য সম্বন্ধে উৎসুক হয়েও উঠেছিলেন তিনি, কিন্তু অন্তরের নেপথ্যলোকে ওই মেয়েটি কি যে মায়ার প্রভাব বিস্তার করছিল, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

...কবি ফিরলেন যখন, তখন একটা বেজে গেছে। মন্দাকিনী তাঁর পথ চেয়ে অনাহারে চিন্তিত মুখে ব'সে ছিলেন। নানারকম দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তাঁর। সম্ভব অসম্ভব নানারকম। মনে হচ্ছিল, কোথায় কোন্ বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শুয়োর বাঘ সাপ-খোপ কত কি আছে, কামড়ে দিলেই হ'ল। ছেলেবেলায় বুনো শুয়োর-চেরা একটা লোক দেখেছিলেন, তার রক্তাক্ত ছবিটা বার বার মনে জাগছিল। বাঘে ধ'রে নিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। চিন্তিত হয়ে বৈজ্ঞানিকের বাড়িতেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বাড়িতে ছিলেন না। পথ চেয়ে শঙ্কিত চিত্তে ব'সে ছিলেন মন্দাকিনী। স্বামীকে সশরীরে ফিরতে দেখে শঙ্কা অন্তর্হিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হয়ে উঠলেন।

"কি আক্কেল তোমার। কোথা ছিলে এতক্ষণ?"

"একটা পাখির পেছনে পেছনে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম—"

"পাখির পেছনে? গরুর পেছনে পেছনে যাওয়া যায়, পাখির পেছনে পেছনে গেলে কি ক'রে? উড়ছিলে নাকি?"

কবি স্ত্রীকে চিনতেন, প্রত্যুত্তর করলেন না। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

মন্দাকিনী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি?"

"একটা নতুন ধরনের পাখি। এর আগে দেখি নি কখনও। শ্রাইক একটা।"

"কি?"

"শ্রাইক, বাংলা নাম কুরকুটি।"

ক্যারকাটা নামটা ঠিক মনে পড়ল না কবির।

"কুরকুটি?"

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মন্দাকিনী স্বামীর দিকে। দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। কবি তাঁর দিকে পিছন ফিরে নীরবে জামা-কাপড় ছাড়তে লাগলেন। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, "আমি চান করব না।"

"পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুলোয় ভরতি, চান না ক'রেই খাবে? গরম জল তো উননে বসানোই রয়েছে, চান করতে তার কতক্ষণ লাগবে?"

"বেশ, দাও তা হ'লে।"

নিজের তেতলার ঘরটাতে একা শুয়ে ছিলেন কবি চুপ ক'রে। খেয়ে এসে লেপটি গায়ে ঢাকা দিতেই তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু কিসের একটা শব্দে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চোখ পড়ল, দেওয়ালের চুনবালি খ'সে পড়েছে একটা জায়গা থেকে। পৈতৃক পুরনো বাড়ি। বহুদিন মেরামত করানো হয় নি। এই চিন্তার সূত্র

ধ'রে গুটি গুটি আরও যেসব চিন্তা মনের প্রত্যন্তপ্রদেশে উঁকি দিতে লাগল, তা ভয়াবহ। চুন, বালি, সিমেণ্ট, পারমিট, রাজমিস্ত্রি, ভারা...। তাড়াতাড়ি লেপ ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। উঠেই জানালাটা খুলে দিলেন ; জানালাটা খুলে দিতেই চোখে পড়ল নীলাকাশ এবং সেই নীলাকাশের পটভূমিকায় একটা ন্যাড়া আমড়াগাছ। আমড়াগাছের উঁচু ডালে ব'সে আছে একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আকাশের দিকে মুখটা ঈষৎ তুলে পড়ন্ত রোদটা উপভোগ করছে যেন প্রাণ ভ'রে। জানালাটির ধারেই কবির লেখার জায়গা, তার নীচেই লেখবার সরঞ্জাম ছিল সব। চেয়ারটি টেনে কবি ব'সে পড়লেন। বাড়ির জীর্ণ সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। একদৃষ্টে তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন তিনি পাখিটার দিকে চেয়ে। ঠিক পাখিটার দিকেও চেয়ে নয়, পাখিটাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মন কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল অনন্ত আকাশে। একটু পর আর একটা নীলকণ্ঠ এসে বসল। প্রথম নীলকণ্ঠটা যেখানে ব'সে ছিল, তার নীচের ডালটায়। অতিশয় নির্বিকারভাবে, যেন সে প্রথম নীলকণ্ঠটাকে দেখতেই পায় নি। প্রথম নীলকণ্ঠটা কিন্তু উচ্ছ্বসিত কলরবে ডেকে উঠল। এত উচ্ছ্বসিত যে, তা কর্কশ কি মধুর, তা বিচার করবার আর অবসর রইল না, উচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেসে গেল কবির মন। তারপরই সে উড়ল ডানা মেলে। বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু ক'রে দিলেন হঠাৎ—

বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে
ও নীলকণ্ঠ, রঙ যে তোমার
উপছে পড়েছে ডানার নীচে।
আ মরি মরি
পাশে ব'সে আছে সোহাগী সখীও নীলাম্বরী!
সয় না তর
খুলে যায় মন খুলে যায় ডানা
কণ্ঠে জাগে যে কলস্বর...
দেখি তখন
এ কি স্বপন...
ঘন-নীল আর ফিকে-নীল আর আবছা-নীল
সাগরের নীল, আকাশের নীল, নীল-নিখিল
ফোয়ারার মত অনন্ত নীলে ছড়িয়ে পড়ে
চমক-লাগানো নীলের ঝড়ে,
ঊর্ধ্বে নিম্নে আগে ও পিছে,
বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে।

কবিতাটা লিখে কবি চোখ তুলে দেখলেন, পাখি দুটো চ'লে গেছে। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ। মেয়েটির মুখটা মনে প'ড়ে গেল। কি অদ্ভুত শ্যামল স্নিগ্ধতা ওতপ্রোত হয়ে আছে তন্বী দেহটিতে। যখন চাকরটাকে নিয়ে গেলেন, তখন তার চোখে মুখে ফুটে উঠল কি আনন্দ। অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কবি অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। কাগজ কলম নিয়ে আবার শুরু করলেন লিখতে।—

বল না বোঝাব সখি কি ক'রে
তোমার অঙ্গ ভরি কি মাধুরি মরি, মরি
তোমার নয়ন কোণে কি আলো যে ঠিকরে!
সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে
অরূপ-লোকের মায়া রূপলোকে এসে যেন
অতিশয় দ্বিধা-ভরে থেমেছে।
থমথমে চারিদিক,—চুপ চুপ চুপালি
মেঘেতে লেগেছে রঙ সোনালি ও রূপালি
ভূপালী না ভৈরবী চোখে ওর কি ভাষা
তৃপ্তি না পিপাসা
কল্পনা-বীণা বাজে আকুল ছন্দা যে
মুজরি উঠিয়াছে রজনী-গন্ধা যে
শ্যামল তন্বী তনু-শিখরে
বল না বোঝাব সখি কি ক'রে!

লেখা শেষ ক'রে কবি ব'সে রইলেন। অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। অন্ধকার নামতে লাগল চতুর্দিকে। তার সঙ্গে স্বপ্নও।

৪

"ব'সে পড়ুন, ওইখানেই ব'সে পড়ুন—"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস ক'রে গর্জন ক'রে উঠতেই ব'সে পড়লেন কবি। শহরের বাইরে অনেক দূরে এসে পড়েছিলেন তাঁরা, নদীর ধারে ধারে বক আর বাটানের দল দেখতে দেখতে। উদ্দেশ্য—নদীটা পেরিয়ে কিছু দূরে যে বিলটা আছে, সেইখানে গিয়ে শীতের অতিথি কাদা-খোঁচার দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন কবির।

কবি ব'সে পড়তেই বৈজ্ঞানিক হামাগুড়ি দিয়ে স'রে এলেন তার কাছে।

"ওই দেখুন হলদে খঞ্জন একটা—Yellow Wagtail—এরা উইন্টার ভিজিটার—"

"কোথা থেকে আসে?"

"রাশিয়া থেকে। গ্রীষ্মকালে এরা Ural Mountains থেকে কামস্কাট্‌কা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, আফগানিস্থানের উত্তরেও কিছু কিছু দেখা যায়। অতদূর থেকে ওরা উড়ে আসে এ দেশে।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন ছোট্ট পাখিটিকে। ল্যাজ দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কামস্কাট্‌কার পাহাড়ের আগ্নেয়গিরির খবর ও রাখে নাকি? সোভিয়েট বিপ্লবের আঁচ লেগেছে নাকি ও গায়ে? দেখলে তো মনে হয়, এ দেশের শ্যামাঙ্গিনী মেয়ে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "খঞ্জন কিন্তু আরও চার রকম আছে, White Wagtail, Large Pied Wagtail, Grey Wagtail, Yellow Headed Wagtail। এর মধ্যে Large Pied Wagtail এ দেশেরই বাসিন্দা, সব সময়ে থাকে। শুনুন, ডাকছে, শুনতে পেলেন?"

কবি ধমকে উঠলেন, "পেয়েছি। আপনি একটু চুপ করুন তো।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, কবি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন খঞ্জন পাখিটার দিকে

তন্ময় হয়ে। মনে হচ্ছে, একটা অপরূপ কিছু দেখছেন যেন তিনি। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিক সহসা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"ওই দেখুন।"

"কি?"

"দোয়েল। শীতকালে বড় দেখা যায় না। ওই ঝোপটার ধারে টপ ক'রে নামল। পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে বোধ হয়। চলুন, ওঠা যাক।"

আবার দুজনে চলতে শুরু করলেন। ঝোপটার কাছাকাছি এসে বৈজ্ঞানিক বললেন, "দাঁড়ান একটু, আমি দোয়েলটাকে দেখে আসি ভাল ক'রে। ও বোধ হয় ওই ঝোপটাতেই থাকে।"

কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে পড়ল, একটা ফিঙে ব'সে আছে টেলিগ্রাফপোস্টের উপর। চমৎকার মিষ্টি সুরে ডাকছে। আর একটা ফিঙে উত্তর দিচ্ছে তেমনই মিষ্টি সুরে। কবির মনে হ'ল, বিশ্ব জুড়ে এই চলেছে অহোরাত্র। অন্তরতমকে ডাকছে সবাই। নিরন্তর চলেছে এই ডাকাডাকি—গানে গন্ধে বর্ণে। ডানার কথা মনে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন খানিকক্ষণ। দূরের শিমুলগাছটায় প্রকাণ্ড একটা শকুনি এসে বসল। বিরাট পাখি। শকুনি সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছে হ'ল। ঘাড় ফিরিয়ে বৈজ্ঞানিককে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? হঠাৎ দেখতে পেলেন, প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন তিনি ঝোপটার পাশে, এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে কি দেখছেন। কবি এগিয়ে গেলেন।

"কি দেখছেন?"

"দেখতে পেলাম না ঠিক। পালাল। চলুন।"

"শিমলগাছটায় শকুনি বসেছে একটা—"

"ও, কই?"

"ওই যে—!!"

বৈজ্ঞানিক দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন একবার।

তারপর বললেন, "এটা হচ্ছে White-Backed Bengal Vulture. পিঠের ওপর সাদা আর গলায় কলারের মত সাদা আছে, দেখুন। এইটেই সাধারণত দেখা যায়, আর এক রকমও দেখা যায়, Long-Billed Vulture—Gyps Indicus—এদের ঠোঁট আর একটু লম্বা হয়, পিঠের কাছে সাদা নেই। লাল-গলা শকুনিও আছে এক রকম, দেখেছেন নিশ্চয়, সেগুলোর নাম King Vulture, পণ্ডিচেরি ভাল্‌চারও বলে কেউ। বামুন শকুনিও বলে।"

কবি কিন্তু ভাবছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। তাঁর মনে হচ্ছিল, শকুনির ছদ্মবেশে এ যেন আর কেউ। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল, সেকালে রোমে কার্নিভালের সময় সকলে যেমন ছদ্মবেশ প'রে বেরুত, এ বোধ হয় তেমনই একটা ঘটনা। শকুনির ওই জবড়জঙ্গ পোশাকের অন্তরালে হয়তো লুকিয়ে আছে কোনও রাজপুত্র বা রাজকন্যা। যে খঞ্জনটা এখনই দেখলেন, তার ওই চটুল চঞ্চল গতি, মিষ্টি মিহি সুর, ওই স্বর্ণাভ কান্তি—এ কি শুধু পাখির?

বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। গত বার শকুনির ডিম সংগ্রহ করতে পারেন নি তিনি। এবার করতেই হবে। শীতের গোড়ার দিকে অনেক সময় ডিম পাড়ে ওরা। হনহন ক'রে এগিয়ে চললেন শিমুলগাছটার দিকে।

"ওদিকে কোথা চললেন আবার? বিলের রাস্তা তো এই দিকে—"

"শকুনির কোনও বাসা আছে কি না, দেখে আসি চলুন না। ওদের বাসা চিনতে দেরি হয় না। আর একটা মজা কি জানেন। ওরা অনেক সময় চার পাঁচটা বাসা করে, হয় একই গাছে কিংবা পাশাপশি গাছে, কিন্তু ডিম পাড়ে মাত্র একটি। বাসা করেছে কি না দেখে আসি চলুন।"

কবির মনে হ'ল, তড়বড়ে লোকটার পাল্লায় প'ড়ে প্রাণ যাবে দেখছি। নিজের চিন্তাধারা ছিন্ন হওয়াতে বিরক্তও হয়েছিলেন তিনি একটু!

"আপনি যান মশাই, আমি এইখানেই বসছি--"

বৈজ্ঞানিক চলে গেলেন। কবি একটা উঁচু ঢিপির উপর গিয়ে বসলেন। তিন-চারটে হলদে খঞ্জন উড়ে এসে বসল আবার একটু দূরে। কি অদ্ভুত সুন্দর পাখি। চঞ্চলা চপলা নৃত্যপরা অথচ পলাতকা। ওই মেয়েটির সঙ্গে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কাছাকাছি আছে অথচ কত দূরে, মনে হয়, নাগালের বাইরে। মনে হয়, বাইরে যা দেখা যাচ্ছে, ও তা নয়, ও যেন অন্য কিছু। সেই অন্য-কিছুর আভাস ধরা পড়েছে কবির মনে। মনের অবর্ণনীয় অনুভূতিটা ছন্দে গাঁথবার চেষ্টা করতে লাগলেন।—

ও খঞ্জন, ও খঞ্জন
কবির চোখে পড়ল ধরা
মূর্তি তোমার নিরঞ্জন।

অগ্নি-গিরির তপ্ত খবর
মিষ্টি সুরে আঁকছ যে
নীল্‌চে ধূসর ওড়না দিয়ে
হলদে শাড়ি ঢাকছ যে
নৃত্যপরা চলছ ছুটে
চলচ্ছবি উঠছে ফুটে
পুচ্ছ-দোলায় কোন্ সে গানের
তালটিকে ঠিক রাখছ যে,
ও খঞ্জন!

প্রিয়ার চোখে তোমার চলার
দোল দোলানো
হঠাৎ-পাওয়ার পুলক তুমি
মন-ভোলানো
নয়কো খাঁচায় নয়কো নীড়ে
মনের বীণার মধুর মীড়ে
লুকিয়ে বেড়াও দৃষ্টি এড়াও
কিন্তু আবার ডাকছ যে
ও খঞ্জন!

ঝরনাতলায় নদীর ধারে
তীর বনেতে
তোমার নাচের আসর জমে
নির্‌জনেতে
একটু সাড়া পেলেই পালাও
হাওয়ার বুকে ঢেউ তুলে দাও
কবির মনে কিন্তু তুমি
পালিয়ে গিয়েও থাকছ যে
ও খঞ্জন!

নিজের কবিতায় নিজেই তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে কে ব'লে উঠল, 'কোউ'। চমকে উঠলেন কবি। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছু দেখতে পেলেন না। অদ্ভুত মিষ্টি স্বর। মনে হ'ল, মানুষের কণ্ঠে যেন ক'য়ে উঠল কেউ। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন। সামনের আমগাছে ব'সে আছে হলদে পাখিটা। মাথাটি কালো, ডানার ধারে ধারে কালো. ঠোঁটটি লাল, বাকি সবটা হলদে। চমৎকার হলদে, স্বর্ণসন্নিভ। মনে পড়ল বৈজ্ঞানিক দেখিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, ইংরেজী নাম Oriole, বাংলা নাম বেনেবউ। আর এক রকম আছে, তার মাথাটাও নাকি হলদে। বেনেবউ? নামটা অবশ্য খুবই লাগসই। ধনী বণিকগৃহিণীর সর্বাঙ্গ সোনায় মোড়া, কালো মুখটি ঢাকতে পারেন নি কেবল সোনা দিয়ে, পান খেয়ে ঠোঁট দুটি হয়েছে টকটকে লাল। লাগসই হ'লেও নামটা বেশি বস্তুতান্ত্রিক। ওর মধ্যে পরশ্রীকাতরতারও ছোঁয়াচ রয়েছে যেন একটু, কবির মনে হ'ল। তার চেয়ে সোজাসুজি 'হলদে পাখি' নামটা মন্দ নয়। কিন্তু অমন চমৎকার স্বর্ণকান্তির, অমন চঞ্চল সজীবতার কোনও মর্যাদাই ফুটছে না ও নামে। 'কনক সখি' নাম দিলে কেমন হয়? বেনেবউ উড়ে এসে বসল কাছের একটা ডালে। কবির মনে গুঞ্জন ক'রে উঠল কবিতা।—

কনক সখি, কনক সখি,
সবাই তোমায় বলছে ও কি!
শালিক চড়াই কাক ছাতারে
সক্কলকে হকচকিয়ে
বণিক বধূ কেবল তুমি
গয়না বেড়াও চকমকিয়ে?

মিথ্যা কথা, তুমি কেবল
ভ্রমরকেশী কাজল-চোখী
সবুজ পাতায় লুকিয়ে বেড়াও
কনক সখি, কনক সখি।

কবি সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন, খঞ্জনগুলো উড়ে গেছে। কনক সখিও উড়ে গেল। আর একজন এসে বসলেন সামনের সরু ডালটায়। বাদামী রঙের পাখি, ল্যাজের কাছটায় পিঠের দিকে যেন আগুনের ঝলক।

একটু উড়লেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটা। গলার কাছে মাথার উপর কালো। রেডস্টার্ট একটা। থরথর ক'রে ল্যাজটা কাঁপিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে যেন অভিবাদন

জানাল কবিকে। তারপর পিঠটা ফিরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, আমাকেও ভাল ক'রে দেখ, তোমার কনক সখির চেয়ে দেখতে নেহাৎ খারাপ নই আমিও। বৈজ্ঞানিক সেদিন বলেছিলেন, মনে পড়ল, এরা কাশ্মীর অঞ্চল থেকে শীতকালে এ দেশে আসে। কবির মনে আবার জাগল কবিতা—

যে দেশেই থাক নাকো তুমি মোর মিতা গো
অঙ্গকে ঢেকে রাখ বাদামী বা সবুজে
কাব্যলোকেতে তুমি চির-পরিচিতা গো
কবিকে ঠকাতে সখি পারবে না কভু যে।
কাশ্মীরী রাশিয়ান ইরানী বা তুরানী
পেশোয়াজ ওড়না বা অঞ্চল-ঘুরানী
ওগো মন-চুরানী,
ওগো মঞ্জুরাণী,
যে বেশেই আস-নাকো চিনি তোরে তবু যে।

হঠাৎ বন বাদাড় ভেঙে হুড়মুড় ক'রে বৈজ্ঞানিক এসে হাজির হলেন।

"শকুনির বাসা দেখেছি একটা। শকুনির সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওদের বাচ্চাকে ওরা কেমন ক'রে খাওয়ায় জানেন? ওরা নিজেরা যে মাংস খেয়ে আসে তাই উগরে দেয় বাচ্চার মুখে ছোট ছোট গুলির মত আকারে। অদ্ভুত নয়?"

কবির কাব্যলোকে বজ্রপাত হ'ল যেন।

"চলুন, ওঠা যাক।"

বিলের উদ্দেশ্যে আবার বেরুলেন দুজনে। দুজনে নীরবেই যাচ্ছিলেন। বৈজ্ঞানিক হঠাৎ বললেন, "পাখির বাসা আর তাদের সন্তান-পালন দুটো ব্যাপারই অদ্ভুত। পাখির বাসা অনেকেরই নজরে পড়ে, সন্তান-পালনটা লক্ষ্য করে না অনেকে। বাবুই পাখির বাসা দেখছেন নিশ্চয়, দর্জি পাখিদের বাসাও চমৎকার! সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে ধনেশ পাখির বাসা। গাছের গুঁড়ির গর্তে ওরা বাসা করে। সেই গর্তে স্ত্রী-ধনেশ ঢুকে নিজের মল ঠোঁটে ক'রে নিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে ফেলে—"

"মল? তার মানে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

"জিনিসটা ঠিক কি বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, নিজের droppings নিয়েই ওরা গর্তের মুখটা বোজায়, আবার কারও মতে সে সময় ওদের গা থেকে চটচটে একরকম রস বেরোয় আঠার মত, তাই দিয়ে বন্ধ করে মুখটা। সে যাই হোক, স্ত্রী-ধনেশ গর্তের মুখটা বুঝিয়ে বন্দিনী ক'রে ফেলে নিজেকে। নিজের মুখটি বার করবার মত ছোট্ট একটু ফাঁক থাকে শুধু। যতদিন সে ডিমে তা দেয়, ততদিন বাসা ছেড়ে বেরোয় না। পুরুষ-ধনেশ তখন সেই ছোট্ট ফাঁক দিয়ে স্ত্রীকে খাইয়ে যায়। তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা হ'লে স্ত্রী-ধনেশ দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে। ভাঙা দেওয়াল আবার জুড়ে দেয়। যতদিন না বাচ্চারা বড় হয়, ততদিন তারা বন্দী অবস্থায় থাকে। স্ত্রী পুরুষ দুজনে মিলে তখন খাওয়ায় তাদের সেই ছোট ফাঁক দিয়ে। অনেকটা আমাদের আঁতুর-ঘরের মত, নয়? ফটিক জল, বেনেবউ এদের বাসাও চমৎকার—"

কবির কাছ থেকে কোনও সাড়া'না পেয়ে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। অন্যমনস্ক কবি ঘাড় হেঁট ক'রে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক আড়চোখে কবির মুখের দিকে আর একবার চেয়ে

চুপ ক'রে গেলেন। কবিকে মনে মনে একটু ভয় করেন তিনি। অদ্ভুত লোক! তুচ্ছ একটা জিনিস নিয়ে বিরাট একটা কিছু গড়ছেন হয়তো। এই ধরনের লোককে বোঝা শক্ত। প্রকৃতির সম্বন্ধে এঁদের কৌতূহল খুব, কিন্তু যা দেখবেন তা মানবেন না, তাকে ঘিরে কিম্ভূত-কিমাকার একটা কিছু করা চাই। না করতে পারলে তৃপ্তি হয় না কিছুতে। পাখিকে পরী করবার জন্যে ব্যস্ত। স্ত্রী-ধনেশকে বন্দিনী রাজকন্যা-টন্যা ভাবছেন হয়তো, কে জানে! আড়চোখে আর একবার চাইলেন তিনি কবির দিকে। কবি ঘাড় হেঁট ক'রে চলেছিলেন আপন মনে। আবার একটা রেডস্টার্ট এসে বসল সামনের গাছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "একটা রেডস্টার্ট এসেছে, দেখুন।"

কবি বললেন, "ওর একটা বাংলা নাম দিন।"

"কবিতায় ঢোকাতে পারছেন না বুঝি? কবিতা লিখেছেন ওকে নিয়ে?"

"লিখি নি, তবে—ওই পালাল! কবিতা চাই নাকি?"

মুখে মুখেই একটা ছড়া বানিয়ে ফেললেন তৎক্ষণাৎ—

তড়িৎসম ত্বরিত গতি
নয়কো তবু তুরঙ্গিনী
ভঙ্গীভরে পালায় ছুটে
পক্ষী না এ কুরঙ্গিনী?
ছন্দভরে অঙ্গ দোলায়
এক নিমেষে মনকে ভোলায়
আগুন জ্বলে ডানার তলে
উড়ন্তিকা সুরঙ্গিনী।

বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকার! অদ্ভুত শক্তি আপনার!"

কবি বললেন, "আপনার প্রশংসা করবার শক্তিও তো কম নয় দেখছি। পাখিটার নাম ফুলকি রাখলে কেমন হয়?"

"বেশ তো।"

"ছোট পাখি বড় নাম মানাবে না। আগুনের আভাও আছে—গায়ে। ওড়া মাত্রই ল্যাজের কাছটায় আগুন জ্বলে উঠল যেন। কি চমৎকার!"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ইংরেজীতে ওর আর একটা নাম আছে—ফায়ার টেল। রেডস্টার্ট কথাটার মানেও তাই।"

বৈজ্ঞানিকের কেবলই চেষ্টা কবির মনকে কি ক'রে বিজ্ঞান-মুখী করা যায়। করতে পারলে—তাঁর বিশ্বাস—বিস্ময়কর একটা কিছু ক'রে ফেলতে পারে লোকটা। তাঁর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বললেন, "এইটুকু ছোট পাখি কতদূর থেকে এসেছে! আশ্চর্য নয়? মাইগ্রেশন ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। ভারি রহস্যময়। যে কাদাখোঁচাদের আমরা দেখতে যাচ্ছি, সেগুলো সবই প্রায় শীতের অতিথি, এ দেশে থাকে না। অথচ কেন আসে বোঝা যায় না ঠিক। অনেকে বলেন, শীতকালে ওদের বাসভূমিতে খাবার পাওয়া যায় না, রোদ থাকে না, তাই ওরা চ'লে আসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঠিক একই জাতের পাখি ওদেশে আবার থেকেও যায় কতকগুলো, তাই—"

কবি হেসে বললেন, "বললাম তো সেদিন; ওরা প্রাণের টানে আসে।"

"প্রাণের টানটাই বা কেন হয়?—বিজ্ঞানের তাই প্রশ্ন। বিজ্ঞান মনে করে, নিশ্চয়ই কোন

অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্যে একদল পাখি তাদের আবাসভূমি থেকে চ'লে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই যে যেমন ধরুন না, ওই ভদ্রমহিলা যেমন বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছেন। ওটাকে আপনি যদি টান বলেন, তা হ'লে কি ঠিক হবে? জাপানী বোমা না পড়লে কি উনি আসতেন? পাখিদের সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই মনে করেন যে, ওদের চ'লে আসবারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে—কোনও অদৃশ্য বোমা আছে—সেইটে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কাজ।"

বৈজ্ঞানিক উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাইলেন কবির দিকে। তাঁর মনে হ'ল, ওই মেয়েটির উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোধ হয় স্পষ্ট করতে পেরেছেন তিনি কবির কাছে। কবির মনে কিন্তু যা ঘটল, তা একটু অন্যরকম। মেয়েটির কথা উত্থাপিত হওয়াতে কবির কল্পনা-কাননে একটা নতুন ফুল ফুটে উঠল যেন।

তিনি বললেন, "টানটা কি সব সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যায়? মেয়েটি বিশেষ ক'রে এই অঞ্চলেই এল কেন, এর কারণ ও নিজেও হয়তো জানে না ভাল ক'রে। আপনি বলেছেন, জাপানী বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু অন্য জায়গাতেও যেতে পারত। এখানে আসবার মানে কি?"

বৈজ্ঞানিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "আমি যদি বলি অ্যাক্‌সিডেণ্ট?"

কবি ফিরে চাইলেন বৈজ্ঞানিকের দিকে। হাসি উপচে পড়তে লাগল তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে।

"এইটেই প্রত্যাশা করেছিলাম। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট আবির্ভাবটাই তো আপনারা অ্যাক্‌সিডেণ্টের কোঠায় ফেলে দিয়েছেন।"

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা এখন বাদ দিন, আপনার মতে তা হ'লে ও মেয়েটির এখানে আসার কারণ কি?"

"প্রারব্ধ। তার মানেই অদৃশ্য টান।"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন এবার।

"ওটা কি একটা যুক্তি হ'ল, আপনিই বলুন।"

যুক্তির তো প্রয়োজন নেই আমার। নিজের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করবার জন্যেই যুক্তির দরকার। আমি মেনে নিতে চাই, ওতেই আমার তৃপ্তি। একটা অদৃশ্য টানে মেয়েটি এখানে এসেছে—এইটে ভেবেই আমার সুখ। বাজে যুক্তির কচকচিতে দরকার কি আমার?"

বৈজ্ঞানিকের ঈষৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

"আপনার দরকার না থাকতে পারে, বিজ্ঞানের দরকার আছে।"

"কবি আর একটু হেসে বললেন, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কে জানেন?"

"আপনিই বলুন কে।"

"কবি। যে কবি বলতে পারে—

> ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
> ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্
> ভবতু ভবতীহময়ি সততমনুরোধিনী
> তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।

অনবদ্য সৌন্দর্যের পায়ে লীলাময়ী প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রে কৃতার্থ হয় যে, সে-ই কবি, সে-ই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সৃষ্টিরহস্যের সারমর্ম সে-ই বুঝেছে।"

তর্কটা হয়েতো আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত কিন্তু তারা বিলের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আচ্ছা লোক তো তোমরা হে, নৌকো নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে, তোমাদের পাত্তাই নেই! আশ্চর্য কাণ্ড!"

কবি বললেন, "দেরি অমরবাবুর জন্যে। উনি খানিকক্ষণ দোয়েলের পিছু পিছু ঘুরলেন, তারপর শকুনির বাসা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।"

"চি-হুইট্ চি-হুউট্ চিহু চিহু চিহু—"

একটা পাখি ডেকে উঠল।

"কি বলুন তো?"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চাইলেন। মিনিট খানেক আগে তর্ক ক'রে মনে যে তিক্ততা এসেছিল, সেটা মধুর হয়ে উঠল পাখির ডাকে।

কবির উত্তর দেওয়ার আগেই বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন "দুর্গা টুনটুনি। পুরুষটা ডাকছে। ব্রিডিং প্লুমেজ (Breeding Plumage) দেখুন কেমন সুন্দর। ব্রিডিং সিজ্‌নে ওদের এই রকম রঙ হয় গায়ে, অন্য সময়ে থাকে না। দেখুন, ওই যে—"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন, কুচকুচে কালো ছোট একটি পাখি আকাশের দিকে মুখ তুলে ডেকে চলেছে চি-হুইট্ চি-হুইট্ চিহু-চিহু। আগাগোড়া সব কালোও নয়। ডানা দুটো কালো, ঘন-নীলও আছে খানিকটা, টকটকে লালও আছে গলার পাশে। মুগ্ধ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "মধু খেয়ে থাকে ওরা। তাই ওদের মৌ-চোষাও বলে কেউ কেউ। এ দেশে তিন রকম দেখা যায়—নর্থওয়েস্টার্ন-ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান-সিলোনিজ আর আসাম-বার্মা রেস। আমার বিশ্বাস, আরও আছে দু-এক রকম। রঙের ঈষৎ তারতম্য শুধু। ওদের ওয়ার্বলার (Warbler) ব'লে ভুল করবেন না যেন। ঠোঁটটা লক্ষ্য করুন, একটু বাঁকা, মধু খায় কিনা।"

রূপচাঁদ বললেন, "বক্তৃতাটা নৌকোয় যেতে যেতে করলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।"

নৌকায় আরোহণ করলেন তিনজন। নৌকা ছেড়ে দিল। রূপচাঁদ বললেন, "ফ্লাস্কে ক'রে চা এনেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধ হয়। ওরে বান্‌ছা, ঢাল কাপে কাপে।" বালক-ভৃত্যটি কাপে কাপে চা ঢালতে লাগল। রূপচাঁদ একটি টিফিন-কেরিয়ার থেকে টোস্ট, ওম্‌লেট আর কেক বার করলেন।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "এত কাণ্ড করেছেন আপনি!"

কবি বললেন, "রূপচাঁদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা রকম।"

রূপচাঁদ একবার বৈজ্ঞানিকের এবং একবার কবির মুখের দিকে চাইলেন শুধু। চোখের পাতাগুলো মিটমিট করল দু-চার বার। কোনও কথা বললেন না।

টোস্টে কামড় দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন কবি—"বাঃ, চমৎকার রুটি তো! নলিনী এ রকম রুটি করছে নাকি আজকাল? আমাদের যা দিচ্ছে, তা—"

রূপচাঁদ বললেন, "নলিনী নয়, ফিরপো।"

"ফির্‌পো? ফির্‌পোর রুটি পেলে কোথা?"

"পুলিস সাহেবের জন্যে আসে। আমি একখানা ক'রে নিই।"

"আমরা পাই না?"

কবি বললেন বটে, কিন্তু তিনি এ কথা ভাল ক'রেই জানেন যে এই মফস্বলে রোজ ফির্‌পোর রুটি খাওয়ার মত অবস্থা তাঁর নয়। রূপচাঁদেরও সে কথা অবিদিত নেই। তবু তিনি বললেন, "বেশ, চাও তো পাবে।"

বৈজ্ঞানিক দু-টুকরো টোস্টের মাঝখানে খানিকটা ওম্‌লেট পুরে বাঁ হাতে ধ'রে সেটা কামড়াচ্ছিলেন আর বিলটার চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর কোটের উপর পাঁউরুটির গুঁড়ো পড়েছিল, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না।

রূপচাঁদ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, আপনারও চাই না কি?"

"কি?"

"ফির্‌পোর রুটি!"

"রুটি? ও, আচ্ছা জিজ্ঞেস করব রত্নাকে।"

সমস্ত পাঁউরুটিটা মুখে পুরে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন চারদিকে।

কবি প্রশ্ন করলেন রূপচাঁদকে, "বার্মা-রেফিউজি সেই ভদ্রমহিলাটির খবর কি?"

"কার? ডানার? খবর ভালই। তুমি একটা চাকর যোগাড় ক'রে দিয়েছ শুনলাম।"

"হ্যাঁ। ওর নাম ডানা নাকি?"

"তাই তো শুনছি। ছেলেবেলায় এক মেম নার্স্‌ ওর নাকি নামকরণ করেছিলেন Diana। বাংলায় সেটা ক্রমশ ডানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চমৎকার নামতো! ডায়না ডানা—দুটোই চমৎকার।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনশ্চক্ষে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল গ্রীক দেবী ডায়েনার শবরী-রূপ। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চঞ্চলা ডায়েনা ধনুর্বাণ হস্তে শিকারের পিছু পিছু ছুটে বেড়াত বনে বনে, যার কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়েছিল এণ্ডিমিয়নের প্রেমে, কবিকল্পনায় যার রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল নিত্য নবীন বনশ্রীতে, উন্মুখ মাতৃত্বের জগদ্ধাত্রীরূপে, সৃষ্টির আবেগ-মহিমায়, জীবনের দুর্জয় প্রকাশে, চরাচরব্যাপী বিকশিত প্রাণ-সম্পদে...মনে হ'ল, এই ডায়েনাই বোধ হয় আমাদের দেশের অনন্তযৌবনা উর্বশী, মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে বারবার প্রাণ-লক্ষ্মীর মূর্ত প্রতীক রূপে ; এই ডায়েনাই বোধ হয় ডানা মেলে উড়ে আসছে অনন্ত কাল ধ'রে মৃত্যু-পরিকীর্ণ পৃথিবীর দিকে, সঞ্জীবিত করছে তাকে নবীন প্রাণধারায়, উজ্জীবিত করছে নব নব প্রেরণায়...

"বাঃ, চমৎকার! আশাই করি নি এটা।"

হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"অস্‌প্রে (Osprey) একটা। দেখুন, দেখুন, কত বড় মাছ ধরেছে দেখুন।"

কবি দেখলেন, চিলের মত প্রকাণ্ড একটা পাখি আকাশে উড়ছে। দু'পায়ে ক'রে একটা মাছ ধ'রে আছে। সূর্যের আলো লেগে মাছটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে রৌপ্যদ্যুতি, ফুলঝুরি-উৎসব হচ্ছে যেন শূন্যে। পাখির বুকটা সাদা, তার উপর একটা কালো দাগ।

বৈজ্ঞানিক আবার বললেন, "এর সংস্কৃত নাম উৎক্রোশ। ডাক্তার সত্যচরণ লাহা কুররীও বলেছেন, কালিদাসে এর উল্লেখ আছে নাকি।"

একটা করুণ আর্তস্বর ফুটে উঠল আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে প'ড়ে গেল, কালিদাসের সেই শ্লোকটা।

তথেতি তস্যা প্রতিগৃহ্যবাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ।

সীতাকে নির্বাসন দিতে যাচ্ছিলেন যখন লক্ষ্মণ, তখন কুররীর মত করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করেছিলেন সীতা। কবি সবিস্ময়ে শুনছিলেন। সত্যিই বড় করুণ ডাক। অমন বিশাল বলিষ্ঠ পাখি, আকাশে ডানা মেলে উড়ছে, তার অমন করুণসুরে ডাকবার কারণ কি? কবির মনে হ'ল, ওই আকাশচারী বিহঙ্গকে নিতান্ত আধিভৌতিক প্রয়োজনে বার বার মাটিতে নেমে আসতে হচ্ছে ব'লেই সম্ভবত, ওর কণ্ঠ থেকে বিলাপধ্বনি নির্গত হচ্ছে।

রূপচাঁদও দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "প্রচুর হাঁস এসেছে দেখছি। একদিন ডাক্-রোস্টের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না।"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন একটু। বললেন, "আমারও এবার ইচ্ছে আছে কতকগুলো হাঁসকে stuff করানো। ট্যাক্সিডার্‌মিস্টের কাছে পাঠাতে হবে।"

হঠাৎ কয়েকটা পাখি অপ্রত্যাশিতভাবে উড়ল এক জায়গা থেকে। গতিটা সরল রেখায় নয়, এঁকেবেঁকে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "স্নাইপ। হিন্দিতে চাহা বলে। এরা শীতকালে আসে। এরা থাকে ইউরোপে আফ্রিকায় কাশ্মীরে। সাইবিরিয়াতেও।" তারপর তিনি বক্তৃতা করতে লাগলেন স্নাইপ কত রকমের আছে।

"সত্যিকার স্নাইপ অনেকে চেনে না, বুঝলেন। Sandpiper বা Snippet গুলোকে স্নাইপ ব'লে মনে করে অনেকে, এরাই প্রচুর ঘুরে বেড়ায় কি না, এ দেশের নদীর ধারে, বিলে, ঝিলে। প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়। আসল স্নাইপের গায়ের রঙ অদ্ভুত সুন্দর। পাণ্ডুর পিঙ্গল মেটে সাদা বাদামীর অদ্ভুত সমন্বয়। মনে হয়, চমৎকার ছিটের পট্টির কোট গায়ে দিয়ে আছে যেন। ল্যাজের দিকে পাণ্ডুরের সঙ্গে কমলা রঙের আভাস বিশেষ লক্ষণীয়। ঠোঁটটা বেশ লম্বা। কাদা খোঁচাতে হয় কিনা। যে সব পাখিদের খুঁচিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, তাদের ঠোঁট লম্বা। হুপো দেখেছেন? হুপোর মুখটা যেন একটা গাঁইতি। Sandpiper-দের পায়ের পাতা ঈষৎ জোড়া, এদের তা নয়, বুঝলেন, শুনছেন?"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "কাদাখোঁচা নামটা শুনে দ'মে গেলেন বুঝি? কবিতা লেখা যাবে না বোধ হয় এদের নিয়ে।"

"তা যাবে না কেন? রূপচাঁদ, তোমার পকেটে কাগজ পেনসিল আছে কি?"

"পকেট-বুক আছে, তাতে পেনসিলও আছে একটা।"

"দাও তো।"

"ওতে কবিতা লিখবে?"

"ক্ষতি কি।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কবির দিকে। তারপর পকেট-বুকটা বার ক'রে দিলেন। কবি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা শুরু ক'রে দিলেন দেখে বৈজ্ঞানিক রূপচাঁদের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

"বুঝলেন রূপচাঁদবাবু, স্নাইপদের ল্যাজের আকৃতি অনুসারে এদের আবার ফ্যান-টেল্, পিন-টেল এই দু-রকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—"

রূপচাঁদ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "রোস্ট করলে কি স্বাদের কোনও তফাত হয়?"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন, "না, তা হয় না—"

"তবে শ্রেণীবিভাগ জেনে আর লাভ কি বলুন! আচ্ছা, ওই দূরে ওগুলো কি বলুন তো?"

"বক। বকও তিন রকম দেখা যায়, সাধারণত এ অঞ্চলে ইগরেট—"

"ওগুলো চখা বোধ হয়, দেখুন তো।"

রূপচাঁদ বিলের অন্য আর একটা দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে দেখালেন।

"হ্যাঁ, ওগুলো চখা। ব্রাহমিনি ডাক্‌স্‌।"

"একদিন আসতে হবে বুঝলেন।"

"বেশ তো, ব্যবস্থা করুন না একদিন।"

রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, নৌকা বাঁধবার মত সুবিধাজনক কোনও স্থান আছে কি না। বৈজ্ঞানিকও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন যে, জলচর পাখিদের নিজের চোখে যদি পর্যবেক্ষণ করতে হয় তা হ'লে এখানে একটা মাচা বাঁধা দরকার হবে জলের উপর, মাছ ধরবার জন্যে অনেকে যেমন করে। ছোট ডিঙ্গিও রাখতে হবে একটা। দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন আবার। মনে হ'ল, টিলও (Teal) আছে—ছোট বড় দু-রকমই আছে কি? রত্নার সঙ্গে আজ গিয়েই পরামর্শ করতে হবে—এখানে কাছাকাছি একটা ছোট ঘর বেঁধে দুজনেই থাকি যদি—

কবি ব'লে উঠলেন, "হয়েছে, শুনুন—

কাদাখোঁচা কাদাখোঁচা
কিসে তুমি কম বা
অঙ্গে আছে তো রঙ
পুচ্ছেতে আছে ঢঙ
নও মোটে খাঁদা বোঁচা
ঠোঁটটি তো লম্বা।
বাইরেতে ধোয়া-মোছা
মেনকা ও রম্ভা
কাদা ঘাঁটে চুপি চুপি
বহু সতী বহু-রূপী ;
—কুন্তী ও অম্বা
না হয় যদি বা ওঁচা
তবে তোর কাদাখোঁচা
কিসের শরম বা!"

বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "বাঃ! বেশ হয়েছে।"

কবি বললেন, "কবিতা লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল। উইন্‌টার ভিজিটার যে কটি দেখলাম—ফুলকি, খঞ্জন, কাদাখোঁচা প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়—কেন বলুন তো? আমাদের ছোকরা বাবুরা যেমন বেড়াতে গিয়ে কোঁচা দুলিয়ে বা ছড়ি দুলিয়ে বেড়ায়, এরাও তেমনি বিদেশে বেড়াতে এসেছে কিনা, তাই বোধ হয় ল্যাজ দোলাচ্ছে—"

"না, ঠিক তা নয়।"

ঈষৎ হেসে বৈজ্ঞানিক ভাবতে লাগলেন, এর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি রূপচাঁদ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। কবিও চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। শীতের সোনালী রোদ বিলের কালো জলে লুটিয়ে পড়েছে যেন, আত্মহারা হয়ে উজাড় ক'রে দিচ্ছে যেন নিজের সমস্ত সৌন্দর্য। এক ঝাঁক পাখি—চার পাঁচটা—জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওগুলো *Tern*, বাংলায় গাংচিল বলে। আর ওই যে ওপরে শূন্যে পাখা দুটো বিস্তার ক'রে জলের দিকে মাথা নীচু ক'রে আছে ওটা হ'ল মাছরাঙা—Pied King Fisher, White-breasted King fisherও দেখতে পাবেন এখনই, চমৎকার নীল—বুকে চকোলেটের মাঝখানে সাদা—"

কবি কোনও উত্তর দিলেন না দেখে বৈজ্ঞানিকও চুপ ক'রে গেলেন। একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল সহসা। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

সহসা উৎক্রোশের আক্ষেপধ্বনিটা ভেসে এল আবার। কবি চোখ তুলে দেখলেন, পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে চলেছে বিরাট পাখিটা। কবির মনে হ'ল, ও যেন বলছে—

শুনেছি তাহার স্বর
চিত্ত মোর হয়েছে উধাও
পাখায় করেছি ভর
ছেড়ে দাও মোরে ছেড়ে দাও—

৫

রূপচাঁদ মৌলিক সেদিন স্ত্রীকে একটি রঙিন শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন, আবার এক জোড়া দুল নিয়ে এলেন। আপিস থেকে ফিরে পাকানো চাদরটি গলা থেকে নামিয়ে আলনায় রাখতে রাখতে খুব রহস্যময় দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইলেন একবার। তারপর আপন মনে হাসলেন, আর একবার রহস্যময় দৃষ্টিতে চাইলেন স্ত্রীর দিকে, তারপর বললেন, "ভারি দাঁওয়ে একটা জিনিস পেয়ে গেছি আজ—"

স্ত্রী বকুলবালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন, "কি?"

"তোমার পছন্দ হবে কি, দেখ তো।"

দুল জোড়া বার করলেন। পছন্দ যে হবেই, তাতে রূপচাঁদ মৌলিকের সন্দেহ ছিল না। স্ত্রীকে চিনতেন তিনি। বকুলবালার দৃষ্টিতে একটা বিস্মিত আনন্দ ফুটে উঠলেও অনুযোগ-মিশ্রিত ভর্ৎসনার সুরে তিনি বললেন, "আমার দুলের অভাব কি, সেদিনই তো কানপাশা কিনে দিলে এক জোড়া, আবার দুল কিনতে যাওয়া কেন? তোমার যত সব—"

বকুলবালা ঈষৎ নাচের ভঙ্গীতে আয়নার দিকে ফিরে পুনরায় বেণী-রচনায় মন দিলেন। প্রতিবারই এই ধরনের মেকি ভর্ৎসনা ক'রে থাকেন বকুলবালা। রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হাসিটা গোপন ক'রে কণ্ঠস্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে বললেন, "ওসব বাজে কথা রাখ দিকি, তোমার পছন্দ হয়েছে কি না, তাই বল।"

"পছন্দ না হবার কি আছে। কিন্তু কি দরকার ছিল এখন ওসব বাজে খরচ করবার? সেদিন অত দাম দিয়ে শাড়ি কেনারই বা কি দরকার ছিল?"

"আমার খুশি আমি বাজে খরচ করব। আমার বাজে খরচ করতে ভাল লাগে।"

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "তোমাকে কিনে দেব না তো কাকে কিনে দেব বল তো?"

ছোট খুকীর মত আবদার-তরল কণ্ঠে বকুলবালা বললেন, "আমার চকোলেট এনেছ?"

"নিশ্চয়। মর্টনের লজেন্জও এনেছি এক শিশি।"

"কই দাও—"

রূপচাঁদ কোটের পকেট থেকে লজেন্‌জ এবং চকোলেটের শিশি বার ক'রে দিলেন। পঁয়ত্রিশ-বর্ষ বয়স্কা স্থূলাঙ্গিনী বকুলবালা লজেন্‌জ এবং চকোলেট মুখে পুরে ছোট খুকীর মত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে বেণী দুলিয়ে।

রূপচাঁদ আর একটু হেসে কোটের বোতামগুলি খুলতে লাগলেন নীরবে। এই খুকী-প্রকৃতির স্ত্রীটিকে রূপচাঁদ মৌলিক বুদ্ধিবলে প্রায় খাঁচার মধ্যে বন্দিনী ক'রে রেখেছেন বললেই হয়। খাঁচাটা অবশ্য দেখতে সাধারণ খাঁচার মত নয়। কিন্তু শাড়ি, গহনা, লজেন্‌জ, চকোলেট, মিছে কথা, রাগ-অনুরাগের অভিনয় প্রভৃতি দিয়ে যে পরিবেশ তৈরী করেছেন তিনি, তা বকুলবালার পক্ষে দুরতিক্রম্য। এই পরিবেশের ওপরে কি আছে তা জানবার পর্যন্ত কৌতূহল নেই তাঁর। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবার ইচ্ছে হয়, এবং সে ইচ্ছে প্রকাশ করবামাত্র রূপচাঁদ মৌলিক নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশে বসিয়ে তাঁকে সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে আসেন। শহরের এমন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, যেখানে আশেপাশে বাঙালী প্রতিবেশী কেউ নেই। বাঙালী প্রতিবেশীদের, বিশেষ ক'রে প্রতিবেশিনীদের, বড় ভয় করেন রূপচাঁদ। তাঁর ধারণা, হিতৈষীর ছদ্মবেশে এঁরা বাড়ির ভেতর ঢুকে হাঁড়ির খবর নেন, তারপর কথায়-বার্তায় ঠারে-ঠোরে আচারে-ব্যবহারে এমন একটা জটিল কুৎসিত ব্যাপার ক'রে তোলেন যে, পারিবারিক শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে যায়। নিজের স্ত্রীকে তিনি কখনও কারও বাড়ি যেতে দেন না, কারও স্ত্রী তাঁর বাড়িতে আসে এ-ও তিনি পছন্দ করেন না। বকুলবালাও করেন না, স্বামীর মতে সায় দিতেই তিনি ভালবাসেন। এইটে রূপচাঁদ মৌলিকের একটা অসাধারণ কৃতিত্ব। বিবাহিত স্ত্রীকে এমনভাবে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ কাজ নয়। এই দুঃসাধ্য কাজ তিনি করতে পেরেছেন দুটো কারণে। প্রথম কারণ, বকুলবালার সঙ্গে বাইরের জগতের কোনও যোগ নেই, তিন কূলে কেউ নেই তাঁর, ছেলেপিলে হয় নি, হবার সম্ভাবনাও নেই। বিয়ের বছর তিনেক পরে একবার তিনি সন্তান-সম্ভবা হয়েছিলেন, কিন্তু সন্তানটির স্বাভাবিক পরিণতিতে ব্যাঘাত ঘটল। জরায়ুতে না এসে ভ্রূণটি থেকে গেল টিউবে। নিপুণ অস্ত্রোপচারের ফলে প্রাণে বেঁচে গেলেন বকুলবালা কোনক্রমে। কিন্তু তাঁর জরায়ু এবং টিউব কেটে ফেলতে হ'ল। ভবিষ্যতে সন্তান হবার কোনও সম্ভাবনাও রইল না আর। দ্বিতীয় কারণ, বকুলবালা লেখাপড়া জানেন না। সুতরাং রূপচাঁদকে সত্যিসত্যিই বকুলবালার জীবন-সর্বস্ব হয়ে পড়তে হ'ল। বকুলবালার জীবনে রূপচাঁদই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পুরুষ। আর একটি পুরুষ এ বাড়িতে আসে অবশ্য মাঝে মাঝে। রূপচাঁদের সহকারী উমেশবাবুর ছেলে চণ্ডী। স্কুলে পড়ে ছেলেটি। বকুলবালার পাখি দেখতে সে আসে। তারও পাখি পোষার খুব সখ। পাখি দেখবার জন্যে স্কুল থেকেও পালিয়ে আসে সে মাঝে মাঝে। রূপচাঁদ যদিও ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন না, কিন্তু আপত্তিও করেন না তেমন।

রূপচাঁদ কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। পাঞ্জাবী-রুমাল-সর্বস্ব ভদ্রলোক নন, শক্ত সমর্থ পুরুষমানুষ তিনি। নিজের মতে নিজের পথে চলতে পেলে তিনি জীবনে ঠিক কি যে হতেন, তা আন্দাজ ক'রে লাভ নেই। উপস্থিত তিনি হয়েছেন বকুলবালার স্বামী এবং পুলিস সাহেবের আপিসের বড়বাবু। এবং এই উভয়বিধ প্যাঁচোয়া 'পরিস্থিতি'র মধ্যেও স্বকীয় বুদ্ধিবলে নিজের পৌরুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গৃহে স্ত্রী এবং আপিসে সাহেব দুই-ই তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। জীবনের এই দুটি অনিবার্য বাধাকে নিজের আয়ত্তাধীন ক'রে রূপচাঁদ গোপন পথে নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবনযাপন ক'রে থাকেন—এইটেই বর্তমানে তার বিশেষত্ব।

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে রূপচাঁদ মৌলিকের ধারণাটা কি ধরনের, তা তিনি একবার বহুদিন আগে তাঁর বন্ধু আনন্দমোহনকে লিখেছিলেন। কলেজ-জীবন থেকেই আনন্দমোহনের সঙ্গে রূপচাঁদের বন্ধুত্ব। মাঝে অনেকদিন দেখাশোনা হয় নি। জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে আবার দুজনের দেখা হয়েছে এখানে অনেক দিন পরে। চিঠিপত্র অবশ্য চলত মাঝে মাঝে। একটা চিঠিতে স্ত্রীলোকপ্রসঙ্গে একবার তিনি লিখেছিলেন, দেখ ভাই আনন্দমোহন, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তোমার মনোভাবটা কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'ল। আমার মতবাদ (দর্শনও বলতে পার) ও বিষয়ে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। চুনি, পান্না, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মণিমাণিক্যের সঙ্গে নারীর নামও করা উচিত। রমণী সত্যই রত্ন-বিশেষ, রত্ন-শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাকে নিয়ে নানারকম কবিতা লিখতে পার, আপত্তি করব না ; কিন্তু একটি কথা ভুলো না, যে, রত্নের মতই তাকে আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এই আহরণের এবং রক্ষণাবেক্ষণের নানা পদ্ধতি মানুষ যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে। কখনও তাকে প্রহার করেছে, কখনও হারেমে পুরেছে, কখনও দাসী বানিয়েছে, কখনও দেবী বলেছে, কখনও তার স্বাধীন সত্তার গুণগান ক'রে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে শত সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে, কখনও ছিনিয়ে এনেছে, কখনও বিবাহ করেছে, কখনও কবিতা লিখেছে—কত রকম করেছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ। প্রেমের কবিতার জন্মও হয়েছিল বোধহয় ওই একই কারণে। ভারি মনোরম ফাঁদ ওটি, সকলে যদিও ফাঁদ পাততে জানে না। তোমার ও কৌশলটা জানা আছে, কিন্তু ওটি ফাঁদ মাত্র—এই কথাটি মনে রেখো। ওটা নিয়েই দিশাহারা হয়ে প'ড়ো না, কারণ ওটা মীনস্ (means), এণ্ড (end) নয়। যখন তখন আত্মহারা হয়ে তুমি বেসামাল হয়ে পড়, তাই তোমার বন্ধুভাবে কথাটা বললাম। যদি অবধান কর, অনেক বাজে বখেড়ার হাত থেকে রেহাই পাবে।

বলা বাহুল্য, আনন্দমোহন অবধান করেন নি, কারণ তিনি ভিন্ন জাতের লোক।

প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে স্ত্রী-রত্নবিষয়ক এবম্বিধ জহুরীর কোষাগারে বকুলবালারূপ অমূল্য রত্ন এসে যখন কায়েমী আসন গেড়েছিল, তখন রূপচাঁদ প্রথমটা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন বটে ; কিন্তু একটানা ঘাবড়ে থাকবার লোক তিনি নন। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্যকরূপে খাপ খাইয়ে নিজের তরী নানা ঘাটে ভিড়িয়ে এসেছেন তিনি এতকাল অসামান্য দক্ষতাসহকারে। বকুলবালা একা যে তাঁর পারুষ্যের ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম, এই সত্যটি বকুলবালার কাছ থেকে গোপন করতে না পারলে তাঁর ক্ষুধা যে অতৃপ্তই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত—এ কথা বিবাহের কিছুদিন পরেই বুঝেছিলেন তিনি। বিবাহিতা স্ত্রীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এমনই নিখুঁত ছিল যে, বিদ্রোহ করার কল্পনাও তিনি করেন নি। বরং ঠিক উলটো পথ ধরেছিলেন। বকুলবালা এবং নিজের ক্ষুধার মাঝখানে যে গোপনতার জাল তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার প্রায় পনেরো আনাই বকুলবালা-আরতি। বকুলবালার অজস্র প্রশংসা ক'রে, তাঁকে অযাচিত উপহার কিনে দিয়ে রূপচাঁদ তাঁর সচেতন মানসের চতুর্দিকে যে রঙিন কুয়াশা সৃজন করেছিলেন, তা ভেদ ক'রে সত্যের সন্ধান করবার মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি বকুলবালার ছিল না। বকুলবালার নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, স্বামী তাঁর এবং একান্তই তাঁর। এত সাবধানতা সত্ত্বেও বায়ুবাহিত বীজের মত দু-একটা উড়ো খবর কুয়াশাজাল ছিন্ন ক'রে মাঝে মাঝে বকুলবালার কর্ণকুহরে যে না ঢুকত তা নয় ; কিন্তু রূপচাঁদ এমন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রেখেছিলেন যে, সেই উড়ো খবরের বীজ বকুলবালার মনে বিষবৃক্ষে পরিণত না হয়ে অমৃতবৃক্ষেই রূপান্তরিত হ'ত। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে না জানি কি

রহস্যময় একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাঁকে দেখামাত্রই অধিকাংশ স্ত্রীলোক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং চেষ্টা করে তাঁকেও আকৃষ্ট করতে। কিন্তু বকুলবালার মত স্ত্রী ঘরে থাকতে—হুঃ! বকুলবালা গদগদ হয়ে পড়তেন। তিনি কল্পনা করতেন, অদৃশ্য একটা যুদ্ধক্ষেত্রে রূপচাঁদ অহরহ যেন যুদ্ধ করছেন এবং প্রতিবারেই জয়ী হচ্ছেন। সবাই তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করছেন না। বকুলবালা-প্রেমবর্মে আচ্ছাদিত থাকতে কেউ কিছু করতে পারছে না তাঁর। নিজের স্বর্গ-সুখেই ছিলেন বকুলবালা।

জলযোগান্তে মৃদু হেসে রূপচাঁদ বললেন, "আবার এক ফ্যাসাদে পড়া গেছে, বুঝলে?"

"কি ফ্যাসাদ?"

"বার্মা-ফেরৎ একটা মেয়ে এসে জুটেছে। শুধু জোটে নি, ঘাড়ে পড়েছে।"

"বার্মা-ফেরৎ মেয়ে? বার্মা কোথায়, কতদূর এখান থেকে?"

স্মিতমুখে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ। সহধর্মিণীর বিরাট অজ্ঞতায় চমকে গেলেন একটু মনে মনে। খুশিও হলেন পরমুহূর্তে।

"বার্মা অনেক দূর। মগের মুলুক। সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে আজকাল। জাপানীরা বোমা ফেলছে।"

"ও!"—চোখ দুটো বড় হয়ে গেল বকুলবালার।

"সেই বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটি। পথে বাপ ভাই মা বোন—সব ম'রে গেছে। জুটেছে এখানে এসে। অমরেশের বাসায় আছে। অমরেশ কেন যে এসব জোটায়! এখন আমাকে বলছে—তুমি ভাই, সব ঠিক ক'রে দাও ওর।"

"তুমি কি ঠিক ক'রে দেবে?"

"বাসা-টাসা, দাই-চাকর—এই সব আর কি। আমি অমরেশকে বললাম, তুমি নিজের বাসায় ঠাঁই দিয়েছ, বাকিটুকু তুমিই কর না। কিন্তু ও তা শুনবে! না-ছোড় লোক। আমাকে বলছে—তুমি পুলিসের লোক, তুমি সহজে ব্যবস্থা করতে পারবে। দেখ দিকি কি আপদ!"

স্বামী-গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বকুলবালার মুখে।

"আহা, ক'রেই দাও না। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে কষ্টে পড়েছে বেচারী। বাপ-মা ম'রে গেছে?"

"সব।"

"বিয়ে হয় নি?"

"না।"

"আহা! দাও একটা ব্যবস্থা ক'রে।"

"মেয়েমানুষ কিনা! এখনই চট ক'রে কে কি ব'লে বসবে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, আনন্দকে দিয়ে তোমার মুনিয়া পাখির বিষয়ে ছোট্ট একটা ছড়া লিখিয়ে এনেছি।"

"সত্যি?"

নতুন খেলনার লোভ দেখালে শিশুর চোখ দুটো যেমন আনন্দে আগ্রহে জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে, বকুলবালারও তেমনই উঠল।

"কই, পড় না শুনি।"

বকুলবালা সময় কাটাবার জন্যে নানারকম পাখি কিনে দিয়েছেন তাঁকে রূপচাঁদ। টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, ময়না, শ্যামা, মুনিয়া। এই সূত্রেই অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল

কিছুদিন পূর্বে। তারপর আলাপ অবশ্য গাঢ়তর হয়েছে। পাখির সম্বন্ধে যতটা না হোক, অমরেশবাবু লোকটির সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। প্রাক্তন বন্ধু আনন্দও এসে জুটে যাওয়াতে জ'মে উঠেছে ব্যাপারটা। কবিকে দিয়ে কবিতাটা অনেকদিন আগেই লিখিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এখন তাক মাফিক কাজে লাগালেন।

"কই, পড়—"

"দাঁড়াও সিগারেটটা ধরাই আগে।"

ধীরে-সুস্থে সিগারেটটা বার করলেন। ধীরে-সুস্থে ঠুকলেন সেটাকে টেবিলের উপর, ধীরে-সুস্থে দেশলাই কাঠিটি বার ক'রে ধরাতে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু বকুলবালার তর সইল না আর। হাত থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা কেড়ে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বললেন, "না তুমি পড় আগে।"

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেললেন রূপচাঁদ। এই-ই তিনি চাইছিলেন। বকুলবালার মনটা যেদিকে যখন ঝোঁকে, সেই দিকেই তখন ছোটে অবিলম্বে। অন্য দিকে তখন ফিরে চায় না, ফেরবার সামর্থ্য থাকে না। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা ছবি মনে পড়ল রূপচাঁদের। এই ছবিটা প্রায়ই মনে পড়ে তাঁর। বকুলবালা-চরিত্রের একটা ভয়ঙ্কর দিক আবিষ্কার করেছিলেন সেদিন তিনি। ঈর্ষার প্ররোচনায় বকুলবালা যে খুন পর্যন্ত করতে পারে, এ কথা তার আগে কল্পনাতীত ছিল রূপচাঁদের। বকুলবালা সত্যিই খুন করেছিলেন। অবশ্য মানুষকে নয়, একটা রামছাগলকে। অনেকদিন আগে একটা রামছাগলের ছানা কিনে দিয়েছিলেন তিনি বকুলবালাকে। কিন্তু রামছাগলটা তাঁরই বেশী ন্যাওটা হয়ে পড়ল কোনও অজ্ঞাত কারণে—সম্ভবত, তার পরমায়ু ফুরিয়েছিল ব'লে। তিনি যখন আপিস থেকে আসতেন, তখন সেটা তাঁরই আশে পাশে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াত। বকুলবালা ডাকলেও তাঁর কাছে যেত না। তখন শীতকাল। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি, রামছাগলটা তড়াক ক'রে এসে বিছানায় উঠল এবং যে জায়গাটায় বকুলবালা শোন, সেই জায়গাটায় বসল এসে বাগিয়ে। লম্বা লম্বা কান দুটি নেড়ে সরল চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা ভাষা ফুটিয়ে তুলল, যার অর্থ—রূপচাঁদের মনে হ'ল—লেপটা জড়িয়ে দাও না আমার গায়ে। রূপচাঁদ লেপটা জড়িয়ে দিলেন তার গায়ে। সে আরও গুটিসুটি হয়ে ঘেঁষে এসে বসল। কিছুক্ষণ পরেই এলেন বকুলবালা—এবং যেমন তাঁর প্রাত্যহিক রীতি—ছেলেমানুষের মত হুড়মুড় ক'রে বিছানায় উঠে রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন—

"এ কি, লেপের তলায় এ কে?"

"ছাগলটা এসে ঢুকেছে।"

"বেরো, বেরো, বেরো পোড়ারমুখো"—হিড়হিড় ক'রে টেনে সেটাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। রূপচাঁদ প্রত্যাশা করছিলেন, ছাগলটাকে বার ক'রে দিয়ে বকুলবালা তখনই আবার ঢুকবেন লেপের তলায় এসে। কিন্তু বকুলবালা ফিরলেন না। কয়েক মিনিট পরে আর্তকণ্ঠের একটা 'ব্যা' শব্দ শুনে উঠতে হ'ল রূপচাঁদকে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন, বকুলবালা মাছ-কাটা বড় বঁটিটা দিয়ে ছাগল-ছানাটাকে কাটছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগুন, মাথার কাপড় স'রে গেছে, কুন্তল আলুলায়িত। সে ভয়াবহ মূর্তি। ঈর্ষাপীড়িত হ'লে বকুলবালা যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন, সেই দিন চকিতের মধ্যে বুঝেছিলেন তিনি, আর সেই দিন থেকে মনে মনে ভয়ও করেন তিনি তাঁকে।

"পড় না ছড়াটা!"

রূপচাঁদ মানিব্যাগের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটি বার ক'রে প'ড়ে শোনালেন—

মুনিয়া রে মুনিয়া,
কথা যা রে শুনিয়া
গায় ক'টা ফোঁটা আছে
আয় দেখি গুণিয়া।
পতঙ্গ ধরিয়াছে পক্ষীর বেশ কি
ছটফটানির তোর নেই আর শেষ কি
সারা গায়ে অপরূপ রেশমের গালচে
কখনও সবুজ রঙ কখনও বা লালচে
কখনও পান্না তুই
কখনও বা চুনিয়া
মুনিয়া রে মুনিয়া।

কবিতা শুনে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো! ভাল ক'রে লিখে দাও তুমি একটা কাগজে, খাঁচাটার গায়ে সেঁটে রাখব।"

"আচ্ছা, সিগারেটটা খেয়ে নিই, দাঁড়াও।"

"না, আগে লেখ তুমি।"

রূপচাঁদ চেয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। অবুঝ শিশুর দৃষ্টি চোখের চাহনিতে।

"তুমি আনন্দবাবুকে ব'লে আমার মদনলাল, যমুনা আর সোহাগীর নামেও ছড়া লিখিয়ে এনো, কেমন? প্রত্যেকের খাঁচার গায়ে সেঁটে দেব, বেশ?"

রূপচাঁদ স্ত্রীকে চিনতেন। বাগ্‌বিতণ্ডায় আর সময় নষ্ট না ক'রে লিখতে শুরু করলেন ছড়াটা। বকুলবালা উন্মুখ আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন।

৬

কবি একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেদিন আপন মনে। অমরবাবু রূপচাঁদ কেউ সঙ্গে ছিলেন না। ভোরে উঠেই দুজনে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন, তা বলতে পারলে না কেউ। রত্নপ্রভা বললেন, পাশের গ্রামে কোনও পাখিওলার কাছে গেছেন সম্ভবত—"

কবি একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল, সজনে গাছে ফুল ধরেছে। গোছা গোছা সাদা সাদা ফুল। আর একটু এগিয়ে গেলেন—পাতাগুলোও কি চমৎকার! আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, চাকুন্দা গাছে লম্বা লম্বা শুঁটির মত ফল ধরেছে। কিছুদিন আগেই হলদে হলদে ফুলের গোছায় ভরতি ছিল সব। এখনও ফুল আছে দু-চারটে, কিন্তু ফলের সংখ্যাই বেশি। শুভ্র সুন্দর ধুতরো ফুলগুলোও আর নেই, কণ্টকিত ফল দেখা দিয়েছে। একটা কথা মনে পড়তেই এগিয়ে গেলেন তিনি। একটু দ্রুতপদেই গেলেন। কিছুদিন আগে একটা ঝোপের মধ্যে ঘন বেগুনী রঙের ফুলের ছড়া দেখেছিলেন। বড় বড় দুলের মত দুলছিল যেন বনলক্ষ্মীর অলকগুচ্ছ। গিয়ে দেখলেন, একটিও নেই, তার জায়গায় সিম ঝুলছে গোছা গোছা। মনে হ'ল, শীতের সময় যে সব ফুলের দল এসেছিল চ'লে গেছে তারা। মনে পড়ল, বাগানে রঙ্গন কুন্দর গাছে যে মহোৎসব পড়েছিল কিছুদিন আগে, তাও আর নেই। ফুটছে বটে দু-চারটে ফুল, কিন্তু জোয়ার নেবে গেছে। স্থলপদ্মও ফুটছে না আর। জবাও খুব কম।

গাঁদা আর বিদেশী মরশুমী ফুলেদেরই ভিড় এখন। শীতকালে যেমন এক দল বিদেশী পাখি আসে আবার চ'লে যায়, তেমনিই এক দল ফুলও আসে আবার চ'লে যায়। বিদেশী পাখিরা চ'লে যায়, কিন্তু রেখে যায় কি কিছু? যায় কি না জানা নেই। শীতের ফুলেরা ফল রেখে যায়, কিন্তু কোথায় যায় ওরা? তাও জানা নেই। ফুলই ফলে পরিণত হয়—এ বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে মন যেন মানতে চায় না। বরং ভাবতে ভাল লাগে যে, দু জাতের জিনিস ওরা। এক দল আসে আর একদল চ'লে যায়। এক দলের কর্তব্য শেষ হয়, শুরু হয় আর এক দলের। প্রথম দলই দ্বিতীয় দলে পরিণত হয়—চুল-চেরা হিসেব ক'রে ঠিক করেছে যারা, তারা বেনে। হিসেবটাও নিখুঁত নয় সব সময়ে। তবু ছাড়বে না, তর্ক করবে। হিসাবের খুঁটিনাটিতে মত্ত হয়ে কি ক'রে যে দিন কাটায় ওরা! না, হিসাব নিয়ে মাথা-ঘামানো কবির কাজ নয়। প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না। যে আবির্ভাব সমস্ত সত্তাকে উতলা ক'রে তোলে, তার সত্য রূপ হিসাব ক'রে দেখা যায় না, দেখা যায় কবির দৃষ্টি দিয়ে...এই ধরনের খাপছাড়া ভাবনা ভাবতে ভাবতে আপন মনে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি।

...হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, শহরের বাইরে অনেক দূর এসে পড়েছেন। খাতা পেন্সিল সঙ্গে এনেছিলেন। অনেক কবিতার লাইন মনে আসে, কিন্তু হারিয়ে যায়। এবার থেকে টুকে রাখবেন ঠিক করেছেন। ওরা যখন কেউ সঙ্গে নেই আজ, আপন মনে কবিতাই লেখা যাবে কোথাও ব'সে। একটা আমবাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি। দেখলেন, একটা গাছের তলায় রোদ এসে পড়েছে. বেশ। নিজের র‍্যাপারটা বিছিয়ে তার উপর বসলেন। মনে হ'ল, মন্দাকিনী দেখলে কুরুক্ষেত্র করতেন। মুচকি হাসলেন একটু।

...দূরে নদীর চর দেখা যাচ্ছে। সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন। মাঝে মাঝে সরষে ফুল। বিরাট একটা সবুজ মখমলের গালিচায় সোনার চুমকি জ্বলছে অজস্র। এক ঝাঁক পাখি এসে বসল সামনের গাছটায়। ব'সেই আবার উড়ল। আবার বসল আর একটা গাছে। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। দেখে চিনতে পারলেন। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছেন সেদিন। এই দেশে 'পাওয়াই' বলে। ময়না এক জাতের। ইংরেজী নাম Grey headed Myna। মাথা পিঠ ধূসর রঙের, পেটের তলা বাদামী, ঠোঁটটি কালচে গোছের। শীতকালে আসে। কবির মনে হ'ল, মানুষদের মধ্যেও এক জাত আছে, যারা ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে—সন্ন্যাসীর দল, বেদুইনের দল। তারা মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দেখা দেয়, হয় ভিক্ষা করতে, না হয় রাহাজানি করতে। এ পাখিগুলোও তেমনই বোধ হয়। পাওয়াই নাম না দিয়ে বেদুইন নাম দিলে বোধ হয় বেশি মানায়। আর একবার তাঁর মনে হ'ল, আমাদের ভাষায় সব পাখির নাম সুন্দর নয়। নতুন নামকরণ করা উচিত। আবার উড়ল ময়নার দল। উড়ে চ'লে গেল দৃষ্টির ওপারে। কোনও চিহ্ন আর রইল না তাদের। কবির মনে জাগল কবিতা—

আকাশেতে ওড়ে নিশি
ওড়ে কত দিন
ওড়ে পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে
শকুনি সারস কাক,
অদৃশ্য ঘোড়া চ'ড়ে
ওড়ে বেদুইন
কিন্তু আকাশে কোনও
থাকে না তো চিন্।

উড়ে সব চ'লে যায়
চিহ্ন থাকে না হায়
চেয়ে থাকে মহাকাল
শান্ত প্রবীণ
নির্মল মহাকাশ
নাই কোন চিন্।

চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। স্বপ্নালোক মূর্ত হয়ে উঠল যেন চারিদিকে। অনামা শব্দ, অজান-গন্ধ, চকিত স্পর্শ...তার ওপার থেকে পরিচিত জগতের টুকরো টুকরো খবর ভেসে আসছে। দূরে ঘুঘু ডাকছে করুণ সুরে। কুটুর কুটুর ক'রে বুলবুলিরা ডাকছে মাঝে মাঝে পাশের ঝোপটায়। আবার নীরব হয়ে গেল সব। আবার চোখে ভেসে উঠল দূর দিগন্তের মায়া-মরীচিকা—হ্যাঁ, যদিও সবুজ, তবু মরীচিকাই—কাছে গেলে থাকে না। দূর থেকে প্রলুব্ধ করে শুধু...হঠাৎ চোখে পড়ল, সামনের কলকে ফুলের গাছে কোকিল ব'সে আছে একটা। এতক্ষণ দেখতে পান নি। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। কুচকুচে কালো পালক। কালো গরদ যেন। সবুজ ঠোঁট। লাল চোখ। চুপ ক'রে ব'সে আছে গুটিসুটি হয়ে। কবির মনে হ'ল, ধ্যান-মগ্ন। মনে হ'ল, ও কোকিল নয়—আলোক-পিপাসী অন্ধকার। অমানিশার টুকরো একটা। পালিয়ে এসেছে আলোর দেশে।

পিক-রূপে অন্ধকার আলোর তপস্যা করে
আলো চায় কালো,
চঞ্চুতে সবুজ-স্বপ্ন, নয়নে অনল-ভাতি
বলে—আলো জ্বালো,
হে দেবতা, জ্বালো আলো—সপ্তবর্ণ-সম্মিলন-ভাতি—
দূর হোক অন্ধকার দুর্বিষহা ভয়ঙ্করী রাতি
অবারিত হোক দৃষ্টি জীবনেতে জাগুক প্রভাতী
আলো দাও আলো—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ সুরে ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক ক'রে উঠল কে যেন। কবি চেয়ে দেখলেন, পাশের গাছটা থেকে উড়ে গেল জংলা-শাড়ি পরা কোকিলা। ওর সঙ্গিনী বোধ হয়। পরমুহূর্তেই কোকিলও উড়ে গেল। তপোভঙ্গ হ'ল তার। দূরে কোমল মধুর কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল তার মিনতি—কুক্, কুক্, কুক্, কু—

খাতা পেন্সিল প'ড়ে রইল ঘাসের উপর। সামনের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন কবি। এক ঝাঁক সবুজ টিয়া বসল সামনের বকুল গাছটায়। দূরদিগন্তের সবুজ মরীচিকাই নবরূপে ভোলাতে এল নাকি তাঁকে? নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন তিনি। হ্যাঁ, সমস্ত মরীচিকাই! ডানার কথা মনে পড়ল সহসা। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন খানিকক্ষণ। কল্পনালোকে ঘন অরণ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন যেন। সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই বাজাতে লাগল কেবল—হোক মায়া, হোক মরীচিকা, তবু সুন্দর। কালই যে কবিতার দুটো লাইন এসেছিল তাঁর মনে কিন্তু যা তিনি শেষ করেন নি, সেই দুটো লাইনই গুনগুন ক'রে এল আবার—

ভ্রমর আসিয়া কানে কানে কহে কুন্দর
তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর।

এল, আবার চলে গেল। শেষ করতে ইচ্ছা হ'ল না। মনে হ'ল, অসমাপ্ত জিনিসেরও না-বলা বাণী আছে একটা। তা অব্যক্তরূপেই বিকশিত। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। যে রোদের ফালিটা পিঠের উপর ছিল এতক্ষণ কোলের উপর পড়ল সেটা এসে। দুষ্টু ছেলে যেন একটা। এতক্ষণ, পিঠের উপর ঝুলছিল, কোলে এসে বসল এবার। আলোক-শিশু। কোথা থেকে এল এ? গাছের কোন ফাঁকটা দিয়ে এল দেখতে গিয়ে আর একটা জিনিস চোখে প'ড়ে গেল। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। চোর-পাখি। দূরবীন তুলে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন। পেটের তলাটা বাদামী, অনেকটা আরশোলার মত রঙ। পিঠের রঙটা ইঁদুরের মত। ছোট্ট চৌকোণা ল্যাজটি। ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ডালটা ঠোকরাচ্ছেও কাঠঠোকরার মত। বাঃ, হঠাৎ কেমন ঘুরে গেল ডালের নীচের দিকে! খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি খাতা পেন্সিল তুলে নিলেন।

আরশোলা-রঙ পেটের তলায়
ইঁদুরের রঙ পিঠে
তবু গাই তার জয়
নামটা তাহারে বঙ্গবাসীরা
দেয়নি যদিও মিঠে
তবু সে তুচ্ছ নয়।

আকাশের সাথে মিতালি যে তার
মেলতে জানে সে ডানা
করে না সে চাক্‌রি তো
পাশাপাশি ব'সে কাঠঠোক্‌রার
খায় সে পোকার খানা
সরল স্বোপার্জিত।

চোরা-বাজারের সঙ্গেতে তার
নেই কোনও পরিচয়
চেনে না কালো-বাজার
ডালে ডালে শুধু হামাগুড়ি দেয়
পাতায় পাতায় নয়
আমি জয় গাই তার।

আমার কাব্যে চোরা-পাখি তুমি
চতুরিকা চঞ্চরী
গোপন-সঞ্চারিণী
অদৃশ্য পথে আনাগোনা কর
অন্তর মন ভরি' —
আমি যে তোমারে চিনি।

কবিতাটা শেষ ক'রে কবি আবার চেয়ে দেখলেন উপরের দিকে। চ'লে গেছে চতুরিকা

পাখি। ওরা থাকে না, চলে যায়। আসা আর যাওয়া দুটোই সত্য। পাওয়া আর হারানো, মিলন আর বিরহ, অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে বিশ্বকবির ছন্দে। আমরা একটাকে আঁকড়ে ধরি, অন্যটাকে মানতে চাই না। তাই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাই বার বার। হাহাকার ওঠে জগৎ জুড়ে।

'কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক' আর্তস্বরে হাহাকার ক'রে উঠল কে যেন। কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, আর একটা পাখি। অচেনা পাখি। উঠে পড়লেন। দূরের উঁচু ডালটায় বসল। দূরবীন দিয়ে দেখলেন, ভাল বোঝা গেল না। এগিয়ে গেলেন একটু। এবার দেখা গেল। নতুন ধরনের শ্রাইক (Shrike) নিশ্চয়, কারণ চোখের উপর কালো টানা রয়েছে। 'কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক'—চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল আবার পাখিটা। দূরের একটা গাছে গিয়ে বসল। সেখান থেকে উড়ল দুটো পাখি। সঙ্গী পেয়ে গেল বোধ হয় প্রথমটা।

কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক—বসন্ত-বউরি ডাকছে। টংক টংক টংক—ডেকে চলেছে ভগীরথ। তার সঙ্গে জাল বুনে চলেছে ঘুঘুর করুণ সুর। কয়েকটা চিল ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার উপর মন্থরগতিতে। অদ্ভুত পরিবেশ! বিহ্বল কবি ব'সে পড়লেন একটা ঝোপের ধারে। বাঁশ-পাতি পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন বাঁশের পাতা। ছিপছিপে দেহ, আর পাতলা সবুজ রং। দূরবীন দিয়ে দেখলেন, শুধু সবুজ নয়, ঈষৎ হলুদেরও আমেজ আছে। নীলেরও আভাস আছে মুখের কাছটায়, বিশেষত গলায়। ঘাড়ের কাছে সোনালি। চোখের কাছে কালো, গলায় কালো কণ্ঠি, চোখ লাল, ঠোঁট কালো। ল্যাজের থেকে লম্বা সরু পালক বেরিয়ে এসেছে একটি। রূপসী। হঠাৎ মনে হ'ল দুটো লাইন—

ফলের মধ্যে নাসপাতি
পাখির মধ্যে বাঁশ-পাতি।

তখনই মনে হ'ল, মিলের জন্যেই লাইন দুটো মনে এল নাকি? নাসপাতির সঙ্গে সত্যি সত্যি কিছু কি মিল নেই ওর কোনখানে? আছে বইকি। রঙের মিল তো অনেক আছে। স্বভাবেরও মিল আছে হয়তো। ছিপছিপে চটুলা কিশোরীর মত দেখতে, স্বভাবও হয়তো অম্লমধুর। কবিতাটা আর একটু বাড়াবেন কি না ভাবছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আর একজন। সামনে ছোট্ট একটা ডাল হাওয়ায় দুলছে। ডালের উপর ওটা কি? নাচছে নাকি? বাঃ, চমৎকার তো! মনে পড়ল বইয়ে ছবি দেখেছিলেন। অমরবাবু বলেওছিলেন এর কথা। কুলো পাখি নিশ্চয়। না হয়ে যায় না। ছোট্ট পাখিটি, চড়ুই পাখির মতন। দূরবীনে নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে ব'সে রইলেন মুগ্ধ হয়ে। বাঃ, নাচের কি বাহার! উড়ে গেল। খাতা খুলে ব'সে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

হাওয়ার দোলে বাহা বাহা
ছোট্ট শাখী
ফুরফুরিয়ে
উঠছে দুলে,
তার উপরে নাচছে আহা
ছোট্ট পাখি
ল্যাজ ঘুরিয়ে
প্যাখম তুলে।

আলোয় মাখা সবুজ ডালে
আপন মনে নাচছে তালে
পালকগুলি যাচ্ছে ঘুরে
প্রাণের সুরে গানের সুরে
সকল ভুলে।
চোখের উপর কি সুন্দরই
মরি মরি
চন্দনেরি
তিলক শোভে,
ওড়নাখানা তার পোষাকী
পরল নাকি
চড়াই পাখি
নাচের লোভে!
কালচে রঙে সাদার ছিটে
মানিয়েছে বেশ লাগছে মিঠে
পুচ্ছ-পাখার বাহার দিয়ে
হচ্ছে মনে লাফিয়ে গিয়ে
আকাশ ছোঁবে।
বুঝবে না তো আকাশ-ছোঁবার অর্থ কি, ও
কুলো পাখি? মিথ্যা কথা, নর্তকী ও।

কবিতা শেষ হতে না হতেই আর একটা তীক্ষ্ণ-মধুর ডাকে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। ঢেউ-খেলানো তীক্ষ্ণ মধুর একটানা ডাক একটা। সুরের 'গ্রাফ' (graph) যেন এঁকে-বেঁকে মূর্ত হচ্ছে শ্রুতিলোকে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। ঘাড় তুলে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন নীল রঙের পাখিটাকে। চিনতে পারলেন। মাছরাঙা। White-breasted King Fisher। তখনই মনে হ'লে—পক্ষীবিদ্‌রা এর সাদা বুকটাকেই এত প্রাধান্য দিয়েছেন কেন? গায়ে তো ওর রঙের অভাব নেই? খাতা খুলে আবার শুরু করলেন কবিতা।

বাজাই তোমার রূপের ডঙ্ক
হে বর্ণাঢ্য মৎস্য-রঙ্ক
ধন্য হয়েছে তোমারে পাইয়া
খাল বিল নদ নদীরা,
পক্ষীবিদেরা করেছে লক্ষ্য
কেবল তোমার শুভ্র বক্ষ
জানি না কেন যে দেখে নি চাহিয়া
তব লাল-নদী খদিরা।
কবির চক্ষু বর্ণ মগ্ন
স্বপ্ন, স্বপ্ন কেবল স্বপ্ন—
মাতায়ে তুলেছে উন্মুখ হিয়া

বর্ণ-বহুল মদিরা,
ভেসেছে মনের ময়ূরপঙ্খী
কার সন্ধানে সে নিঃশঙ্কী
অজানা নদীতে উজান বাহিয়া
চলেছে উতলা অধীরা।

পাখিটা উড়ে চ'লে গেল। কবি ভাবতে লাগলেন ওর 'হোয়াইট-ব্রেস্টেড্' নাম হ'ল কেন? অমরবাবু কাছে থাকলে হয়তো একটা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কবির মনে হ'ল, সেকালে পক্ষীবিদেরা পাখি মেরে মেরে পক্ষী-বিজ্ঞান চর্চা করতেন। ওর ধপধপে সাদা বুকটায় বন্দুকের তাক করবার সুবিধে হ'ত ব'লেই বোধ হয় ওই নাম দিয়েছিলেন তাঁরা। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। শিস দিলে কে? পাখি? একটা পাখি নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে চলতে লাগলেন নদীর দিকে। প্রায় ছুটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, কি একটা হাতছাড়া হয়ে গেল যেন। নাগালের বাইরে চ'লে গেল চিরদিনের মত। কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কিন্তু। মাঠে ছোট ছোট মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দু প'ড়ে ছোট ছোট মুক্তোর জালের মত হয়েছে, চারিদিকে ছড়ান রয়েছে অজস্র। প্রখর দিবালোকে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত একটা কথা মনে হ'ল তাঁর। এই নির্জন প্রান্তরে কাল রাত্রে দেবকন্যারা আসে নি তো? লাস্যলীলা-অবসানে চ'লে গেছে হয়তো ভোরবেলা। ফেলে গেছে তাদের কবরীর জালাবরণ! যে পাখিটার অনুসরণ ক'রে একটু আগে চলছিলেন, তার কথা ভুলেই গেলেন। সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা হেঁট ক'রে চললেন নদীর দিকে। মিষ্টি মিহি আর একটা সুর শুনে একটু পরেই কিন্তু উপরের দিকে চাইতে হ'ল আবার। একদল কালো কালো ছোট ছোট পাখি উড়ছে। দূরবীন দিয়ে দেখেই চিনলেন। কমন সোয়ালো (Common Swallow)। এর সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন অমরবাবু। এদেরই সম্বন্ধে বোধ হয় সেই পাদরি বৈজ্ঞানিক গিল্‌বার্ট হোয়াইট বলেছিলেন যে, এরা শীতকালে কাদার নীচে চ'লে যায়। আসলে কিন্তু শীতকালে এরা এ দেশে আসে। ও দেশে থেকে গ্রীষ্মকালে। ইংরেজী প্রবাদটাও মনে পড়ল—One swallow does not make a summer। দূরবীন দিয়ে দেখলেন আবার। ল্যাজটা অনেকটা ফিঙের মত, পেটের কাছে সাদাটে, গলার নীচেটা বাদামী, পিঠটা কুচকুচে কালো, ছোট্ট ঠোঁট, মুখটি সুন্দর। দেশী নাম আবাবিল। কি চঞ্চল! এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। আবার একটা কবিতা জাগল মনে। অন্তরলোকে কবিতার প্রস্রবণ বইছে আজ। খাতা আর বার করলেন না। মনে মনেই চলল রচনা।

শীতের অতিথি আবাবিল,
নূতন আকাশে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুরে ঘুরে দেখে খাল বিল,
গ্রাহ্য করে না আশে পাশে ওড়ে
শকুনি গৃধিনী কাক চিল,
কি চায় কি চায় ঠিকানা না পায়
বিশ্রাম নেই এক তিল,
শীতের অতিথি আবাবিল।

ডানার কথা মনে পড়ল। ও মেয়েটিও তো অতিথি এ দেশে। ওর মনও কি চঞ্চল হয়ে

উঠে নি এই আবাবিলদের মত? হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। খঞ্জন, ফুলকি, কাদাখোঁচা, আবাবিল, উৎক্রোশ সকলেই কেমন যেন উন্মনা অস্থির, কি যেন খুঁজছে সবাই। ডানা কি চুপ ক'রে আছে? কি খুঁজছে ও? কাকে খুঁজছে? কি ভাবে খুঁজছে? ওর কালো চোখের দৃষ্টিতে যে আলোর ঝলক দেখেছিলেন সেদিন, তা ভাষা-ভরা কিন্তু তার অর্থ কি? কবির সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল, কাঁপতে লাগল ছন্দভরে। পরমুহূর্তেই নতুন একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল কিন্তু। সামনে সাঁকো একটা। অত্যন্ত পল্‌কা ব'লে মনে হ'ল। কয়েকটা বাঁশ আর তক্তা দিয়ে তৈরি। আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পণে পার হলেন। পার হয়েই সবুজের রাজ্য। গম যব ছোলার ক্ষেত। ও কিসের শব্দ? ভারি মিষ্টি তো! উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার শব্দ হ'ল। কোন্ পাখি এ? এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছুই দেখতে পেলেন না। একজন চাষাকে দেখা গেল দূরে। কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তাকেই প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি ডাকছে বলতে পার?"

"ভরত।"

ভরত! ভরদ্বাজ! সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে গাইতে ছোট্ট একটি পাখি উড়ল গমের ক্ষেত থেকে। সোজা উঠল খানিক দূর আকাশে, তারপর থেমে গেল শূন্যে, ডানা দুটো কাঁপতে লাগল, দেখা যেতে লাগল দোদুল্যমান পা দুটো, গানের ঝরনা ঝরতে লাগল চতুর্দিকে।

ভরত—স্কাইলার্ক—শেলী-ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক!

অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। সোঁ ক'রে পাখিটা নেবে এল আবার। অদৃশ্য হয়ে গেল গমের ক্ষেতে। সুর শোনা যেতে লাগল সবুজের আড়াল থেকে, মনে হ'ল, গম ক্ষেতই গান গাইছে বুঝি। ভরত! ভারতবর্ষের সঙ্গে যার নাম গাঁথা? ভারতের কাব্যে পুরাণে ধর্মে রূপকথায় অমর হয়ে আছে যে নাম! সুরের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

চাষাটি ঘাস কাটতে আরম্ভ করেছিল। কবি তার কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে বসবার মত জয়গা হবে একটু কোথাও?"

"আমার ওই মাচায় গিয়ে বসতে চান তো বসতে পারেন।"

কাছেই ছোট মাচাটি। কবি তার উপর উঠে বসলেন। আবার উড়ল একটা ভরত পাখি। বাদামী রঙের ছোট্ট পাখিটি। দূরবীন দিয়ে দেখলেন কবি। বাদামী রঙ, তার উপরে ঘন-বাদামীর পোঁচ চারিদিকে, অনেকটা বাঘের গায়ের মত। তাই বোধ হয় সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্রাট। অপরূপ গানে আবার পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কবির মন। মূর্ত হয়ে উঠল যেন অতীতের মাধুরী সুরের অপ্সরা-রূপে। ইতিহাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশতে লাগল ছন্দের চটুল গিটকিরি। কবি দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন এই অদ্ভুত সুরস্রষ্টাকে। তারপর খাতা বার ক'রে লিখতে লাগলেন—

প্রণাম জানা প্রণাম জানা মহৎ ও ক্ষুদ্রে
জলতরঙ্গ বাজায় ও যে সবুজ সমুদ্রে,
বিষ্ণুশর্মা চিনত ওকে, চিনত বাল্মীকি
রাম-সীতা ওর আত্মীয় যে—তোরাই ভুলবি কি?
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

শকুন্তলার পুত্র ভরত—ভারতবর্ষ যার,
হরিণ-পাগল ভরত ঋষির গল্প চমৎকার,

নাট্য শাস্ত্র লিখল ভরত,—ভরত বিহঙ্গ
সবুজ ক্ষেতে ছন্দে মেতে করছে কি রঙ্গ
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

সবুজ ক'রে সবুজতর গিটকিরি ছন্দে
উড়ছে সোজা আকাশপানে মনের আনন্দে
থামিয়ে ডানা মাতিয়ে দিয়ে শূন্য-উষরকে
তখ্‌খুনি ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজ ভূস্বর্গে
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

বৃহস্পতির পুত্র যিনি মুনি ভরদ্বাজ
অঙ্গিরা যাঁর ঠাকুরদাদা—তিনিই বুঝি আজ
সুরের ধারায় শুষ্ক ধরায় করেন নিষিক্ত
নতুন ক'রে করেন প্রমাণ আপন ঋষিত্ব
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

অরূপ দোলা দুলছে এ কি মর্ত্যে নন্দনে
আকাশ মাটি পড়ল বাঁধা সুরের বন্ধনে
স্বপ্ন এবং বাস্তবেতে প্রভেদ ঘুচে যায়
রোদের সোনায় সবুজ দোলে সুরের ব্যঞ্জনায়
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন কবি। মনে হ'ল শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চ'লে গেছে। ভারি দুর্বল বোধ করতে লাগলেন। চোখ বুজে ব'সে রইলেন। অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। মুদিত চোখের সামনেও মূর্ত হতে লাগল অপরূপ কি যেন একটা, যা অবর্ণনীয় কিন্তু অনুভূতি-গোচর। যখন চোখ চাইলেন, তখন সেই চাষা চ'লে গেছে। কত বেলা হয়েছে, কে জানে! চারিদিকে চেয়ে দেখলেন আবার। সবুজ, সবুজ কেবল সবুজ। সরষে ফুলে স্বর্ণকান্তি ঠিকরে পড়ছে দূরে। আরও দূরে নির্মল নীল আকাশ নুয়ে পড়েছে। দিগন্তরেখায়—সবুজ আর নীল মিশেছে যেখানে—সেখানে শিখিকণ্ঠকান্তি কোন্ ময়ূর গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ওখানে! ভরদ্বাজ ডাকছে। মনে হচ্ছে, মিষ্টি-কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক পড়ছে যেন কে। সহসা তাঁর মনে হ'ল একটা বিরাট কিছুর সামনে ব'সে আছেন তিনি। যা ঐশ্বর্যময় কিন্তু অনাড়ম্বর, দিগন্তপ্রসারী কিন্তু নিকটতম, যা সমৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। আবার কবিতা জাগল মনে—

বহমান নদীতীরে উন্মুক্ত আকাশতলে
ব'সে আছ কোন্ মহারাজ,
নাহি কোনও তূর্যনাদ উচ্চ বাদ-প্রতিবাদ
তুচ্ছ 'সাজ্ সাজ্'।
ঘনশ্যাম সিংহাসনে ব'সে আছ আপনা পাশরি
রূপে রসে পরিপূর্ণ নানা ছন্দে বাজিয়ে বাঁশরী
শুভ মাঙ্গলিক-মন্ত্র উচ্চারিছে শতকণ্ঠ ভরি'

শত ভরদ্বাজ

হে জনক নির্বিকার, হে রাজর্ষি আসক্তি-বিহীন,
তোমারে প্রণাম করি আজ।

কবিতাটা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত, কিন্তু বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

"আরে, আপনিও এখানে?"

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন কবি। মাঠের সরু পথ বেয়ে গম-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক আসছেন। তাঁর পিছনে রূপচাঁদ আর একজন লোক। কাছে আসতে দেখা গেল, রূপচাঁদের এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে থলি। অচেনা লোকটির হাতে ঢাকা-দেওয়া খাঁচা একটি। কবি খাতাটি পকেটে পুরে মাচা থেকে নেবে পড়লেন।

"আপনাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি একা একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম আজ। রূপচাঁদ, তুমি আপিস যাও নি? কটা বেজেছে?"

রূপচাঁদ নিজের হাত-ঘড়িটি দেখে বললেন, "বারোটা। আজ রবিবার।"

"ও। কোথা গিয়েছিলে তোমরা?"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন।

"আমি বেরিয়েছিলাম লিয়াকতের উদ্দেশে। কোয়েলের সন্ধানে।"

"কোয়েল? কোকিল?"

"না, সে কোয়েল নয়। এ হচ্ছে কিউ ইউ এ আই এল—Quail! বটের। ওরাও উইন্‌টার ভিজিটার কিনা। আপনাকে দেখাবার জন্যেই বিশেষ ক'রে বেরিয়েছিলাম। লিয়াকৎ বটের পোষে আমি জানতাম, তার কাছ থেকেই আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ওদিকের ধান-ক্ষেতেও কিছু পেয়ে গেলাম আসবার সময়। রূপচাঁদবাবুর বন্দুকও ছিল। দেখবেন? দেখাও তো লিয়াকৎ।"

লিয়াকৎ সাবধানে বটের পাখিটিকে বার করলে খাঁচা থেকে। এত সাবধানে, এত সন্তর্পণে, যেন পাখি নয়, অপরূপ নিধি।

"এটা পুরুষ। তার চিহ্ন হচ্ছে গলায় এই কালো দাগ। অনেকটা নোঙরের মত, নয়? মেয়েদের গলা সাদা। মেয়েগুলো আকারেও একটু বড়। মেয়েদের গলার সাদাটা বুশ কোয়েল (Bush Quail), রেন কোয়েল (Rain Quail), পেন্টেড বুশ কোয়েল (Painted Bush Quail), এগুলোতে আরও স্পষ্ট। বাটন কোয়েল (Button Quail) ব'লে আর এক রকম পাখি আছে, তারা আসলে অবশ্য কোয়েল নয় মোটেই, তাদের ল্যাজ নেই। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি, গোড়াতেই সেটা বলা উচিত ছিল, কোয়েলদের বিশেষত্ব হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন, ল্যাজ নেই, তা ছাড়া এই দেখুন চারটে ক'রে আঙ্গুল। বাটন কোয়েলদের ল্যাজ নেই কিন্তু আঙ্গুল তিনটে, তাই তারা আসল কোয়েল নয়। এটার নাম হচ্ছে কমন গ্রে কোয়েল (Common Grey Quail), এরাই শীতকালে এ দেশে বেশি আসে। এর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে ডানায়। এই দেখুন এগুলোকে পিনিয়ন কুইল (Pinnion Quill) বলে, এর রঙটা লক্ষ্য করুন, ড্রাবের (Drab) ওপর বাফের (Buff) দাঁড়ি দাঁড়ি। ড্র্যাবকে কি বলবেন বাংলায়? কটা? বাফ বোধ হয় মানুষের চামড়ার রং, না? এই বিশেষত্বটা অন্য কোয়েলদের তেমন নেই। কোয়েল আছে অনেক রকমের। বুশ কোয়েলই কয়েক রকমের আছে। বাস্টার্ড কোয়েল (Bustard Quail), রেন কোয়েল, জাপানীজ কোয়েল (Japanese Quail) আছে অনেক রকম।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। ছোট্ট জীবন্ত ফানুস যেন একটা।

"বিদেশ থেকে আসে এরা? কতদূর থেকে?"

"বহুদূর। আফ্রিকা, সেণ্ট্রাল এশিয়া, ওয়েস্ট এশিয়াও। এদের জ্ঞাতিগুষ্টিদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে গুড ফ্লায়ার্স (Good-fliers)—ওড়ন্দাজ বললে বাংলাটা ভুল হবে কি?"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হেসে চাইলেন কবির দিকে।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "এইটুকু পাখি অত উড়তে পারে?"

"নিশ্চয়। লোহিত সাগর, ভূমধ্য-মহাসাগর পার হয়ে চ'লে আসছে। ভেবেই দেখুন না। সেণ্ট্রাল এশিয়া থেকে যেগুলো আসে, আর বেশির ভাগ সেখান থেকেই আসে, তাদের আবার হিমালয় পার হতে হয়। পথে অবশ্য মারা পড়ে অনেকে। কিন্তু অদ্ভুত, নয়?"

বৈজ্ঞানিক চাইলেন রূপচাঁদের দিকে।

রূপচাঁদ বললেন, "খেতেও অদ্ভুত?"

"তা ঠিক মানুষের কবলে এরাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি পড়ে পাখিদের মধ্যে। আপনি কটা পেয়েছেন?"

'বেশি নয়, গোটা-বিশেক হবে। চাখা চলবে। আপনার বাড়িতেই সন্ধ্যেবেলা জমা যাবে সকলে, কি বলেন, আপনার বাইরের দিকের ওই বাবুর্চিখানাটায় সব ব্যবস্থা করবেন। আমিই রাঁধব। আনন্দ, তুমি আসছ তো?"

"আসব। কিন্তু বেশি ঝাল দিও না।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে একবার, কোন জবাব দিলেন না।

বৈজ্ঞানিক মনে মনে বিব্রত হলেন একটু। সন্ধ্যার সময় একটা প্রবন্ধ ফাঁদবেন ভেবেছিলেন ডিম সম্বন্ধে। মুখে তবু বললেন, "বেশ তো, আসবেন। রত্না সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।"

চলতে শুরু করলেন আবার সবাই।

লিয়াকৎ অমরবাবুর দিকে চেয়ে বললে, "আমাকে এবার ছুটি দিন তবে। এঁর দেখা তো হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, এবার তুমি যাও। তিতিরের কথা মনে থাকে যেন।"

"হ্যাঁ, সে আমি যোগাড় ক'রে দেব। যোগীন্দরের আছে এক জোড়া।"

কবি লিয়াকতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বটের পুষেছেন কেন? খাবার জন্যে?"

উত্তর দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"না না লড়াই করবার জন্যে। মুরগীর লড়াই যেমন হয়, আগে বুলবুলির লড়াই যেমন হ'ত, তেমনই বটেরেরও লড়াই হয়। পুরুষগুলো ভারী ঝগড়াটে। তিতিরও খুব লড়ে। লিয়াকতের বটের চ্যাম্পিয়ন এ অঞ্চলে।"

লিয়াকৎ সগর্বে নিজের বটেরটির দিকে তাকিয়ে চুমকুড়ি দিলে একবার। সঙ্গে সঙ্গে বটেরটা যেন ব'লে উঠল, "ঠিক তো ঠিক।"

লিয়াকৎ বটেরকে খাঁচায় পুরে সেলাম ক'রে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চাইলেন কবির দিকে।

"অদ্ভুত শিখিয়েছে তো লিয়াকৎ! শুনলেন ডাকটা? ইংরেজরা এ ডাককে কেউ বলে ওয়েট মি লিপ (Wet me lip), কেউ বলে ডিক-বি কুইক (Dick-be-quick)। ফাঁকা মাঠে জঙ্গলের কাছাকাছি এই ডাক শুনে শিকারীরা বুঝতে পারে যে, বটের আছে। ওদের ওড়বার

সময় একটা বিশেষ ধরনের শব্দও হয়, হুররররর গোছের। ধান-ক্ষেতে সেই শব্দ শুনেই আমরা টের পেলাম, বটের আছে। অনেক পাখিরই ওড়বার সময় একটা শব্দ হয়। ঘুঘুদের হয়, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়—"

বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতায় বাধা পড়ল। ভরত-পাখি ডেকে উঠল একটা। বিস্মিত আনন্দে থেমে গেলেন হঠাৎ তিনি ব্যায়ত আননে।

"ভরত! দেখেছেন?"

"দেখেছি। কবিতাও লিখেছি একটা"—বিস্মিতমুখে উত্তর দিলেন কবি।

"ও, দ্যাট্'স অল রাইট—এবার বটেরকে নিয়েও লিখুন।"

"সেটা কাবাব খাওয়ার পর হবে"—কবির দিকে আড়চোখে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "কাবাবে আর কাব্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।"

কবি হাসলেন একটু। তারপর বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শীতকালের পর ওরা এ দেশ থেকে চ'লে যায় সব?"

"কিছু কিছু থেকেও যায়। ডিমও পাড়ে এ দেশে। ওদের ডিমও দেখতে চমৎকার। বাদামীর ওপর চকোলেটের ছিট-ছিট। তাই তো মনে হয় যে, ফুল্‌কি, মানে রেডস্টার্ট, হয়তো ডিম পাড়তে পারে এ দেশে, যদি ধ'রে রাখা যায়। রেডস্টার্ট তিন রকম আছে বলেছি কি আপনাকে? ব্ল্যাক, হোয়াইট ক্যাপ্‌ড্ (White capped), প্লাম্‌বিয়াস (Plumbeous)—আমরা ব্ল্যাকটাকেই দেখতে পাই।"

কবির কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন একবার তাঁর দিকে। মাথা হেঁট ক'রে চলেছেন ভদ্রলোক। নীরবে পথ অতিবাহন করতে লাগলেন তিনিও। কবির মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ বেশ ছিলেন তিনি স্বপ্নের হাট ভেঙে গেল হঠাৎ। অমরেশবাবুর বিজ্ঞান আর রূপচাঁদের বন্দুক সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে যেন। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর রূপচাঁদের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি বললেন, "শুনবে নাকি কবিতা?"

"কি বিষয়ে?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"বটের।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এর মধ্যেই হয়ে গেল নাকি?"

কবি আবৃত্তি করলেন—

পার হয়ে হিমালয় সাগর করিয়া জয়
উড়ে আসে ছোট ছোট পক্ষী-ফানুস
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে সোজা গতি
বটের তো নয় ওরা,—পালকের প্রজাপতি
শীতের অতিথি সব,—আহা, কি চমৎকার!
আমরাও ক'রে থাকি যথোচিত সৎকার
ঝোপে ঝাড়ে উৎসুক
ব'সে থাকি উন্মুখ
হাতে ল'য়ে বন্দুক
সভ্য মানুষ—
কাবাব কোপ্তা কারি ক'রে ফেলি রকমারি
ছিল যা একটু আগে রঙিন ফানুস।

বৈজ্ঞানিক সোল্লাসে ব'লে উঠলেন, "বাঃ!"

কবির দিকে মিটমিট ক'রে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আমাকে ঝাল দিতে মানা করলে, নিজে কিন্তু বেশ ঝাল দিয়েছ তো!"

৭

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রি। সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটাতে রাত্রির রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে যেন। ডানা বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে আছে। শুয়ে জেগে আছে, ঘুম আসছে না কিছুতেই। ভয় করছে না। যে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিপর্যয় অতি-দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হেনে তার আত্মীয়-স্বজন সহায়-সম্পদকে অবলুপ্ত করেছে, ভয়কেও অবলুপ্ত করেছে সে-ই। আর ভয় করে না। স্বয়ং মৃত্যুকে সামনে মূর্ত দেখলেও চমকে ওঠবার মত মানসিক সজীবতা তার আর নেই। অন্তত মনে হচ্ছে, নেই। সমস্ত মনটা অসাড় হয়ে গেছে। যে অদৃষ্ট-দেবতা এক নিমেষে তার সমস্ত অতীত জীবনটাকে ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে একাকার ক'রে দিয়ে গেছেন, তার এই বিধ্বস্ত বর্তমানের কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি না, তিনিই তা জানেন। এ জীবনের কোনও ভবিষ্যৎ থাকা উচিত কি না, তিনিই তা ঠিক করবেন। ডানার যেন কোনও দায়িত্ব নেই, দায়িত্ব বহন করবার শক্তিও নেই। খরস্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করেছে সে, যেখানে গিয়ে ঠেকবে সেইখানেই তার স্থান। সে আপত্তি করবে না উল্লসিত হবে না, মেনে নেবে।

সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটা ঠিক নদীর ধারে। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র সৈকত দেখা যাচ্ছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হচ্ছে মাঝে মাঝে অতিক্ষীণ দূরাগত হংস-কাকলীতে। দূর নদীর চরে হাঁসের মেলা বসেছে বোধ হয়। চিত্রটা কল্পনায় পরিস্ফুট হওয়ামাত্র মনটা হাঁসের পাখায় ভর ক'রে উড়ল যেন মহাশূন্যে। মনে হ'ল, সেও যেন সত্যি উড়ে চলেছে আলোক আঁধারে সূর্যকিরণে ঝড়ের মেঘে। জন্ম-জন্মান্তরের মাঠ পাহাড় সমুদ্র বনানী পেরিয়ে কোথায় চলেছে সে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল খানিকক্ষণ। 'ওয়াক্' ক'রে শব্দ ক'রে উঠল রাতের বক। ন'ড়ে চ'ড়ে শুল সে আবার। রাত্রি কত হয়েছে কে জানে! আনন্দবাবু যে চাকরটাকে দিয়ে গেছেন সে বাইরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে অঘোরে। রূপচাঁদবাবু, আনন্দবাবু দুজনেই লোক ভাল—হঠাৎ মনে হ'ল ডানার। রূপচাঁদবাবু সাহায্য না করলে তাকে আরও কত জায়গায় যে ভেসে ভেসে বেড়াতে হ'ত অনিশ্চিতভাবে! দুপুরের রোদ মাথায় ক'রে আনন্দবাবু তার জন্যে চাকর খুঁজে নিয়ে এলেন দূরের এক গ্রাম থেকে। অত বড় অধ্যাপক একজন। ভাল লোক দুজনেই। কিন্তু তখনই তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। যেন তার সদা-জাগ্রত অন্তরাত্মা সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলে—সত্যিই ভাল লোক কি, সত্যিই কি নিঃস্বার্থপর? মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। সে যখন বি. এ. পরীক্ষা দেয়, প্রফেসার চৌধুরী দু বেলা তার বাড়িতে আসতেন তাকে সাহায্য করবার জন্য। একান্তভাবে সাহায্যও করেছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে সে কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেত না কিন্তু তবু প্রফেসার চৌধুরীর সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা আছে, তা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়। মনে পড়ল রিসার্চ স্কলার ভাস্কর বসুর কথা শান্ত সৌম্য বলিষ্ঠ মূর্তিটা স্পষ্ট ভেসে উঠল চোখের উপর...তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। ভাস্করের সম্বন্ধে তার মনে কোনও গ্লানি নেই, কোন মোহও নেই। কোথায় সে এখন? এই ভীষণ আবর্তে কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে! ঠিকানাও জানা নেই যে খোঁজ করবে। খোঁজ করবার প্রেরণাও নেই মনে। তার মুদিত নয়নের সামনে এলোমেলো নানা স্মৃতির টুকরো, অসম্বন্ধ বহু প্রশ্নের আভাস ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল

জলস্রোতের খড়কুটোর মত। তার মনে হচ্ছিল, সবই বৃথা, সবই অর্থহীন। কোন কিছুই তার মনে বিশেষ কোন সাড়া তুলছে না। তার মনে হচ্ছিল বটে, তুলছে না, কিন্তু তুলছিল। অতি সঙ্গোপনে অবচেতন-লোকে তুলছিল। তার বিধ্বস্ত চেতনার নেপথ্যলোকে অগোচরে জাগছিল নতুন আশার অঙ্কুর, নতুন কৌতূহলের ঔৎসুক্য। সে বুঝতে পারছিল না। সমস্ত শোক, সমস্ত বিপদ, সমস্ত ঝঞ্ঝার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি ক্ষতে প্রলেপ দেয়, ক্ষতিকে পূর্ণ করে, শোকের তীক্ষ্ণতাকে রূপান্তরিত করে সান্ত্বনার প্রশান্তিতে, সে প্রাণশক্তি তার অন্তরেও কাজ ক'রে চলেছিল অগোচরে।

...নদীর দিক থেকে দুম দুম ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কয়েকটা, সচকিত হয়ে উঠে বসল সে। তার আপাত ঔদাসীন্যের পরদাটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ যেন। সেই ফাঁক দিয়ে তার মন নিমেষে নীত হ'ল আসামের জঙ্গলে, যে জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়েছিল তারা। ডাকাতদের হাতে বন্দুক ছিল। সেই বন্দুকের গুলিতেও তার বাবা, সৎ-মা আর ছোট সৎ-ভাইটি মারা যায়।...নিবিড় জঙ্গল, অদ্ভুত একটা লতার ঝোপ, তীব্র গন্ধ একটা, সামনে একটা এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ পাথর প্রকাণ্ড, তার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে সে। কেমন ক'রে পালিয়ে কি ভাবে যে ঝোপটায় ঢুকেছে, তা বুঝতে পারছে না। অনেকক্ষণ ব'সে রইল।...তারপর মনে হ'ল, এমন ভাবে ব'সে থাকাটা অনুচিত হচ্ছে, ওদের কি হ'ল দেখি...আমাদের দলটাই বা কত দূরে! পরের গ্রামে গরুর গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় এবং আগে থাকতে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে সহজে পাওয়া যাবে—এই আশায় বাবা দলের কাউকে কিছু না ব'লে একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন রাত্রে। যে লোকটা গোপনে খবর দিয়েছিল, সেই হয়েছিল পথপ্রদর্শক। ওই অঞ্চলেরই একজন লোক। সে-ই এই জঙ্গলে এনে ঢুকিয়েছিল। সে যে ডাকাতদের গুপ্তচর তা পরে বোঝা গেল। অতীতের সেই ভীষণ কয়েকটা ঘণ্টা আবার ফিরে এল যেন, ডানার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল বার বার। জঙ্গলের তীব্র গন্ধটা আবার অনুভব করতে লাগল সে যেন প্রত্যক্ষ চেতনায়...সেই রুক্ষ পাথরটা সে যেন আবার স্পষ্ট দেখতে পেলে। পাথরটার আড়ালে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল সে। কোনও হিংস্র জন্তু কিন্তু আসে নি। কেবল সাপের মত কি যেন একটা চ'লে গিয়েছিল পাশ দিয়ে, সাপ হোক, যাই হোক, কিছু বলে নি। দংশন করল বিবেক। বিবেকের দংশনে অধীর হয়েই সে বেরিয়ে এল পাথরের আড়াল থেকে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ডাকাতদের দল চ'লে গেছে নাকি? সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে মেরে এগুতে লাগল সে। চারিদিকে অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না, কোন শব্দ নেই। একটু এগিয়ে হতাশ হয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। চোখ বুজে এল আবার, সজাগ হয়ে থাকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। তারপর হঠাৎ যখন চোখ খুলল তখন সকাল হয়ে গেছে, পাখির ডাকে সারা বন মুখরিত। সে একটু বিস্মিত হ'ল লজ্জিত হ'ল। এত দুঃখে এমন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেও ঘুম আসে! কিন্তু এসেছিল। আশ্চর্য! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, উঠে একটু এগিয়েই দেখতে পেলে, তিনটি মৃতদেহ পড়ে আছে সারি-সারি। তার বাবার মায়ের আর ভাইটির। তিনজনেই উলঙ্গ। ডাকাতরা কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে কতক্ষণ সে যে দাঁড়িয়ে ছিল, তা তার মনে নেই...তারপর কেন যে তাদের ছেড়ে এসেছিল, তাও ভাল মনে পড়ছে না,—হ্যাঁ, পড়েছে, তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করবার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল সে বন থেকে। ভেবেছিল, কাছাকাছি কোনও লোকালয় যদি পাওয়া যায়, তা হ'লে হয়তো কোনও ব্যবস্থা হতে পারবে। কিছুদূর গিয়ে পথ পেয়েছিল একটা। সেই পথ দিয়ে কিছুক্ষণ চলবার পর একটা মিলিটারি লরি দেখা গেল। হাত তুলতে থামলও সেটা। নির্বিচারে বিনা দ্বিধায়

সেইটেতেই উঠে পড়ল সে। 'টমি'তে ভর্তি ছিল। একটু দূরে গিয়ে একটা গ্রামে ঢুকেই নেবে পড়তে হয়েছিল। 'টমি'দের ন্যক্কারজনক অতি আপ্যায়ন সহ্য করতে পারছিল না সে। মনে হয়েছিল, এরাই সভ্যতার বড়াই করে? এদের দেশের মিস মেয়ো নাক তুলে কথা বলে? গ্রামে দেখা হ'ল কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে শবদেহগুলির সন্ধান ক'রে সৎকার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাকে সাহায্য করলেন অনেক এবং একটা ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, এই ট্রেনটায় না গেলে ভবিষ্যতে আর যাওয়াই হবে না সম্ভবত। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন কি না কে জানে!

দুম দুম দুম দুম—আবার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। হাঁসের কলরব বেড়ে উঠল যেন। উৎকর্ণ হয়ে ব'সে রইল ডানা। এখানেও ডাকাত পড়বে নাকি? নির্জন নদীতীরের প'ড়ো বাড়িতে অসম্ভব নয় কিছু। কিন্তু কি লোভে আসবে এখানে ডাকাত! বাড়িটা প'ড়ো—সেও তো নিঃস্ব। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল সে যে নিজেই একটা লোভনীয় বস্তু। সোনা-রূপো, মণি-মাণিক্য, জরি-জহরতের চেয়েও ঢের বেশি মূল্যবান। তার অঙ্গ অলঙ্কৃত করবার সুযোগ পায় ব'লে তো মূল্য ওসবের। তাকে কেন্দ্র ক'রেই তো উতলা হয়েছে মানুষের বাসনা যুগে যুগে...রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড—মহাকাব্য মহাযুদ্ধ—সবই তো তাকে কেন্দ্র ক'রেই। দানব-মানব-দেব সবাই লোলুপ আগ্রহে চেয়ে আছে তারই দিকে। 'টমি'গুলোর কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল ইরানী সেই ভদ্রলোকের দৃষ্টি...ভয় নয়, একটা সূক্ষ্ম গর্ব তার সারা মনে সঞ্চারিত হতে লাগল ধীরে ধীরে। বিছানার উপর হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসেছিল সে। হাত দুটি কোলের উপর ছিল। হঠাৎ সে হাত দুটি তুলে এলায়িত কুন্তলটা ঠিক ক'রে নিলে...ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করলে আয়নার অভাব...তারপর উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল দ্বারের দিকে! অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে একটা। তার গণ্ডে অলকে গ্রীবাভঙ্গীতে তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠল বিজয়িনীর মাধুরী-মহিমা।...মানুষের গলার শব্দ—হ্যাঁ, একাধিক মানুষের।

"আমাদের ভাগ্য ভাল। অনেক রকম পাওয়া গেছে। গীজ যে পাওয়া যাবে তা আশাই করিনি।"

ডানা উঠে এসে জানলাটা খুলে দিলে। জানালার নীচেই খানিকটা বাগানের মত ছিল এক কালে। সেখান থেকে সিঁড়ি নেবে গেছে নদীর তীরের দিকে। সেখানে বাঁধানো চাতাল আছে একটা, লোহার বেঞ্চিও আছে খান কয়েক। সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন, ডানা দেখতে পেলে। একজনের হাতে প্রকাণ্ড একটু পেট্রোম্যাক্স্-জাতীয় আলো। টর্চও প্রত্যেকের হাতে। তাদের মুখ দেখা না গেলেও কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল!

"কটা কি পাওয়া গেল গুণে দেখবে না?"—গলার আওয়াজে ডানা বুঝলে রূপচাঁদবাবু।

বৈজ্ঞানিক সোৎসাহে বললেন, "বেশ তো।"

নিজেই গুণতে শুরু করলেন।

"নাকি হাঁস পাঁচটা, লালশর গোটা তিনেক, বারহেডেড গীজ চারটে।"

"গীজের দেশী নাম নেই কোনও?"—কবি প্রশ্ন করলেন।

"রাজহাঁস বলে অনেকে। ও, আপনাকে সব দেশী নাম বলতে হবে বুঝি? গড! এই পাঁচটা হচ্ছে লেসার হুইস্‌লিং টীল, মানে শরাল হাঁস বলা হয় যাকে।"

কবির দিকে চেয়ে হাসলেন বৈজ্ঞানিক।

মুন্সি পাশে দাঁড়িয়েছিল, বললে, "এখানে সিল্‌হি বলে।"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে আরও কয়েকটা হাঁস আলাদা করতে করতে বললেন, "এগুলো হচ্ছে ব্রাহমিনি ডাক্‌স—মানে চখা। এ পাঁচটা হচ্ছে আর এক জাতের লালশর, আর এগুলো সব টীল—কয়েক রকমই আছে দেখছি। বাইজোভ—পীনটেলও পাওয়া গেছে দেখছি। এটা কি? স্মিউ—বাঃ, চমৎকার! এটাকে স্টাফ করাতে হবে।"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন জানলার দিকে।

"উনি উঠেছেন দেখছি।"

বৈজ্ঞানিক জিব কাটলেন অপ্রস্তুত মুখে।

"ছি ছি, অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না। ছি খুব অন্যায় হয়েছে।"

রূপচাঁদের অধরে এমন অদ্ভুত একটা হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল যার সম্যক অর্থ করা একটু কঠিন। চতুরতা, ব্যঙ্গ, লোভ, আঘাত-ঔদাসীন্য এবং আরও অনেক কিছুর সমন্বয় তা।

কবি বললেন, "উঠেই পড়েছেন যখন, তখন চলুন না, যাওয়া যাক বারান্দার ওপর। এখানে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কি?"

"কোনও অর্থ হয় না"—বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন।

"না না, সেটা কি ঠিক হবে?"—বৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ করলেন তাড়াতাড়ি। "এত রাত্রে একজন ভদ্রমহিলাকে এমনভাবে বিব্রত করা, বিশেষত তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ নেই মোটে। হয়তো ভাবতে পারেন যে, আমরা তাঁর দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে—"

"আপনারা শিকার করতে বেরিয়েছিলেন বুঝি!"—কপাট খুলে বেরিয়ে এল ডানা।

"অনেক পাখি মেরেছেন তো? কি ওগুলো—সব হাঁস নাকি?"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি। ডানার এই অতিসাধারণ প্রশ্নের অন্তরালে তিনি যেন বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুর আকৃতি প্রত্যক্ষ করলেন।

"শুনবেন ওদের পরিচয়?"

"বেশ তো।"

"এই মুন্সি, নিয়ে আয় ওগুলোকে বারান্দার ওপর।"

সবাই এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। মুন্সি হাঁসগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে সাজাতে লাগল। এক ধারে একটা ভাঙা টুল ছিল, তার ওপরে রাখা হ'ল পেট্রোম্যাক্‌স লণ্ঠনটা।

"যে বেঞ্চিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়?"—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন ডানাকে।

"ভিতরে আছে! বার করব?"

"আপনি করবেন কেন? আমরা করছি"—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন কবি। রূপচাঁদও গেলেন। দুজনে মিলে বার ক'রে নিয়ে এলেন বেঞ্চিটাকে। কবি যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, আরব্য উপন্যাসের একটা রজনী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। তিনি যেন হারুন-অল-রসিদ। অনেকক্ষণ থেকেই একটা অস্পষ্ট ভাব তাঁর মনে সঞ্চরণ করছিল। হঠাৎ সেটা কবিতার রূপে মূর্ত হলে।

উতলা রজনী কিসের গন্ধে,
গভীর রাতের গোপন ব্যথায়
অতনু শিল্পী অশোনা ছন্দে
কি রাগিণী গাহে অরূপ গাথায়।
এ কি অশ্রুত মোহন ছন্দ

এ কি অস্ফুট গোপন গন্ধ
কোন্ কাননের এ অচেনা ফুল
　　এ কবিতা লেখা কাহার খাতায়।
মদির হয়েছে নিবিড় রজনী
　　অধীর হয়েছে কবির চিত্ত
অসম্ভব কি হবে সম্ভব?
　　চির-অনিত্য হবে কি নিত্য?
হয়তো খুলিবে দুয়ার বন্ধ
হয়তো দৃষ্টি লভিবে অন্ধ
প্রত্যাশা-ভরা আকুল 'হয়তো'
　　অন্ধকারকে ছন্দে মাতায়।

ডানা কবির দিকে চেয়ে বললে, "বসুন।"

"আপনি বসুন আগে"—সম্ভ্রমসহকারে উত্তর দিলেন কবি।

ডানা বসল গিয়ে। ডানা বসতেই রূপচাঁদও ব'সে পড়লেন তাঁর পাশে। ঈষৎ ইতস্তত ক'সে সসঙ্কোচে কবিও বসলেন আর এক পাশে।

বৈজ্ঞানিক হাঁসগুলোকে আবার শ্রেণীবিভাগ ক'রে সাজিয়ে ফেলছিলেন। সাজানো হয়ে যাবার পর উপবিষ্ট শ্রোতাদের দিকে চেয়ে হাতে হাত ঘ'ষে বললেন তিনি, "সত্যিই কি হাঁসের বিষয় কিছু শুনবেন আপনারা? ভাগ্যক্রমে এক সোয়ান (Swan) ছাড়া আর সব রকমই পাওয়া গেছে দেখছি, এমন কি ড্যাবচিক (Dabchick) মানে পানডুবি পর্যন্ত, যা অনেকে টীল ব'লে ভুল করে।"

"বেশ তো, বলুন না"—ডানা বললে।

"বলবার আগে হাঁসের সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা দরকার। জলচর পাখিমাত্রেই হাঁস নয়। হাঁসের কয়েকটা লক্ষণ আছে। ঠোঁট সোজা, ঠোঁটে দাঁতের মত খাঁজ-খাঁজ আছে ওপরে নীচে দু জায়গাতেই, পায়ের গোছ খুব লম্বা নয়, পায়ের সামনের তিনটে আঙুল জোড়া, আর একটা ছোট্ট আঙুল পেছনের দিকে আছে। এই দেখুন পানকৌড়ির পায়ের আঙুল জোড়া নয়; যদিও সাঁতার কাটবার জন্যে প্রত্যেক আঙুলে ওয়েব (web) আছে। হাঁসের শ্রেণীবিভাগ নানা রকম আছে। কিন্তু ফিন (Finn) সাহেব মোটামুটি চেনবার জন্যে যে ভাগটা করেছেন সেটা মন্দ নয়।"

রূপচাঁদ ডানার কানে ফিসফিস ক'রে বললেন, "লম্বা লেক্‌চার ঝাড়বেন বলে মনে হচ্ছে।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার হাঁসগুলোকে দেখছিলেন। রূপচাঁদের কথা শুনতে পেলেন না তিনি। হঠাৎ ফিরে শুরু করলেন বক্তৃতা।

"ফিন সাহেব হাঁসদের চারটে ভাগ করছেন—Swan, Goose, Mergansers, Ducks, Swan এ দেশে প্রায় দেখা যায় না। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে আকারে বড়, গলাটা খুব লম্বা। Goose-এর গলাও লম্বা, কিন্তু এদের নাকের ছ্যাঁদাটা ওপর-ঠোঁটের ঠিক মাঝামাঝি আছে। বার-হেডেড গুজের এই দেখুন। দেহের এবং গলার তুলনায় মাথাটা ছোট। ঠোঁটও ছোট এবং একটু কম চওড়া। হাঁসদের ঠোঁটের মাঝখানে একটা নখের মত থাকে, এই দেখুন। এদেরটা একটু বড় হয়। ঠোঁটের খাঁজও দাঁতের মত, ঘাস কাটবার উপযোগী। এরা সাধারণত

নদীর ধারে চ'রে বেড়ায় কিনা। এদের গায়ের রঙেরও বিশেষত্ব আছে। হয় বাদামী গোছের, না হয় পাঁশুটে, আর প্রত্যেক পালকের ধারটা একটু ফিকে রঙের, সেই জন্যে সর্বাঙ্গে একটা ডুরে-ডুরে ভাব। এরা সাধারণত উত্তর-মেরুতে থাকে। শীতকালেও বড় একটা দক্ষিণ অঞ্চলে আসে না। তবে আমাদের দেশে এই Bar-headed Goose ছাড়া আর এক রকম Grey Goose দেখা যায় শীতকালে। গীজ আরও আছে কয়েক রকম। Red-breasted Dwarf, White-fronted, Pink footed তবে এ দেশে দেখা যায় না বড়। এদের সকলেরই পা হয় হলদে, আর একটু লম্বা গোছেরই, কারণ ডাঙায় হেঁটে বেড়াতে হয় কিনা। হাঁসদের তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে Mergansers। এদের বিশেষত্ব সরু ছুঁচলো ঠোঁট, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়, wind-pipe-এর নীচের দিকে ফাঁকা একটা কৌটোর মত জিনিস থাকে, Bulla Ossea। এরা খুব সাঁতার কাটে, ভাল ডাইভারও। মাংসে আঁসটে গন্ধ। এরা সাধারণত আমিষ-ভোজী। এদের জাতের আমরা একটা পেয়েছি—স্মিউ (Smew)। এরাও সাধারণত আসে না এ দেশে। তারপর আসুন, চতুর্থ শ্রেণীর হাঁস—Ducks। এদের বিশেষত্ব গলা লম্বা নয়, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়—except in golden eye—ঠোঁটও ছুচলো নয়। এরা অনেক রকম species-এর হয়—উনত্রিশ রকম। এইগুলোই সাধারণত দেখি আমরা। ফিন সাহেব এদের আবার তিন ভাগ করেছেন। এক ভাগ ডাইভিং—এরা প্রায় জলেই থাকে, দ্বিতীয় ভাগ Pedestrian and Perching—অর্থাৎ ডাঙাতেও আসে মাঝে মাঝে, গাছেও দেখা যায়। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে Surface feeders। এরা সাধারণত জলে ডুবে খাদ্য সংগ্রহ করে না, কিংবা গাছেও চড়ে না।"

"সংক্ষেপ করুন"—রূপচাঁদ বললেন। তারপর তিনি ডানার কানে কানে কি বলতেই ডানা উঠে পড়ল এবং বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে বললে, "এক মিনিট। আসছি এক্ষুণি"—ব'লেই চ'লে গেল ভিতরে।

"কেন, কি হ'ল?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

"একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম। চায়ের সব সরঞ্জাম কিনে দিয়ে গেছি। চা হ'লে আরও জমবে।"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হাসলেন একটু। যদিও ফাল্গুন মাস প'ড়ে গেছে, তবু শেষরাত্রে বেশ শীত এখনও। একটু গরম চা পেলে যে ভালই হয়, এ কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি। কিন্তু বাধা পড়াতে তিনি যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তা তাঁর হাসি থেকেই বোঝা গেল। হেঁট হয়ে আবার পাখিগুলোই সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন তিনি।

কবি একদৃষ্টে মৃত হাঁসগুলির দিকে চেয়েছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ পাখির দল। কি সুন্দর! উন্মুক্ত ডানায় উড়ে বেড়াত নীল আকাশের নীচে। আর উড়বে না। বৈজ্ঞানিকের সত্য-সন্ধানের এই পথটাই কি ঠিক পথ? কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে কতটা খবর পাওয়া যায়! তা ছাড়া সত্য কি কেবল চোখে দেখবার জিনিস? অমরবাবুর বিজ্ঞানচর্চার এই সব নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে আগে আগে খুব কষ্ট হ'ত তাঁর। এখন আর হয় না। সহ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এখন শুধু যে কষ্ট হচ্ছে না তা নয়, আনন্দ হচ্ছে। এই মৃত মরাল-মরালীর স্তূপের উপর পা রেখেই তো তিনি উঠতে পেরেছেন মানসীর মন্দিরে এই নিবিড় নিশীথে। এই হাঁসগুলো না মরলে কি সম্ভব হ'ত এই নৈশ অভিযান? দেবী-পূজায় এরা বলি। নতুন দৃষ্টিতে স-সম্ভ্রমে চেয়ে রইলেন তিনি মরা হাঁসগুলোর দিকে। রাজহংসটার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল,

ব্যাধশরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনই তো আদি কবিতার উৎসব। সেই ক্রৌঞ্চমিথুন কি মরেছে? ওই রাজহংসটাকে মৃতের দলে ফেলে দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল। ও মরে নি, চিরকাল ও প্রেরণা যোগাবে কবির মনে। কবিতা জাগতে লাগল ধীরে ধীরে। তন্ময় হয়ে ছন্দের মালা গাঁথতে লাগলেন তিনি।

রাজহংস আকাশচারী
নীল আকাশের বার্তা যাচে
নীল আকাশের খবর কি চাও?
তাও তো পাবে তাহার কাছে।
স্বচ্ছ নদীর সবুজ মাঠের
মানস-সরের অচিন ঘাটের
গোপন কথা সেই তো জানে
ফল সে খোঁজে কল্প-গাছে।
হিমালয়ের তুঙ্গ চূড়ায়
মহাদেবের জটার পাকে
কলস্বরা গঙ্গা যেমন
সোহাগ ভ'রে জড়িয়ে থাকে
সন্ধ্যা-ঊষায়, তড়িৎ জ্বালায়
ইন্দ্রধনুর বর্ণমালায়
চন্দ্রতারার স্বপ্নলোকে
রূপ ঢালা হয় কিসের ছাঁচে
সেই তো জানে সরস্বতীর
পায়ের তলায় কি রঙ আছে।

রূপচাঁদ একটি সিগারেট ধরিয়ে চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন ক'রে কি যে ভাবছিলেন, তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন না স্পষ্ট ক'রে। একটা কুয়াশাচ্ছন্ন অজানা পথের প্রান্তে সংশয়াকুলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি যেন। স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আশা করছিলেন পাবেন!

৮

ডানা ভিতর থেকে এসে আবার বসল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক—

"এইবার আমরা যে সব হাঁস পেয়েছি, সেইগুলোকে দেখি আসুন। এই যে পাঁচটা দেখছেন এগুলো হ'ল Lesser Whistling Teal—বাংলায় শরাল হাঁস বলে, হিন্দী সিল্‌হী। এরা হচ্ছে Ducks যারা Pedestrian এবং Perching, অর্থাৎ হেঁটে বেড়াতে পারে, গাছেও চড়ে। এদের সঙ্গে Goose-এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এদের ঠোঁট এবং গোছ প্রায় সমান হয়। স্ত্রী পুরুষ দেখতে এক রকম, গায়ে বেশ রঙ আছে। Whistler চার রকম হয়। এগুলো হচ্ছে Lesser Whistling Teal। Large Whistler ও আছে এক রকম। আরও দু' রকম আছে—Wandering Whistler এবং Spotted Whistler—তারা এ দেশে আসে না, East Indies-এ থাকে। হুইস্‌লার ছাড়াও আরও কয়েক রকম Pedestrian Perching হাঁস

আছে, যেমন চখা—আমরা পেয়েছি; নাকি হাঁস—আমরা পেয়েছি। Common Sheldrake—শাহ চখা এ দেশে আসে না প্রায়, Cotton Teal—পেয়েছি, বাংলায় এদের বলে ঘাংরিয়েল, হিন্দী গিররি। সবচেয়ে ছোট Duck এরা। শীতকালে খুব আসে। এ দেশে থাকেও। এ দেশে ডিমও পাড়ে। এদের শ্রেণীতে আরও দু' রকম আছে, Wigeon আমরা পাই নি, আর Mandarin Ducks এ দেশে আসেই না। আচ্ছা, আর কি কি Ducks পাওয়া গেছে দেখা যাক্—Pedestrian Perching-এর মধ্যে Lesser Whistling Teal, চখা, Cotton Teal."

রূপচাঁদ আর একটি সিগারেট ধরালেন।

কবি বললেন, "Pedestrian Perching-এর বাংলা করুন কিছু। বড় খটমট শোনাচ্ছে। আমি ভেবে একটা ঠিক করেছি। Swan-গুলোকে মরাল, Goose-দের রাজহংস, Mergansers না কি বললেন—"

"হ্যাঁ। আমরা একটা পেয়েছি,—এই যে, স্মিউ (Smew)।"

"চমৎকার দেখতে তো!"

"চমৎকার। এদের আরও দু রকম আছে, Goosander আর Red-breasted Merganser, সে দুটো দেখতে আরও চমৎকার। এরা বরফের দেশে সমুদ্রের জলে থাকে, এ দেশে আসে না। এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা আলাদা রঙের হয় আর দুজনেই দেখতে সুন্দর।"

কবি বললেন, "তা হ'লে এদের বিচিত্র-হংস নাম দেওয়া যেতে পারে এবং Duck-দের শুধু হংস।"

"বাঃ, তা হ'লে তো চমৎকার হয়। Ducks-দের মানে হংসদের তিনটে ভাগ আছে—Diving Ducks, Pedestrian and Perching এবং Surface Feeding Ducks."

কবি বললেন, "Diving Ducks ডুবুরি হাঁস, Pedestrian and Perching-দের ভূমিচর ও তরুচর বললে মন্দ কি! Surface Feeding Ducks কি রকম?"

"তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ডুবও দেয় না, কিংবা গাছেও চড়ে না। এরা জলের ওপর থেকে কিংবা মাঠে যা সামনে পায় খায়। শভলারের (Shoveller) ঠোঁট তো অদ্ভুত, জলে ঠোঁট ডুবিয়ে যা পায় শুষে নেয়।"

"তা হ'লে এদের সম্মুখভোজী বলুন, সামনে যা পায় খায়।"

"হ্যাঁ, বেশ হবে।"

ডানা কতকগুলো হাঁসকে দেখিয়ে বললে, "ওইগুলো টীল বললেন না?"

"হ্যাঁ, ওগুলো কটন টীল। টীল মানে ছোট হাঁস। এ অনেক জাতের আছে। এই এগুলো দেখুন—Lesser Whistling Teal, এই দেখুন এদের ল্যাজের ওপর দিকে মেরুন রঙের ছোপ রয়েছে। Large Whistling Teal-এর ক্রীম রঙ থাকে এখানটায়। তা ছাড়াও এ দুটোও দেখুন Teal কিন্তু এরা ও-জাতের নয়, এরা হল আনন্দবাবুর নামকরণ অনুসারে সম্মুখভোজী, কমন টীল (Common Teal) যাকে বেলে হাঁস বলে। সম্মুখভোজীদের দশ রকম আছে। তার মধ্যে পাঁচরকমের স্ত্রী-পুরুষ অনেকটা একরকম দেখতে—Wood-Duck, Pink Head, Marbled Teal, Shoveller, Pintail। আমরা Pintail পেয়েছি। এর কথা পরে বলছি। স্ত্রী পুরুষ দেখতে আলাদা আলাদা—Mallard, Gadwal, Bronze cap Teal। এই Teal তিন রকম। Common Teal, Andaman Teal আর Oceanic Teal। শেষের দুটো এ দেশে পাওয়া যায় না। আমরা পেয়েছি কমন টীল। আর এক রকম আছে—Garganey। এদের Blue-winged Teal-ও বলে। এটা কি?—বাঃ, চমৎকার!

একটা Spot-bill-ও পেয়েছি দেখছি, এও হচ্ছে Mallard জাতের, Indian Mallard বলে কেউ কেউ, এর বিশেষত্ব—দুটো কমলা রঙের ফোঁটা ঠোঁটের দুপাশে কপালের কাছে। আর ডগাটা হলদে। এই দেখুন। পালকের প্যাটার্নটা অনেকটা আঁশ-আঁশ গোছের—সুন্দর, নয়?"

"ওগুলো কি বললেন?"—ডানা প্রশ্ন করলেন।

"নাকি হাঁস—Comb-Duck। এর হচ্ছে Pedestrian and Perching, কি নাম করলেন এর আনন্দবাবু?"

"ভূমিচর ও তরুচর। একসঙ্গে ভূ-তরু-চরও করা যায়।"

"মন্দ নয়। চলতি ভাষায় এদের 'নাক্‌টা' বলে। এদের পুরুষদের নাকের কাছে একটা উঁচু ঢিবির মত থাকে, দেখতে পাচ্ছেন? Breeding Season-এ এটা আরও উঁচু হয়ে ওঠে। অধিকাংশ হাঁসই শীতের সময় এ দেশে আসে, এরা কিন্তু এ দেশেরই বাসিন্দা। ডিমও পাড়ে এ দেশে, গাছের গুঁড়ির ফাটলে বা গর্তে ডিম পাড়ে।"

কবি বাধা দিলেন।

"ডিমের কথা যাক্ এখন। পাখিদের পরিচয় শেষ করুন আগে।"

"আচ্ছা বেশ, ডিম নিয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। ও নিয়ে প্রবন্ধই লেখবার ইচ্ছে আছে একটা।"

ডানা আর একটা হংস-স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এগুলো কি?"

"এ দেশে ওগুলোকে লালশর বলে। অর্থাৎ লাল মাথা। কিন্তু মজা আছে, সবগুলো এক জাতের নয়। Diving Ducks, মানে ডুবুরি-হংসদের মধ্যে যেগুলো লালশর তাদের Pochard বলে। তিন রকম আছে—Red-crested Pochard, বাংলায় এদের পুরুষটাকে অনেক জায়গায় দুমার বা ডুমার বলে। এদের পাও হয় লাল বা অরেঞ্জ। এরা শুধু ডুব-সাঁতারই দেয় না, মাঠে চরেও। এদের সকলেরই সাদা রঙের Wing-Bar আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার লালশর—Red-headed Pochard-এর এই Wing Bar নেই।"

"Wing-Bar কি আবার?"

"এই যে ডানার এই পালকগুলোকে Wing-Bar বলে। Red-headed Pochard-এর এটা নেই। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে এই হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লালশর। এদের বাংলায় ভুতিহাঁসও বলে, ইংরেজী White-eyed Pochard। এদের পুরুষগুলোর চোখের বিশেষত্ব সাদা চোখ। এদের পেটের নীচেও একটা সাদা ওভাল (oval) প্যাচ আছে, এই দেখুন। যখন ওড়ে তখন দেখা যায়। ডুব-সাঁতার কাটতে এরা প্রায় অদ্বিতীয়। ডানায় এক-আধটা ছররা লাগলে এদের ধরা শক্ত। এমন ডুব-সাঁতার কেটে কেটে লুকিয়ে বেড়াবে যে, পাত্তাই পাওয়া যাবে না। এরা নির্জন স্থানেই থাকতে ভালবাসে। ধানের ক্ষেতেও চরতে দেখেছি ভোরবেলা। উত্তর-মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে এরা প্রতি বছর শীতের সময় আসে এ দেশে। এই তো গেল ডুবুরিদের মধ্যে, লালশর ভূমি-তরু-চরদের মধ্যেও আছে। Wigeon-এর উল্লেখ আগেই করেছি, Wigeon-কেও কোথাও কোথাও ছোট লালশর বলে। আর এইটে দেখুন, ইনি হচ্ছেন সম্মুখভোজী, একেও লালশর বলে, কিন্তু ইনি হচ্ছেন Pink-headed Duck। গোলাপী লালশরও বলে কেউ কেউ। কি চমৎকার রঙ দেখেছেন! এ কিন্তু একেবারে এদেশী পাখি। ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ—এই ধরনের ডাক—আর একটা কথা ব'লে নি—শুধু লালশর নয়, নীলশর-সবুজশরও আছে। ডুবুরি হাঁসদের মধ্যে যাকে Eastern White-eye

বলে, তার মাথা হচ্ছে Dark glossy green। এ দেশে আসে না। পুলিনবিহারীদের মধ্যে নীল বা সবুজ মাথা নেই তেমন। সম্মুখভোজীদের মধ্যে আছে, Mallard-এর মাথা সবুজ, হিন্দীতে কিন্তু নীলশির বলে।"

ডানা মুখের সামনে বাঁ হাত রেখে হাই তুলতেই বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, বিষয়টা বোধ হয় হৃদয়রোচক করতে পারছেন না তিনি। ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার মত হয়ে যাচ্ছে। অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। একটা হাঁস তুলে বললেন, "আচ্ছা, ওটার কি বিশেষত্ব চোখে পড়ছে কোনও?"

সকলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন. কোনও উত্তর বা উত্তরের আভাস কারও মুখে দেখতে পেলেন না। রূপচাঁদ গুম হয়ে ব'সে ছিলেন তাঁর ধূমাচ্ছন্ন চিন্তালোকে। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল কি না সন্দেহ। উন্মনা কবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক চিন্তায় আবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল রঘুবংশ। ইন্দুমতী যখন স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে প্রত্যেক রাজাই বিভিন্ন রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন। কেউ আন্দোলিত করেছিলেন লীলাকমল, কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে কেয়ূরের প্রান্ত-লগ্ন-মালাটি ঠিক করেছিলেন, কেউ কনক-পাদপীঠে নখরাঘাত ক'রে করেছিলেন ইঙ্গিত, অঙ্গুলি আন্দোলন ক'রে রত্নাঙ্গুরীচ্ছটায় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন কেউ, কেউ নিজের রত্নশোভিত মুকুটে হাত দিয়েছিলেন, কেউ বামস্কন্ধ ঈষৎ উন্নমিত ক'রে প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বৃষস্কন্ধ, কেতকীপত্র ছিন্ন করেছিলেন কেউ অধীরচিত্তে। কিন্তু এর কোনটাই তো সম্ভব নয় এখন। তাঁর মনে হচ্ছিল স্বয়ংবরসভাতেই এসেছেন তিনি, ইন্দুমতীও এসেছেন, কিন্তু কি ক'রে তাঁকে মনোভাব জানাবেন! এ কি অদ্ভুত পরিস্থিতি!

বৈজ্ঞানিকের কথায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, অমরবাবু একটা মরা হাঁস তুলে ধ'রে আছেন। চকোলেট রঙের মাথাটা ঝুলে পড়েছে একধারে। ডানাটা বিচিত্র। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

ডানা বললে, "ওর ল্যাজটা একটু বেশি ছুঁচলো মনে হচ্ছে।"

"ঠিক বলেছেন। এর নামই পিন-টেল (Pintail)—এর ল্যাজের জন্য। বাংলায় এর নাম হচ্ছে দিগ-হাঁস, শোলঙ্গুও বলে কেউ কেউ। পশ্চিমেরা বলে সিংক-পার। এর মাংস খেতে খুব চমৎকার। এরা আসে উত্তরমেরু থেকে। এখানে কটন টিলকে অনেকে দীঘৌচ বলছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এইগুলোই দীঘৌচ। বাংলা দিগ-হাঁসের সঙ্গে বেশ মিল হয়। না? এটা পুরুষ, মেয়েটা এত সুন্দর নয়। মাথায় এ রকম চকোলেট রঙ নেই, এ রকম Bronze-green, Wing-Barও নেই।"

একটু হেসে তারপর বললেন, "পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি অলঙ্কৃত।"

ব'লেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

"সব সময় অবশ্য নয়। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের মেয়েটাও কম সুন্দর নয়। তা ছাড়া, এই হাঁসেদের মধ্যে যাদের Mergansers বললাম, আনন্দবাবু যাদের বিচিত্র-হংস নাম দিলেন, তাদের Female-গুলো চমৎকার। এই যে স্মিউটা দেখছেন, এর সঙ্গিনীও কি কম সুন্দর? তার মাথাটা বাদামী, কালো নয় এর মত। Goosander-ও তাই। শাহ চখার স্ত্রী-পাখিটাই বোধ হয় বেশি সুন্দর। সাধারণ চখার স্ত্রী-পাখিটার গলায় কেবল কণ্ঠী নেই, কিন্তু আর সবই এক। মানে—"

অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে গেলেন। যদিও এটা অবিসম্বাদিত সত্য যে পক্ষী-সমাজে

পুরুষরাই বেশি সুন্দর, তবু নিজে পুরুষ হয়ে একজন মহিলার সামনে জোর গলায় তা প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটু অভব্যতা প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথাটা স্পষ্টভাবে মনে হওয়ামাত্র সব গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সবচেয়ে বড় হাঁসটা কি বললেন?"—ডানাই প্রশ্ন করলে আবার।

"ও, ওটা বার-হেডেড গুজ (Bar-headed goose), এটাও পুরুষ। স্ত্রীদের মাথায় এই কালো দাগটা থাকে না। এদের গায়ের রঙ ডগমগে নয়, দেখেছেন? বেশ আভিজাত্য আছে। এদেরই আর একটা জাত এ দেশে আসে, তাদের Grey Lag বলে। তাদের গায়ের ধূসর বর্ণ একটু বেশি। Grey Lag-এর বাংলা হচ্ছে কলহংস, সংস্কৃত কাদম্ব। এরা যখন আকাশে ওড়ে, মনে হয় মালা উড়ে যাচ্ছে একটা। অনেক সময় লম্বা রেখায় ওড়ে, অনেক সময় আবার V-shaped, চমৎকার দেখায়। ডাকও চমৎকার। এরা নিশাচর। দিনের বেলা বিশ্রাম করে, রাত্রে চরতে বেরোয়। দল বেঁধে আকাশ পথে উড়ে যায় তখন ডাকতে ডাকতে। একজন ইংরেজ লেখক তা শুনে লিখেছেন, থ্রিলিং।"

"তার চেয়ে ঢের ভাল ক'রে বলেছিলেন কালিদাস।"

কবি ব'লে উঠলেন হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক যে বাজে কচকচিতে ডানার সমস্ত মনোযোগ দখল ক'রে রেখেছেন, এ যেন সহ্য হচ্ছিল না তাঁর।

"কি বলেছেন?"

"কামঞ্চ হংসবচনংমণি-নূপুরেষু, মণি-নূপুরের নিক্কণের সঙ্গে তিনি উপমিত ক'রেছেন হাঁসের ডাককে। আমরা যে চোখে রাজহংসকে দেখি, সে চোখে সাহেবরা, দেখতে পারবে না ওকে। আর ওর সঙ্গে জড়িত করেছি দময়ন্তীকে, সরস্বতীকে, যক্ষের বিরহ বেদনাকে, হিমালয়ের স্বপ্নকে, আকাশের অনন্তকে। লীলাঞ্চিতা মদালসার রূপমাধুরী, বধূদুকূল, সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনি—কত কি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে! শুধু 'থ্রিলিং' বললে কিছুই বলা হয় না।"

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "বিজ্ঞানের ভাষা একটু সংযত কিনা। তার কেবলই ভয় হয়, পাছে সে এমন কিছু ব'লে ফেলে, যা সে প্রমাণ করতে পারবে না। কাব্যের তো সে দায়িত্ব নেই।"

"কে বললে নেই? কাব্যও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সত্য যাচাই করবার যন্ত্র আপনাদের কাছে না থাকতে পারে, রসিকের কাছে আছে।"

ডানার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

"ওগুলো চখা বুঝি? চমৎকার রঙ তো!"

যদিও প্রশ্নটা অবান্তর তবু ডানা দেখলে, প্রশ্ন করা ছাড়া তর্কের মোড় ফিরিয়ে দেবার আর কোন উপায় নেই।

"হ্যাঁ। ইংরেজীতে বলে ব্রাহমিনি ডাক্‌স্।"

কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সংস্কৃতে চক্রবাক।"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "সংস্কৃতে ওর আর একটা নাম বোধ হয় রথাঙ্গনামা। নয়?"

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কবি।

"আপনি সংস্কৃত জানেন?"

"হ্যাঁ। বি. এ-তে আমার সংস্কৃত ছিল। কালিদাসের শ্লোক মনে আছে এখনও।"

ব'লেই সে আবৃত্তি ক'রে দিলে—

অত্র বিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহ মীক্ষিতানি।

আবৃত্তি ক'রেও কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ল একটু। নিজের বিদ্যা জাহির করার মত শোনাল যেন। কিন্তু এ'দের কাছে আত্মপরিচয় না দিয়েও সে পারলে না কিছুতে। মনে হ'ল, 'কেন দেবে না?'

কবি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন শুধু ডানার দিকে। বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়েছিলেন। অতিশয় অবহেলাভরে তিনি যে আশ্রয়হীনাকে এই প'ড়ো বাড়িটাতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে যে হঠাৎ এমন ভাবে কালিদাস আবৃত্তি করতে পারবে, তা তিনি প্রত্যাশাই করেন নি। রূপচাঁদও করেন নি। শুধু বিস্মিত নয়, চমকে গিয়েছিলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন ডানার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি চকচক করছিল।

ডানা সামলে নিয়েছিল নিজেকে।

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা কবিরা যে কল্পনা করেছেন, চখাচখীরা সমস্ত দিন একসঙ্গে থাকে কিন্তু রাত্রে দুজনে নদীর দুপারে চ'লে যায়, এর কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি?"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "না! বরং এ নিয়ে ঠাট্টাই করেছেন দু-একজন। তবে দিনের বেলায় যে ওরা একসঙ্গে থাকে, মানে জোড়ায় জোড়া থাকে, তাতে কোনও ভুল নেই। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন।"

বৈজ্ঞানিকের এই কথায় কবি প্রতিবাদ করলেন না। কবি ল্যাণ্ডরের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে প'ড়ে গেল তাঁর—I strove with none, because none was worth my strife। তাঁর মনে হ'ল, এই সব বৈজ্ঞানিকেরা অতি অদ্ভুত রকম শিশু-প্রকৃতির লোক, সামান্য মাটির পুতুল নিয়ে মেতে থাকে, আকাশের দিকে চাইবার অবসর পায় না। উচ্চাঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ হ'লে মানুষের মুখভাব যেমন হয়, কবির মুখভাব তেমনই হয়ে উঠল। ডানার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর, তিনি নিজেও কি একটা খেলনা দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েন নি? কিন্তু তখনই তাঁর মন এ অভিযোগের জবাব দিলে কবিতায়। তাঁর মনে গুনগুন ক'রে উঠল—

তুচ্ছ ক্ষুদ্র খেলনা নয় ও
আকাশ নেমেছে উহারই কাছে
নয়নে রয়েছে নীলের আভাস
চাহনীতে ওর বিজলী নাচে

গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কেশ-পাশে
নিবিড় মেঘের মহিমা প্রকাশে
মহা-আকাশের অন্ত-হীনতা
ওই তনু-দেহে লুকায়ে আছে।

কবিতাটা আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত হয়তো, কিন্তু চা এসে পড়ল। রূপচাঁদ একটি কথা বলেন নি এতক্ষণ। চা আসাতে ঈষৎ ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে

শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দিলেন সেটা এবং চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে চা খেতে লাগলেন নীরবে। চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল। বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত করছিলেন, হংসবিষয়ক বক্তৃতায় অগ্রসর হওয়াটা এর পর শোভন হবে কি না।

কিন্তু ডানাই প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা, কালিদাস যে বলেছেন চক্রবাক উৎপল কেশর খায়, তা সত্যি নাকি?"

"জানি না। আমি যতদূর জানি, ওরা সব খায়। গুগলি শামুক পোকা-মাকড়, ছোট ছোট সরীসৃপ, এমন কি মড়া পর্যন্ত।"

"মড়া খায়?"

"আমি নিজের চোখে খেতে দেখিনি। বইয়ে পড়েছি।"

কবি হেসে বললেন, "ঠিকই পড়েছেন। একটা কথা কিন্তু পড়েন নি এবং বিজ্ঞানের বইয়ে সম্ভবত তা পাবেনও না। সেটা শুনে রাখুন। যে চখা-চখীরা উৎপল-কেশর খায়, নিশীথে যাদের মাঝখান দিয়ে বিরহের নদী ব'য়ে যায়, মত্তমাতঙ্গদের সংস্রব বর্জন করে যারা, তাদের নাগাল বৈজ্ঞানিক পায়নি কখনও, শিকারীর গুলিতে মারা পড়ে নি সেই হিরণ্য-হংসদম্পতি আজও।"

বৈজ্ঞানিক গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কিন্তু এক জায়গায় তারা ধরা পড়েছে শুনেছি।"

"কোথায়?"

"কবির কল্পনাজালে।"

রূপচাঁদ বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে সিগারেট ধরালেন।

ডানার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৌতুকের দীপ্তিতে।

কবি বললেন, "নিশ্চয়।"

তারপর হেসে বললেন কবিতাতে—

"কল্পনা-জাল অল্প না জেনো
নাহিক গণ্ডি পরিধি তার
অবাঙ্ মানস-গোচরও তাহাতে
ধরা প'ড়ে যায় বারংবার।"

ডানা ব'লে উঠল, "বাঃ, বেশ কবিতা তো! কার লেখা?"

চুপ করে রইলেন কবি। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বক্ষ-পঞ্জরে মাথা কুটতে লাগল হঠাৎ। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না তাঁর। নীরবে ব'সে রইলেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "উনিই বানালেন বোধ হয়। চমৎকার কবিতা লিখতে পারেন উনি। পাখি নিয়েই কত কবিতা লিখেছেন।"

"তাই নাকি! দেখাবেন আমাকে? কবিতা বড় ভাল লাগে আমার।"

কবির মনে হ'ল, কল্প-লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। মন্দাকিনীর কল্লোল শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে পারিজাতের গন্ধ। ক্ষণিকের জন্য তাঁর চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন সব। খানিকক্ষণ পরে যখন আত্মস্থ হলেন, তখন শুনলেন, বৈজ্ঞানিক শরাল-হাঁস আর বালি-হাঁসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে চলেছেন, ডানা নিবিষ্টচিত্তে শুনছে। রূপচাঁদ নীরবে ধূম উদ্গীরণ ক'রে নিজের চতুর্দিকে আবার একটা অস্পষ্টলোক সৃজন ক'রে ব'সে আছেন তার মধ্যে।

হঠাৎ মধুরকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল কে যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে। সংস্কৃত গান, সেই পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকটা—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

চমকে উঠলেন সবাই।

রূপচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল আরও।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "এখানে আর কেউ আছে নাকি?"

"আমার তো জানা নেই, আর কেউ আছে। আনন্দবাবু যে চাকরটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে-ই আছে কেবল। ওই যে।"

চাকরটা একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব।

"তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?"

"না তো।"

"ও তবে কে?"

"জানি না।"

"মুন্সি, দেখে আয় তো, আলোটা নিয়ে যা। নদীর ধারে আউট-হাউসটার দিক থেকেই গানটা আসছে মনে হচ্ছে।"

মুন্সি আলোটা নিয়ে চ'লে যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দাটা। অদ্ভুত অনুভূতিময় অন্ধকার। মনে হ'ল, অন্ধকারের পরতে পরতে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, কিন্তু ডানার মনে হচ্ছে, তার চারিদিকে যেন আছড়ে পড়ছে অনুক্ত ভাবের অসংখ্য তরঙ্গ। দূরে অন্ধকারের ভিতর থেকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে সংস্কৃত গানটা তখনও ভেসে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল সেটা। একটু পরেই দেখা গেল, মুন্সি ফিরছে, তার পিছু পিছু আর একটি লোক। লোকটি কাছে এসেই নমস্কার করলে সকলকে। অদ্ভুত চেহারা। খুব লম্বা। মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি। খালি পা। গায়ে কালো কম্বল জড়ানো একটা। শ্যামবর্ণ। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত। ব্যক্তিটির অসাধারণত্ব লেখা রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

"আমি একজন পথিক। সন্ধ্যাবেলায় এসেছি এখানে। রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছি ওই প'ড়ো ঘরটাতে।"

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে। রূপচাঁদ এটা প্রত্যাশা করেন নি। আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর কপাল।

"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

"সংগ্রামপুর থেকে।"

"সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে আসবার কোনও ট্রেন তো নেই।"

"আমি হেঁটে এসেছি।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরটা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। ত্রিশ মাইল হেঁটে আসবার কল্পনাও কেউ করে না আজকাল, বিশেষত ট্রেন আসে যখন সেখান থেকে।

"কোথায় যাবেন আপনি?"—বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন.

"তা ঠিক করি নি এখনও।" তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, "আপনাদের যদি

আপত্তি না থাকে, ওই প'ড়ো ঘরটাতে কাটিয়ে যেতে পারি দিন কতক। নদীর ধারটা ভাল লাগছে বেশ।"

ওই কথায় কবির অন্তর পুলকিত হ'ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "বাড়ি কোথায় আপনার?"

"কোথাও নেই।"

"কি করেন?"

"কিছুই করি না।"

এর পর কি জিজ্ঞাসা করবেন জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে কি না—কবি ভেবে পেলেন না। চুপ ক'রে রইলেন।

রূপচাঁদ বলেন, "চলে কি ক'রে আপনার?"

"কি চলবার কথা বলছেন?"

"পেট।"

"পোস্ট-অফিসে আমার কিছু টাকা আছে, তার সুদ থেকে চলে।"

কথাটা বলে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল লোকটি, পোস্ট-অফিসে টাকা থাকাটা যেন অপরাধ। আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সবাই। লোকটিই নীরবতা ভঙ্গ করলে।

"আমি যদি কয়েকদিন ওখানে থাকি, আপত্তি আছে কি আপনাদের? যদি আপত্তি থাকে, কাল সকালেই আমি চ'লে যাব।"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইনি এখানে থাকেন, এঁর যদি অসুবিধা না হয়।"

ডানার দিকে চাইলেন তিনি। সকলেই তার দিকে চাইলেন। ডানা দেখছিল লোকটিকে। আপাতদৃষ্টিতে তার লম্বা চুল, কুঞ্চিত ঘন গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কম্বল-জড়ানো, খালি পা, দেখলে ভয় হবার কথা। কিন্তু কিছুমাত্র ভয় করছিল না ডানার। একটা অদ্ভুত আশ্বাস যেন ক্ষরিত হচ্ছিল লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে। অতি পবিত্র, অতি নির্মল, অত্যন্ত আনন্দময় একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল যেন। ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল, নির্ভরযোগ্য একটা কিছু পাওয়া গেল। রূপচাঁদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন ডানার দিকে। চোখাচোখি হতেই তিনি বামচক্ষুটা ঈষৎ বুজে এবং মাথাটা ঈষৎ নেড়ে যে ইঙ্গিতটা করলেন, তার মর্ম ডানা যে বুঝতে পারলে না তা নয়, কিন্তু বুঝতে না পারার ভান করল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে সে বললে, "না, আমার কিছু অসুবিধা হবে না। বরং কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক যদি থাকেন, ভালই তো।"

আগন্তুক এর পর দাঁড়িয়ে রইল আরও মিনিট খানেক।

তারপর বলল, "এবার আমি যেতে পারি কি?"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনাকে এমনভাবে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হয়েছে আমাদের। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।"

প্রতি-নমস্কার ক'রে আগন্তুক চ'লে গেলেন। তারপরই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল একটা। পরমুহূর্তেই বোঝা গেল, রাত্রি শেষ হয়েছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সহসা পাখিরা কলরব ক'রে উঠল একযোগে। ঐকতান-বাদন শুরু হয়ে গেল যেন। মনে হতে লাগল, নাটকের নতুন অঙ্ক আরম্ভ হবে এইবার।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে কবির দিকে ফিরে বললেন, "শুনছেন?"

"কি?"

"ওই যে, ওই যে।"

কবি শুনতে পেলেন এইবার। মধুর গিটকিরিভরা একটা সুর। মনে হ'ল, প্রভাতে আলো যেন কাঁপছে। বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। নূপুরের নিক্কণ, বাঁশীর সুর, তার মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে যেন কেউ, সেতারের মীড়ের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আরও কত কি—যা অবর্ণনীয়, মিনতি-ভরা আহ্বান, সোহাগ-ভরা আবেদনের সঙ্গে প্রাণ-ভরা বলিষ্ঠ সঙ্গীতময় পৌরুষের কি অদ্ভুত সমন্বয়।

কবির মুগ্ধভাবটা বৈজ্ঞানিক উপভোগ করছিলেন। যে কৃতিত্বটা তাঁরই, সুরের নয়। উন্মনা কবি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে ছিলেন স্বচ্ছায়মান অন্ধকারের দিকে, যেন প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন অদ্ভুত এই সুর-সমন্বয়কে। আশা করেছিলেন, নিজের অজ্ঞাতসারেই কোনও অপরূপ অপ্সরাকে দেখতে পাবেন বুঝি এইবার। ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হ'ল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে।

তিনি বললেন, "দোয়েল।"

"ও।"

"দেখেছেন কখনও?"

"না।"

"চলুন, দেখিয়ে দিই।"

তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "আচ্ছা, চলি এবার আমরা। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, মাপ করবেন।"

তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "চলুন।"

সোৎসাহে নেবে পড়লেন দুজনেই বারান্দা থেকে।

মুন্সি মরা হাঁসগুলোকে পুরতে লাগল বোরার মধ্যে।

মুন্সিও যখন চ'লে গেল তখন রূপচাঁদ কথা কইলেন।

"আমি অবাক হয়ে গেছি। শুধু অবাক নয়, ভয় পেয়ে গেছি একটু।"

"কেন?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আপনার সংস্কৃত শুনে। সত্যি আপনি বি. এ. পাস করেছেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে?"

হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে ডানা চেয়ে রইল রূপচাঁদের দিকে।

"সত্যিই নেই?"

রূপচাঁদের চোখের দৃষ্টিতেও হাসির ঝলক খেলে গেল একটু।

নিমগাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে ডাকছিল দোয়েলটা। কবি আর বৈজ্ঞানিক দুজনেই ব'সে ছিলেন একটা ঝোপের ধারে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন, আর বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছিলেন ফিসফিস ক'রে—

"আমার মতে কোকিলের ডাক নয়, দোয়েলের ডাকই এ দেশে বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। কোকিল তো এ দেশে বারো মাসই ডাকছে। দোয়েল কিন্তু শীতকালে ডাকে না তেমন, বসন্ত পড়লে ডাকে। বাই দি বাই, আমরা যাকে কোকিল ব'লে থাকি, ইংরেজীতে তার নাম Cuckoo নয়, Koel। হিন্দীতে কোয়েলই বলে। ইংরেজীতে যার নাম Indian Cuckoo—বাংলায় তিনি হচ্ছেন 'বউ কথা কও'। একটু গরম পড়লে সেগুলোর ডাক শোনা যাবে আমবাগানে।"

কবি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন দোয়েলের গান। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে ঢুকছিল কিন্তু মনে প্রবেশ করছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল—

আমরা কেবল সদরে গলিতে
ধূলায় পঙ্কে কাদায় পলিতে
রঙ-বেরঙের নানান থলিতে
নানান রকম স্বার্থ ভরিয়া
করি কলরব করি বাড়াবাড়ি
করি হুড়োমুড়ি করি তাড়াতাড়ি
করি মারামারি করি কাড়াকাড়ি
অপরের শির লক্ষ্য করিয়া
কাদা ছুঁড়ি আর ইঁট মারি।
শাখার শিখরে ও দোয়েল পাখি
চটিয়া গিয়াছ তাই তুমি নাকি
পুচ্ছটি বুঝি তাই থাকি থাকি
আকাশের দিকে ধরিতেছ তুলি
হানিতে চাহিছ সবার প্রাণেতে
তীব্র মধুর তীক্ষ্ণ তানেতে
অবাধ সুরের 'মেশিন গান'-এতে
মর্ম-ভেদিনী এ কি গোলা-গুলি
গিটকারি-ভরা টিটকারি।

কবির মনে হ'ল, শীতের তীক্ষ্ণতা হঠাৎ কমে গেছে যেন। কনকনে পুবে হাওয়ার ভিতরও ভেসে আসছে যেন দক্ষিণা বাতাসের আমেজ। মানসপটে ভেসে উঠল, কর্ণিকার মুকুলের গুচ্ছ বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠছে অশোক-শাখা মুকুলভারনম্র। আকুল নয়নে তিনি খুঁজতে লাগলেন কোথায় নবমল্লিকার দল, কোথায় পদ্মবন...

"এদের নিকট-আত্মীয় শ্যামা মানুষের কাছে ঘেঁষে না বড়।"

কবি শুনলেন, বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছেন, কতক্ষণ থেকে ব'লে চলেছেন কে জানে!

"এরা কিন্তু খুব মানুষ-ঘেঁষা। বাগানে প্রায়ই দেখতে পাবেন। এমন কি এরা ডিমও পাড়ে আমাদেরই ঘরের কাছাকাছি। সেবার আমার মালীর ঘরের পেছনের দিকের কার্নিশে দেখেছিলাম ওদের বাসা। ডিম ওদের—"

বাধা পড়ল। পাশের ঝোপ ভেদ ক'রে অপ্রত্যাশিভাবে এসে হাজির হলেন মল্লিক, সনাতন মল্লিক, তাঁর হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ভদ্রলোকের কাপড়ে লেগেছে অজস্র চোর-কাঁটা। পাঞ্জাবির পকেটটা কি লেগে যেন ছিঁড়ে গেছে। ঝুলছে। এঁদের দেখতে পেয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতিশয় কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "কাল সন্ধে থেকে আপনাকে খুঁজছি।"

"আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম এঁদের নিয়ে। কেন, কিছু দরকার আছে নাকি?"

"আপনার পাখির জন্যে যে ফড়িং দরকার তা তো আমি জানতাম না, সত্যি বলছি,

জানতামই না। মুন্সি ব্যাটা মিছিমিছি লাগিয়েছে আমার নামে মায়ের কাছে। তিনি কাল একটা চিঠি দিয়েছেন আমাকে। কি আশ্চর্য, সামান্য ব্যাপার, আমাকে একটু বললেই চুকে যেত। ফড়িঙের ভাবনা কি, আমার বাগানে তো যথেষ্ট ফড়িং, দেখুন তো মিছিমিছি কি কাণ্ড!"

বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা ঠিক।

বললেন, "কি চিঠি, কে দিয়েছে?"

"এই যে দেখুন না, সামান্য ব্যাপার, ছি ছি!"

একটি ছোট চিঠি বার ক'রে দিলেন তিনি।

রত্নপ্রভার চিঠি। রত্নপ্রভা গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

ওঁর পাখির জন্য ফড়িং যোগাড় ক'রে দেবার ভার আপনাকে নিতে হবে। যদি না পারেন কাজে ইস্তফা দিন, আমরা অন্য ব্যবস্থা করব।

ইতি রত্নপ্রভা

বৈজ্ঞানিক ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ ক'রে গেলেন। তারপর আড়চোখে চাইলেন একবার সনাতনবাবুর দিকে। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কি যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না।

মল্লিক ব'লে চলেছিলেন, "সামান্য ফড়িঙের জন্যে এত কাণ্ড করার দরকাটা কি ছিল মুন্সির।"

অকারণে গলাটা ঝেড়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। তবে এটা ঠিক, আমার পাখিগুলো ফড়িঙের অভাবে ম'রে যাচ্ছে। গোটা পাঁচেক ম'রে গেছে।"

"আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

"ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, এ চিঠির কথা আমি কিছু জানতাম না।"

তাঁর একবার ইচ্ছে হ'ল যে বলেন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু রত্নপ্রভার আত্মসম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে চুপ ক'রে গেলেন। মল্লিক দন্ত বিকশিত করে হেসে ফেললেন খুব খানিকটা।

তারপর বললেন, "উনি মনিব, আমি চাকর, হুকুম দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ওঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু সামান্য ফড়িং, দেখুন দিকি।"

বৈজ্ঞানিক অপ্রতিভমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"এই কথাটা বলবার জন্যেই খুঁজছি আপনাকে কাল থেকে। এক-আধটা নয়, প্রচুর ফড়িঙের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আজই লাগিয়ে দেব ছোঁড়াগুলোকে। মুন্সিকে দেবেন পাঠিয়ে, সেও ধরবে। ফড়িঙের আবার ভাবনা! আচ্ছা, চলি এবার তবে।"

নমস্কার ক'রে মল্লিক চলে গেলেন।

কবির দিকে চেয়ে একটু হেসে বৈজ্ঞানিক আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, "হ্যাঁ, দোয়েলের ডিমের কথা হচ্ছিল। এদের ডিম চমৎকার দেখতে, বুঝলেন?"

কবি হেসে উত্তর দিলেন, "এখন একটি কথা ছাড়া আর সমস্তই অবান্তর মনে হচ্ছে আমার কাছে।"

বৈজ্ঞানিক একটু থমকে গেলেন।

"সে কথাটি কি?"

"বসন্ত এসেছে। যার সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলেছেন—

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামা পবনঃ সুগন্ধিঃ
সুখাং প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।"

উদ্ভাসিত চক্ষে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "ও, সার্টেনলি।"

৯

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অমরবাবু। সত্যি সত্যি পাখির গান রেকর্ড করা যাবে তা হ'লে এইবার।...বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিস্টার নিকল্‌সন্‌, মিস্টার কক আর তিনি। শহর থেকে অনেক দূরে, সমস্ত কোলাহলের বাইরে। সঙ্গে আছে পার্লোফোন কোম্পানির সাউণ্ড-ভ্যানটা, তার ভিতরে আছে গান রেকর্ড করবার সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম। খুব ভাল মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোনের সঙ্গে লাগাবার তারও আছে প্রচুর। ভ্যানের ভিতরে ব'সে সুইচ লাগিয়ে দিলেই লাউড-স্পিকার বেজে উঠবে। বনের ভিতর মাইক্রোফোনের সামনে যত রকম শব্দ হচ্ছে, শোনা যাবে সব। পাখির গানও। অনায়াসেই রেকর্ড করা যাবে। অনেকগুলো অ্যাকুমুলেটারে (Accumulator) ইলেকট্রিসিটি পুরো চার্জ ক'রে আনা হয়েছে। মোমের তৈরি রেকর্ডও আছে প্রচুর। রেকর্ড অনেক আনতে হয়েছে, নষ্ট হবে অনেকগুলো। পাখি কখন গাইবে ঠিক নেই, রেকর্ড কিন্তু ঘুরিয়ে যেতে হবে ক্রমাগত। বসন্ত-বউরির গানটাই আগে তুলতে হবে। দোয়েলের তুললেই ভাল হ'ত, কিন্তু দোয়েল আজকাল ডাকছে না বেশি। বসন্ত-বউরির ডাকটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। কোকিলও অবশ্য আছে। যে রেডস্টার্টগুলো ধ'রে রেখেছেন, তাদের গান তুললে কেমন হয়? ও জায়গাটা কিন্তু বড় অসমতল। কক সাহেব বলেছেন, সাউণ্ড-ভ্যানটাকে সমতল জায়গায় দাঁড় করাতে হবে। শহরের বাইরের মাঠটাতেই ঠিক হবে। বসন্ত-বউরি পাওয়াও যাবে সেখানে প্রচুর।

...মাঠ। ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের উঁচু ডালে অনেক বসন্ত-বউরি এসে জোটে ভোরবেলায়। গাড়িটাকে একটু দূরে সমতল জায়গায় দাঁড় করিয়ে মাইক্রোফোনটাকে ফিট ক'রে রাখা হয়েছে। আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে, পাখিটা যাতে হঠাৎ মাইক্রোফোন দেখে ভড়কে না যায়। না, যায় নি। রোজ যেমন ডাকে, ঠিক ডাকছে।

...ভোরবেলা। রেকর্ড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কই বসন্ত-বউরি আজ এল না তো গাছটায়! অথচ রোজ আসে। আজ কাক ডাকছে কতকগুলো। ওটা কিসের শব্দ? পাখির হতে পারে না। কুকুরের। ছি, ছি!

...কক সাহেব হেসে বলছেন, ব্যস্ত হ'লে চলবে না। আমরা একটা ব্ল্যাক বার্ডের গান রেকর্ড করবার জন্যে চেষ্টা করেছি দিনের পর দিন, রোজ রাত দুটো থেকে উঠে। অপেক্ষা করতে হবে।

...ওই এসেছে। ওটা কি হ'ল? শর্ট সার্‌কিট (Short Circuit) হয়ে গেলে। মাটি ভিজে যে।

...আবার ঠিকঠাক ক'রে বসা হ'ল। রেকর্ডের পর রেকর্ড ঘুরে চলেছে।

...মোটর চ'লে গেল একটা দূরের রাস্তা দিয়ে। বাতাস উঠল জোরে। ডাল-পালায় হুড়মুড় শব্দে পাখির গান চাপা প'ড়ে যাচ্ছে।

...এইবার হয়েছে। বাঃ ঠিক হয়ে গেছে—

"শুনছ, ওগো, ওঠ ওঠ।"

চোখ খুলে বৈজ্ঞানিক দেখলেন রত্নপ্রভা সামনে দাঁড়িয়ে, কক সাহেব নয়।

"স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?"

বৈজ্ঞানিকের বুকের উপর একখানা বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ স্বপ্নই। অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন একটা।"

"রূপচাঁদবাবু এসেছেন বাইরে।"

"ও।"

উঠে পড়লেন বৈজ্ঞানিক।

"চা খেয়ে বেরুবে, না, বাইরেই পাঠিয়ে দেব দুজনের একসঙ্গে?"

"তাই দাও।"

রত্নপ্রভা চ'লে গেলেন। বৈজ্ঞানিক বইটার দিকে চেয়ে দেখলেন আর একবার। Songs of Wild Birds। ওদের দেশে পাখির গান সত্যিই রেকর্ড করেছে ওরা। আমাদের দেশে এসব এখন সুদূরপরাহত। স্বপ্নই। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এ দেশের অধিকাংশ লোক দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না।

...বেরিয়ে গেলেন।

বৈঠকখানায় যাওয়ামাত্রই রূপচাঁদ বললেন, "দু-একটা বাড়তি ফার্নিচার আছে তোমার চেয়ার, বেঞ্চি, ছোট টেবিল, এক-আধটা আলনা?"

"কেন, কি হবে?"

"ওই মেয়েটির দরকার. আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, কপর্দকহীন—দরকার তো সব জিনিসই।"

"গুদোমে আছে বোধ হয়। রত্না জানে ঠিক।"

"এখানেই যদি পেয়ে যাই তা হ'লে বেশি ঘুরতে হয় না আর।"

"আছে আমার।"

"বাঁচা গেল তা হ'লে।"

"রূপচাঁদের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কল্পনায় ডানার কৃতজ্ঞতাস্নিগ্ধ মুখচ্ছবিটা ফুটে উঠল একবার।

"আনন্দবাবুর খবর কি?"

"সেখান থেকেই তো আসছি। সে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড সবুজ বই নিয়ে তন্ময় হয়ে ছবি দেখছে। তুমিই দিয়েছ বোধহয় বইটা।"

"ওয়াইল্‌ড্ কোরাস (Wild Chorus) খানা দেখছেন বোধ হয়। আপনি দেখলেন বইটা?"

"একটু উঁকি মেরে দেখেছি। হাঁসের ছবি।"

"হ্যাঁ। অদ্ভুত বই।"

চা এসে পড়াতে বইয়ের কথা চাপা প'ড়ে গেল।

কবি তন্ময় হয়ে নিজের তেতলার ঘরটায় চৌকির উপর চিত হয়ে শুয়ে Wild Chorus

বইখানা দেখছিলেন। শুধু বইখানাই দেখছিলেন না, তিনি কল্পনা-নেত্রে দেখছিলেন হংস-রসিক পিটার স্কটকে, আর চেষ্টা করছিলেন তাঁর মানসলোকে ঢুকে তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-স্পন্দনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেতে। ভদ্রলোক শুধু বৈজ্ঞানিক নন—কবিও। অদ্ভুত চিত্রকর। কি চমৎকার ছবিই না এঁকেছেন। থাকেন সমুদ্রের ধারে। হাঁসের সঙ্গলোভেই শহর ছেড়ে গেছেন সেখানে। নদী যেখানে এসে মিশেছে সমুদ্রে, সেই মোহনার কাছেই এক প্রকাণ্ড 'লাইট হাউসে' (Light House) আস্তানা ওর। শীতকালে অজস্র হাঁস আসে সেখানে। অনেক বুনো হাঁস ধ'রে পুষেওছেন নিজে। বাড়ির তিন দিকে নোনা বালির চড়া, তারপর খানিকটা জল, খানিকটা কাদা, তারপর সমুদ্র-সৈকত। জোয়ারের সময় সবটা সমুদ্রের জলে ভ'রে যায়, বাড়িটা শুধু জেগে থাকে। চোখ বুজে কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন কবি। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সাগরের ঢেউ। তারপর আকাশ। আকাশের রঙ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কখনও নীল, কখনও ধূসর, কখনও কালো। আবীর ছড়িয়ে পড়ছে কখনও, কখনও স্বর্ণরেণু। কখনও অরুণ, কখনও গৈরিক। কত অজস্র রঙের লীলা চলেছে। আর তার মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে খামখেয়ালী মেঘের দল ভেসে ভেসে আসছে আর চ'লে যাচ্ছে। উড়ে উড়ে আসছে হাঁসের দল তুষারের দেশ থেকে। হাঁস দেখবার জন্যে কতরকম আয়োজন করেছেন ভদ্রলোক। কত দেশে ঘুরেছেন। অস্ট্রিয়া-হাংগেরি-রুমানিয়ায়, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে, দানিয়ুব নদীর তীরে, ক্যাস্পিয়ন সাগরের সৈকতে।...কবিতা জাগল মনে। তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে ব'সে গেলেন। লিখে না ফেললে থাকে না। চ'লে যায়, পালিয়ে যায়।

পাখা মেলে উড়ে চলে হাঁসেদের সারি
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।
রোদ-ঝড়-আলো-ছায়া-চন্দ্র-তপন
শূন্যবিহারী
অন্ধকারের বুকে তারা অগণন
সারি সারি সারি ;
মায়া বিস্তারি'
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে রঙিন স্বপন
সন্ধ্যা-উষার মেঘে আলোকের অলঙ্করণ ;
দিগন্তে ধরার নেত্রে কজ্জলিত স্বপ্ন মনোহারী ঃ
অকস্মাৎ তার মাঝে উড়ে আসে কল-কণ্ঠ হাঁসেদের সারি
সচকিয়া সমুদ্র-গিরি-মরু-বন
সাদা-মাথা, লাল-বুক, গোলাপী-চরণ,
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।

লিখে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে। বইখানা আবার ওলটাতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হ'ল, এ ভদ্রলোক হাঁস দেখতে বেরোন নি, হাঁস ধরতে বেরিয়েছেন। হাতে আছে জাল—Clap net। হাঁস ধ'রে তার পাখা ছেঁটে বা বেঁধে তাকে বন্দী ক'রে রাখবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুষ্ট মন যে। উপভোগের অন্তরালে তাই উঁকি মারছে ভবিষ্যতের ভাবনা, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। প্রকৃতির আনন্দলীলা যে অফুরন্ত, অজস্র ঐশ্বর্য যে অবারিত রয়েছে সহস্র দিকে—এ বোধ বোধহয় জাগে নি এখনও ভদ্রলোকের। সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছেন তাই প্রাণপণে। ভাবছেন, ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে তুমি, ওরা থাকবে।

মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন এসে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড।

"ওগো, শুনছ, বিনয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। চিঠি পেলাম এখুনি, এই দেখ।"

বিনয় মন্দাকিনীর ছোট ভাই। কবি বইটা মুড়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

তাঁর কাব্যলোক অন্তর্হিত হ'ল এবং পরমুহূর্তেই তাঁকে পানসে কালি দিয়ে-লেখা বানান-ভুলে-পরিপূর্ণ অর্ধমলিন পোস্টকার্ডটিতে মনোনিবেশ করতে হ'ল। "শ্রীচরণেষু'তে 'শ' এই প্রথম দেখলেন।

মন্দাকিনী ব'লে চলেছিলেন, "শেষ পর্যন্ত ওইখানেই হল, দেখলে তো! কত ফরকটই তুলেছিল। যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে—। হ'লই বা আই. সি. এস.। তার হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকলে তার সঙ্গেই বিয়ে হ'ত। কিন্তু ও মেয়ে দিয়েছে আমার ভাইয়ের হাঁড়িতে চাল, হবে কি ক'রে অন্য জায়গায় বিয়ে? তারিখের কথা লেখে নি। অথচ বাজে কথা লিখেছে একটি গাদা। হরেন সিঙ্গির বিধবা বোনের কালাজ্বর হয়েছে, মানিক চাকরি পায় নি, বিপিনবাবুদের গাই বিইয়েছে। কাজের কথা শেষ ক'রে জায়গা থাকলে লিখতিস এসব। তা নয় রাজ্যের বাজে কথা লিখে ভ'রে দিয়েছে পোস্টকার্ডটা।"

"বিয়ের তারিখ এখনও ঠিক হয় নি হয়তো।"—সন্তর্পণে কবি বললেন।

"দেনা-পাওনাও কি ঠিক হয় নি এখনও? সেইটেই তো আসল। বিনয়ের পছন্দ হয়েছে মেয়েকে খুব তা মানি, কিন্তু তা ব'লে একেবরে ফাঁকি দেবে নাকি? আমাদের নমস্কারী টমস্কারীগুলো তো নিশ্চয়ই দেবে। আই. সি. এস. না হতে পারে, কিন্তু বিনয়ও আমাদের ফেলনা ছেলে নয়। কি রূপ, কি গুণ! ওভারসিয়ারি ক'রে মাসে চার-পাঁচশো টাকা রোজগার করে। অসময়ে বাবা মারা গেলেন তাই, তা না হ'লে ও ছেলেও আই. সি. এস. হ'ত।"

বকবক করে ক্রমাগত ব'লে যেতে লাগলেন মন্দাকিনী। কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে শুনে যেতে লাগলেন। বিনয়ের কথা থেকে এল মাসীমার কথা, তারপর যোগেনের বিয়ের কথা, তারপর বরযাত্রীর কথা, তারপর আজকালকার অগ্নি-মূল্য জিনিসপত্রের কথা, মাছ-তরকারির কথা, ধোপার কথা, সুন্দরী গরুর কথা...

কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে সব শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এও একরকম হাঁস। নারী-বেশিনী হাঁস। মন্দাকিনীর অজস্র কথার মাঝখানে তিনি যে শুনতে পেলেন, আংগাংক্, আংগাংক্, আংগাংক্...সেই চিরন্তন ডাক চিরপথিক হংসযাত্রীর—যে।

স্থির-লক্ষ্য চলিয়াছে বেগবান নিজ পক্ষ-রথে
ঝড়ে জলে অন্ধকারে অরণ্যে পর্বতে।

১০

ডানা চুপ ক'রে ব'সেছিল বারান্দায়। কিছুক্ষণ আগেই চেয়ার টেবিল আলনা আলমারি পৌঁছে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদবাবু। অনেক আশ্বাসও দিয়ে গেছেন। কিন্তু ঠিক যে ধরনের আশ্বাসকে মানুষ নির্ভরযোগ্য মনে করে, সে আশ্বাস পায় নি এখনও ডানা। বাইরের কোনও লোক সে আশ্বাস দিতে পারে না। অন্তরের অন্তস্থল থেকে তা উৎসারিত হয়। তার মনে হচ্ছিল যে, তার চারিদিকে পুঞ্জিভূত হয়েছে যে কুয়াশা, তা খানিকক্ষণ পরে অপসারিত হবে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—তবু কিন্তু অনিশ্চয়তা থাকবে। কোনও বাইরের লোকের বাচনিক আশ্বাসে তা ঘোচবার নয়। নিজের চোখে যাচাই ক'রে নির্ভয় হতে হবে। কুয়াশার ভিতর যেটাকে দৈত্য মনে হচ্ছে, সেটা আসলে যে মানুষ তা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত

সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক করছিল। তার মনের মধ্যে আর একটা সত্তা যেন গোপনে গোপনে কামনাও করছিল—আহা, ওটা সত্যিই যদি দৈত্য হয়। হ'লে যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা ভেবে শিহরণ জাগছিল তার সর্বাঙ্গে। কৌতূহলে উন্মুখ এবং ভয়ে কণ্টকিত হয়ে ব'সে ছিল সে চুপ ক'রে। অতীতের দিনগুলোও কেমন যেন ঝাপসা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। নিজের মায়ের কথা মনে নেই তার। বিমাতার সঙ্গে কলহ হয় নি, ভাবও হয় নি। তার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা রক্ষা ক'রে এসেছে সে এতকাল। হঠাৎ সব শেষ হয়ে যাওয়াতে যেন আরামই বোধ করছে। পায়ের টাইট জুতোটা খুলে গেল যেন চিরদিনের মত,. আর পরতে হবে না। বিমাতার সঙ্গে ভাব না থাকলেও ছোট বৈমাত্র ভাইটিকে ভালবাসত খুব। টুলটুলে মুখখানি। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে থাকত। যখন হাসত, তখনও। ওইটেই ছিল যেন তার দৃষ্টিভঙ্গী। পৃথিবীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে যেন সে বলত, যা দেখছি তা সত্যিই ভাল না কি! চ'লে গেল কোথায় চিরদিনের মত। বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার। মনে পড়ে—এইটে ভাবতেই অবাক লাগে। বাবা যে থাকবেন না, তাঁকে যে মাঝে মাঝে মনে পড়বে, এই বিস্ময়কর সত্যটার বিস্ময় কিছুতেই যেন আর কাটছে না। ট্রেনের সহযাত্রীর মত বাবাও এক জায়গায় নেবে গেলেন হঠাৎ নাম না-জানা একটা স্টেশনে। দেখা হবে না আর কখনও। সে অথচ চলেছে। প্রতি-মুহূর্তে অতিক্রম করছে নিত্য নতুন পথ। অপ্রত্যাশিতভাবে পারিপার্শ্বিক বদলাচ্ছে। নতুন দৃশ্য আসছে আর চ'লে যাচ্ছে। ট্রেনটা থেমেছে মনে হচ্ছে একটা নতুন স্টেশনে। অনেকক্ষণ থেমে আছে। নতুন যাত্রীরা উঠেছে তার কামরায়। জিনিসপত্র নাবাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। কুয়াশা চারদিকে, স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মানুষ ওরা? এতকাল যে ধরনের মানুষ সে দেখে এসেছে, তাদেরই মত, না, নতুন রকম কিছু? বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৌতূহল-ভয়, লোভ-আত্মসম্মান, পরস্পরবিরোধী আলোছায়ার অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে একটা। দূরে কোথায় যেন কাঁসরঘণ্টা বাজছে, তার অতীত জীবনটাই যেন উৎসব শুরু করেছে আর কোথাও। সে কেবল স'রে এসেছে সেখান থেকে। ওরা কেউ কোথাও যায় নি, সে-ই কেবল স'রে এসেছে। কথাটা মনে হতেই অদ্ভুত ধরনের ঠেকল। সে-ই কি একলা কেবল আসতে পারে? একটা জটিল জিজ্ঞাসা চিহ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল মনের ভিতর। এ নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবসর কিন্তু সে আর পেলে না। ঘাড় ফিরিয়েই দেখলে, বৈজ্ঞানিক আর কবি নদীর ধার থেকে এগিয়ে আসছেন তার দিকেই।

একটু এসেই বৈজ্ঞানিক ব'সে পড়লেন ভাঙা সিঁড়িটার উপর তার দিকে পিছন ফিরে, তারপর দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখলেন। তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "পাখিটাকে আগে দেখে নিন ভাল ক'রে।"

কবি দেখতে লাগলেন।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। ওই পাখিটাই ডাকছিল অমন ক'রে? উকু কুক্ উকু কুক্ উকু কুক্—এই ধরনের ডাকটা, নয়?"

"ক-য়ের স্থানে প-ও দিতে পারেন। হুপো, হুপোপো—এ বললেও অন্যায় হয় না। ইংরেজী নাম ওর হুপো, হিন্দীতে বলে হুদ্‌হুদ্। Upupa Epops হ'ল কেতাবী নাম।"

"ওর বাংলা নাম মোহনচূড়া দেওয়া যাক—মাথায় অমন চূড়া আছে যখন। হঠাৎ মনে

হয়, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান যেন পাখির বেশ ধরেছে। নয়? ফর্র্ ক'রে মাথার চুড়াটা আবার খুলে যাচ্ছে জাপানী পাখার মত। চমৎকার তো!"

ডানা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ইচ্ছে হ'ল একটু আলাপ করে গিয়ে, কিন্তু সঙ্কোচ হ'তে লাগল। তার মনের কথা টের পেয়েই কবি যেন ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন তার দিকে।

"নমস্কার। আসুন। পাখি দেখতে বেরিয়েছি আমরা। কি চমৎকার একটা পাখি দেখুন!"

"কি নাম ওর?"

"ইংরেজী নাম হুপো, আমি নামকরণ করলাম মোহনচূড়া। বাংলা নাম আছে হয়তো কোনও, জানি না।"

"তিনটে রয়েছে দেখছি।"—ডানা বললে।

"আরও বেশি থাকে"—বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন—"ওরা একটু নির্জন জায়গায় চরতে ভালবাসে, অনেকটা ঘুঘুর মতন স্বভাব। ঠোঁটটা দেখুন ভাল ক'রে, মাটি খুঁড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, তাই অনেকটা পিক-অ্যাক্সের (Pickaxe) মত। ওদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওদের বাসা। গাছের গুঁড়িতে বা পুরনো বাড়ির দেওয়ালের গর্তে ওরা ডিম পাড়ে সাধারণত। ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-পাখিটা গর্ত থেকে কদাচিৎ বেরোয়। পুরুষ-পাখি তখন খাওয়ায় স্ত্রীকে। এ বিষয়ে ধনেশ পাখির সঙ্গে মিল আছে খানিকটা। ধনেশের ঠোঁটের সঙ্গেও এর ঠোঁটের মিল আছে একটু। স্ত্রী-পাখিটা বাসা ছেড়ে বেরোয় না ব'লে বাসার ভেতরে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সাদা ডিমগুলো পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে যায়। অদ্ভুত স্বভাব, নয়? এই পাখিদেরই মধ্যে আবার কোকিল দেখুন ডিম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরের বাসায় ডিম পেড়ে চ'লে আসছে।"

এই পর্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, ডানা তাঁর কথা শুনছে না।

"চমৎকার দেখতে, নয়?"—বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত ক'রে আবার শুরু করলেন—"ওর বুকে যে রঙটা রয়েছে, সেটা ঠিক বাদামী নয়, ফন (fawn)। অনেকটা হরিণশিশুর গায়ের রঙের মত। আবার পিঠের ডোরা ডোরা দেখলে মনে হয় জেব্রার গায়ের রঙ।"

তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কিছু বলছেন না যে?"

"আমিও মিল খুঁজছি"—হেসে উত্তর দিলেন কবি।

তারপর বললেন, "আমার বক্তব্য এখনই বলা যাবে না। লিখতে হবে।"

"পাখিগুলো উড়ে গেল"—ডানা বললে।

"চলুন, আপনার ওখানেই যাওয়া যাক। লিখে ফেলি কবিতাটা।"

সকলে প'ড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হলেন।

কবি গিয়েই চেয়ারটা টেনে ব'সে পড়লেন টেবিলের পাশে। পকেট থেকে বেরুল ফাউন্টেন পেন আর খাতা। শুরু ক'রে দিলেন লিখতে।

বৈজ্ঞানিকও একটা চেয়ার টেনে বসেছিলেন, কিন্তু 'কির্র্ কির্র্' গোছের একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে উঠে পড়লেন টপ ক'রে এবং ছুটে নেবে গেলেন মাঠে, তারপর ঊর্ধ্ব মুখ হয়ে চোখে লাগালেন দূরবীন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। দুই বিপরীতমুখী স্রোতের কোনোটাতে গা ভাসিয়ে দিতে পারছিল না সে। ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারছিল না। তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। কোথায় কোন্ একটা অদৃশ্য নোঙর যেন আটকে রাখছিল তাকে।

"শুনুন।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন হঠাৎ।

ডানা নেবে গেল।

"নতুন ধরনের একটা পাখি দেখুন। ওই যে।"

ডানা দেখলে, পায়রার মত একটা পাখিকে কয়েকটা কাক তাড়া করেছে।

"বাজ ওটা একটা। লাল-মাথা বাজ—Redheaded Merlin। এদের স্ত্রী-পাখিটাকে তুরম্‌তী বলে অনেক জায়গায়। পাখি ধরার জন্যে পোষে অনেকে। কুনকী হাতীরা যেমন বুনো হাতী ধরে, এরা তেমনই নীলকণ্ঠ, হুপো, তিতির প্রভৃতি পাখি ধরে। ধরাটা যদিও একজাতীয় না। কুনকী ভুলিয়ে আনে, এরা ছোঁ মেরে ধরে। চেহারাটা সুন্দর। মাথা লাল, পিঠটা নীলচে, বুকে-পিঠে সাদার ওপর ছিটছিট। দেখুন।"

দূরবীনটা ডানার হাতে দিলেন।

"ওই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে নিন নিজের চোখের সঙ্গে।"

ডানা দেখতে লাগল।

সহসা বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, মেয়েটিকে বাজপাখির সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞানদান করা উচিত বোধ হয়।

"বাজের ঠোঁট আর পায়ের নখ লক্ষ্য করবার জিনিস। ওদের চেনবার আর একটা উপায় হচ্ছে ল্যাজের পালকের তলায় বেশ চওড়া ডোরা—Barred—দেখতে পেয়েছেন?"

ঘাড় নেড়ে ডানা জানালে, পেয়েছে।

"ঠিক এই রকম সাইজের আর এক রকম বাজ আছে। তাকে কেস্‌ট্রেল (Kestrel) বলে। তার মাথাটা কিন্তু নীলচে, পিঠটা লাল। এর ঠিক উল্টো।"

ডানা দূরবীনটা বৈজ্ঞানিকের হাতে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ক'রে বসল একটা, "একটু চা খাবেন?"

"বেশ তো"—ব'লেই বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে মেয়েটির কৌতূহল ঠিক উদ্রিক্ত করতে পারলেন না তিনি। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপস্রিয়মান ডানার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। গোড়ালির উপর শাড়ির পাড়টা চোখে পড়ল। মনে হ'ল, ঠিক যেন শিকরা পাখির ল্যাজের তলার মত। ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অনুসরণ করলেন।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "কই, কি লিখলেন, পড়ুন।"

ডানার দিকে কবি চাইলেন। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন উৎসুক।

"পড়ব? আশ্রমপীড়া হবে না তো?"

"না না। কবিতা আমার খুব ভালো লাগে। আপনি পড়ুন। কি নিয়ে লিখলেন?"

"যে পাখিটা দেখলাম এখুনি—মোহনচূড়া।"

"ও, পড়ুন।"

কবি পড়তে লাগলেন।

কি করিয়া মিল হ'ল ঘুঘু আর ধনেশে
জেব্রা ও হরিণে
সে কথা ভাবিয়া আমি মরি নে।
আমি শুধু বার বার ডেকে বলি নিজেকে

কেবা কালো কেবা সাদা কেবা উঁচু নীচে কে
সত্য কে মিছে কে
তাহার হিসাব নিক যাহারা বৈজ্ঞানিক
তুই শুধু অঞ্জলি ভরি নে।

তুই শুধু দেখ্ রে পেখম মেলেছে মন
ও মোহন চূড়াতে
গরীব সখীর হিয়া জুড়াতে, না পুড়াতে!
চঞ্চল ও চলন শুধু চলাটুকু কি
উকু কুক্ উকু কুক্ শুধু উক্ কুকু কি
ওর সুখ দুখু কি
পেয়েছে কোথাও বাণী? কোন্‌খানে? কতখানি?
ছন্দেতে পারিস কি কুড়াতে?

"সুন্দর"—অস্ফুট কণ্ঠে বললে ডানা।
"বাঃ"—সোল্লাসে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

১১

শীত শেষ হ'ল। বসন্ত এসেছে। ঝ'রে পড়ছে অনেক গাছের পাতা। ঝরতে না ঝরতেই দেখা দিচ্ছে নব মুকুলের আভাস, পাওয়া যাচ্ছে কিশলয়দের সাড়া। বাতাসে শীতের আমেজটুকু আছে, তীক্ষ্ণতা নেই। ভোরের দিকের কুয়াশায় নিবিড়তা নেই, স্বচ্ছতা এসেছে। মসলিনের টুকরোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে দূরে দূরে। তিসির ফুল, যবের শীষ, গমের শীষ, মটর ফুল, অড়র ফুল ছেয়ে ফেলেছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ঘেঁটু ফুল ফুটেছে চারিদিকে। শিমুলের কুঁড়ি ধরেছে। সজনে ফুলের শ্বেতগুচ্ছ দেখা যাচ্ছে দু-এক জায়গায়। শিয়ালকাঁটার বনেও ফুল ফোটবার সাড়া পড়েছে, সোনালি ফানুস দুলছে গাছে গাছে। বটগাছে ফল ধরেছে অজস্র। আখ কাটা হচ্ছে। পেয়ারা পেকেছে। টুনটুনি পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে দলে দলে। পুরুষ টুনটুনি পরেছে চকচকে কালো রেশমের বর-বেশ। উচ্চ রোল তুলে নীলকণ্ঠ প্রণয় নিবেদন করছে প্রেয়সীকে। বাঁশপাতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে মাটিতে। কাঠঠোকরার ক্রেংকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বেনেবউ ডাকছে নানা সুরে। টিউ—কৃষ্ণ গোকুলে—ও বউ হলুদ তোল—নানা রকম কথা বলছে সে। বুলবুলিরাও টুরু টুরু শুরু করছে ঝোপে ঝাড়ে। বসন্ত-বউরির আনন্দ-সঙ্গীত উৎসের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। টংক্ টংক্ টংক্—ডেকে চলেছে ভগীরথ। চন্দুল আর ভরতের গানে লেগেছে নতুন সুর। খঞ্জনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে গরুদের কাছে কাছে। শকুনি, বাজ, মুনিয়াদের বাচ্চা হয়েছে, তাই নিয়ে ব্যস্ত তারা।

...অমরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিরাট একটা পার্সেল নিয়ে। মালয় থেকে তাঁর একজন বন্ধু স্টাফ্‌ড্ (stuffed) পাখি পাঠিয়েছিলেন কয়েক রকম তাঁর জন্মদিনের উপহার-স্বরূপ যুদ্ধের আগে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে পার্সেলটা পৌঁছেছে এতদিন পরে। সর্প-ঈগলটা (Serpent Eagle) অতি অদ্ভুত রকম সুন্দর। ভীষণ অথচ সুন্দর, মাথায় পালক-গোঁজা

সম্রাট যেন। কি দৃপ্ত ভঙ্গী, এর সঙ্গে এদেশী সর্প-ঈগলের মিল-অমিল কোন্‌খানে কতটুকু আছে তা তিনি বুঝিয়ে চলেছেন রত্নপ্রভাকে। রত্নপ্রভা গম্ভীর মুখে শুনে যাচ্ছেন। অনেক কিছুই বুঝছেন না, কিন্তু তাতে রস-ভঙ্গ হচ্ছে না। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি এবং নীরব গাম্ভীর্য জমিয়ে রেখেছে প্রসঙ্গটাকে। সাদা-কলার-ওলা চমৎকার মাছরাঙাটাও মন দিয়ে শুনছে যেন অমরবাবুর বক্তৃতা। ওটা যে মরাপাখি তা মনেই হচ্ছে না। বহুবর্ণ-বিশিষ্ট পিট্টা (Pitta) প'ড়ে আছে কাত হয়ে এক ধারে। পিঠে-চুল হলদে-বুক বুলবুলিটার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। লাল-ঘাড় নীল-পিঠ টিয়া ব'সে আছে গ্রীবাভঙ্গী ক'রে। মৃত্যুও তার গর্ব অপহরণ করতে পারে নি যেন। ক্রমাগত ব'কে চলেছেন অমরবাবু। যে পক্ষীনিবাস তিনি তৈরি করতে চান, তার কল্পনায় মেতে উঠেছে তাঁব মন। রত্নপ্রভারও।

...চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন মন্দাকিনী। চৈত্র মাস এসে গেল, অথচ চাল কেনা হ'ল না এখনও। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। মাঘের মধ্যেই সারা বছরের মতন চাল কিনে ফেলেন তিনি। এবারও ফেলতেন, কিন্তু রূপচাঁদবাবু দাঁও মাফিক কিনে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব'লে অপেক্ষা করছেন। রূপচাঁদবাবুর কিন্তু পাত্তা নেই। একটি বিষয়ে মন খুশি আছে তাঁর। মনের মত ক'রে দু'টি লেপ করাতে পেরেছেন এবার। চমৎকার ছিটটি। ধনুকর ডাকিয়ে সামনে ব'সে বার বার ক'রে ধুনিয়ে, চক্রাকার সেলাই দিয়ে মনোমত ক'রে করেছেন লেপ দুটি। রূপচাঁদবাবুর দৌলতেই হয়েছে। তাই আশা করছেন যে, চালের ব্যবস্থাটাও ক'রে দেবেন উনি।

..উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বকুলবালা দিন গুণছেন, কবে পাখি-ওলা হলদে পাখি বেনেবউ এনে দেবে তাঁকে। পাখি-ওলাটা রোজই বলে, এখনও পায় নি। অথচ সামনের আমগাছে প্রায়ই তো দেখা যায়। কি সুন্দর রঙ, সোনা ঠিকরে পড়ছে যেন গা থেকে। ওই রঙের শাড়ি আছে একখানা তাঁর। পাখিটা যখন আসবে, তখন তিনি যে কি করবেন, তারই কল্পনায় তন্ময় হয়ে আছেন তিনি। বেনেবউ এলে মদনলাল, সোহাগী হিংসেয় ফেটে পড়বে নিশ্চয়। তা পড়ুক, ওরা হিংসুটে ব'লে নতুন পাখি পুষবেন না তিনি বুঝি! আচ্ছা আবদার তো!

হলদে পাখির স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে বকুলবালার শিশুমন।

...সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটার কাছে যে নদীটা আছে, বর্ষার সময় তার কূল ছাপিয়ে যায়, আশেপাশের ডোবাগুলোতে জল ঢোকে এসে। মাছও ঢোকে। এইরকম একটা ডোবার ধারে ছিপ ফেলে ব'সে আছেন রূপচাঁদ। বকও ব'সে আছে কয়েকটি। মাথার উপর দিয়ে টিয়া উড়ে গেল এক ঝাঁক। টেলিগ্রাফ-পোস্টের উপর ব'সে একটা ফিঙে পাখি ঝনৎকার দিয়ে ধমকাচ্ছে যেন কাকে। তীরের একটা গাছের পাতায় আত্মগোপন ক'রে হাঁড়ি-চাঁচা মাঝে মাঝে 'কক্‌রিং কক্‌রিং' শব্দ ক'রে প্রিয়াকে ডাকছে। রূপচাঁদের কিন্তু লক্ষ্য নেই এসব দিকে। ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ব'সে আছেন তিনি।

...ডানা ব'সে আছে চুপ ক'রে বারান্দার উপর। আসন্ন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে তার মনেও, কিন্তু সজ্ঞানে সে অনুভব করছে না কিছুই। উতলা হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। অতীতের তীরভূমির দিকে চেয়ে আছে সে, দূরে স'রে যাচ্ছে সেটা ক্রমশ। বর্তমানের নানা চিত্র ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের স্বীকার করতে বাধছে, অস্বীকার করতেও পারছে না। অদৃশ্য ভবিষ্যতের জয়গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কোন্ অদৃশ্য কবি। অস্পষ্ট সুরটা শোনা যাচ্ছে কেবল, তাও নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়। তার সঙ্গে মিশছে এসে কোকিলের কুহু, পাপিয়ার

'পিউকাঁহা', বায়সের চীৎকার, বসন্তের সুরোচ্ছ্বাস। অনিবার্য বর্তমানের অকুণ্ঠিত অসংখ্য দাবী।

...নিজের তেতলার ঘরটিতে ব'সে কবি কবিতা লিখছিলেন।

আজ বিকেলে হঠাৎ যেন
দেখতে পেলাম পাঞ্চালীকে
ইচ্ছামতীর উচ্চ পাড়ে
খুঁজছে বাসা গাংশালিকে।

কঠিন গাছে কোমল গুটি
রঙিন হয়ে উঠছে ফুটি
ব্যাসের মুখে ফুটছে ভাষা
কোথায় তুমি অম্বালিকে।

জাগছে জীবন ভুবন-ভরা
সকল দ্বিধা শঙ্কা ঘোচে
শবের বোঝা সরিয়ে নে' যায়
মৃত্যু যেন সসঙ্কোচে।

জীবন-যাগের আগুন ফুঁড়ে
কৃষ্ণা জাগে বিশ্ব জুড়ে
স্বয়ম্বরের বিরাট সভায়
গান ধরেছে বৈতালিকে।

কৃষ্ণা আজও পার্থে মাগে
বহ্নি জ্বলে তন্বী-চোখে
শিক্‌রে বাজের পুলক জাগে
সমুদ্যত চঞ্চু-নখে।

সবুজ-লালে স্বর্ণ-পীতে
আগুন-মাখা বর্ণ-গীতে
কোন্ শবরী অর্ঘ্য সাজায়
বসন্তের এ বৈকালিকে।

ঝনাৎ ক'রে কপাট ঠেলে প্রবেশ করলেন মন্দাকিনী। কবিতার খাতাটা তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেললেন কবি।

মন্দাকিনী খাতাটার দিকে এক নজর চেয়ে অসঙ্কোচে বললেন, "কি যে বাজে কাজে সময় নষ্ট করছ তুমি সারাদিন ব'সে ব'সে! চার্লের ব্যবস্থা কর। রূপচাঁদবাবুর তো পাত্তাই নেই।"

অপ্রতিভ মুখে চেয়ে রইলেন কবি। কিছু একটা বলতেন হয়তো, কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠলেন। অঘটন ঘ'টে গেল একটা যেন। সুরের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ তুবড়ির মত আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বাতায়নপথে শুনতে পেলেন এ বছরের প্রথম পাপিয়ার ডাক—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—। চোখের অপ্রতিভ দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর, মন উড়ে গেল আকাশে, গুনগুনিয়ে উঠল কবিতার দুটো লাইন—

চোখ গেলে কি গান ধরে কেউ
অমন ধারা তান তুলে?
চোখ যায় নি মন গিয়েছে
বল্ না সেটা প্রাণ খুলে।

মন্দাকিনী বিরক্ত মুখে চেয়ে ছিলেন স্বামীর দিকে। তাঁর বিরক্তির কারণ, তিনি নিজের আকাশে উড়তে পারছিলেন না। সবাই নিজের নিজের আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

নদীর ধারের প্রকাণ্ড শিমুলগাছটায় পাতা নেই। অসংখ্য লাল ফলে ভ'রে উঠেছে সেটা, আর তাকে কেন্দ্র ক'রে সাড়া প'ড়ে গেছে পাখিদের মহলে! জোয়ারি, হাঁড়িচাঁচা, টুনটুনি, শালিক, গোশালিক, টিয়া, ছাতারে, কাক, বুলবুল—একটা হাট বসে গেছে যেন। কাকলী-কলরবে নদীতীর পরিপূর্ণ, আকাশটাও হুমুড়ি খেয়ে পড়েছে যেন কৌতূহলভরে। নদীর স্বচ্ছ শীর্ণ ধারাতেও লেগেছে আনন্দের ছোঁয়াচ, অসংখ্য ঊর্মির শিহরণ জেগেছে যেন তার স্রোতোধারায়। নদীর ওপারে শুভ্র সৈকত। তার ওপারে মাঠে, গম যব মটর ছোলার ক্ষেত। শ্যামকান্তি নেই আর তাতে। শিশু-প্রাণের সবুজ অবুঝ উচ্ছলতা আর দেখা যাচ্ছে না, যৌবনের স্বর্ণাভা ফুটে উঠেছে চারিদিকে, ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে সফল সৌন্দর্যের সার্থক মহিমা। লুটিয়ে পড়েছে।

...মুগ্ধনেত্রে দেখছিলেন আগন্তুক পথিক! পদ্মাসনে ঋজু-মেরুদণ্ড হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি সেই প'ড়ো ঘরটির সামনের চাতালে। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে। আরও কাটবে বোধ হয় কিছু কাল। এঁরা যতদিন না আপত্তি করেন, থাকবেন তিনি এখানে। থাকবার যে বিশেষ একটা আগ্রহ আছে, তা নয়! আগ্রহের সঙ্গত কারণ যদিও আছে একটা, কিন্তু সেটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর। থাকবেন, কারণ কোথাও তো থাকতে হবে! এ জায়গাটা ভাল লাগছে। নদীতীর বেশ নির্জন। যে মেয়েটি ওই বাড়িতে থাকে, আশঙ্কা ছিল, সে হয়তো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। সে কিন্তু বিশেষ কিছুই করে না, ও-বাড়িতে কোন লোক আছে ব'লেই মনে হয় না। সামনের বারান্দায় ক্যাম্পচেয়ারে ব'সে থাকে চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে। কখনও পড়ে। বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে তাঁর কাছেও আসে, খোঁজখবর নেয়। প্রশ্নও করে দু-একটা এমন বিষয়ে যাতে মনে হয়, মেয়েটি অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। আগন্তুক হাসেন মনে মনে। ভাবেন, সবাই হাতড়াচ্ছে, কেউ সেটা বোঝে, কেউ বোঝে না।...ভাল লাগে মেয়েটিকে! হয়তো পিপাসা জেগেছে। মনে প'ড়ে যায় পুণার মুসলমানী সন্ন্যাসিনী হজরৎ বাবাজানের কথা। মুখময় বলি-রেখা, মাথায় শুভ্র কেশভার। চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু শিশুসুলভ কৌতূহল, যেন পাখা মেলে উড়তে চাইছে অজানার উদ্দেশে। ডানাকে দেখে শঙ্কা হয়েছিল তাঁর প্রথম প্রথম। এখন আর ভয় নেই। যে অনর্থ আশঙ্কা ক'রে মহাজনরা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন, সে অনর্থের সম্ভাবনা 'ডানার মধ্যে লক্ষ্য করেন নি তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে। তার তূণে অসংখ্য মোহিনী বাণ আছে তা সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে যখন আসে, তখন তূণটা ঢেকে রাখে। তখন তার চোখে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে, তাতে কুহকিনীর ইন্দ্রজালের আভাসমাত্র দেখতে পান নি তিনি একদিনও। বরং পথহারার অনিশ্চিত ব্যাকুলতাই লক্ষ্য করেছেন মাঝে মাঝে।

পুষ্পিত শিমুলগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অসংখ্য লাল ফুল, বিচিত্র-বর্ণ অসংখ্য পাখি, অসংখ্য রকম কাকলী।...ডানাও আছে ওর মধ্যে, তিনি নিজেও। অনন্তমুখী অনন্ত লীলার স্রোতে ভেসে চলেছেন স্বয়ং ভগবান, দেহ এবং দেহাতীত একসঙ্গে।

এই চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন।

২

রূপচাঁদ যখন ডানার কাছে এলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সূর্যাস্তের রক্তিমাভা যদিও লেগে রয়েছে পশ্চিম দিগন্তে, কিন্তু অন্ধকার আসন্ন। রূপচাঁদ আপিস-ফেরত প্রায়ই আসেন আজকাল ডানার কাছে। অজুহাতের অভাব হয় না। শুধু তাই নয়, অজুহাতটা যে দরকার তাও মনে হয় না সব সময়ে। নানা প্রয়োজনে প্রত্যহ আসেন। কোনদিন না এলেই বরং ডানা বিস্মিত হয়।

সেদিন এসেই রূপচাঁদ যে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন তাও নতুন নয়, কয়েক দিন থেকেই কথাটা বলছেন তিনি। ডানা মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারে নি এখনও। রূপচাঁদ এসে গলার পাকানো চাদরটি খুলে রোজ যেমন রাখেন আজও তেমনই রাখতে যাচ্ছিলেন কপাটের উপর।

ডানা বললে, "আলনা থাকতে ওখানে রাখা কেন? দিন।"

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে এবং ঘাড়টা একটু নামিয়ে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন তার দিকে, যার অর্থ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তুমি নেবে? এই ঘামেভেজা চাদরটা তোমার হাতে দেওয়া ঠিক হবে কি? কিন্তু এর গভীরতর যে অর্থ রূপচাঁদের মনের অন্তরালে ছিল, তা ডানা টের পাচ্ছিল না। সেটা হচ্ছে—তাই নাকি? আমার চাদরের সম্বন্ধে মমত্ব-বোধ জেগেছে নাকি তোমার? এইটেই তো প্রত্যাশা করছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে চাদরটা তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর চেয়ারে ব'সে পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার ক'রে একটা সিগারেট নিয়ে সন্তর্পণে ঠুকতে লাগলেন সেটা সিগারেট-কেসের উপরে।

ডানাই আবার প্রশ্ন করলে, "দেশলাই আছে তো?"

"আছে।"

পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেট ধরালেন, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? আমি আজ ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্‌ অব্‌ স্কুলসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বললেন—হয়ে যাবে। তুমি দরখাস্তটা ক'রে দাও।"

স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেসের পদটি খালি আছে। রূপচাঁদের ইচ্ছা, ডানা সেটির জন্য দরখাস্ত করুক। ডানার কিন্তু ইচ্ছা নয় তেমন। অথচ আর্থিক পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠছে ক্রমশ যে, অর্থাগমের কোনও একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। সেটা যে কি ক'রে সম্ভব হবে তা তার জানা নেই—রূপচাঁদবাবুর এই প্রস্তাবে তার অবিলম্বে রাজি হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই সে মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারছিল না। সে বিদ্যা অর্জন করেছিল মানসিক সংস্কৃতির জন্য, চাকরি করবার জন্যে নয়। তাকে যে কোনও দিন চাকরি করতে হবে—এ সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করে নি কখনও সে।

রূপচাঁদ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, "মুদির দোকান থেকে চাল ডাল তেল ঘি দিয়ে গেছে সব?"

"হ্যাঁ, গেছে।"

"আনন্দ তোমাকে যে চাকরটা এনে দিয়েছে, সেটা কাজ করছে তো ভাল ক'রে? না হ'লে বল, আমার হাতে একটা ভাল চাকর এসেছে, রাঁধতেও পারে।"

"না, এ বেশ কাজ করছে।"

"মাইনে কত ঠিক হয়েছে?"

"আমি কিছু ঠিক করি নি। আনন্দবাবু কিছু বলেন নি আমাকে।"

"আগে থাকতে ঠিক ক'রে নেওয়া ভাল। পরে গোলমাল না হয়। আনন্দ কি এসেছিল এর মধ্যে?"

"কাল এসেছিলেন।"

"ও।"

চুপ ক'রে গেলেন রূপচাঁদ। ডানাও চুপ ক'রে রইল। একটা অদৃশ্য রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে উঠল দুজনাকে ঘিরে। সিগারেটে টান দিয়ে রূপচাঁদ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "দু-চার দিনের মধ্যে জন মজুর এসে পড়বে। কালই আসত, আজকাল যা পায়া-ভারী ব্যাটাদের। কন্‌স্টেবল্‌ পাঠিয়ে তবে ঠিক করতে হয়েছে। আসবে ঠিক।"

"জনমজুর কেন?"

"সামনেই বর্ষা। এই প্রকাণ্ড খোলার বাড়ি, না সারিয়ে দিলে থাকাই যাবে না।"

"কিন্তু সারাতে গেলে অনেক খরচ প'ড়ে যাবে যে।"

"তা পড়বে বইকি। বাঁশ দড়ি খাপরা সবই অগ্নিমূল্য আজকাল। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। অমরেশের টাকার অভাব নেই।"

রূপচাঁদের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"তার বাড়ি সে-ই সারাবে। আমি শুধু ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, মানে—ঝঞ্ঝাটটা পোয়াচ্ছি।"

এই শেষ উক্তিটি ক'রে রূপচাঁদ ডানার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যার অর্থ—তোমার জন্যেই পোয়াচ্ছি।

ডানা লজ্জিত হয়ে পড়ল। শুধু লজ্জিত নয়, শঙ্কিতও হ'ল। তার মনে হতে লাগল, একটা বেড়াজাল ক্রমশ যেন এগিয়ে আসছে তার চারিদিক ঘিরে। একটি মাত্র ফাঁক আছে—স্কুলের চাকরি নেওয়া। পরের দাক্ষিণ্যের উপর কতদিন থাকবে সে এমন ক'রে? দাক্ষিণ্যের কি প্রতিদান প্রত্যাশা করেছে এরা?

"আচ্ছা, স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের কি কোয়ার্টার্স আছে?"

"না। যতদিন কোয়ার্টার্স না হচ্ছে, ততদিন তারা মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে ভাড়া দেবে। এই বাড়িটাই নিতে পার তুমি, এইটে নেওয়াই সুবিধে, কারণ অমরেশকে যে ভাড়া আমি বলব তাতেই রাজি হয়ে যাবে সে। পঁচিশ টাকা দিয়ে শহরের মধ্যে এত বড় বাড়ি তুমি পাবে না। খালি বাড়িই নেই। তোমার জন্যে খুঁজতে কসুর করি নি তো।"

এই কথায় ডানা আবার মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। সহসা আর একটা কথা মনে পড়ল তার। রূপচাঁদবাবু কেমন সহজে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছেন। যদিও এতে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নেই. আমাদের দেশে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠকে তুমিই ব'লে থাকে সাধারণত ; তবু কিন্তু প্রথম যেদিন শুনেছিল, সেদিন কেমন একটু খটকা লেগেছিল। অমরেশবাবু, আনন্দবাবু—এঁরাও তো আসেন কিন্তু এঁরা কখনও 'তুমি' বলেন না তো। অবান্তরভাবে হঠাৎ সে ঠিক করলে, ওঁদেরও আর সে 'আপনি' বলতে দেবে না। ওঁদেরও অনুরোধ করবে 'তুমি' বলবার জন্যে। রূপচাঁদবাবু একাই ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার দাবি করবেন কেন? কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবু দাবি করতে পারেন বইকি। একা এই বিদেশে রূপচাঁদবাবু না থাকলে কি করত সে? রূপচাঁদবাবুই তো তাকে আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন এবং এখনও প্রতিদিন কিসে তার সুবিধা হয় তারই চেষ্টা করছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত তাঁর ব্যবহারে এমন কিছুই সে লক্ষ্য করে নি, যা সন্দেহজনক।...সে অন্যদিকে চেয়ে

ভাবছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রূপচাঁদবাবু নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছেন এবং সে চাহনি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা আতঙ্কজনক নয়, অথচ ঠিক আশ্বাসজনকও নয়।

খানিকক্ষণ নির্নিমেষে ডানার দিকে চেয়ে থেকে রূপচাঁদ বললেন, "তুমি দরখাস্তটা ক'রে দাও আজই। কারণ পরশু দরখাস্ত দেবার শেষ দিন।"

"ভাবছি—"

রূপচাঁদ ভাবনাটা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন মনে মনে। কিন্তু ওই একটি কথা ব'লেই ডানা থেমে গেল। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলে, তার মনের নিগূঢ় কথাটা কি সে নিজেই জানে না ভাল ক'রে।

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, এই অচেনা জায়গায় নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলাটা কি ঠিক হবে?"

"অচেনা জায়গা চেনা হতে কদিন লাগে?"

"আমার বেশ একটু দেরি লাগে।"

"রেঙ্গুন ছাড়া আর কোনও চেনা জায়গা আছে কি তোমার?"

"না, তাও নেই।"

"তবে?"

এই ধরনের 'তবে'র উত্তর দেওয়া শক্ত, সহসা কিছু বলা যায় না। ডানা চুপ ক'রে রইল। তারপর হঠাৎ সমস্ত চোখ মুখ জ্বালা ক'রে মুখটা লাল হয়ে উঠল তার, দুঃসহ একটা বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, "তবে এটা ঠিক যে, এখান থেকে যাবার আগে সকলকার প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়ে তবে যাব। আমার দু-একখানা গয়না আছে এখনও।"

একটা স্নিগ্ধ হাস্যে রূপচাঁদের মুখভাবের তীক্ষ্ণতাটা কোমল হয়ে এল। বিদেশিনী বিদুষী এই তরুণীর মধ্যে চিরন্তনী নারীকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন তিনি যেন। ধরবার ছোঁবার মত কিছু যেন পেলেন একটা। এতদিন অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন। কেতাদুরস্ত মৌখিক ভদ্র আলাপের মুখোশ বিভ্রান্ত ব্যাহত করছিল তাঁকে এতদিন। আজ তাঁর কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর ধ্বনিত হওয়াতে আনন্দিত হলেন তিনি।

হেসে বললেন, "দেখ, সস্তা কবিত্ব করবার ভারি সুন্দর একটা সুযোগ দিয়েছ তুমি। এখনই তুমি যা বললে, তার উত্তরে অনায়াসেই বলতে পারতাম, গয়না-বিক্রি করা টাকা দিয়ে সবরকম প্রাপ্য শোধ করা যায় না এবং সেটা মিথ্যা কথাও হ'ত না। কিন্তু আমি ওসব বলব না। আমি বরং বলব—হ্যাঁ, নিশ্চয়, সকলের ন্যায্য প্রাপ্য শোধ করতে হবে বইকি। তা না করলে আত্মসম্মান বজায় থাকে না। আর তোমার মত মেয়ের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে—এর চেয়ে শোচনীয় ছবি আমি কল্পনাও করতে পারি না। গয়না বিক্রি না ক'রেও যাতে সেটা হয়, সেই চেষ্টাই করছি আমি তাই গোড়া থেকে। আর একটা কথাও তোমার মত মেয়ের বোঝা উচিত যে, গয়না বিক্রি ক'রে ধার শোধ করাটাও এক হিসাবে আত্মসম্মানহানিকর। উপহারের মর্যাদাকে প্রয়োজনের তাগিদে বিসর্জন দেওয়াটা কি ভাল?"

একটানা এতগুলো কথা ডানাকে তিনি বলেন নি ইতিপূর্বে। তাঁর নিজের কানেই কথাগুলোর অতি-নাটকীয়তার ঢঙটা বিশ্রী ঠেকল। মনে হ'ল, রাশটা বোধ হয় বেশি আলগা ক'রে ফেলেছেন! অপ্রতিভ হলেন নিজের অক্ষমতায় এবং পরমুহূর্তেই এমন ভাবে সংযত করলেন নিজেকে যে, মুখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে টান দিলেন

আর একটা, এবং নাক মুখ দিয়ে যে ধূম উদ্‌গিরণ করলেন তা দেখে ডানার হঠাৎ মনে হ'ল, ও সিগারেটের ধোঁয়া নয়—আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "আত্মসম্মানের চুলচেরা বিচারই যদি করতে হয়, তা হ'লে আর একটা কথাও ভাবা উচিত।"

ডানার মুখের দিকে ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে রইলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, "কি সেটা"?

"ঠকানোটা কি আত্মসম্মানজনক?"

"তার মানে?"

"যা আমি জানি না, তা করবার ভান ক'রে বেতন নেওয়াটা কি ঠকানো নয়? ইতিপূর্বে কখনও আমি মাস্টারি করিনি। আমার বিশ্বাস, ও বিষয়ে আমার তেমন কোনও যোগ্যতাও নেই ; একটা ডিগ্রী থাকলেই যোগ্যতা হয় না।"

"সত্যি সত্যি তোমার যাতে যোগ্যতা আছে ব'লে আমি মনে করি, তদনুসারে চলতেও তোমার বিবেকে বাধবে"—ব'লেই রূপচাঁদ থেমে গেলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবার বললেন, "সেটা কি, তাও বলতে আমার বাধবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনিই বিচিত্র এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদ এতই প্রবল যে, যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবার সুযোগ আমরা প্রায়ই পাই না। জীবনে সকলকেই আপোস ক'রে চলতে হয় সব দিকে বাঁচিয়ে। আমি এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ছিলাম, কেমিষ্ট্রিতে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল, কিন্তু সারা জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে পুলিস-সায়েবের কেরানীগিরি ক'রে। কেরানী হবার যোগ্যতা আমার ছিল না—" .. হঠাৎ আবার থেমে গেলেন রূপচাঁদ। মনে হ'ল, সস্তা হৃদয়াবেগের আবর্তে খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি আচম্বিতে এসে অবাক ক'রে দিল তাঁকে। মনে হ'ল এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বললে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে তাঁর। নিগূঢ় বেদনার উৎসমুখে যে কঠিন পাথরটা চাপা দেওয়া ছিল, সেটা ন'ড়ে উঠল সহসা যেন। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতার শ্মশানভূমি থেকে একটা হিমশীতল হাওয়া হাহাকার ক'রে চ'লে গেল যেন তাঁর অন্তরতম সত্তার ভিতর দিয়ে। মনের এ অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হলেন তিনি। রাগও হ'ল। এমনভাবে বিচলিত হওয়ার মানে কি? সিগারেটটার দিকে এক নজর চেয়ে টান দিলেন তাতে দু-একটা, তারপর ফেলে দিলেন সেটা।

ডানা হেসে জবাব দিলে, "আপনি যা বললেন, তা ঠিকই। কিন্তু অযোগ্য কেরানী দেশের তত অনিষ্ঠ করে না, যত করে অযোগ্য মাস্টার বা অযোগ্য ডাক্তার। এদের হাতে দেশের প্রাণশক্তির ভার আছে। অত বড় ভার নেবার সাহস আমার নেই।"

"কি করবে তা হ'লে ঠিক করেছ?"

"আমি ভাবছি, চ'লে যাব এখান থেকে। কলকাতা কিম্বা বম্বে।" রূপচাঁদের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"তাতে লাভটা কি হবে?"

"সেখানে নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ জুটিয়ে নিতে পারব একটা। ধরুন, টেলিফোনে কাজ পেয়ে যেতে পারি, কেরানীগিরিও পেতে পারি কোথাও, শর্টহ্যান্ড টাইপ রাইটিং জানা আছে আমার। তা ছাড়া গানবাজনা শিখেছিলাম ভাল ক'রে—তাও শেখাতে পারি। বড় বড় শহরে অনেক রকম কাজ পাওয়া যায়। এসব জায়গায় মাস্টারি ছাড়া অন্য গতি নেই।"

"তা ঠিক।"

যুক্তিযুক্ত কথার প্রতিবাদ করা রূপচাঁদের স্বভাব নয়। কিন্তু তাঁর সমস্ত মুখে আশঙ্কার ছায়ার সঙ্গে তিক্ত বিদ্রূপের এমন একটা সম্মিলিত রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠল, যা প্রতিবাদের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, "তুমি যদি আমার নিজের লোক হতে, তা হ'লে তোমাকে এর আর একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই।"

শশব্যস্ত হয়ে ডানা ব'লে উঠল, "না না, ও কথা বলছেন কেন? পৃথিবীতে আপনারাই এখন আমার একমাত্র আত্মীয়। আপনাদের সাহায্য না পেলে আমার যে কি হ'ত, তা জানি না। আপনাদের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করব না। আমি ভাবছিলাম, কলকাতায় গেলে অন্যভাবে উপার্জনের পথ একটা পেতাম হয়তো। মাস্টারি আমি করতে পারব না। "

ঘাড়টা একটু নীচু ক'রে নির্নিমেষে তার দিকে চেয়েছিলেন রূপচাঁদ অর্ধনিমীলিত নেত্রে। মনে হচ্ছিল, ডানার কথাগুলো উপভোগ করবেন কি না প্রণিধান করছেন। শুনে নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "সত্যিই যদি তুমি আমাকে নিজের আত্মীয় ব'লে মনে কর, তা হ'লে বলছি, শোন—তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না তোমাকে। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক।"

"এমন ভাবে থাকা যায় নাকি?"

"কেমন ভাবে থাকতে চাও বল, তারই ব্যবস্থা করছি।"

"ব্যবস্থা তো করেছেন, কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছে।"

হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটিয়ে ব'লে উঠলেন রূপচাঁদ, "তোমার এ অস্বস্তি কেন জান?"

"কেন বলুন?"

"তুমি সত্যি আমাকে আত্মীয় ব'লে ভাবতে পারছ না। পারলে তোমার এ অস্বস্তি হ'ত না। তুমি মুখে আমাকে আত্মীয় বলছ, অথচ তোমার ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি তোমার জন্যে সামান্য যা করছি, তার বদলে তুমি কি করবে তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ মনে মনে, অথচ ভেবে পাচ্ছ না কি ক'রে সেটা করবে।"

অত্যন্ত সপ্রতিভ হাসি হেসে ডানা জবাব দিলে, "ঠিকই ধরেছেন আপনি। আপনাদের আত্মীয় ব'লে ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যবহারে সেটাকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কেমন যেন বাধো-বাধো লাগছে।"

"কেন?"

আবার একটু হেসে ডানা জবাব দিলে, "কি জানি।"

রূপচাঁদও হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, "জটিল মনস্তত্ত্বের অরণ্যে প্রবেশ করলে দিশাহারা হয়ে পড়বে। ঋণ পরিশোধ যদি করতে চাও ক'রো। কিন্তু তার জন্যে এখনই ব্যস্ত হবার দরকার নেই। প্রতীক্ষা করবার মত ধৈর্য্য আমার আছে...।"

ধৈর্যভরে কেউ ঋণ-শোধের জন্য প্রতীক্ষা করছে—এ চিত্রটা আরও অস্বস্তিকর ব'লে মনে হ'ল ডানার। কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল।

"দরখাস্ত তা হ'লে করবে না, এই ঠিক হ'ল তো?"

"হ্যাঁ। ওসব থাক্ এখন।"

"আচ্ছা, তা হ'লে চাদরটা দাও, এবার উঠি।"

'এখনই যাবেন? চা করতে বলেছি।"

"তা হ'লে চা-টা খেয়েই যাই।"

চা খাওয়ার প্রস্তাবটার মধ্যে একটা নতুন আলোক যেন দেখতে পেলেন রূপচাঁদ। রোজই তিনি চা খেয়ে যান, কিন্তু আজ যেন এটাকে একটু অভিনব ব'লে মনে হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর সহসা সোৎসাহে বললেন, "দেখ, একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমি যখন তোমার ভার নিয়েছি, তোমার ভয় নেই। তুমি যদি চাকরি করতে, তা হ'লে আমার পক্ষে সেটা সহজ হ'ত। টাকাকড়ির দিক থেকে নয়, লোকচক্ষুর দিক থেকে। একজন অপরিচিতা বিদেশিনীর এখানে থাকার একটা সঙ্গত অর্থ করতে পারত তারা, অবশ্য তাতেও যে তাদের মুখ বন্ধ হ'ত তা নয়, তবে আমার দিক থেকে দেবার মত একটা জবাবদিহি থাকত।"

অপ্রত্যাশিতভাবে ডানা ব'লে উঠল, "কে কি বলবে তা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা—"

ব'লেই থেমে গেল সে মুচকি হেসে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন রূপচাঁদ। তবু চুপ ক'রেই রইল ডানা। কিন্তু রূপচাঁদ ছাড়বার পাত্র নন।

"তোমার ভাবনাটা কি শুনিই না, যদি বলতে তোমার আপত্তি না থাকে।"

"আমার ভাবনা নিজেকে নিয়ে। নিজের কাছে যদি আমার আচরণ নিখুঁত হয়, তা হ'লে অপরের মতামতের তোয়াক্কা তত করি না। আমার নিজের আচরণ নিখুঁত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না।"

"ও।"

আর কিছু বলবার পূর্বেই চা নিয়ে চাকরটা প্রবেশ করল এবং টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চা ছাঁকতে লাগল। রূপচাঁদ নীরবে নিবিষ্টচিত্তে চাকরটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার চেহারা, চলন, মুখভাব, পরিচ্ছদ, চা-ছাঁকবার ভঙ্গী—প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এইটে তাঁর একটা স্বভাব। কোনও প্রশ্ন না ক'রে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করেন, এবং যখন সেটা করেন তখন কেউ বুঝতে পারে না যে, তিনি এত বড় একটা কঠিন কাজে লিপ্ত আছেন।

চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল।

চা শেষ হতেই উঠে পড়লেন রূপচাঁদ।

"চাদরটা দাও, এবার যাই।"

ডানা চাদর আনতে পাশের ঘরে গেল। রূপচাঁদ পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলে সেটার দিকে।

ডানা ফিরে আসতেই বললেন, "একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে পারছি না। খোলাখুলি সেটা জিজ্ঞেস করাই ভাল বোধ হয়।"

"কি কথা?"

"আমি যে এখানে আসি যাই, তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করি, এতে আর যে যা বলে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার মনে কোনরকম সন্দেহ হয় না তো আমার সম্বন্ধে?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন ডানার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ঠিক সত্যি কথাটা সোজা করে বলতে পারলে না ডানা।

একটু হেসে বললে, "সে রকম কোনও কারণ ঘটে নি তো এখনও।" ক্ষণকাল নীরব থেকে কথাটা প্রণিধান করলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, 'যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ আমাকে হিতৈষী আত্মীয় ব'লে মেনে নিতে আপত্তি নেই তা হ'লে?"

"এত ভূমিকা কিসের বলুন তো—"

"তা হ'লে এইটে অসঙ্কোচে দিতে পারতাম তোমাকে।"

খামটা দেখালেন।

"কি ওটা?"

"আমি চ'লে যাবার পর খুলে দেখো।"

খামটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটু ইতস্তত করতে লাগল ডানা। তারপর মনঃস্থির ক'রে ফেললে।

"আচ্ছা দিন।"

খামটা দিয়েই বেরিয়ে গেলেন রূপচাঁদ।

ডানা খুলে দেখলে, একশো টাকার নোট রয়েছে একখানা, আর তার সঙ্গে ছোট একখানা চিঠি। ইংরেজীতে টাইপ করা। চিঠির মর্ম ঃ—অতিশয় সসঙ্কোচে টাকাটা তোমায় দিচ্ছি। বন্ধুর সাহায্য হিসেবে নিতে যদি তোমার বিবেকে বাধে, ঋণস্বরূপই নিও। যখন সুবিধে হবে, শোধ দিও। বলাবাহুল্য, আমার দিক থেকে কখনও কোনও তাগাদা থাকবে না—নীচে কোনও নাম নেই।

ডানা নোটখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ নীরবে। রূপচাঁদবাবুর উপর রাগ হ'ল না। সঙ্কোচও হ'ল না তেমন কিছু। তবে তার অজ্ঞাতসারেই তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল একটু। যে নিষ্ঠুর নিয়তি তার জীবনকে সুখের শিখর থেকে চ্যুত করছে, তারই করাল ছায়া মুখের উপর পড়ল যেন ক্ষণকালের জন্য। মনে পড়ল একটা চিত্র। তারা যখন বর্মা থেকে পালায়, তখন পথে এক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছিল, পালিয়ে আসছিল যথাসর্বস্ব ফেলে। তফাত ছিল না ধনী আর ভিক্ষুকে! ভীত পীড়িত ভগ্নহৃদয় বুভুক্ষু জনতার সেই মিছিলটা ভেসে উঠল তার চোখের উপর আবার। হিতৈষী প্রতিষ্ঠানটি সকলের খাওয়ার আয়োজন করেছিল একটি নদীর তীরে। জলের সুবিধার জন্যই সম্ভবত। আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা ডাল-চালের খিচুড়ি আর শাক-সবজির একটা ঘন্ট, সারি সারি পাতা পেতে দিচ্ছিল সবাইকে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা তাই খাচ্ছিল সাগ্রহে বার বার চেয়ে। পথে উপর্যুপরি তিন দিন কোনও খাবার পাওয়া যায় নি। হঠাৎ দেখা গেল, একটি লোক খাচ্ছে না। খিচুড়ির দিকে চেয়ে পাতার সামনে ব'সে আছে চুপ ক'রে। লোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টিতে, কিন্তু খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে ব'সে আছে চুপ ক'রে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ে সিল্কের ময়লা পাঞ্জাবি, হাতে বেমানান-রকম উজ্জ্বল হীরের আংটি একটা। কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি খাচ্ছেন না কেন?" লোকটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে। তারপর নিজের পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হতেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল একটু, বললে, "হ্যাঁ, খাব। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন।" কর্মকর্তা বললেন, "কি বলুন?" একটু ইতস্তত ক'রে লোকটি বললে, "আমার পাতাটা যদি সরিয়ে একটা আলাদা জায়গায় দেন!" কর্মকর্তা লোক ভাল ছিলেন, আলাদা জায়গাতেই খেতে দিলেন তাকে। ডানা পাশেই ছিল, সবিস্ময়ে শুনছিল সব। লোকটি পংক্তি থেকে আলাদা জায়গায় ব'সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বোকার মত হাসতে হাসতে কর্মকর্তার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এই কয়েকদিন আগেই আমি কোটিপতি ছিলাম। আমার বাড়িতেই প্রত্যহ আড়াইশো

কাঙালী ভোজন করাতাম। এখন আমি সর্বস্বান্ত তবু ওদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে খেতে পারছি না।"—আবার ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর গপগপ ক'রে খেতে লাগল। ডানার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সমস্ত ছেড়ে এসেছেন বর্মায়, একটি জিনিস কিন্তু ছেড়ে আসতে পারেন নি। অহঙ্কার। অনেক দিন পরে আজ আবার মনে পড়ল ছবিটা। মনে হ'ল রূপচাঁদবাবুর টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে অশোভন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করবে না সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। সকালবেলা আনন্দবাবু এসেছিলেন। নদীর ওপারের আকাশটা মনোহর হয়ে উঠেছিল তখন। সাদা মেঘের বিরাট একটা জাল টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন নীল আকাশপটে। আনন্দবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথাগুলো এখনও ডানার কানে বাজছে।

"আপনি আর আমি কিন্তু ঠিক এক রকম দেখছি না। পৃথিবীতে কোন দুটি লোক ঠিক এক রকম দেখে না, যদিও একই জিনিস দেখে।'

তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন আকাশের দিকে। মনে হ'ল দৃষ্টি তাঁর হারিয়ে গেল যেন ওই নীল অসীমের মাঝখানে।

হঠাৎ বললেন, "কাগজ আছে ?"

"চিঠি লেখার প্যাড আছে একখানা।"

তার প্যাডে একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তিনি।

ডানা টেবিলের কাছে স'রে গিয়ে কবিতাটা পড়ল আবার।

আকাশ কেবল বাহিরেই নাই, সখি,
মনেরও ভিতরে আকাশ রেখেছ ঢাকি
সে আকাশ ভরি' যে তারার ঝকমকি
গভীর নিশীথে দেখেছ কখনও তা কি?

তোমার আকাশে জাগিছে তোমারই ভাষা
হয়তো নয় তা সাবেক তপন তারা
আমার আকাশে কাঁপিছে আমার আশা
আপনার সুরে আপনি আত্মহারা
তোমার আকাশে যে রাগিণী শোন তুমি
আমার হয়তো শুনিতে আছে তা বাকি।

তোমার আকাশে যে ইন্দ্রধনু ছটা
তাহার মহিমা একাই দেখেছ তুমি
আমার আকাশে বরষার ঘনঘটা
আকুল করিয়া তোলে মোর মনোভূমি
তব অভিসার ছায়া পথে পথে যবে
ধ্রুবতারা পানে চেয়ে থাকে মোর আঁখি।

বাহির-আকাশে জাগে অনন্ত নীল
মনের আকাশে বহু বর্ণের খেলা '
এ দুয়ের মাঝে আছে কি না কোনও মিল
তারই সন্ধানে বসেছে কবির মেলা
যুগ-যুগান্ত জাগিছে তন্দ্রাহীন
ছন্দে ছন্দে তাহারই হিসাব রাখি।

দুই অম্বরে বাজে গম্ভীর বাণী
জানি না কি সুরে কে যে সঙ্গীত গাহে
কান পেতে আছে কবি গুণী সন্ধানী
শিল্পী তাহারে চিত্রে আঁকিতে চাহে
বৃথা সন্ধানে হয়তো জীবন কাটে
ভুল রঙ দিয়ে সত্যের ছবি আঁকি।

ডানার সহসা মনে হ'ল, আনন্দবাবুর কবিতা আর রূপচাঁদবাবুর একশো টাকাব নোট একই জিনিসের দুই রূপ, রসায়নশাস্ত্রে যাকে বলে অ্যালোট্রপিক মডিফিকেশন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। মনের অন্ধকারে মনে হ'ল, পেতের মতন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

৩

অতিশয় উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের বাড়ির পেছন, দিকে। দোয়েলটা খুব ডাকছে নিমগাছের উঁচু ডালটায় ব'সে। এটা তাঁরই দোয়েল, অর্থাৎ গত বছর যে পাঁচটা দোয়েলের পায়ে তিনি রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন, এটা তারই একটা, বাকি চারটেকে এখনও দেখতে পান নি তিনি। এটাকেও এতদিন খুঁজে পান নি। হঠাৎ আজ নজরে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক তার নোটবুক বার ক'রে তাড়াতাড়ি তারিখটা লিখে নিলেন, দোয়েলটাকে কোথায় প্রথম দেখা গেল, তাও লিখলেন। হঠাৎ আবার সেই সন্দেহটা মনে জাগল। সমস্ত শীতকাল এদের এত কম দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এরা বোধ হয় এদেশে থাকেই না। শীত একটু কমলে তবে আসে। সিন্ধু, করাচী প্রভৃতি স্থান থেকে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে দোয়েলরা যে চ'লে আসে—এ কথা লাহা মশায় লিখেছেন। হয়তো শীতের সময় ওরা ওই অঞ্চলেই চ'লে যায়, কে জানে! শীতকালে ও-দেশের টেম্পারেচার কত থাকে একটু খোঁজ করতে হবে! দোয়েলটা উড়ে গিয়ে বসল টেলিগ্রাফের তারের উপর। গানের ধরনটাও গেল বদলে। ধমকের সুর ফুটে উঠল। বৈজ্ঞানিক আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, কারণটা কি, নিশ্চয় আর কেউ এসেছে। দেখতে পেলেন না কিছু। পাখিটা লেজ খাড়া ক'রে তেড়ে যেতেই চোখে পড়ল আর একটা দোয়েল। এইটেই প্রত্যাশা করছিলেন। দ্বিতীয় দোয়েলটা তাড়া খেয়ে অপরাধীর মত পালিয়ে গেল কিছুটা দূর, কিন্তু কিছু দূর গিয়েই রুখে দাঁড়াল। তাৎপর্যটা বুঝতে বৈজ্ঞানিকের দেরি হ'ল না। একথা বইয়ে পড়েছেন এর আগে। প্রত্যেক পাখিরই নিজের এলাকা থাকে। নিজের এলাকায় কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। দুটো এলাকার মাঝখানে থাকে খানিকটা 'এজমালি' এলাকা সেখানে সব এলাকার পাখিই যেতে পারে। দ্বিতীয় দোয়েলটিই প্রথম দোয়েলের এলাকায় ঢুকে যে বে-আইনী কাজ করেছে তা

বেশ জানে, তাই অপরাধীর মত স'রে পড়ল তাড়া খেয়েই! কিন্তু এজমালি এলাকায় গিয়ে, যেখানে তারও অধিকার আছে, সে আর বকুনি সহ্য করতে রাজী নয়। পালক ফুলিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পাখিটা তেড়ে গেলে তার দিকে, দ্বিতীয়টা তুড়ুক ক'রে সরে বসল আর একটা ছোট ডালে আর তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অমরবাবুর মনে হ'ল, এটা গান তো নয়ই, হাহাকারও নয়, অনেকটা হুমকি-গোছের। ঘাড়ের রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে, লেজটা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে বারংবার, মনে হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি বলছে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছু হঠার ভাবও আছে। শেষ পর্যন্ত পালাতেই হ'ল বেচারীকে। প্রথম পাখিটা এমন ছোঁ মেরে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল যে, টিকে থাকা অসম্ভব হ'ল তার পক্ষে। চোঁ-চা দৌড় দিলে বকুলগাছের পাশ দিয়ে। প্রথম পাখিটা আর পশ্চাদ্ধাবন করলে না, ফিরে এসে বসল নিমগাছের সেই উঁচু ডালটাতে। এটা তার নিজের নিমগাছ, এর ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় কোনও দোয়েলকে আসতে দেবে না সে আর। বৈজ্ঞানিক নিজের নোট-বুকে এই দোয়েলটির এলাকার ম্যাপ এঁকে নিলেন একটি। বকুলগাছ আর আমগাছের মাঝামাঝি জায়গাটা বোধ হয় এজমালি এলাকা। পূর্বদিকে নিমগাছ, পশ্চিমে মল্লিকের বাগানের দেওয়াল, উত্তরে মালিদের ওই ঘরটা আর দক্ষিণে আস্তাবল। প্রায় বিঘে দশেক জায়গা হবে। এইটুকুই মনে হচ্ছে এই দোয়েলটির স্বরাজ্য। ...এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল গাছটাতে, আমগাছের যে ডালটা সবচেয়ে উঁচু, তার উপর এসে বসল একটা পুরুষ টুনটুনি। কুচকুচে কালো রঙের উপর নীলের আভা বেরুচ্ছে। ডানার পাশে ছোট্ট একটু লাল জ্বলছে আগুনের মত। চি হুইট্ চি হুইট্, চি হুইট্....মুখ উঁচু ক'রে ডাকতে লাগল পাখিটা। সারি দিয়ে বাঁশপাতি পাখি উড়ছে একদল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দূর থেকে ভেসে আসছে পাপিয়ার অবিশ্রান্ত ডাক।

...ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন কোন অবাস্তব স্বপ্নলোকে এসে হাজির হয়েছেন, সেখানে সুর আর রঙ ছাড়া প্রকাশের আর কোনও ভাষা নেই। সহসা যেন তিনি ভুলে গেলেন যে, দোয়েল পাখির জীবনের অনেক খুঁটিনাটি সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে, অন্যমনস্ক হ'লে চলবে না। কিন্তু মনকে কি এমন ক'রে একমুখী ক'রে রাখা সম্ভব? একই মন সহস্র দিকে সহস্র ডানা মেলে উড়তে চাইছে যে অহরহ। দোয়েলের ডাকেই ঘোর ভাঙল বৈজ্ঞানিকের। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, নিমগাছের উঁচু ডালে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাইছে। এক ঝাঁক গিটকিরি যেন অদৃশ্য পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাঁশীর তানে ভর ক'রে। একটু আগে যে পাখিই মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তা কে বলবে! একটু দূরে টুনটুনি ডাকছে, টিয়ার ঝাঁক বসেছে পাশের বকুলগাছে, বাঁশপাতি পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে আশেপাশে, দোয়েলের তাতে আপত্তি নেই। দ্বিতীয় আর একটি দোয়েল এলে কিন্তু ও আর কিছুতে সহ্য করবে না তাকে। আত্মীয়প্রীতি মোটে নেই। কারই বা আছে? হঠাৎ মনে হ'ল বৈজ্ঞানিকের। আত্মীয়দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হয় না, কারণ তাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কটা এত উগ্ররকম মুখ্য যে, প্রীতির সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। তোমার সুখ-সুবিধায় ভাগ বসাতে উৎসুক তারা সর্বদা। তোমার ঐশ্বর্যে যদি ভাগ বসাতে দাও তাদের, তবু তারা সুখী হবে না, হিংসায় জ্ব'লে মরবে। জটিল মনস্তত্ত্ব। এই জন্যেই পৃথিবীর বড় বড় কাব্যের বিষয় বোধ হয় আত্মীয়-বিরোধ। বড় বড় গণিতজ্ঞ যেমন শক্ত শক্ত অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন, বড় বড় কবিরা তেমনই জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্য নিয়ে আত্মহারা হতে চান—থিয়োরিটা খাড়া ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। আশ্চর্য! অনাত্মীয়ের সঙ্গেই

প্রেম হয়। যার সঙ্গে কোনদিন চেনাশোনা ছিল না, সে-ই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ। আগে সভ্য সমাজে লোকে বোনকেই বিয়ে করত, সে যখন আরও সভ্য হ'ল তখন এ প্রথা উঠে গেল। বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পরের মেয়েকে গৃহিণী করার প্রথা শুধু যে প্রজনন-বিজ্ঞানের উপযোগিতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। প্রজনন-বিজ্ঞান অনেক পরের ব্যাপার। রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেম জমে না—এই সত্যটাই মানুষ বোধ হয় অনেক আগে আবিষ্কার করেছিল। আবার বৈজ্ঞানিক সচেতন হয়ে উঠলেন। চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। দোয়েলটার দিকে আবার মন দিতে চেষ্টা করলেন। ওই যে সঙ্গিনীটিও এসে নীচের ডালে বসেছেন। ভাবটা, যেন কিছুই জানেন না। ওকে কেন্দ্র ক'রেই যে এখনই অত বড় যুদ্ধ একটা হয়ে গেল, ওরই উদ্দেশে উপরের শাখায় যে অমন সঙ্গীতচর্চা চলছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন যেন। ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গিয়ে আর একটা ডালে বসল। যদিও গায়ের রঙ পুরুষ পাখিটার মতই, কিন্তু অত চকমকে কালো নয়, একটু পাঁশুটের আভাস আছে। কিন্তু ওই পাঁশুটে কালোর মধ্যেই বেশ সুন্দর শ্রী আছে একটি। পুরুষটার চেয়ে একটু বেশি মার্জিতও যেন। পুরুষ পাখিটা উড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় বসল, আবার শুরু করল গান।

...পদশব্দ শুনে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, রত্নপ্রভা আসছেন। পিছনে একজন চাকর। তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা আয়না।

রত্নপ্রভা বললেন, "কোথায় রাখব?"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মত।

"ওই নিমগাছটার তলায় রাখলে কেমন হয়! গাছপালা দিয়ে একটু ঘিরে দিতে হবে কিন্তু। আর আমরা কোন্‌খানটায় বসব বল দিকি! কাছাকাছি আমাদেরও বসবার একটা জায়গা করতে হবে, ফোটো তুলব কিনা!"

"আমাদের ছোট তাঁবুটা এখানে টাঙিয়ে দিলেই তো হয়।"

"বেশ তো, তা হ'লে চমৎকার হবে।"

"ওই উঁচু জায়গাটায় দিই?

"তা হ'লে তো গ্র্যান্ড হবে। গাছপালা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কিন্তু। মানে তাঁবু-টাবু দেখে পাখিটা—"

"বুঝেছি। আগে তুমি খেয়ে নাও। চা ভিজিয়ে এসেছি।"

"ও চল।"

বৈজ্ঞানিক ফিরেই দেখলেন, কবিও আসছেন।

"ও, আপনি এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আজ একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করব ভাবছি।"

"কি?"

"দেখতেই পাবেন, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক্‌, চলুন।

গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোট তাঁবুটির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে কবি আর বৈজ্ঞানিক ব'সে ছিলেন। নিমগাছের তলায় প্রকাণ্ড আয়নাটাও গাছপালা দিয়ে এমনভাবে রত্নপ্রভা রেখে দিয়েছিলেন যে, সেটাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে ব'সে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দোয়েলের আগমন-অপেক্ষায়। কবি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিলেন এক জোড়া শালিককে। সামনের চালাটার উপর ব'সে ঘাড় নেড়ে কত কথাই

বলছে যে! ওর রূপ রঙ গলার স্বর কিছুই খারাপ নয়, কিন্তু প্রত্যহ দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে মনে আর কোনও চমক লাগায় না। কেমন যেন একটা অতিপরিচিত ঘরোয়া ভাব। শালিকদের মধ্যেও পুরুষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু ওদের পুরুষ ব'লে মনেই হয় না। উৎক্রোশ বা শিক্‌রে-জাতীয় পাখিদের তো কথাই নেই, পুরুষ-দোয়েল বা নীলকণ্ঠেরও একটা পৌরুষ আছে যেন। শালিক পাখি কিন্তু অন্য রকম, অতিপরিচিতা প্রতিবেশিনী যেন। বৈজ্ঞানিক প্রায় নির্নিমেষে আয়নাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে এবং কবির দিকে চেয়ে চুপিচুপি বললেন, "আপনিও এমনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। কতক্ষণ যে থাকতে হবে ঠিক নেই।"

বৈজ্ঞানিক আর কোনও কথা বললেন না। গিরিগিটির মত মাথা তুলে নিমগাছের পাতার আড়ালে ছোট্ট কি একটা পাখি চিকচিক ক'রে বেড়াচ্ছিল, সেইটেকে দূরবীন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কবি অতি দুরূহ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে শালিকটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে। মাথা নেড়ে নেড়ে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ফুলিয়ে কত কথাই বলছে! হঠাৎ মনে জেগে উঠল কবিতা—

শালিকের সাথে মালিকের মিল যদিও আছে
কর্তার মতো হাবভাব তার মোটে নয়
আলিসার 'পরে গোয়ালের ধারে কিংবা গাছে
এ যাবৎ তার মিলিয়াছে যত পরিচয়
সে যেন কেবল গিন্নী।
ঘাড় নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে
খড়কুটো তুলে বাসা বানায়
পাড়াপড়শীর সঙ্গেতে ব'সে
সুখ-দুঃখের কথা জানায়।

সুবিধা মতন পোকা মাকড়টা যা পায় খোঁটে,
সইতে পারে না আদিখ্যেতা বা ঠ্যাকার মোটে,
বেড়াল নেউল সাপ দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে,
হয়তো বা মানে সিন্নি।
সে যেন কেবল গিন্নী।

"এসেছে এইবার।"

ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। পিং শব্দ ক'রে শালিকটাও উড়ে গেল। তুড়ুক ক'রে কোথা থেকে নেমে এল একটা পুরুষ-দোয়েল। নেমেই ছোট্ট একটা ফড়িং ধ'রে এক ঝটকায় সেটাকে মেরে গলাধঃকরণ ক'রে ফেললে। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল একটু। একটা ভাঙা ঘুঁটে প'ড়ে ছিল, সেইটেকেই ঠোকরাতে লাগল। তারপর হঠাৎ নিজের প্রতিচ্ছবিটাকে দেখতে পেলে আয়নায়।

পাওয়ামাত্রই ল্যাজটা খাড়া হয়ে উঠল সোজা। চিকচিক ক'রে গাল থেকে শব্দের স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন দুটো। তারপর ঘাড় ফুলিয়ে তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে লাগল আয়নার দিকে। ল্যাজটা ঠিক খাড়া আছে। ক্লিক ক'রে শব্দ হ'ল। বৈজ্ঞানিক ফোটো নিলেন। দোয়েলটা তারপর তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু আয়নায় প্রতিহত হয়ে

উড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। উড়ে গিয়ে বসল পাশের পেয়ারাগাছের ডালে, আর সেখানে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে সুরের শায়ক বর্ষণ করতে লাগল সবেগে। তারপর হঠাৎ উড়ে গেল।

বৈজ্ঞানিকের চোখ থেকে আনন্দ যেন উপছে পড়ছিল।

"দেখলেন?"

"হ্যাঁ, দেখলাম বইকি।"

"পাখিটার চোখ দুটো লক্ষ্য করেছিলেন কি?"

"লক্ষ্য করবার ছিল নাকি কিছু?"

"বাঃ, ছিল বইকি! চোখের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল। ওইটেই তো আসল। যখন ওরা প্রণয় নিবেদন করে, তখনও ওরা অমনই তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচে, গানও গায়।"

"মানে, রাগ আর অনুরাগের চেহারা প্রায় একই রকম?"—হেসে বললেন কবি।

"না, তফাত আছে একটু। চোখের ভাবটা তখন বদলে যায়। অন্যরকম হয়।"

"অন্যরকম মানে?"

"মোলায়েম। অনেকটা এইরকম গোছের।"

বৈজ্ঞানিক নিজের চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু ক'রে মোলায়েম দৃষ্টি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কবি হেসে ফেলতেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়লেন একটু।

তারপর বললেন, "দোয়েলদের স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা দেখতে। কিন্তু যেসব পাখির স্ত্রী পুরুষ এক রকম এবং তারা যখন হাজার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে অন্য দেশে চ'লে যায়, তখন পুরুষ-পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের চেনে কি ক'রে? ওই ভাবভঙ্গী দেখে। ইংরেজীতে ওকে বলে 'পশ্চারিং' (Posturing)। ওদের তাড়া ক'রে যাওয়া আর প্রণয় নিবেদন করার ধরনটা প্রায় একই রকমের। স্বজাতের যে কোনও পাখি দেখলেই পুরুষপাখিটা ওই রকম 'পশ্চার' করতে থাকে। অচেনা পাখিটি যদি চুপ ক'রে থাকে কিংবা গুটিসুটি মেরে ব'সে পড়ে, তা হ'লে বোঝা যায় যে, সেটা স্ত্রী-পাখি। কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় কিং বা তেড়ে আসে, তা হ'লে বোঝা যায়, সেটা পুরুষ-পাখি। দোয়েলের বেলায় কিন্তু ঠিক এ কথা খাটে না। কারণ স্ত্রী-দোয়েল দেখতে আলাদা। আমি দেখতে চাইছি, স্ত্রী-দোয়েলকে দেখে ওরা যেমন গান গায়, যেমন ভঙ্গী করে, পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখলেও ঠিক সে রকম করে কি না। একটু আগেই যা দেখলাম—দেখুন দেখুন, দেখলেন? একটা ঘুঘু একটা হাঁড়িচাঁচার পিছনে ছুটছে। দেখেছেন? ওই দিক দিয়ে গেল।"

"দেখেছি। ঘুঘুর এমন মিলিটারি ভাব কেন?"

"হাঁড়িচাঁচা ঘুঘুর ডিম খেয়ে ফেলে যে।"

"বলেন কি! পাখি পাখির ডিম খায়?"

"খায় বইকি। কোনও পাখিই নিরামিষাশী নয়। হাঁড়িচাঁচাগুলো কাকের নিকট-আত্মীয় কিনা, সেজন্যে আরও বেশি আমিষভক্ত।"

"কি বললেন নাম?"

"হাঁড়িচাঁচা, টাকাচোরও বলে কেউ কেউ। ইংরেজী নাম ট্রি পাই (Tree Pie), আর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওর—"

"বৈজ্ঞানিক নামে দরকার নেই। খুব শ্রুতিকটু হবে নিশ্চয়। হাঁড়িচাঁচা নামটাও শ্রুতিকটু। টাকাচোরও সুবিধের নয়। পাখিটা দেখতে কিন্তু বেশ। হিন্দি নাম নেই?"

"আছে। কোত্রি মহোখা।"

"সেদিন যে মহোখা ব'লে একটা পাখি দেখালেন, যার বাংলা নাম 'কুকো'?"

"হ্যাঁ, সেটাকেও মহোখা বলে—Centropus Sinesis।"

'কুকো নামটাও ভাল নয়। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। হাঁড়িচাঁচাকেও নতুন নাম দিতে হবে একটা।"

"চুপ চুপ, আর একটা দোয়েল এসেছে। ওই যে।"

দোয়েলটা গাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কবিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন দুজনে। পাখিটা গেয়েই চলেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, 'চমৎকার। নয়?"

কবি উত্তর দিলেন কবিতায়—

"সুরের আবেগে সুরের মেঘেতে সুরলোকে নাবে সুরের শ্রাবণ,
সুরের ঝর্ণা, সুরের বন্যা, সুরের ফোয়ারা, সুরের প্লাবন।"

রত্নপ্রভা এসে হাজির হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

ধরা-গলায় বললেন, 'সবজিবাগের বাড়িতে ডানা বলে যে মেয়েটি থাকেন, তিনি এসেছেন।"

"তাই নাকি?"

শশব্যস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক উঠে পড়লেন।

কবি কেবল বললেন, "ও!"

তাঁর চোখের দৃষ্টি অবর্ণনীয় হয়ে উঠল।

ডানা যদিও খুব সপ্রতিভভাবে ব'সে ছিল বাইরের ঘরটাতে মনে মনে কিন্তু তার কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কুণ্ঠার কারণ, অন্তরে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তরের ভিখারিণী-ভাবটাকে সে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখবার প্রেরণাতেই এসেছিল সে, কিন্তু কামনা করছিল, আহা যদি অন্যরকম হয়ে যায়! গম্ভীর প্রকৃতির রত্নপ্রভা তার সামনে খাবারের থালা এবং চায়ের পেয়ালা ধ'রে দিয়ে অতিশয় সম্ভ্রমসহকারেই অভ্যর্থনার প্রয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর মনে হচ্ছিল, এই বিপন্না বিদুষী বিদেশিনীকে যতটা আপ্যায়িত করা উচিত, ততটা তিনি ঠিক পারছেন না। কথা তিনি বেশি বলতে পারেন না। যার-তার সামনে মোটা ধরা-গলায় কথা বলতে তাঁর লজ্জাও করে। কালো-কালো মুখখানিতে তাই একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর অক্ষমতাজনিত লজ্জা অভিজাতসুলভ ভদ্রতা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মিশে এমন একটি ভাব হয়েছিল, স্বল্প পরিচয়ে যার মর্মোদ্ভেদ করা শক্ত। কখনও তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করছিলেন, হাসবার চেষ্টা করছিলেন কখনও, ইতস্তত ক'রে দু-চারটি কথা ব'লে সহসা আবার এত বেশি গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন যে ডানা ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যক্তিটি কি রকম। রত্নপ্রভাকে দেখে ডানার প্রথম বাঙালী ব'লেই মনে হয় নি। ভেবেছিল, মাদ্রাজী কিংবা সাঁওতাল আয়া বোধ হয়, বাঙালীর পোশাক প'রে আছে। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। এ রকম বলিষ্ঠগঠন বাঙালী মেয়ে দেখা যায় না বড়। ইনিই অমরেশবাবুর স্ত্রী? রত্নপ্রভাও তন্বী ডানার মার্জিত মুখশ্রীতে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, সপ্রতিভ স্বল্পভাষণে এমন এক মেয়েকে দেখতে পেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। এবং যা তিনি ইতিপূর্বে আর দেখেন নি। ভারি ভাল লেগে গেল মেয়েটিকে। কিন্তু এই ভাল-

লাগাটাকে কিছুতেই তিনি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এই বিদুষীর সঙ্গে ঠিক কি ভাবে আলাপ করলে যে শোভন হবে, সে রকম আলাপ করবার যোগ্যতাও যে তাঁর নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ততটা করা উচিত—এই জাতীয় জটিল মনস্তত্ত্বের জালে জড়িয়ে প'ড়ে তাঁর চোখে মুখে আলাপ জমছিল না কিছুতে।

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বৈজ্ঞানিক ও কবির পদশব্দ বারান্দায় শোনা গেল। বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরও। কবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

"পাখিদের গান নিয়ে আপনারা কবিতা লিখছেন লিখুন, কিন্তু ও নিয়ে বেশ ভাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লেখা যায়। বিদেশী লেখকরা লিখেওছেন। টার্নবুলের Bird Music বইখানা দেখেছেন আপনি? তাতে দেখবেন, পাখির সুরের বিশ্লেষণ করেছেন উনি। পাখিরা কেন গান গায়, সেই গানের মূল উপকরণ, মানে Component Elements কি কি—"

তারপর হঠাৎ ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ও, আপনি এসেছেন! নমস্কার নমস্কার! ভারি আনন্দিত হলাম, বসুন বসুন। আমরা দুজনে দোয়েল দেখছিলাম।"

কবিও সহাস্য দৃষ্টি মেলে চাইলেন ডানার দিকে। তাঁর মনে হ'ল যদিও প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যদি যেত বেশ হ'ত যে দোয়েলের গান আর ওই ডানার রূপ আসলে এক জিনিষ। একটা কান দিয়ে মর্মে পৌঁছোয়, আর একটা চোখ দিয়ে। অমরবাবুকে বললে তিনি বোধ হয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু আসলে কোনও তফাত নেই সত্যি।

ডানা বললে, "আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"কি বলুন তো?"

"আমি ঠিক করেছি, কলকাতা যাব।" ডানা ক্ষণকাল থেমে রইল কি যেন একটু প্রত্যাশা ক'রে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ও, তাই নাকি? বেশ তো।"

ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সর্বস্বান্ত হ'লে মনের যে রকম অবস্থা হয়, কবির মনের অবস্থা সেই রকম হ'ল অনেকটা। খবরটা শুনে বিবর্ণমুখে নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি।

ডানা বললে, "কলকাতায় আমার তেমন চেনাশোনা কেউ নেই তো। আপনার যদি কেউ চেনশোনা থাকে আর তাদের নামে আপনি যদি দু-একটা চিঠি দিয়ে দেন তা হ'লে আমার একটু সুবিধে হয়।"

"বেশ তো, দিয়ে দেব। কলকাতায় আপনি গিয়ে আমার বাড়িতেও উঠতে পারেন। বাড়িটা তো খালি আছে, নয়?"

"না। সেটা কালীবাবুরা নিয়েছেন"—গম্ভীরভাবে বললেন রত্নপ্রভা। তাঁর চোখে হাসির আভা ফুটে উঠল।

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না। আচ্ছা, আমি চিঠি দিয়ে দেব।"

ডানা বললে, "আর একটা কথা। আমি প্রায় দু মাস হ'ল আপনার বাড়িতে আছি। তার ভাড়াটা কত?—চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই।"

"বাড়ি তো আমরা ভাড়া দিই নি"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভাই আবার বললেন, "আপনাকে থাকতে দিয়েছিলাম।"

ডানা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, "আবার অত খরচ ক'রে—"

"আপনি না থাকলেও সারাতে হ'ত। বাড়ি থাকলেই সারাতে হয়।"

কথা কটি ব'লে রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চাইতে গিয়ে দেখলেন, তিনি ওধারে স'রে গিয়ে হেঁট হয়ে শেল্‌ফে বই খুঁজছেন। রত্নপ্রভার বড় বড় চোখ দুটি মধুর রসিকতার রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন কানায় কানায়! কিন্তু একটি কথা বললেন না তিনি। হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু স্বামীর দিকে।

ডানা বললে, "আমার আর কিছু বলবার নেই তা হ'লে। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভদ্রতার মূল্য দিতে যাওয়া বর্বরতা, কিন্তু কি ক'রে যে এর প্রতিদান দেব বুঝতে পারছি না।"

হঠাৎ ডানা থেমে গেল। তার নীচের ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল যেন। কিন্তু তা এত ঈষৎ যে, কারও চোখে পড়ল না।

কবি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। জীবনটা যে স্বপ্ন, যা দেখছি সবই মায়া—এ ধরনের কোনও বৈদান্তিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধ'রে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন না। মর্মান্তিক দুঃখটাকেই তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—

মলয় হাওয়া চলিয়া গেল
আসিল ছুটে আঁধি
তবু যে লাগে ভালো,
তোমারি তরে বিজন ঘরে,
বসিয়া একা কাঁদি
জ্বালি আশার আলো।
কাননে পথে মেতেছে ঝড় কি গরজন তুলি
শিহরি ভাবি বুকেতে যারে ধরিয়াছিল ধুলি
মুছিয়া গেল বুঝি রে সেই চরণরেখাগুলি
ঘনাল ঘন কালো,
তবুও লাগে ভালো!

ডানা থেমে যেতেই তাঁর ঘোরটা কেটে গেল যেন সহসা! ডানার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আপনি স্কুলে যে চাকরি নেবেন কথা হচ্ছিল, তার কি হ'ল?"

"সেটা না নেওয়াই ঠিক করলাম। মাস্টারি তো কখনও করি নি, ও আমি পারব না।"

বিবর্ণমুখে কবি উত্তর দিলেন, "ও। যা বলছেন তা এক হিসেবে অবশ্য ঠিক, কিন্তু আবার আরম্ভ করলে দেখতেন হয়তো অন্যরকম।"

"ও আমার ভালও লাগে না।"

"চলুন, আমরা ভিতরে যাই"—রত্নপ্রভা ডানার দিকে চেয়ে বললেন। তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "আপনাদের আরও চা চাই নিশ্চয়?"

বৈজ্ঞানিক বই খুঁজতে খুঁজতে বললেন, "চা নয়, কফি।"

"আচ্ছা।"

ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রত্নপ্রভা ভিতরে চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক একটা পাতলা গোছের বই শেল্‌ফ্ থেকে বার ক'রে সেটার ধুলো ঝাড়লেন।

"টার্নবুলের বইখানা পেয়েছি। পাখির গান আর ভাষা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন

ভদ্রলোক। পাখিরা কেন গান গায়, তার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর মতে বসন্তঋতুই পাখিদের গান গাইবার একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় দিয়েছেন প্রণয়লীলা—মানে, Nuptial Display।"

তাড়াতাড়ি বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে, তৃতীয় কারণ দিচ্ছেন Rivalary—মানে, প্রতিযোগিতা, Defiance, অর্থাৎ যুদ্ধং দেহি ভাব এবং Assertion of Rights—মানে, নিজের অধিকার জাহির করা। আর চতুর্থ কারণ হচ্ছে, Joy and high spirits—মানে, আনন্দ স্ফূর্তি। আমরা এখনই যে দোয়েলটাকে লক্ষ্য করলাম, এর সবগুলোই তার মধ্যে পাওয়া গেল, কি বলেন? কিন্তু দাঁড়ান।"

আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে।"

"কি?"

"পাখির ডাককে ইনি বারো দফায় ভাগ করেছেন। দেখা যাক, দোয়েলের মধ্যে সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না। Song Proper—মানে, রীতিমত গান, শুনেছি ; Little Song—মানে, ছোটখাট গান, শুনেছি ; Phrases—মানে, এমনই ডাক শুনেছি ; Chirrups, নিজেদের মধ্যে আলাপ, শুনি নি ; Call Notes—আহ্বান, শুনি নি ; Flight Notes—মানে, ওড়বার ডাক শুনি নি ; Alarm Notes—ভয়ের ডাক শুনি নি, Love Notes—প্রণয়সম্ভাষণ, শুনেছি ; Imprecations—অভিশাপ, শুনেছি ; Cradle Notes—বাচ্চাদের সঙ্গে ওরা যে সব কথা বলে, শুনি নি ; Grief Notes—ব্যথা পেলে যে ভাবে ডাকে, বোধহয় শুনি নি। Drumming of woodpecker—এ অবশ্য আলাদা জিনিস।"

কবি যদিও মনমরা হয়ে পড়েছিলেন একটু, তবু জিজ্ঞেস করলেন, "এত রকম ডাক আছে? একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন তো। প্রথমটা কি হ'ল?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রথমটা হ'ল Song Proper—মানে পুরোদস্তুর পাবলিক গান। দোয়েল যে গানটা কোনও উঁচু ডালে ব'সে একটানা গেয়ে যায়, তার ইচ্ছেটা, যেন সবাই এ গান শুনুক। Little Song হচ্ছে ওরই ছোট সংস্করণ। আর Chirrups হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, চড়ুই বা ছাতারে যা ক্রমাগত করছে। দোয়েলের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করি নি কখনও। দোয়েল গম্ভীর পাখি, বাজে বকবক করতে শুনি নি। Phrases—মানে, এমনই একটানা ডাক, কাক যেমন কা-কা করে বা ঘুঘু যেমন একটানা ডেকে যায়, দোয়েলের শিসটা এই ধরনের বলতে পারেন। Call Notes হচ্ছে যখন একটা পাখি আর একটা পাখিতে ডাকে কিংবা একদল পাখি যখন আর একদল পাখিকে ডাকে, তখন সেই ডাককে Call Note বলে। একদল বক বা হাঁস যখন উড়ে যায়, দেখবেন, একটা বা দুটো ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে। দোয়েলের শিসটাকে Call Note ও বলা যেতে পারে। শিস দিয়ে অনেক সময় সঙ্গিনীকে ডাকে ওরা, আলাদা কোনও Call Note শুনেছি ব'লে তো মনে হয় না। Flight Notes হচ্ছে ঠিক ওড়বার সময় অনেক পাখি একটা ডাক দিয়ে তবে ওড়ে। শালিক পিং ক'রে একটা শব্দ করে, কোকিল খুব তাড়াতাড়ি কু-কু-কু-কু ক'রে উড়ে যায়। দোয়েল নিঃশব্দে ওড়ে, ওর Flight Note শুনি নি, Alarm Note ও শুনি নি। ভয় পেলে কিংবা উত্তেজিত হ'লে Alarm Note শোনা যায়। সাপ বা বেড়াল দেখলে শালিকরা যে ভাবে ডাকে, তাই হচ্ছে Alarm Note। Love Notes

মানে ভালবাসার ডাক ; দোয়েলের Love Notes ভারি মিষ্টি। শোনাব একদিন আপনাকে। Imprecation হচ্ছে গালাগালি, ফিঙেদের মুখে প্রায় শুনবেন। দোয়েলরা একটা মৃদু কের্‌র্‌র্ গোছের শব্দ করে। Cradle Notes, শালিক-চড়ুইয়ের শোনা যায়, যখন তারা বাচ্চাদের খাওয়ায়। দোয়েলের শুনি নি, এবার শুনতে হবে, বুঝলেন। আমার গোয়াল আর আস্তাবলের কার্নিসে ওরা বোধহয় বাসা করে, তখন শোনা যাবে। Grief Notes দোয়েলের কখনও শুনি নি, তবে শীতের সময় ওরা যে করুণ ডাক ডাকে, তাকে Grief Notes বলা যায়। সাধারণত কষ্ট পেলেই—"

মুন্সিকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"হুজুর, পাখিগুলো বড্ড বেশি ডাকছে আজ সকাল থেকে।"

"তাই না কি! খেতে দিয়েছিলি তো?"

"হাঁ হুজুর। খাবার তো আজকাল কষ্ট নেই। মল্লিকবাবু আজকাল রোজ অনেক ফড়িং পাঠিয়ে দেন।"

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ পাখিগুলো?"

"সেই রেডস্টার্টগুলো, যাদের নাম দিয়েছেন আপনি ফুলকি। এই সময় ওরা ফিরে যায় কিনা, তাই ছটফট করছে বোধহয়। চলুন দেখি গিয়ে।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কফির সরঞ্জাম নিয়ে একজন চাকর এসে হাজির হল।

"কফিটা খেয়েই যাওয়া যাক তা হ'লে, কি বলেন? মুন্সি, তুই এগো, আমরা আসছি।"

কবির কিছুই ভাল লাগছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি কফির একটা পেয়ালা তুলে নিলেন।

বৈজ্ঞানিক কফি খেতে খেতে আড়চোখে কবির দিকে একবার চেয়ে দুষ্টু ছেলের মত একটু হেসে বললেন, "আজ কিন্তু আবার এমন একটা কাজ করতে হবে, যা হয়তো আপনার মনঃপূত হবে না ঠিক।"

"কি?"

"আরও কয়েকটা রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট্ করতে হবে। দেখতে হবে, ওদের ওভারি (ovary) আর টেস্‌টিস্ (testes) গুলোর অবস্থা কি এখন।"

কবি কফিতে চুমুক লাগিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হ'ল না, রত্নপ্রভা এসে পড়লেন। রত্নপ্রভা এসে এমন একটা কথা বললেন, যা অপ্রত্যাশিত, যা শোনামাত্র কবির অসাড় মন সজাগ হয়ে উঠল নিমেষে।

রত্নপ্রভা বললেন, আচ্ছা, তুমি তো একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছ, তোমার ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে, তোমার প্রবন্ধ টাইপ করবার জন্যে। এঁকেই সেই কাজটা দাও না। উনি বি. এ. পাশ, শর্টহ্যান্ড টাইপ-রাইটিং জানেন। উনি মাস্টারি করতে চান না, এই ধরনের কাজ খুঁজতেই উনি কলকাতা যাচ্ছেন।"

"বেশ তো! উনি যদি থাকতে রাজি হন, আমার কিছু আপত্তি নেই।"

"উনি রাজি আছেন। তবে উনি আলাদা থাকতে চাইছেন, এক বাড়িতে থাকতে একটু ইতস্তত করছেন।"

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটে উঠল।

"যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতে পারেন। আমার কাজের সময় পেলেই হ'ল।"

অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কবি ব'লে উঠলেন, "সে তো চমৎকার হবে!"

"চলুন, রেডস্টার্ট গুলো দেখি গিয়ে, ডাকছে কেন!"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। কবি সোৎসাহে বললেন, "দেখুন, যদিও প্রথম প্রথম আপনার ওই ডিসেক্‌শন ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগত, এখন কিন্তু ভেবে দেখছি, ওরকম খারাপ লাগার কোনও মানে নেই। যা কর্তব্য তা করতে হবে।"

"খারাপ-লাগা ভাল-লাগাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত, এখন কিন্তু বেশ লাগে।"

"ঠিক।"

দুজনে হন হন ক'রে অগ্রসর হতে লাগলেন।

৪

মন্দাকিনী খুব ভোরেই উঠেছেন সেদিন। উঠেই প্রথমে তিনি গেলেন ঘুঁটেগুলো দেখতে। কাল রাত্রে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘুঁটেগুলো ভিজে গোবর হয়ে গেল বোধ হয়। গিয়ে দেখেন, ঘুঁটেগুলো ভিজে তো গেছেই, একপাল গোশালিক এসে তছনছ করছে সেগুলোকে। ঠুকরে মাড়িয়ে চীৎকার চেঁচামেচি ক'রে কি কাণ্ডই যে বাধিয়েছে মুখপোড়ারা। নিরুপায় ক্ষোভে তাঁর চোখে জল এসে গেল যেন। একে আজকাল কয়লা কাঠ কিছুই পাওয়া যায় না, চাকর-বাকর নেই, ঠিকে ঝি এবেলা ওবেলা কোন রকমে বাসনটা মেজে দিয়েই পালায়, নিজের হাতেই কাল ঘুঁটে দিয়েছিলেন! সমস্ত ভিজে গেছে। গোশালিকগুলো নিমগাছটার উপর ব'সে কলরব করছিল, সেদিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলেন তিনি সুন্দরীর গোয়ালে। গোয়ালেও যা দেখলেন, তা আনন্দজনক নয়। গোয়ালের চাল ছাওয়ানো নেই ভাল ক'রে, সুন্দরী সমস্ত রাত ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাছুরটার সারা গায়ে গোবর। সুন্দরীর পিছনের পা দুটোও গোবরে মাখা। সব পরিষ্কার করতে হবে নিজেকে। হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি সঞ্চারিত হ'ল তাঁর ; উৎসাহের উৎসমুখ অবারিত হ'ল সহসা ; নিজের অজ্ঞাতসারেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি! খাদ্য পেলে পুলকিত হয় যেমন ক্ষুধার্ত, কাজ পেলে তেমনই আনন্দিত হন মন্দাকিনী। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তিনি বাছুরটাকে সরিয়ে বাঁধলেন, সুন্দরীকে বাইরে বার ক'রে দিলেন। আমগাছটার দিকে একবার চাইলেন, খুব মুকুল এসেছিল, বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল সব। ক্ষণকাল ধৌত-পরাগ মুকুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, পাপে ভ'রে রয়েছে পৃথিবী, তাই এই সব অনাসৃষ্টি হচ্ছে। গরুর দুধ নেই, খেজুরগুড়ে গন্ধ নেই, অসময়ে বৃষ্টি। সুন্দরীকে বেঁধে গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে। রান্নাঘরের একটু উনুন পরিষ্কার ক'রে নিকিয়ে কাঠের জ্বালে চা করতে হবে। নিজের জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। তারপর রান্নাঘর ধুয়ে, উনুনে ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে চান করতে যাবেন তিনি। ততক্ষণ ঠিকে ঝিটা এসে যাবে, বাজার ক'রে আনবে, তারপর বাসন মাজবে, জল তুলবে, ঘরদোর পরিষ্কার করবে। ততক্ষণ মন্দাকিনীর স্নান সারা হয়ে যাবে, পুজোও সারা হয়ে যাবে। তারপর পাথরের গ্লাশে ক'রে একটি পুরো গ্লাশ চা খাবেন তিনি। চা খেয়ে তারপর বাকি রান্নাটা করবেন। ঝি চ'লে যাবে। আনন্দবাবু তো চা খাবার পরই রোজ বেরিয়ে যান বাইনাকুলার হাতে ক'রে পাখি দেখতে। বারোটার আগে কোনও দিন ফেরেন না। এই সময়টুকুর মধ্যে মন্দাকিনী টুকিটাকি নানা কাজ করেন। সুন্দরীর তদারক করেন, খাবার করেন, বিকেলের জন্য পরোটা তরকারি করতে হয়, মাঝে

মাঝে দু-একটা শৌখিন খাবারও করেন জিনিসপত্র পেলে। কাল গোয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনে ক্ষীর ক'রে রেখেছেন রাত্রে, আজ মালপোয়া করার ইচ্ছে আছে। সোৎসাহে তিনি উনুন পরিষ্কার করতে লাগলেন। পরিষ্কার ক'রে কাঠের ঘরে গেলেন কাঠ আনতে। কাঠের ঘরের চালাটাও শত-ছিদ্র, জল প'ড়ে সব কাঠ ভিজে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে বেছে বেছে কিছু কাঠ নিয়ে এলেন তিনি, পুরনো খবরের কাগজ আর সামান্য কেরোসিন তেল দিয়ে ধরালেন সেগুলো। একটু ধ'রেই নিবে গেল আবার'! বেশি কেরোসিন দিলে ধ'রে যেত। কিন্তু উনুন ধরাবার জন্যে বেশি কেরোসিন আজকাল খরচ করা চলে না। পয়সা ফেললে বাজারে মিলবে না। রাত্রে পড়াশোনা করবার জন্যে ওঁর তেল চাই। শুয়ে শুয়ে না পড়লে ঘুমই হয় না। যত সব বদ অভ্যাস! ঘরে আলো জ্বললে তাঁর তো ঘুমই আসে না। এই দুঃখে ওঁর কাছে শোওয়া ছেড়েই দিয়েছেন তিনি আজকাল। পাশের ঘরে শোন। উনি একা ঘরে পড়েন শুয়ে শুয়ে। কখনও বা উঠে লিখতে ব'সে যান। অদ্ভুত মানুষ! না, কেরোসিন আর খরচ করা চলবে না। হেঁট হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগলেন আর গজগজ ক'রে গাল পাড়তে লাগলেন। আনন্দমোহনকে নয়, নিজের অদৃষ্টকেও নয়, বিধাতাকে। মন্দাকিনীর ধারণা, ওই মুখপোড়াই দুষ্টুমি ক'রে মাঝে মাঝে গোলমাল করে দেয় সব। খোকনের প্রতি তাঁর যে মনোভাব, বিধাতার প্রতিও তেমনই। এও তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস, শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও খোকনকে যেমন শেষকালে হার মানতে হয় তাঁর কাছে, বিধাতাকেও তেমনি হবে। সেই ছেলেবেলায় পুণ্যি-পুকুর থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত তিনি যে পথে নিষ্ঠাভরে চ'লে এসেছেন, সেই পথেই তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। বিধাতার সাধ্য নেই তাঁকে আটকায়। মাঝে মাঝে তিনি দুষ্টুমি করে পথের মাঝখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন—মনের জোর আছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু ওসবে দমবার লোক মন্দাকিনী নন। কিন্তু দুষ্টুমি করার তো একটা সীমা থাকা উচিত, অসময়ে বৃষ্টি ক'রে শুকনো কাঠগুলো ভিজিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের চোখকে ধোঁয়ায় জ্বলিয়ে দেওয়ার মানে হয় কোনও? মন্দাকিনী হেঁট হয়ে হয়ে ক্রমাগত ফুঁ দিতে লাগলেন।

কবি সকালে উঠে মুখ ধুয়েই গিয়েছিলেন ছাতে। মনটা খুব প্রসন্ন ছিল। অকারণ পুলকে ঝলমল করছিল সমস্ত অন্তঃকরণ। মোটা মোটা ঠোঁট দুটোকে কুঁচকে শিস দেবার চেষ্টা করলেন একটু। রাত্রের বৃষ্টিতে সব মলিনতা ধুয়ে গেছে যেন। গাছপালার শ্যামশোভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দোয়েল পাখিটা ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের ডালে ব'সে ডেকে চলেছে অবিরাম। ফিঙে একটা ব'সে আছে টেলিগ্রাফের তারে। নীলকণ্ঠ উড়ে এসে বসল একটা। কালো কালো দুর্গাটুনটুনিরা ডাকছে ক্রমাগত। হঠাৎ চোখে পড়ল, উত্তরদিকে ক্ষান্ত-বর্ষণ একটা মেঘ লম্বিত রয়েছে, তাতে রোদের আভা লেগেছে, মনে হচ্ছে একটা অপরূপ পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ যেন। মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্
দরীগৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তী।

কল্পনায় জেগে উঠল হিমালয়ের গৃহাভ্যন্তরে নগ্না কিন্নরীকুলের লজ্জা-নিবারণের জন্য মেঘ যবনিকার মত ঢেকে সেদিকে গুহামুখ। অদ্ভুত কল্পনা কালিদাসের। স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেদিকে গিটকিরিভরা এক ঝাঁক সুর আছড়ে পড়ল সহসা তাঁর চেতনায়। উজ্জয়িনী থেকে ফিরে আসতে হ'ল, নেমে পড়তে হ'ল হিমালয় থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন সজনে গাছের উপর একঝাঁক পাখি ডাকছে। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন নিজের তেতলার ঘরটিতে। দুরবীনটা নিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের জানলায়

দাঁড়িয়ে। জানলার ভিতর দিয়ে গাছটা স্পষ্ট দেখা যায় আরও। বিস্মিত হয়ে গেলেন দেখে। গোশালিকের ঝাঁক। গোশালিকের এত রূপ! এত সুর তার কণ্ঠে! যে গোশালিকের দল একটু আগে মন্দাকিনীর ক্রোধের কারণ হয়েছিল, তারাই জাগাল কবির মনের কবিতা—

রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা
ও গোশালিক, দেখতে পেলাম
তুচ্ছ তো নও, রূপান্বিতা!
দেখতে পেলাম ভোরের আলোয়
মানিয়েছে বেশ সাদায় কালোয়
ঠোঁটে তোমার রঙ মেহেদি
চোখ মেলে তো দেখিই নি তা।

দোয়েল শ্যামা বুলবুলিরা
সুর-গরবে অহঙ্কারী
শুনুক তারা কণ্ঠে তোমার
উঠছে সুরের কি ঝঙ্কারই।

অতি-চেনার বোরখা প'রে
দাঁড়িয়েছিলে ঘরের দোরে
বেরিয়ে এলে বোরখা খুলে
অর্থটা তার বলবে কি তা?
রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন। ক'রেই বললেন, "তোমার কি ভীমরতি ধরেছে নাকি! রাঁধুনী বামুন রাখতে চাইছ, টাকা কোথায় অত?"

"রাঁধুনী বামুন!"

স্বপ্নলোক থেকে নেবে এলেন কবি এবং নেবে এসেই সচেতন হলেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে।

"একটা মৈথিল বামুন এসেছে। বলছে, তুমি নাকি রূপচাঁদবাবুকে বলেছিলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এই খরচই কুলোতে পারছি না, আবার বামুন কেন?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন কবি।

বললেন, "হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে রূপচাঁদকে। এসেছে বামুন? রাখ না। খেটে খেটে মরবার যোগাড় হয়েছে যে!"

মন্দাকিনী মনে মনে প্রীত হলেন একটু। মুখে কিন্তু বললেন, "খাটলে আবার মানুষে মরে নাকি? কাজকর্ম না থাকলে সমস্ত দিন করবই বা কি?"

"কাজের ভাবনা কি? এস না, দুজনে মিলে পাখি দেখি। কি অদ্ভুত যে—"

"হয়েছে"—হেসে ফেললেন মন্দাকিনী। "নাও, চা-টা খেয়ে নাও, পেয়ালাটা নিয়েই যাই।"

কবি ডিশে ঢেলে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। চলকে খানিকটা চা প'ড়ে গেল কাপড়ে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মন্দাকিনী, "আবার কাপড়ে চা ফেললে তো! সমস্ত কাপড়গুলোতে দাগ হয়ে গেছে। চায়ের দাগ সহজে কি উঠতে চায়?"

কবি হেসে বললেন, "ওঠাবার দরকার কি, থাক্ না।"

"ওসব নোংরামি আমি দেখতে পারি না।"

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। গোশালিকের কলরব আবার উদ্দাম হয়ে উঠল নিমগাছে। কবির চোখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত চা-টা ডিসে ঢেলে এক নিমেষেই পান ক'রে ফেললেন সবটা।

"বামুনটাকে রাখ, বুঝলে? পাখি যদি একবার দেখতে আরম্ভ কর, তা হ'লে বুঝবে, কি চমৎকার জিনিস ও। এই গোশালিকই এতদিন অচেনা ছিল আমার কাছে।"

কবি হঠাৎ একটা প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি তুলে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগল, গোশালিকের মধ্যে তিনি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন রূপ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর প্রৌঢ়া গৃহিণীর মধ্যেও হয়তো তিনি আজ তেমনই আবিষ্কার ক'রে ফেলবেন সঙ্গিনীকে, যে শুধু তাঁর সন্তানের জননী নয়, সংসারের কর্ত্রী নয়, যে তাঁর কবি-মানসের বিবিধ বিচিত্র খেয়ালের সহচরী। মন্দাকিনীর উত্তর শুনে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হতে হ'ল তাঁকে।

"ঝাঁটা মারি আমি গোশালিকের মুখে। সমস্ত ঘুঁটেগুলোকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে, নখ দিয়ে খুঁড়ে তছনছ করেছে একেবারে।"

"ও বেচারাদের চ'রে খেতে হবে তো! ওদের তো আর পেনশন নেই আমার মত।"

এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করলেন না মন্দাকিনী। ঘরের কোণে যে ফুল-ঝাড়ুটা রাখা ছিল, সেটা নিয়ে তিনি কবির বই-রাখা শেল্‌ফগুলো ঝাড়তে লাগলেন। প্রচুর ধুলো জমেছিল। কবি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভ'রে উঠল সহসা। বারো বছর বয়সের যে কিশোরীটিকে বিয়ে ক'রে এনেছিলেন তিনি বহুকাল পূর্বে, তাকে যেন তিনি দেখতে পেলেন হঠাৎ। সেই থেকে ক্রমাগত সেবা ক'রে চলেছে। কিছুতেই থামবে না। মন্দাকিনীর মত স্ত্রী না পেলে কি তাঁর মত মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হ'ত? সংসারের কোন আঁচটি তাঁর গায়ে লাগতে দেয়নি। তখনই কিন্তু মনে হ'ল, তা দেয় নি বটে, কিন্তু মন্দাকিনী তাঁর জীবনে ঠিক সেই প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছে কি, যার জন্যে তাঁর কবি-চিত্ত সতত উন্মুখ হয়ে আছে? এমন একটি মহিমাময় মুহূর্ত মন্দাকিনী তাঁর জীবনে মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছে কি, যার জন্যে সমস্ত সুখ-সুবিধা তুচ্ছ ক'রে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও লোকে ইতস্তত করে না? তিনি কবি, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তিনি, তাঁর সমিধ-সম্ভারে একটি স্ফুলিঙ্গও দিতে পেরেছে মন্দাকিনী কোনও দিন? সে আগুনের জন্যে বারে বারে তাঁকে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। ডানার মুখখানা মনে পড়ল। এমন অদ্ভুত একটা বহ্নি আছে মেয়েটির মধ্যে, যার সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত মন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। না, ঠিক যৌন-লালসা নয় এটা—বৈজ্ঞানিকেরা যা-ই বলুন, আকর্ষণ মাত্রেই যৌন-আকর্ষণ নয়। লোহার সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্কটা কি যৌন? এক একটা বিশেষ লোককে দেখলেই মনে হয়, এই তো সে, যাকে খুঁজছিলাম একদিন—তা সে নারী পুরুষ যে-ই হোক। তার কাছে গেলেই মনে ছবি জাগতে থাকে উদার আকাশের, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের, দুরারোহ পর্বতের, সীমাহীন সমুদ্রের। অপূর্ব পুলকে সমস্ত চিত্ত ভ'রে ওঠে, অদ্ভুত উৎসাহ সঞ্চারিত হয় অঙ্গ

-প্রত্যঙ্গে, কোনও কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় না, মনে হয়, সব পারব, মন ডানা মেলে উড়তে চায়। মন্দাকিনী ঠিক এ জাতের নয়। মন্দাকিনী বিচক্ষণ সচিব, অভিজ্ঞ গৃহিণী। কিন্তু প্রিয়সখী নয়, ললিতকলাবিধির কোনও ধার ধারে না ও।

আশ্চর্য, ধুলো ঝাড়তে মন্দাকিনীও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। নিজের চরিত্রে বা আচরণে যদিও কোনো দোষ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না, কবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধেও হঠাৎ তিনি যে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাও নয়, তবু কেমন যে আবছাভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল, এ লোকটির ঠিক সঙ্গিনী তিনি হতে পারেন নি। মনে হওয়ামাত্রই রাগ হ'ল তাঁর, নিজের উপর নয়—কবির উপর। বুড়ো বয়সে ওই সব ছেলেমানুষি মানায় নাকি! সঙ্গে ক'রে তীর্থে নিয়ে যেতে চাও রাজি আছি, পাখি দেখে বেড়াবার বয়স আছে কি আর এখন? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন একবার। কবি জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। আশ্চর্য মানুষ! হেঁট হয়ে শেল্‌ফের তলার ধুলোগুলো পরিষ্কার ক'রে নিলেন। একটা কাগজে সেগুলো নিপুণভাবে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কবি নিস্পন্দ হয়ে, চোখে দূরবীন।

"কি দেখছ অত তুমি?"

কবি চমকিত হলেন। তারপর হেসে বললেন, "একটা ফিঙে। ফিঙে দেখেছ ভাল ক'রে কখনও? ওয়াণ্ডারফুল!"

"টেলিগ্রাফ পোস্টের ওপর কি চমৎকার ব'সে আছে তখন থেকে! কুচকুচে কালো, গা থেকে রোদ পিছলে পড়ছে যেন। সূর্য যেন শত ধারায় সোনা ঢালছে ওর গায়ে, আরও যেন ঘাড় বেঁকিয়ে বলছে, চাই না তোমার সোনা, নিয়ে যাও, নিছক কালোই ভাল আমার, অলঙ্কার দরকার নেই, থ্যাঙ্কস্!"

হেসে ফেললেন মন্দাকিনী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তরও স্নেহে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন। চুলে পাক ধরলে কি হবে, লোক নিতান্ত ছেলেমানুষ এখনও। ছি ছি, এ রকম লোককে নিয়ে কি সংসার করা চলে?

"দেখবে?"

"ওসব ছেলেমানুষি করবার সময় নেই আমার এখন।"

মুখে যদিও একথা বললেন, কিন্তু মনে মনে দেখবার লোভ যে একটু ছিলনা তা নয়।

"একটুখানি দেখ না।"

খুব অনিচ্ছাসহকারে যেন কবিকে বাধিত করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন মন্দাকিনী। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখলেন ফিঙেটাকে। বাঃ, বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে ছুটলেন দ্বারের দিকে—"ওই যাঃ, ডালটা পুড়ল বোধ হয়, গন্ধ ছাড়ছে, কি যে ছেলেমানুষি কর তুমি!" পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে গেলেন। কবি দেখতে লাগলেন ফিঙেটাকে আবার। একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কাল ভোরে অদ্ভুত রকম মিষ্টি সুরে একটা পাখি ডাকছিল। উঠে টর্চ ফেলে দেখেছিলেন, অভিনব কোন পাখি নয়, ফিঙে। পাশে সঙ্গিনীটিও ব'সে আছে বলে মনে হ'ল। কি রে মেকি কি মে কি কি মে কি কি— ক্রমাগত ডেকে চলছে। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পূর্বাকাশে। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, যা-কিছু মেকি তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ও যেন। সূর্যের সোনা ও চায় না, ফরসা হবার কোনও লোভ নেই ওর। আফ্রিকার জুলুর মত, ভারতবর্ষের কালাআদমির মত কৃষ্ণবর্ণের গৌরবেই ও গৌরবান্বিত, আর সেটাকে প্রচারও

করতে চায় স্পষ্টভাবে। শ্বেতাঙ্গদের বহু শতাব্দীর অত্যাচারের আগুন ওর বুকের ভিতর জ্বলছে। ভোরবেলায় প্রিয়াকে সম্বোধন করবার বেলাতেও তাই বোধ হয় ওর মনে হয়, এও মেকি নয় তো? সুরে সুরে বার বার প্রশ্ন করছে তাই কি রে, মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি?

ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
চেনে নি তোমায় আজও যাহারা
কোন দেশে বাস করে তাহারা
উদ্যত ওগো কালো পতাকা
সদা-জাগ্রত কড়া পাহারা
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কখনও বসিয়া আছ সু উচ্চ টেলিগ্রাফ পোস্টে
গরু ছাগলের পিঠে কখনও বা ভ্রমিতেছ গোষ্ঠে
ফিং দিয়ে ছুটে যাও কখনও বা পতঙ্গ লক্ষ্যি'!
ওগো ফিঙে পক্ষী,
খাইয়া তোমার তাড়া
কাক চিল পাড়াছাড়া
নিমেষে
ঠোকর খাইয়া মরে যদি হয় এতটুকু টিমে সে।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

বুকে যে আগুন জ্বলে সারা গায়ে তারই কালো ঝুল কি?
জ্বলজ্বলে লাল চোখে দেখা যায় বুঝি তারই ফুলকি,
তাই বুঝি চোখে মুখে ফুটে আছে 'আয় দেখি' ভঙ্গী
ওগো ফিঙে জঙ্গী,
পুচ্ছেতে এক জোড়া
বাঁকা বাঁকা কালো ছোরা
শাণিত
জবাব তখুনি দেবে যদি কেউ করে অপমানিত।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
আঁধার রজনী-শেষে আলোর আভাস যবে ঝলকে
প্রেয়সীর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের সুর তোলে বল কে
মেকি কি মেকি কি তুমি বল বল জীবনের সঙ্গী—
ওগো ফিঙে রঙ্গী
তখন যে গাও গান
ওঠে রসিকের প্রাণ
মাতিয়া —
রাগে আর অনুরাগে প্রেয়সীও ওঠে বুঝি তাতিয়া
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কবিতাটা লিখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিক্ষণ। জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরে। হঠাৎ মনে হ'ল, বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি উৎসবে মেতেছে, কর্ণিকার ফুলের কি অদ্ভুত স্বর্ণকান্তি,অশোক-গুচ্ছের কি রূপ!

কু-কুক্-কুক্-কুক্—

কলকণ্ঠে সাড়া দিয়ে উড়ে গেল একটা স্ত্রী-কোকিল। সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল ক'রে উঠল তার জংলা শাড়িখানা।

মন্দাকিনী এক কাপ দুধ হাতে ক'রে প্রবেশ করলেন।

"বুঝলে, সুন্দরীর দুধ আজকাল এত ঘন হয়েছে যে, চড়িয়ে উনুন-গোড়া থেকে নড়বার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে তলা ধ'রে যাবে।"

"ডালটা পুড়ে গেল?"

"না। খুব বেঁচে গেছে।"

মন্দাকিনীর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

কবি দুধের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "বামুনটা রাখ, কত আর খাটবে?"

"তুমি বোঝনা, রাখব কি ক'রে, মাইনে দিতে হবে তো একটি কাঁড়ি?"

'কিছু টাকার যোগাড় হয়েছে।"

"কোথা থেকে?"

"আমি রঘুবংশ আর কুমারসম্ভবের যে নোট লিখেছিলাম, গেল বছর, সে দুটো একজন ছাপাতে চায়, মাসে আমাকে আশি টাকা ক'রে দেবে বলছে।"

খুব খুশি হলেন মন্দাকিনী ও সংবাদে।

"তবে রাখ। মাইনে ঠিক করেছ কিছু?"

"না। তুমিই যা হয় কর না গিয়ে।"

সানন্দে মন্দাকিনী নীচে নেমে গেলেন।

কবিও বাইনাকুলার নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অমরবাবুর চাকর মুঙ্গি এসে গোটা দুই বই দিলে তাঁর হাতে। অমরবাবু একটা ছোট চিঠিও লিখেছেন—এই বই দুটো উলটে পালটে দেখবেন। সাধারণ পাখিদের অনেক খবর আছে এতে। আমাদের বাড়ির সামনে 'চোখ গেল' খুব ডাকছে। পাখিটাকে দেখতে পাই নি এখনও। একটু খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে চান তো আসুন।

কবি বই দুটো টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

৫

রূপচাঁদ মৌলিক আপিসে বেরিয়ে গেছেন। বকুলবালা নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে আছেন তাঁর নতুন খেলনাটি নিয়ে। কাল রূপচাঁদ হলদে পাখিটি এনে দিয়েছেন তাঁকে। আনন্দবাবু যে কবিতাটা লিখে দিয়েছেন সেটা বড় বড় ক'রে লিখে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদ একটা কাগজে। কিন্তু কবিতাটা বড়—অত বড় কাগজ খাঁচায় ঠিক সাঁটা যাচ্ছে না। বকুলবালা শেষে ঠিক করলেন, কাগজটা দেওয়ালে ছবির মত ক'রে টাঙিয়ে দেবেন। টাঙিয়ে তার পাশে খাঁচাটা টাঙিয়ে দেবেন। অনেক খুঁজে খুঁজে পেরেক বার করলেন চারটে। তারপর রান্নাঘর থেকে নোড়া নিয়ে এলেন। নোড়া দিয়ে পেরেক ঠুকতে গিয়ে আঙুলে লাগল দু-একবার। কিন্তু বকুলবালার তাতে গ্রাহ্য নেই। অনেক কষ্টে হেঁট হয়ে হয়ে চারটে পেরেকই ঠুকে

ফেললেন তিনি। কিন্তু ঘরের দেওয়াল পাকা! ভাল ক'রে ঠোকা গেল না, ঠোকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পেরেক প'ড়ে গেল, কবিতার কাগজটা বেঁকে গেল। রাগ চ'ড়ে উঠল বকুলবালার। খানিকটা ময়দা বার ক'রে গুললেন প্রকাণ্ড এক অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে, তারপর ঘুঁটে জ্বেলে উনুনটা ধরিয়ে ফেললেন। ধোঁয়ার চোখ লাল হয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু এসবে নিরস্ত হবার পাত্রী বকুলবালা নন। একবার যখন ঝোঁক উঠেছে কাগজটাকে সাঁটতে হবে, তখন না সেঁটে কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। আঠা হয়ে গেল। কিন্তু ভয়ানক গরম। বাটিটাকে সাঁড়াশি দিয়ে এক চৌবাচ্চা জলের উপর ধ'রে রইলেন। সমস্ত চৌবাচ্চার জলটা যে কালো ভুসোতে ভ'রে গেল সেদিকে খেয়াল নেই। একটু ঠাণ্ডা হতেই তুলে নিয়ে এলেন সেটাকে, হাত দিয়ে দেখলেন, বাটিটা ঠাণ্ডা হয়েছে বটে কিন্তু আঠা এখনও বেশ গরম। কতক্ষণ চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখবেন তিনি? উঠে গিয়ে মশারির চাল থেকে পাখাটা নিয়ে এলেন—পাখার বাঁট দিয়ে আঠা মাখাতে লাগলেন কাগজটায়। খুব বেশি ক'রে ক'রে লাগিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দিলেন কাগজটা তারপর একটু দূরে স'রে গিয়ে দেখলেন। বাঃ চমৎকার হয়েছে, আনন্দে হাততালি দিয়ে আপনার মনেই নেচে উঠলেন একবার। কিন্তু ওখানে খাঁচাটাকে টাঙাবেন কি ক'রে? ওখানে খাঁচা টাঙানো যাবে না। কি করা যায়? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর এক ছুটে ঘরের মধ্যে চ'লে গেলেন। ঘরের ভিতর রূপচাঁদের রিভলভিং বুক-শেল্ফ্ ছিল একটা। বেশ উঁচু। সমস্ত বইগুলো বার ক'রে স্তূপীকৃত করলেন মেঝের উপর। তারপর হিড় হিড় ক'রে বুক-শেল্ফটাকে টেনে নিয়ে গেলেন বাইরে, দেওয়ালে যেখানটায় কবিতা লেখা কাগজটা সাঁটা ছিল সেইখানে। উঃ, ভারী কি কম! জগদ্দল পাথর যেন একটা! হাঁপাতে লাগলেন। বিরক্তি ফুটে উঠল সারা মুখে। কিন্তু খাঁচাটা তার উপর রাখতেই আনন্দে হেসে উঠল আবার চোখ দুটি। কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে! বা! রিভল্ভিং শেল্ফটা ঘোরালে কিন্তু ভয় পাচ্ছে পাখিটা।

"ভয় লাগছে বুঝি? আচ্ছা, আর ঘোরাব না।"

"খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে সান্ত্বনা দিলেন তাকে বকুলবালা।"

"কই, কথা বল একটা, শুনি!"

পাখির কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

"কথা বলবে না?"

তবু কোন উচ্চবাচ্য করে না বেনে-বউ।

"ও বাবা, রাঙামুলো নাকি তুমি?"

পাখি নীরব।

"ভাব করবে না আমার সঙ্গে?"

বেনে-বউ ভাব করবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করলে না।

"এমনই গোমড়া মুখ ক'রে ব'সে থাকবে নাকি রাতদিন? তবেই তো হয়েছে! আমার মদনলাল খুব লক্ষ্মী—মদনলাল, তোমার কথা শুনিয়ে দাও তো ওকে।'

বারান্দার কোণে লোহার খাঁচায় মদনলাল ব'সে ছিল লোম ফুলিয়ে চোখ বুজে। প্রবীণ একটি চন্দনা। ডাক শুনে চোখ খুললে।

"কথা শুনিয়ে দাও ওকে। বল—"

মদনলাল চোখ মিটমিট করতে লাগল, তারপর ব'লে উঠল হঠাৎ, "শিউজি, গোটি পী যাও, গোটি পী যাও, শিউজি, গোটি পী যাও।"

পশ্চিমের একজন কনস্টেবল চন্দনাটিকে এই বুলি শিখিয়েছিল।

"শুনলে তো? তুমিও কথা বল একটি, শুনি।"

বেনে-বউ গম্ভীর হয়ে রইল, একটি কথা বললে না।

"খিদে পেয়েছে নাকি? খাবে? দিচ্ছি, দাঁড়াও, ভাল পেঁপে আছে। পেঁপে খেয়ে কথা বলতে হবে কিন্তু।"

একটা পেঁপে বার ক'রে কাটতে ব'সে গেলেন বকুলবালা।

পেঁপে কাটতে দেখে তাঁর সব পাখিগুলোই চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়ের উপর দুলতে লাগল টিয়াটা। ময়নাটা ব'লে উঠল, 'ওগো শুনছ!' বুলবুলির কণ্ঠে ফুটে উঠল কুটুর কুটুর আওয়াজ। শ্যামা শিস দিয়ে উঠল। 'শিউজি, গোটি পী যাও'—মদনলাল নিজের কৃতিত্ব জাহির করলে আবার। তাদের দিকে একটা রোষদৃষ্টি হেনে বকুলবালা বললেন, "এখুনি তো খেয়েছ সব, আগে ওকে দিই, তারপর তোমাদের দিচ্ছি।"

পেঁপে পেয়ে বেনে-বউ কিন্তু উল্লসিত হ'ল না তেমন। একবার ঠুকরে দেখলে, তারপর ব'সে রইল চুপ ক'রে। বকুলবালা তাঁর প্রত্যেক পাখিকে এক টুকরো ক'রে দিয়ে আবার এসে দাঁড়ালেন বেনে-বউয়ের খাঁচার সামনে।

"কই, খাচ্ছ না যে তুমি? পেঁপে ভাল লাগে না বুঝি? আমার মতন অবস্থা বুঝি তোমার? আমারও ভাল লাগে না পেঁপে। লজেন্স খাবে? চকোলেট?

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে লজেন্স আর চকোলেট নিয়ে এলেন।

"এই নাও।"

একটা লজেন্স আর একটা চকোলেট খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলেন। বেনে-বউ নির্বিকার।

'এও খাবে না? ও বাবা! বুঝেছি, আসলে তোমার দুষ্টুমি। কিছু শুনছি না আর। কথা বল এবার। বল না একটা কথা। বল, লক্ষ্মীটি।"

বহুবার অনুরোধ ক'রেও বেনে-বউয়ের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পেলেন না বকুলবালা। হঠাৎ রাগ হ'ল।

"তবে রে মুখপোড়া, আমাকে চিনিস না?"

পাখাটা তুলে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন খাঁচার উপর। পাখিটা ত্রস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু একটি শব্দ করলে না। পাখাটা ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পাখিটার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ বকুলবালা। তারপর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল হঠাৎ আবার। অমন সুন্দর পাখিটাকে কি বেশি নির্যাতন করা যায়? কিন্তু কি মুশকিল, কথা যদি না বলে, তা হ'লে ও পাখি নিয়ে কি হবে। পাখিটা বোবা নয় তো? মানুষের মধ্যে যেমন বোবা আছে, পাখিদের মধ্যেও হয়তো থাকে। হয়তো পাখিওলা ঠকিয়ে একটা বোবা পাখি বিক্রি ক'রে গেছে। আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন পাখিটার দিকে। কি চমৎকার গায়ের রঙ! হঠাৎ হিংসে হ'ল। বলে উঠলেন, "আমার হলদে রঙের শাড়ি আছে, দামী রেশমী শাড়ি, তোর মত আমিও সাজতে পারি, দেখবি?" তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন বকুলবালা এবং হলদে শাড়িখানা বার ক'রে সত্যি সত্যি সাজতে ব'সে গেলেন। শাড়ি প'রে মাথার চুল আঁচড়ে এমনভাবে ফিতে দিয়ে বাঁধলেন যে, খানিকটা চুল গলায় এবং পিঠের উপর পড়ল গিয়ে। বেনে-বউয়ের মাথা আর গলার কাছটা যেমন কালো, অনেকটা তেমনই দেখাতে লাগল। তারপর ঠোঁটে রঙ দিলেন বেশ ভাল ক'রে। টুকটুকে হ'ল ঠোঁট দুটি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর রূপচাঁদের কালো মাফলারটা বার ক'রে

সেটা কোমরে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন দু'পাশ দিয়ে, তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে চৌকিটার উপর উপুড় হয়ে পাখির মত ব'সে বেনে-বউকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "এই দেখ, তোমার চেয়ে কিছু কি খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে? এস, এইবার ভাব কর আমার সঙ্গে। কথা বল একটি।"

বেনে-বউ তবু কথা বলে না।

এইবার কবিতাটার দিকে নজর পড়ল বকুলবালার। তাঁর মনে হ'ল, ওর সম্বন্ধে যে কবিতাটা লেখা হয়েছে, সেটা তো শোনানো হয় নি ওকে! তাই অভিমান ক'রে ব'সে আছে নাকি? কিন্তু কবিতা কি ক'রে প'ড়ে শোনাবেন এখন? তিনি তো পড়তে জানেন না! হঠাৎ একটা গভীর বেদনায় টনটন ক'রে উঠল সমস্ত মনটা। কবিতাটা রূপচাঁদ প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁকে—মনে করবার চেষ্টা করলেন লাইনগুলো। 'কও না কথা হলদে পাখি'—এই লাইনটা মনে পড়ল শুধু। আর কিছু মনে পড়ল না। কেমন একটা অস্বস্তি লাগল, উঠে পড়লেন তিনি। মনের ভিতর কি যে হচ্ছে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। নির্মল নীল আকাশ। রাস্তার ওধারে বটগাছটার পাতা ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে, শিশুগাছটা ভ'রে উঠেছে কচি কচি শ্যাম কিশলয়ে, উঠোনের আমগাছটায় অজস্র মুকুল ধরেছে, যেন পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে কারা—মুখ দেখা যাচ্ছে না, সোনালি চুলগুলো দেখা যাচ্ছে শুধু। মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, বোলতা উড়ছে, চিল উড়ছে উঁচুতে,....সবাই উড়ছে। বসন্তের হাওয়া বইছে। বকুলবালার সমস্ত অন্তঃকরণ ছটফট করতে লাগল একটা কারাগারের মধ্যে। কবিতাটা পড়তে না-পারার বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, হয়তো ছুটে বেরিয়ে পড়তেন বাইরে। গাড়ি ডাকিয়ে চ'লে যেতেন রূপচাঁদের আপিসে তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না—চণ্ডী এসে পড়ল। স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে চণ্ডী। পাখিওয়ালার কাছ থেকে পরশু সে শুনেছে যে, হলদে পাখিটা রূপচাঁদবাবু কিনেছেন। পাখিওলা যখন রাস্তা দিয়ে যেত, প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে অনেকদিন দেখেছে সে এই হলদে পাখিটাকে।

"মাসীমা, আপনারা আর একটা পাখি কিনেছেন নাকি?"

"কে, চণ্ডী এসেছিস? ভালই হয়েছে!"

বকুলবালার বেশ দেখে চণ্ডী বললে, "আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?"

"না। এমনই পরেছি! পোড়ারমুখো পাখিকে দেখাচ্ছিলাম যে, হলদে শাড়ি আমারও আছে।"

"সুন্দর পাখিটা, নয়?"—চণ্ডী সাগ্রহে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"একটি কথা কইছে না কিন্তু। কবিতাটা পড়্‌তো।"

"কোন্ কবিতা?"

"ওই যে দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ওর বিষয়েই কবিতা, আনন্দবাবু লিখে দিয়েছেন।"

"ও।"

চণ্ডী সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল কবিতাটা।

"চেঁচিয়ে পড়্‌না!"

চণ্ডী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লে লাগল। তার সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে যেতে লাগলেন বকুলবালা।

কও না কথা কও না কথা
কও না কথা হলদে পাখি
সোনার বরণ সুরের সাকী
চলবে না তো আর চালাকি
ধরা যখন প'ড়েই গেছ
নামটি তোমার বলবে না কি
কও না কথা হলদে পাখি।

যে কথাটি ঢাকছ্ কেবল
নানান ছলে নানান সুরে
সেই কথাটি শুনতে যে চাই
আজকে তোমায় খাঁচায় পুরে।

রঙটি গায়ে কলকে ফুলের
কুচকুচে রঙ মাথার চুলের
মনের কথাও রূপকথা কি?
চুপটি ক'রে ছলবে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

সর্ষে ফুলের স্বপ্ন ওগো
পদ্মফুলের বুকের রতন
সোনার কাঠির পরশ পেয়ে
রঙ হ'ল কি সোনার মতন।

তোমার তরেই চাঁদ সদাগর
পার হ'ল কি সাতটা সাগর
বিশ্ব উজল যে দীপ-শিখায়
তুমিই কি তার সলতে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি!

দুজনে মিলে বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন কবিতাটা। আম্রমুকুলগন্ধ-মদির বসন্ত-দ্বিপ্রহর ছন্দভরে কাঁপতে লাগল যেন।

"ট্যিউ।"

হঠাৎ মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল বেনে-বউ।

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন বকুলবালা।

ঘর্মাক্ত কলেবরে রূপচাঁদ যখন আপিস থেকে ফিরছিলেন, তখনও বেশ বেলা রয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে একটি পুঁটলি। পুলিস সাব-ইনস্পেক্টার রহমান মিঞা একটি দুর্লভ জিনিস উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। কেপন—খাসি মুরগি। আপিসেরই চাপরাসীকে দিয়ে মুরগিটি

জবাই করিয়ে কুটিয়ে মাংসের টুকরোগুলি নিপুণভাবে কাগজে মুড়ে রুমালে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল, নিজেই রাঁধবেন। বাজার থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মসলাও কিনে এনেছিলেন। বাড়িতে ঢুকতেই বকুলবালা ছুটে এলেন। তখনও তাঁর পরনে সেই হলদে কাপড়। ঠোঁটের লাল রঙ ঠোঁটেই নিবদ্ধ নেই, গালে এবং চিবুকেও লেগেছে। পরিবারের অসাধারণ প্রসাধন দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। বরং চোখমুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন, যার অর্থ—কি অদ্ভুত রূপসী তুমি, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়! বকুলবালা কিন্তু এসব সূক্ষ্ম ভাবের ধার দিয়েও গেলেন না। অন্য জগতেই ছিলেন তখন। রূপচাঁদকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"কি শয়তান তোমার ওই বেনে-বউ! উঃ, কম জ্বালানটা জ্বালিয়েছে আমায় সমস্ত দিন!"

"কেন, কি হ'ল?"

"প্রথমে তো মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইল। একটি কথা কইবে না, কত সাধ্য-সাধনা—কিছুতে না।"

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত বই মেঝের উপর স্তূপীকৃত।

"এ কি করেছ?"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন বকুলবালা, তারপর রূপচাঁদের হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে বললেন, "বাইরে দেখবে চল না, কি করেছি! কম খোশামোদ করেছি তোমার পাখির?"

রূপচাঁদের সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু হেসে বললেন, "এইটে রাখি দাঁড়াও আগে।"

"কি ওতে?"

"মাংস।"

পুঁটলিটা কোণে রেখে দিয়ে বকুলবালার সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে রূপচাঁদ দেখলেন, তাঁর বুকশেল্‌ফের উপর পাখির খাঁচা রাখা হয়েছে। দেওয়ালে কবিতা সাঁটা রয়েছে তাও দেখলেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা করছ তো! আমার মাথায় এত আসত না। সুন্দর হয়েছে।"

"তবু কি মন পেয়েছি তোমার পাখির! ওর মন ভোলাবার জন্যেই শেষে এই শাড়িটা পরলাম, তবু না। শেষকালে চণ্ডী এল, দুজনে মিলে ওই কবিতাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লাম, তবে বাবুর মুখে কথা ফুটল, তাও একটি বার।"

চণ্ডীর আগমনবার্তায় মনে মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হলেন পুলিস কর্মচারী রূপচাঁদ। বাইরের কোনও লোক বাড়িতে আসে, এ তিনি পছন্দ করেন না।

"চণ্ডী এসেছিল নাকি? বেশি আমল দিও না ওকে।"

"কেন?"

"ছোঁড়াটা চোর শুনেছি।"

অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাটা বললেন রূপচাঁদ।

"তাই নাকি?"

বকুলবালা চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইলেন।

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হবার জন্যে রূপচাঁদ বললেন, "তোলা-উনুনটাতে আঁচ দাও। আমিই মাংস রাঁধব আজ।"

"তোলা-উনুনে কেন?"

"মুরগির মাংস যে।"

"ও!"

বকুলবালা মুরগির মাংস খান, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেন না।

বকুলবালা তোলা-উনুনটা বার করলেন কোণ থেকে।

"উঃ, এর মধ্যেই কি রকম গরম প'ড়ে গেছে দেখেছ? পাখাটা এখানে পড়ে কেন?"

পাখাটা তুলে হাওয়া করতে যেতে ময়দার আঠা লেগে গেল হাতময়।

"এ কি, এতে লেগে আছে কি।"

"ও! আঠা লাগিয়েছিলাম ওটা দিয়ে। কবিতাটা দেওয়ালে লাগাবার জন্যে আঠা করেছিলাম যে। তোমার পাখির জন্যে কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আজ!"

ক্রোধে কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল রূপচাঁদের। মুখে কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে বললেন, "করতেও পার এত!"

উত্তরে বকুলবালাও হাসলেন। রূপচাঁদ ঘরে ঢুকে জামা জতো ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আবার। বকুলবালা তোলা-উনুনে ঘুঁটে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল তাঁর।

"কম দুষ্টু তোমার বেনে-বউ। কবিতা শোনবার পর 'টিউ' ক'রে ছোট্ট একটি শব্দ করেছিল খালি। তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, না রাম না গঙ্গা, কিছু বললে না। এই একটু আগে পরোটা বেলছি, হঠাৎ ব'লে উঠল, 'ওকি ওকি ও'! কি দুষ্টু বল তো—তার মানে, পেঁপে খেয়েছি, ছাতু খেয়েছি, পরোটাও চাই একটু। পরোটা দিলাম, খেলে না, ও মন পাওয়া ভার।"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

একটু মুচকি হেসে সংযতবাণী রূপচাঁদ বললেন, "আস্তে আস্তে ভাল হবে। তোমার মন পেতে আমাকেও কম বেগ পেতে হয় নি।"

"আহা!"

কোপকটাক্ষে স্বামীর দিকে একবার চেয়ে ঘুঁটেয় কেরোসিন ঢালতে লাগলেন বকুলবালা। মাথায় জবাকুসুম মেখে চৌবাচ্চার দিকে অগ্রসর হলেন রূপচাঁদ। স্নান ক'রে চা জলখাবার খেয়ে মাংস রাঁধতে বসবেন।

"এ কি, চৌবাচ্চার জলে কালো কালো এসব ভাসছে কি?"

"কই? ও, অ্যালুমিনিয়ামের গরম বাটিটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে চৌবাচ্চায় বসিয়েছিলাম। দাঁড়াও, ঠিক ক'রে দিই।"

তাড়াতাড়ি এসে বকুলবালা হাত দিয়ে ভাসমান ভুসোগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত জলটাই ঘুলিয়ে উঠল তাতে। রূপচাঁদের মনে ক্রোধাগ্নি দাউদাউ ক'রে জ্বলছিল।

কিন্তু খুব শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "থাক্, আমি জল তুলেই স্নান করছি।"

কেবল ব্রহ্মচারীর নয়, চার্বাকপন্থীরও সংযম দরকার সিদ্ধিলাভের জন্য।

স্বহস্তে ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান সেরে যখন ফিরে এলেন, তখন ঘুঁটের ধোঁয়ায় চারিদিক ভ'রে গেছে, তার মধ্যে দগদগে হলদে কাপড়-পরা বকুলবালা ব'সে চা ছাঁকছেন। রূপচাঁদের মনে হঠাৎ একটা গানের একটা লাইন ভেসে এল, 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে'। যে

স্বর্গলোকে সে ডানা মেলে উড়তে চায়, সেখানে পৌঁছতে হ'লে অনেক নালা নর্দমা আঁস্তাকুড় পার হতে হবে, দ'মে গেলে চলবে না।

"দেখ, মাংসটা আজ ভাল ক'রে রাঁধব। অমরেশকে দিয়ে আসব একটু। সে আমার হাতের রান্না খেতে চেয়েছে। ঘি আছে তো?"

"আছে। মসলা কি কি চাই?"

"বলছি।"

টিফিন-কেরিয়ারটি হাত ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রূপচাঁদ যখন বেরুলেন, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে। পূর্ববন্দোবস্তমত কনস্টেব্‌ল্ রামখেলাওন মিশির এসে বারান্দায় শুয়েছে বকুলবালার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বলেছেন যে, অমরেশবাবুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরে আসতে রাত হবে তাঁর।

অন্ধকার গলি জনবিরল হয়ে এসেছে। রূপচাঁদের পায়ে কেড্‌স্। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। মনের মধ্যে অদ্ভুত ভাব জাগছে একটা। দুঃসাহসী হিমালয়-আরোহীর মনে যে ধরনের ভাব জাগে, অনেকটা সেই রকম। হিমালয়-আরোহী জানে যে, হয়তো তার অভিযান ব্যর্থ হবে, হয়তো সে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে পারবে না, কিন্তু যদি পেরে যায়! ওই 'যদি'টা আলেয়ার মত প্রলুব্ধ ক'রে নিয়ে যায় তাকে দুর্গম পথে। তা ছাড়া, সাফল্য যদি না-ও হয়, অভিযান করার মধ্যেই কি আনন্দ নেই? ভয় জিনিসটার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে একটা। অনিশ্চয়তার মধ্যে অপ্রত্যাশিতের চমকপ্রদ যে সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তার আহ্বানে ছুটে যেতে চায় মন। কোন কষ্টকেই কষ্ট ব'লে মনে হয় না তার, বরং বাধা যত দুরতিক্রম্য হয়, সে তত যেন আকুল হয়ে ওঠে, শক্তি তত যেন সংহত হয়, জেদ তত যেন চ'ড়ে ওঠে। অজানার আহ্বান নতুনের প্রলোভন সুরার মত সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায় তার দেহে মনে স্বপ্নে কল্পনায়। বাইরের নানা বাধা অতিক্রম ক'রে কাম্যলোকে পৌঁছবার ঢের আগেই তার সমস্ত সত্তা কল্পনায় পৌঁছে যায় সেখানে, এবং পৌঁছে গিয়ে যে আনন্দ পায়, তারই আবেগে সে হাসিমুখে অতিক্রম করে সমস্ত বাধা। তার কৃচ্ছ্রসাধন ব্রহ্মালোলুপ তপস্বীর কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। তার লক্ষ্য আলাদা, পথও তাই আলাদা। নিজের স্বর্গলোকে সেও মুক্তি পেতে চায়। তার মনও ডানা মেলেছে—বহুবর্ণবিচিত্র রূপ-রস-রঙের লীলাতীর্থে, মৃন্ময়ী ধরণীর মহিমালোকে—সূক্ষ্ম অবাস্তবে নয়, স্থূল বাস্তবে ; পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষে। পথ পিচ্ছিল, পর্বত দুরারোহ, সমুদ্র-দুস্তর, কণ্টক কঙ্কন কর্দম—বাধার অন্ত নেই। কামনারও অন্ত নেই!

অন্ধকারে হঠাৎ খুব জোরে একটা হোঁচট খেলেন রূপচাঁদ। পায়ের বুড়ো আঙুলটায় খুব জোরে লাগল—জুতো থাকা সত্ত্বেও। সামলে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। বলা বাহুল্য অমরেশের কাছে যাচ্ছিলেন না তিনি, যাচ্ছিলেন ডানার কাছে।

৬

অন্ধকার চতুর্দিকে। নদীতীরের বন-জঙ্গল থেকে অবিরাম ঝিল্লীধ্বনি হিল্লোলিত ক'রে তুলছে অন্ধকারকে। অন্ধকার সমুদ্রে অসংখ্য সুরের ঊর্মি ছন্দিত হয়ে উঠছে যেন, স্পন্দিত করছে নক্ষত্রকুলকেও। সন্ন্যাসী স্থির হয়ে ব'সে ছিলেন এতক্ষণ আনন্দময় স্তব্ধতার মধ্যে।

চরাচরব্যাপী সঙ্গীতের স্পর্শ তাঁকেও আত্মহারা ক'রে তুলল ক্রমশ। হঠাৎ তিনি গান গেয়ে উঠলেন। মীরার একটা ভজন রূপায়িত হয়ে উঠল তাঁর মনে।

চিতনন্দন আগে নাচুংগী
নাচ নাচ পিয়তম হিঁ রিঝাউ
প্রেমী জনকো জাচুংগী ॥
প্রেম প্রীতকা বাঁধ ঘুংঘরা
সুরতকী কছনী কাছুংগী।
লোক লাজ কুলকী মরজাদা
য়া মৈঁ এক ন রাখুংগী
পিয়াকে পলংগা জা পৌঢুংগী
মীরা হরিংবংগ রাচুংগী ॥

তাঁর উদাত্ত অনুপম কণ্ঠে ভ'রে উঠল চারিদিক। পাগলিনী মীরাই যেন অন্ধকারে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার চিতনন্দন প্রিয়তমকে। অন্ধকারের স্তরে স্তরে, গঙ্গার কূলে কূলে, বনস্পতির শাখায় শাখায়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে সেই সন্ধানের সূক্ষ্ম তীব্র আকুতি সঞ্চারিত হ'ল যেন। ঘুরে বেড়াতে লাগল নামহীন সমুদ্রের সৈকতে সৈকতে। সন্ন্যাসীর গান থেমে গেল কিছুক্ষণ পরে, কিন্তু আকুতি থামল না। তার অবাঙ্‌ময় আবেদন সূক্ষ্মতর হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হ'লে বিশ্বের রন্ধ্রে ওন্ধ্রে, ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল নিবিড়তায়, তীব্রতর হয়ে উঠল অনুভূতিলোকে। চোখ বুজে ব'সে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। যখন চোখ খুললেন, তখন দেখতে পেলেন, ভাঙা সিঁড়িটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

"কে?"

"আমি। আপনার গান শুনছিলাম।"

ডানা এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সন্ন্যাসীকে। তার হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল, এ ব্যক্তিটি প্রণম্য।

"থাক্ থাক্"—সঙ্কুচিতভাবে সরে গেলেন সন্ন্যাসী। উঠে দাঁড়ালেন। বিব্রত বোধ করলেন একটু।

"যে গানটা গাইছিলেন, সেটা ভজন, নয়?"

"হ্যাঁ, মীরার ভজন।"

"গানের কথাগুলো খুব মিষ্টি, কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না ভাল।"

সন্ন্যাসী নীরব হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "এই যে ঝিল্লীর সঙ্গীত, এর কি মানে বুঝতে পার?"

"আমি বুঝতে না পারলেও ঝিল্লিরা বুঝতে পারে নিশ্চয়।"

"কিন্তু তুমি তো ঝিল্লী নও, তুমি মানুষ। তোমার বোঝায় আর ঝিল্লীর বোঝায় তফাৎ থাকবে না? ঝিল্লী ওর এক রকম মানেই জানে, কিন্তু তুমি ওর হাজার রকম মানে বার করতে পার, সে শক্তি সে স্বাধীনতা দিয়েছেন তোমাকে ভগবান।"

হঠাৎ একটা নতুন জগতে প্রবেশ ক'রে ডানা যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। সন্ন্যাসীও চুপ করে রইলেন। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে আসছিল, এমন সময়ে ডানার চাকরটা এসে বললে যে সে গোয়াল-বাড়ি থেকে দুধ আনতে যাচ্ছে। ঘর খোলা রইল। চাকরের আবির্ভাবে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল উভয়েরই।

ডানা সপ্রতিভ ভাবে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে? চলুন না, একদিনও তো যান নি।"

"আমি? আচ্ছা, চল।"

ডানার পিছু পিছু সন্ন্যাসী চলতে লাগলেন। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে গোড়া থেকেই কেমন একটা কৌতূহল জেগেছে—কেমন যেন অস্পষ্ট শ্রদ্ধা একটা। এতদিন নানা ছলে ওই ভাঙা ঘরটার আনাচে কানাচে ঘুরছে সে, কিন্তু সোজাসুজি মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারে নি। আজ করতে পেরে যেন আনন্দিত হ'ল।

ঘরে ঢুকে ডানা বললে, "বসুন।"

সন্ন্যাসী নির্বিকার ভাবে মাটিতেই ব'সে পড়লেন।

"চেয়ারে আপনি বসেন না বুঝি?"

"না, আজকাল আর বসি না।" তারপর একটু হেসে বললেন, "একটা ব্রত চলছে আমার—তুমি ব'স চেয়ারে।"

"কম্বল পেতে দেব আপনাকে?"

"কম্বলে আপত্তি নেই। কিন্তু থাক্ না, কি দরকার?"

"আপনি মাটিতে ব'সে থাকবেন, আমি কি ক'রে চেয়ারে বসি?"

ডানা একটা কম্বল পেতে দিলে। সন্ন্যাসী তার উপর উঠে বসলেন। ছোট একটা আসন পেতে ডানা বসল এক ধারে।

তারপর বললে, "আপনি এখনই স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন।"

"বলছিলাম, তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ঝিল্লীর তা নেই। একমাত্র মানুষকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ভগবান, সে যা ইচ্ছে করতে পারে, যা খুশি হতে পারে। তার সামনে অসংখ্য পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। সে ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে, যে কোনও জিনিসকে যেমন খুশি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পরে। এ স্বাধীনতা আর কারও নেই।"

"কেন পশুরাও তো কম স্বাধীনতাতে ঘুরে বেড়ায় না?"

"পশুরা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রাত্রি হ'লে তাকে ঘুমুতেই হবে, ইচ্ছে করলেও সে জেগে থাকতে পারে না। ক্ষুধার উদ্রেক হ'লেই তবে সে খায়, অক্ষুধার সময় কিছুতেই তাকে খাওয়াতে পারবে না। মানুষ কিন্তু যখন ইচ্ছে ঘুমুতে পারে, যতক্ষণ খুশি জাগতে পারে। ক্ষুধা অক্ষুধা—কোন সময়েই তার খাওয়ার বাধা নেই, সামনে খাবার থাকতে স্বেচ্ছায় সে উপবাসও করতে পারে। অন্য কোন প্রাণী তা পারে না।"

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন তিনি, কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। তারপর আপন মনেই বললেন, "সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। জোর করেন না কখনও। অপেক্ষা করেন।"

"কিসের অপেক্ষা?"

"তুমি তাঁকেই নির্বাচন ক'রে নাও কি না, তারই অপেক্ষা। তোমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন সীমাহীন ঐশ্বর্যভাণ্ডার, তোমার অন্তরে দিয়েছেন কামনা, মস্তিষ্কে দিয়েছেন বুদ্ধি। অনন্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পথের মোহনায়, যে কোনও পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। অপেক্ষা করছেন, তুমি তাঁকেই বেছে নাও কি না।"

"এ রকম ধাঁধায় ফেলার মানে কি?"

"জোর ক'রে দখল করায় কোনও আনন্দ নেই। তিনি আনন্দময়, আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু কাম্য নেই তাঁর। তুমি যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে বরণ ক'রে আনন্দ পাও, তা হ'লেই আনন্দ। সত্যিকার আনন্দে ভণ্ডামির স্থান নেই, স্থান নেই জবরদস্তির। জবরদস্তির স্থান নেই ব'লেই বোধ হয় তিনি অন্য পথগুলোও মনোহর করেছেন, তাতেও দিয়েছেন কিছু কিছু আনন্দের খোরাক।"

আবার চুপ করলেন তিনি। আবার ঘনিয়ে এল নীরবতা। স্পষ্ট হয়ে উঠল নদী-তীরের ঝিল্লীধ্বনি।

"আচ্ছা, একটা কথা মনে হচ্ছে, তিনিও কি লোলুপ?"

ডানা এমন স্বরে কথাগুলো বললে যে, সন্ন্যাসীর মনে হ'ল, সত্যিই তার প্রাণে জিজ্ঞাসা জেগেছে। মেয়েটির তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পেয়ে মনে মনে আনন্দিতও হলেন তিনি। কিন্তু চুপ ক'রে রইলেন। যেন মনের গহনে তিনি উত্তর সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন—ডানার মনে হ'ল। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তিনিও লোলুপ। প্রেমের কাঙাল তিনি।"

"তবে শুনেছি যে, তিনি নিখুঁত নির্বিকার।"

"তাও সত্য।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তীরের কাছে সমুদ্রের জল এক হাঁটু, আর একটু দূরে গেলে সেই সমুদ্রই অতলস্পর্শী—দুটোই সত্য। সমুদ্র নীল এও যেমন সত্য, সমুদ্র নীল নয় তাও তেমনই সত্য। একটা ঘটিতে তুলে দেখ সমুদ্রের জল সাধারণ জলের মত। সামান্য সমুদ্রের মধ্যে পবস্পর-বিরোধী সত্য যদি নিহিত হয়ে থাকতে পারে, তা হ'লে কোটি কোটি পর্বত-সমুদ্রের যিনি আকর, তাঁর মধ্যে সত্যের অনন্ত রূপের সন্ধান পাওয়া কি অসম্ভব? তা ছাড়া নিজের অনন্ত রূপ তিনি দেখাচ্ছেন ব'লেই তুমি দেখতে পাচ্ছ।"

"এ রকম পরস্পরবিরোধী সত্য দেখাবারই বা মানে কি?"

"দেখাচ্ছেন বললে ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজেই নিজের অনন্ত রূপ দেখছেন তোমার চোখ দিয়ে। উপভোগ করছেন সেটা। কবি যেমন নিজের কাব্যকে নব নব রূপে উপভোগ করেন বিভিন্ন রসিকের সমালোচনায়, তেমনই। তোমার ভিতর দিয়ে নিজেকেই আবিষ্কার করছেন তিনি বারংবার, কে জানে, হয়তো সংশোধনও করছেন নিজেকে। পুরাতন ছবিকে অবলুপ্ত ক'রে আঁকছেন নতুন ছবি, তাঁর রবারের সামান্য ঘষায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পুরাতন সমুদ্র পর্বত, ঐতিহাসিক পড়ছে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিকের পর্যায়ে, তুলির নতুন টানে ফুটে উঠছে আবার নব নব চিত্র সৃষ্ট হচ্ছে নব নব লোকালয়, নব নব লোকপাল।"

হঠাৎ আবার গানে গেয়ে উঠলেন তিনি।

> একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্
> অস্মিন ক্ষেত্রে সংহরত্যেয দেবঃ
> ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পথয়স্তথেশঃ
> সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা।

গান শেষ হ'লে চুপ করে রইলেন তিনি।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সে। স্বল্পপরিচিত এই উদাসীন ব্যক্তিটির মধ্যে যে এত ঐশ্বর্য আছে, তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। লোকটির ঔদাসীন্য প্রথমে কৌতূহলী করেছিল তাকে, তাঁর শুচিতা শ্রদ্ধান্বিতও করেছিল তারপর ; কিন্তু এতটা

সে প্রত্যাশা করতে পারে নি। নতুন আবেষ্টনীর আকাঙক্ষা-অনিশ্চয়তার মধ্যে সে ততটা বিভ্রান্ত হয় নি। ভেবেছিল, নিরাপদ আশ্রয় কোথাও জুটে যাবেই একটা না একটা। বিপদে পড়েছিল সে নিজের মনকে নিয়ে। মনের পুরাতন আশ্রয় ছিন্ন হয়েছে, নতুন আশ্রয় পাওয়া যায় নি এখনও। কোথায় পাওয়া যাবে, কবে পাওয়া যাবে, কি রকম হবে সে আশ্রয়, কোন কিছুরই নিশ্চয়তা ছিল না। কল্পনা আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করছিল নানা রকম। আদর্শও ঠিক হয় নি। আদর্শ ঠিক না হ'লেও অস্পষ্টভাবে যে আভাসটা তার চেতনায় আঁকা ছিল, তা সাধারণ বাঙালী নারীর গতানুগতিক জীবনেরই ছবি একটা। বিয়ে করবে, ঘরসংসার পাতবে, যুদ্ধ থেমে গেলে পৈতৃক সম্পত্তিও হয়তো ফিরে পাবে কিছুটা—এই ধরনের অনির্দিষ্ট চিত্র। নিখিল বিশ্বের বিধাতা যে তার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখছেন, তার সমালোচনা শোনবার আশায় প্রতীক্ষা করছেন, তার রসবোধের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচিয়ে নিতে চাইছেন—এ খবরটা শুধু যে অদ্ভুত রকম নতুন মনে হ'ল তার কাছে তা নয়, এর সত্যটা সহসা যেন মর্মে গিয়ে বিঁধল তার। সে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল, সে নিজেকে অত ছোট ক'রে ভাবছে কেন? মনে প'ড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা—

আমি নারী আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নারাতে নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যে হ'ত আকাশে চাঁদ ওঠা
মিথ্যে হ'ত কাননে ফুল ফোটা।

মাটির ধূলিকণা থেকে আরম্ভ ক'রে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সবাই প্রত্যাশাভরে তাঁরই জন্যে সেজে ব'সে আছে, এ কথা বিশ্বাস করলে নিজের দৈন্যবোধ আর থাকে না। সমস্ত মন আনন্দে ভ'রে ওঠে। এই আনন্দেই বোধ হয় ভ'রে উঠেছিল মীরার মন।

"মীরার যে ভজনটা আপনি গাইছিলেন এখনই, তারও বক্তব্য কি এই?"

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, "এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও বক্তব্য নেই। কেবল বলবার ধরনটা প্রত্যেকের আলাদা, কারণ প্রত্যেকে তাঁকে নিজের মত ক'রে দেখতে চাইছে, আসলে তিনি নিজেই নিজেকে নানাভাবে দেখছেন। মীরা যখন বলছেন, হে প্রিয়তম, হে চিতনন্দন, আমি পায়ে প্রেমের নূপুর প'রে, গায়ে অনুরাগের বসন ছড়িয়ে, লোক-লজ্জা কুলমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তোমার সামনে নৃত্য করব, তোমার প্রেমকীর্তন করব, তোমার শয্যা আশ্রয় করব,—তখন বুঝতে হবে ভগবানেরই লীলা সেটা, মীরার মুখ দিয়ে নিজের একটা অভিব্যক্তি তিনি ব্যক্ত করছেন। তার প্রমাণ চোখ মেলে দেখলেই দেখতে পাবে। ওই দেখ, সুনীল আকাশ-প্রাঙ্গণে নৃত্যপরা হয়ে উঠছে কোন্ পূজারিণী, বেজে চলেছে তার নূপুর, লুটিয়ে পড়ছে তার প্রেমাঞ্চল, কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠেছে দশদিক, তোমার মুখের দিকে আকুলনয়নে চেয়ে আছেন তিনি। ওই একই কথা বলেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথও আর এক ধরনে—"

হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন আবার সন্ন্যাসী—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
তোমার সূর্য চন্দ্র তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে—

গানটা কিন্তু সমাপ্ত হ'ল না। হতে পারল না। হঠাৎ দ্বার ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন মাংসপূর্ণ টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে। সন্ন্যাসীর দিকে এক নজর চেয়ে টিফিন-কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি ঘরের কোণে। তারপর ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "টিঞ্চার আইয়োডিন আছে তোমার কাছে?"

"না, কেন বলুন তো?"

"হোঁচট খেয়ে আঙুলটায় লেগেছে বড্ড।"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে পড়লেন। নমস্কার ক'রে বললেন, "আচ্ছা আমি এখন চলি তবে।"

উঠে বেরিয়ে গেলেন। অকারণে ডানার কান দুটো গরম হয়ে উঠল। তবু সে আত্মসম্বরণ ক'রে লণ্ঠনটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

"খুব বেশি লেগেছে নাকি? ইস, জুতোটা রক্তে ভিজে গেছে দেখছি যে! খুলে ফেলুন। এত রাত্রে আসবার কি দরকার ছিল অন্ধকারে?"

"তোমার জন্যে মাংস রেঁধে এনেছি একটু। কেপনের মাংস।"

"মাংস? মাংস তো আমি খাই না।"

"তাই নাকি?"

নির্নিমেষে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ।

৭

অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডানা কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হয় নি। মনের নেপথ্যলোকে গোপন অস্বস্তির একটা কীট কোথায় যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। তার ঠিক স্বরূপ সে দেখতে পাচ্ছিল না ; কিন্তু অনুভব করছিল, সে ঠিক যা চাইছে তা পায় নি অথচ সেটা যে ঠিক কি, তাও সে জানে না। খাওয়া পরা থাকা ছাড়া মাসিক দেড় শত টাকা বেতন মোটেই তুচ্ছ করার মত নয় এ বাজারে। এমন একটা ভদ্র পরিবারের আশ্রয়ও অবাঞ্ছিত নয়। তবু কি যেন একটা কি খচখচ করছে মনের ভিতর। আনন্দবাবু রূপচাঁদবাবু— দুজনেই ভদ্র শিক্ষিত লোক, দুজনেই তাকে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ, অথচ—। সন্ন্যাসীর মুখটা মনে পড়ল। আশ্চর্য সন্ন্যাসী। কোনও ভড়ং নেই, গেরুয়া জটা কমণ্ডলু কিছু নেই, কথাও বলতে চান না বেশি। সব সময়ে থাকেনও না। নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে চলে যান কোথায় যেন চরের উপর দিয়ে। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ আবার ফিরে আসেন। নিজের হাতে ভাতে-ভাত রান্না করেন ইঁটের তৈরি উনুনে ছোট মাটির মালসায়। ডানার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভিক্ষা করতে বার হন উনি বোধ হয়। ভিখারীকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে ছেলেবেলা থেকে। এই সন্ন্যাসীটিকে ভিখারী ভাবতে ইচ্ছা করে না কিন্তু তার। ভিক্ষুকের মত কোনও দীনতা তো লক্ষ্য করে নি একদিনও সে। বরং উল্টো কথাটাই মনে হয় তাঁর চেহারা দেখে। প্রকৃত ঐশ্বর্যশালীর আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোয় তাঁর চোখে মুখে। তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর নির্বিকার ভাব-ভঙ্গী সমস্ত দীনতার অতীত ক'রে রেখেছে তাঁকে।...

...সশব্দে পাশের দুয়ারটা খুলে গেল শশব্যস্ত বৈজ্ঞানিক এসে প্রবেশ করলেন। কুণ্ঠিত হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললেন, "আমার দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়, না? আপনি প্রস্তুত নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তা হ'লে শুরু করা যাক এবার।"

হাতে হাত ঘ'ষে বৈজ্ঞানিক একটা চেয়ারে বসলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে বললেন, "আনন্দবাবুরও আসবার কথা ছিল, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি।"

ডানা কি-যে বলবে ভেবে পেলে না ঠিক। তার মনে হ'ল, এঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা এতদিন বেশ সহজ ছিল, কিন্তু সহসা ইনি মনিব হয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা একটু যেন গ্রন্থিল হয়ে পড়ল। এঁর আচরণে ঘুণাক্ষরে যদিও কোন রকম মনিবত্ব প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ডানার মনে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ জেগে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। অমরবাবু যথেষ্ট ভদ্রতাই করেছেন! ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে ডানাকে তিনি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে বলতে পারতেন। তা কিন্তু বলেন নি তিনি। তিনি নিজেই এখানে আসবেন বলেছেন যখন দরকার হবে। চাকরি করার যেটা প্রধান গ্লানি—ঠিক সময়ে আপিসে রোজ হাজির দেওয়া—তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাকে।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে, যেন একটা অনুগ্রহ চাইছেন এমনই ভাবে, অমরবাবু বললেন, "ইয়ে, একটা কাজ যদি করতে পারেন, বেঁচে যাই আমি।"

"কি বলুন?"

"ইংরেজীতে একটানা ডিক্‌টেশন দেওয়া তো আমার অভ্যাস নেই কোন দিন। আমি ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটানা ব'লে যেতে পারি। হয়তো অনেক সময় এলোমেলোও হবে, আপনি সেটা শুনে যদি ইংরেজীতে লিখে যান, পারবেন কি? তারপর আমি সেটা দেখে নে৷ না হয়। পারবেন?"

"তা পারব বোধ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখি একবার।"

"পারেন তো বেশ হয়। জিনিসটা আপনি যদি বুঝতে পারেন তা হ'লে ইংরেজী করা আর শক্ত কি! বৈজ্ঞানিক নাম-টাম অবশ্য আপনাকে দিয়ে দেব আমি। নোট করে এনেছি সব।"

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো টুকরো কাগজ বার করলেন তিনি।

"আজকের বিষয়টা হচ্ছে 'পাখির ডিমের রঙ'। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি জিনিসটা যেমন বিস্ময়কর, তা নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই, পাখিদের ডিমের রঙও তেমনই অদ্ভুত, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। এই সব সম্বন্ধেই আলোচনা করব আজকের প্রবন্ধটাতে।"

"আমি তা হ'লে খাতা পেন্সিল নিয়ে আসি।"

ডানা ঘরের ভিতরে ঢুকে খাতা আর পেন্সিল নিয়ে এল। খাতা পেন্সিল আনিয়েই রেখেছিল সে এজন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবিও হাজির হলেন এসে।

"আপনার এত দেরি হয়ে গেল?"

"আমি একটু আটকে পড়েছিলাম রাস্তায়। অদ্ভুত একটা শোভা হয়েছে, আজকাল, লক্ষ্য করেছেন সেটা?"

"কিসের শোভা?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রকৃতির। বসন্তকাল যে, খেয়াল আছে সেটা? ফুলই ফুটেছে কত রকম। আমের মুকুল তো ধরেইছে, তা ছাড়া আরও যে কত রকম ফুল তার ইয়ত্তা নেই। লালে লাল হয়ে উঠেছে ওই বুড়ো শিমুলগাছটা। দেখেছেন? ন্যাড়া আমড়াগাছটা লক্ষ্য করেছেন? সবুজের শিখা ফুটে বেরুচ্ছে যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে। একদল সোনার প্রজাপতি যেন পাখা মেলে ব'সে আছে শিয়ালকাঁটার বনে। ঘেঁটুফুলও ফুটেছে অজস্র, আর কি তাদের রূপ! ঘাসের ফুল দেখেছেন?

সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো কি যে চমৎকার! বটের গাছেও লাল লাল ফলের ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত জিনিসই যে আমরা দেখি না।"

"হ্যাঁ. তা তো বটেই। ভাল ক'রে দেখার নামই তো দর্শন এবং দর্শনেরই একটা অংশ তো বিজ্ঞান। আমিও একটু পরেই বেরুব। এঁকে একটা প্রবন্ধের মালমসলা দিয়ে দিই। আপনি বসবেন, না, ঘুরে বেড়াবেন নদীর ধারে?"

"আমি বসছি একটু। বই-খাতা সঙ্গে এনেছি, ও-ধারটায় ব'সে আমিও লেখাপড়া করি একটু। আপনি ততক্ষণ কাজ সেরে নিন আপনার। একসঙ্গেই বেরুনো যাবে তারপরে। আপনার প্রবন্ধের বিষয় কি?"

"ডিমের রঙ।"

"বেশ শোনাই যাক একটু।"

"বেশ বেশ"—কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন বৈজ্ঞানিক। কবি একটা চেয়ার টেনে ধারে বসলেন।

বৈজ্ঞানিক শুরু করলেন, "দেখুন, এ বিষয়ে একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার—ডিমের এত বর্ণ-বৈচিত্র্য কেন, তা বিজ্ঞান ঠিক করতে পারে নি এখনও। এ যাঁরা বলেন যে, শত্রুদের কাছ থেকে ডিম গোপন করবার জন্যেই ডিমে এত রঙ, ইংরেজীতে যাকে camouflage বলে, তাঁরা সব ক্ষেত্রে তাঁদের মত সমর্থন করবার মত প্রমাণ খুঁজে পান নি। এই ধরুন না কাকের ডিম greenish blue, শালিকের ডিম নীল রঙের। কিন্তু তারা কি সব সময়ে পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ডিম পাড়ে? শালিক পাখি অনেক সময় বাড়ির কার্নিসে বাসা বানায়, তা তো আমরা সবাই জানি। কাকের এলোমেলো বাসার মধ্যে যেখানে ডিমটা থাকে, সেখানে তো সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। তা ছাড়া তাই যদি হ'ত, তা হ'লে যে সব পাখি গাছে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সকলেরই ডিম সবুজ বা নীল হ'ত। তা কিন্তু হয় না তো। আর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। ট্রপিকাল দেশের মানুষের গায়ে যে কারণে pigment অর্থাৎ রঙ হয়, ঠিক সেই কারণে, তাঁদের মতে যে সব ডিম যত সূর্যের আলো পায়, তারা তত বর্ণবহুল হয়। এরও অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সব পাখি গর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডিম পাড়ে, তাদের অনেকের ডিম অবশ্য সাদা, কিন্তু অনেকের আবার রঙিনও হয়, যেমন গাংশালিক। গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে না অথচ রঙ সাদা—এমন ডিমেরও অভাব নেই, যেমন ঘুঘু, পায়রা, হাঁস, মুরগী। সুতরাং ঠিক নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না কিছু। Bayne সাহেব বলেছেন একটা অদ্ভুত কথা। বলেছেন, স্ত্রী-পাখীদের এটা বোধ হয় artistic impulse অর্থাৎ শিল্প-প্রেরণা। স্ত্রী-পাখিদের গায়ে সাধারণত রঙ কম হয়, তাই তারা সে শখটা মেটায় ডিমের গায়ে নিজের নিজের পছন্দমত রঙ ফলিয়ে। এটা অবশ্য কবিত্ব।"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

কবি উত্তর দিলেন, "সেইজন্যেই বোধ হয় সত্য। কবিরাই সত্যকে দেখতে পায়। আপনারা কেবল আঁকপাঁক ক'রে মরেন, তাতেও অবশ্য আনন্দ কম নেই।"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "এই camouflage ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গাংচিল, বাটান প্রভৃতি পাখি বালির চড়ায় ডিম পাড়ে, কোনও বাসা বানায় না, কিন্তু ওদের ডিমের রঙ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মিশে যায় যে চট ক'রে ধরা যায় না লোকে অনেক সময় মাড়িয়ে ফেলে, তবু দেখতে পায় না। যাদেরই ডিম খাকী রঙের বা মাটির

রঙের বা স্টোন কালার্ড (stone colourd) তাদের সম্বন্ধেই ঐ কথা বলা চলে, যেমন ধরুন Bustar , Curiew, Indian Courser, আরও অনেক আছে। ডিমের রঙের সম্বন্ধে আর একটা কথা ও মনে হয়, ওদের Endocrine glands, বিশেষ ক'রে Adrenal নিশ্চয় এ সবের জন্যে দায়ী। জীবদেহের সমস্ত রকম pigment-এর সঙ্গে Endocrine gland-এর যোগ আছে। যাঁরা পাখিদের ডিম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা সাতটা রঙই পেয়েছেন। আপনি ওখানটা একটু ফাঁক রেখে দেবেন, রঙের খটমট বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি পরে বসিয়ে দেব। রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্ ক'রে বার করেছেন Sorby : এস ও আর বি ওয়াই ; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"আমি নদীর ধারে একটু ঘুরে আসি, বুঝলেন"—কবি উঠে পড়লেন।

"আচ্ছা, বেশ"—অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিকও।

"আমি এটা শেষ ক'রে ফেলব এখুনি। আপনি ততক্ষণ বাটানগুলোর খবর নিন না!"

কবি চলে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম যে?"

ডানা বললে, "রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্ ক'রে বার করেছেন Sorby ; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"ও, হ্যাঁ। সব রঙেরই মূল হচ্ছে সূর্যালোক। আমরা যখন কোনও জিনিসকে সবুজ দেখি, তখন আসলে কি হয়? সূর্যালোকের যে সাতটা রঙ আছে, তার ছটা রঙই সেই জিনিসটা আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সবুজটাকে করে না, আমরা সেটা দেখতে পাই। সুতরাং বকের ডিমকে আমরা যখন সবুজ দেখছি, তখন বুঝতে হবে ভিবজিওরের জি-টা ছাড়া বাকি সবগুলো ডিম শুষে নিচ্ছে। হয়তো বকের ভ্রূণের পক্ষে ওই ছটা রঙের তরঙ্গাঘাত প্রয়োজন, সবুজটা অনিষ্টকারী। এদিক দিয়েও ডিমের রঙের বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে। তা ছাড়া পাখির খাদ্যের সঙ্গেও নিশ্চয় সম্পর্ক আছে এর। কারণ জীবজগতের যত কিছু রঙ, তা তো খাদ্য থেকেই তৈরি হয় শেষ পর্যন্ত। পাখির ডিমের রঙের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন আর বাইল পিগ্‌মেণ্টের যে সম্বন্ধ আছে, তা তো আবিষ্কারই করেছেন Sorby—"

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাংস্য স্বর বাতাসকে চিরে দিয়ে চ'লে গেল। বৈজ্ঞানিক থেমে গেলেন এবং উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলেন?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাখি বলুন তো?"

"কাঠঠোকরা। শব্দটা অদ্ভুত নয়? আচ্ছা, সংস্কৃতে ক্রেঙ্কারধ্বনি ব'লে একটা কথা আছে, তা কি এই রকম শব্দ? আপনি তো সংস্কৃত জানেন।"

"যে কোন কর্কশ শব্দকে ক্রেঙ্কারধ্বনি বলা যায়, কিন্তু হাঁসের ডাকের শব্দকেই ক্রেঙ্কারধ্বনি বলেছেন সংস্কৃত কবিরা।"

"ও। কিন্তু এ সব শব্দকে কি কর্কশ বলা উচিত?"

"সেটা নির্ভর করে শ্রোতার উপর" মৃদু হেসে ডানা বললে।

"তা ঠিক। কাঠঠোকরা দেখেছেন? দেখেন নি? ভারি চমৎকার দেখতে। আজই চিনিয়ে দেব আপনাকে। এইটে হয়ে যাক, তারপর বেরুনো যাবে, কি বলেন? আমি কয়েকটা ফর্দ ক'রে এনেছি ডিমের রঙের। পাখিগুলোর-বাংলা নামই দিয়েছি। আচ্ছা, প্রবন্ধগুলো প্রথমে বাংলা কোনও কাগজে দিলে কেমন হয়, কি বলেন আপনি? বাংলাতেই প্রথম লিখে ফেলুন, পারবেন?"

"পারব না কেন? বাংলা ইংরেজী দু'রকমই লিখে দেব।"

"বাঃ, গ্র্যাণ্ড হবে তা হ'লে।"

কাগজের কয়েকটা টুকরো বার করলেন তিনি পকেট থেকে। তারপর বললেন, "হ্যাঁ লিখুন এইবার। আমি রঙ অনুসারে ভাগ করেছি। কুচকুচে কালো ডিম চেনাশোনা কোনও পাখিরই নেই। ভায়োলেট রঙের ডিমও বড় দেখতে পাওয়া যায় না এদেশী পাখির। ইন্‌ডিগো রঙের ডিমও দেখি নি। নীল রঙ অবশ্য অনেক আছে। আর একটা কথা নিছক একরঙা ডিম খুব কম আছে। অধিকাংশ ডিমেই এক বা একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তা ছাড়া অনেক ডিমের গায়েই কালো বাদামী বা লাল রঙের ছিটছিট থাকে।"

ডানা দ্রুতবেগে লিখে যাচ্ছিল। অমরবাবু চুপ ক'রে গেলেন ডানার চলমান পেন্সিলের দিকে চেয়ে।

"হ'ল?"

"হয়েছে। আপনি ব'লে যান না।"

"নীল রঙের ডিম—ছাতারে, শালিক, গাংশালিক, গোশালিক। গাংশালিক গর্তের ভিতর ডিম পাড়ে, তবু কিন্তু ওর ডিম নীল। এইবার লিখুন ফিকে নীল—গ্রে হেডেড (Grey headed) ময়না, যাদের দেশী নাম—পাওয়াই, ব্রাহ্মণী ময়না, সবুজ মুনিয়া। সাদাটে নীল—দর্জিপাখি, শিকরা, দর্জিপাখির ডিম লালচেও হয়। অনেক পাখিরই ডিমের রঙ এক রকম হয় না। দর্জিপাখি আর শিকরার ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজাভ নীল—খয়রা, কোঁচ বক—"

ডানা লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলে, "খয়রা কি পাখি?"

"ইংরেজী নাম স্নেক বার্ড (snake bird), অনেকটা হাঁসের মত। গলাটা কেবল সাপের মত লম্বা, অদ্ভুত লম্বা। ঝিলে প্রায় দেখা যায় এগুলোকে। যখন মাছ ধরে, মনে হয়, সাপে ছোবল দিচ্ছে। মাথা আর গলা এদের খয়েরী রঙের। সেইজন্যেই খয়রা ব'লে বোধ হয়। জানি না ঠিক। খয়রা মাছও আছে এক রকম, কিন্তু তাদের রঙ তো রূপোর পাতের মত। বলতে পারি না খয়রা নাম কেন,—সুনীতিবাবু হয়তো পারবেন। এ পাখিগুলো ডুব-সাঁতার দিতে খুব ওস্তাদ, ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে এরা।"

ডানা দেখলে খয়রা-প্রসঙ্গে বাধা না দিলে ক্রমাগত ব'লে যাবেন ইনি।

"ও। সবুজাভ নীল আর কোনও পাখির আছে কি?"

"আর কারও নেই। নীলচে সবুজ আছে, কিন্তু সে সবুজের কোঠায় হবে এখন। এইবার লিখুন—নীলাভ সাদা। এগুলো সাদাই, একটু নীলের আভা আছে কেবল। গাই-বক (Cattle Egret), এদের ডিমের রঙ অনেকটা মাখন তোলা দুধের রঙের মত। ফ্লেমিংগোর (Flamingo) ডিমও নীলাভ সাদা। এরা অবশ্য স্পেন ইরাক প্রভৃতি দেশে ডিম পাড়ে। এ দেশে কচ্ছ প্রদেশে পাড়ে শুনেছি।"

"ফ্লেমিংগো? বাংলা নাম আছে কোনও?"

"রাজহংস বলে অনেকে। কিন্তু রাজহংস নামে অনেক পাখিই চলছে। বার-হেডেড গুজকে (Bar-headed Goose) অনেকে রাজহংস বলে, আবার মিউট সোয়ানও (Mute Swan) রাজহংস-রূপে চিত্রিত দেখেছি সরস্বতীর ছবিতে। পেলিকানও (Pelican) রাজহংস নামে চ'লে গেছে কোথাও। আপনি ফ্লেমিংগোই লিখুন। কিংবা নামকরণ করতে পারেন যদি—"

"পাখিটা দেখতে কি রকম?"

"দেখতে? রঙ সাদা, ডানার ধারে ধারে গোলাপী, পা দুটো খুব লম্বা, ঠোঁটও একটু বিশেষ ধরনে বাঁকানো।"

"পা দুটো লম্বা? খুব লম্বা?"

"খুব।"

"তা হ'লে লম্বগ্রীব, লম্বকর্ণর মত লম্বচরণ বা লম্বপদ বলা যায় অনায়াসে।"

"বাঃ, চমৎকার হবে। তাই লিখুন। ব্র্যাকেটে ইংরেজীর নামটা দিন।"

ডানা লিখতে লাগল। অমরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। মেয়েটি নিতান্ত তুচ্ছ করবার মত নয় তো। বাঃ! তার ঘাড়ের কুঞ্চিত কতকগুলো চুলের দিকে চেয়ে তাঁরও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। পাখির পালকে ঠিক এই রকম দেখা যায়। সেদিন দোয়েলের যে পালকটি পেয়েছেন—

হঠাৎ ডানা মুখ তুলে বললে, "তারপর বলুন। নীলাভ সাদা আর কোনও পাখির আছে?"

"আছে। শর্ট-টোড ঈগল (Short-toed Eagle), দেশী নাম সাপমার। এদের ডিম ধবধবে সাদাও হয়। এদের আর একটা বিশেষত্ব—এরা মাত্র একটি ডিম পাড়ে। হোয়াইট ইবিস—সংস্কৃত নাম মুণ্ডক, এদের ডিমও নীলাভ সাদা, সবুজাভ সাদাও হয়। যাদের ডিম দু রকম বা তিন রকম রঙের হয়, তাদের নামটা আর একটা পাতায় টুকে যান তো। আগে পেয়েছেন দর্জিপাখি। যে সব ডিমে ছিটছিট থাকে—অর্থাৎ যাদের ডিম Blotched—তাদের আলাদা একটা লিস্ট করেছি আমি। আচ্ছা, এইবার সবুজে আসা যাক। ঠিক সবুজ ডিম হয় না কারও গ্রে হেরনের (Grey Heron) ডিম সী-গ্রীন।"

"গ্রে হেরনের বাংলা কি?"

"কাঁক-পাখি, সাদা কাঁক, সংস্কৃত—কঙ্ক। সী-গ্রীনের বাংলা কি লিখেছেন? সাধারণত সমুদ্রকে আমরা নীল বলি, কিন্তু ওর সবুজ রঙও হয় দেখেছেন কখনও?"

"দেখেছি। সী-গ্রীন সাগর-সবুজ লিখলে ক্ষতি কি?"

"কিছু ক্ষতি নেই। তাই লিখুন। এদেরই আর এক আত্মীয় পার্পল হেরন (Purple Heron) নীল বক নামে পরিচিত। নীল-বক, কানা-বক, ওয়াক-বক এবং তাদের জ্ঞাতি-গুষ্টিদের...আপনি এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা লিখে দিন....অনেকেরই ডিম ফিকে সবুজ রঙের। আরও দুরকম বকের কথা আগেই বলেছি, কোঁচ-বক, গাই-বক, এদের ডিমে অবশ্য নীলেরই প্রাধান্য। সারস, ব্ল্যাক ইবিস্ (Black Ibis) দেশী নাম কাড়া কোল, এদের ডিমও ফিকে সবুজ, কিন্তু ছিটছিট। রীফ হেরন (Reef Heron) এ দেশে বড় দেখা যায় না, তাদেরও ফিকে সবুজ ডিম। এই সারস বকেদের দলে ঢুকে পড়েছে কিন্তু দুটি ছোট ছোট পাখি কালী-শ্যামা আর দুর্গা টুনটুনি। এদের ডিমও ফিকে সবুজ আর ছিটছিট। এই পাখি দুটি নিজেরা যেমন অস্থির, এদের ডিমের রঙেরও তেমনই কোনও স্থিরতা নেই। কালীশ্যামার সাদা, পীতাভ, ফিকে সবুজ—তিন রকম ডিম হয়। দুর্গা-টুনটুনি ছাই রঙয়ের ডিমও পাড়ে। আশ্চর্য নয়? একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি, পরে বলব। সবুজ, ফিকে সবুজ হয়ে গেল, এইবার আসুন নীলচে সবুজ—Bluish Green। আগে হয়েছে Greenish Blue—সবুজাভ নীল। গোলমাল ক'রে ফেলবেন না। কাক, দাঁড়কাক্র, জলকাক—যার চলতি নাম পানকৌড়ি, ইংরেজী নাম Cormorant—এদের ডিম নীলচে সবুজ। কাক দাঁড়কাকের ডিমে ছিটছিট আছে, আর পানকৌড়ির ডিমের উপর সাদা বা নীলচে সাদা খড়ির মত এক রকম গুঁড়ো-

গুঁড়ো জিনিস মাখানো থাকে। বকেদের সঙ্গে যেমন জুটেছিল কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি, কাকেদের সঙ্গে তেমনই জুটেছে দোয়েল আর শ্যামা। দোয়েলের ডিমে ছিটছিট আছে। লিখেছেন?"

"একটু বাকি আছে।"

তাড়াতাড়ি লেখা শেষ ক'রে ডানা বললে, "হয়েছে, বলুন।"

কিন্তু বাধা প'ড়ে গেল।

একজন কন্‌স্টেব্‌ল সমভিব্যাহারে দুটো কুলি এসে হাজির হ'ল। দুটো কুলির মাথায় দুটো বাক্স। কন্‌স্টেব্‌ল ডানাকে সেলাম ক'রে চিঠি দিলে একটা। রূপচাঁদের চিঠি। রূপচাঁদ লিখছেন—

ডানা, কাল রাত্রে আবিষ্কার করলাম যে, গানের তুমি খুব ভক্ত একজন। আমাদের পরিচিত এক বন্ধু দারোগার একটি গ্রামোফোন ও অনেকগুলি ভাল ভাল গানের রেকর্ড ছিল। তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বদলি হয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আমার কাছে এগুলো রেখে যাচ্ছিলেন, আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি, গান শোনবার জন্যে বাইরের লোক ডাকবার আর প্রয়োজন হবে না তোমার। ইতি—আর. সি.।

বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার?"

"রূপচাঁদবাবু একটা গ্রামোফোন আর কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"ও, বেশ তো! আমার কাছে পাখির গানের কিছু রেকর্ড আছে পাঠিয়ে দেব এখন।"

ডানা কন্‌স্টেব্‌লের দিকে চেয়ে বললে, "ভিতরে রাখিয়ে দাও!"

কন্‌স্টেব্‌ল কর্তব্য সমাপন করে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "নিন, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে হবে এটা। আনন্দবাবু হয়তো অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে নদীর ধারে।"

আবার শুরু করলেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "এইবার আসুন অলিভ গ্রীনের কোঠায়। এর বাংলা কি হবে? জলপাই সবুজ? আমাদের দেশী পাখিদের একমাত্র গৈয়রই অলিভ গ্রীন ডিম পাড়ে।"

"গৈয়র পাখির নাম শুনি নি তো?"

"ইংরেজী নাম স্টোন্ কারলিউ (Stone Curlew), অনেকটা বাটান পাখির মত—গায়ে বাদামী ডোরা, চোখে চশমার মত কালো দাগ আছে। পাথুরে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। খাকী রঙের ডিমও হয় এদের কখনও কখনও। ডিমের গায়ে ছিটেফোঁটাও থাকে। যে সব পাখি বালিতে, পাথরে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে তাদের ডিম সবুজের সঙ্গে নানা আমেজের খাকী, হলুদ আর ছাই রঙ দেখা যায়। গাংচিল (Tern) আর বাটানের (Plover) ডিম Greenish Grey—সবুজ ধুসর, অন্য ধরনেরও হয়। ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজের ফর্দ শেষ হল এইখানে, এইবারে হলুদে আসা যাক। একেবারে ঠিক হলুদ রঙের কোনও ডিম নেই। জলমুরগির ডিম ফিকে হলুদ, খাকীও হয়।"

লিখতে লিখতে ডানা বললে, "জলমুরগি আছে নাকি আবার?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। এগুলোর ইংরেজী নাম হচ্ছে Indian Moor Hen, ওয়াটার হেনও বলে কেউ, তবে আসলে ওয়াটার হেন হচ্ছে ডাহুক। Indian Moor Hen-কে পানপায়রা, কোড়াও বলে। সংস্কৃত নাম কোষষ্টি। বিলে-টিলে খুব থাকে। এদের ডাক হচ্ছে কিররিক-ক্রেক্-রেক্-রেক্। আর ডাহুকের ডাক কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কুক্ কুক্ কুক্। এদের

দুজনেরই ডাক বর্ষাকালেই শোনা যায় বেশি। বিদ্যাপতি, না, কার ভাল একটি কবিতা আছে ডাহুক নিয়ে। আনন্দবাবু থাকলে বলতে পারতেন।"

ডানা বললে, "আমি একটা জানি। মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া"—ব'লেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল আবার।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটেই। বোধ হয় বর্ষার গান। এই সব পাখিদের মেটিং সিজন (Mating Season) বর্ষার সময় কি না, আর সেই সময় খুব ডাকে ওরা।"

"ফিকে হলুদ রঙের ডিম আর কোন্ কোন্ পাখির আছে বলুন?"

"আর কারও নেই। তারপব লিখুন ক্রীম। কালীশ্যামা, তিলেবাজ, দুধরাজ, গ্রে তিতির আর ডাহুক। কালীশ্যামার ডিম ফিকে সবুজ হয়, একথা আগেই বলেছি। ডাহুকের ডিমও লালচে সাদা হয় অনেক সময়। কালীশ্যামা, দুধরাজ আর তিলেবাজের ডিম ছিটছিটও। মানে, Blotched ; এইবার লিখুন ফিকে ক্রীম—ময়ূর, নাক্‌টা হাঁস। ময়ূরের ডিমে ছিটছিট থাকে, নাক্‌টার ডিম আইভরির অর্থাৎ হাতীর দাঁতের তৈরি ব'লে মনে হয়। লিখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর লিখুন, পিংকিশ ক্রিম—কুলোপাখি আর বাজ। বাজের ডিম অবশ্য পেল স্টোনও (Pale stone) হয়। দেখুন এসব রঙের বাংলা নাম কি হবে—কপিশ-টপিশ হবে বোধ হয়, সেগুলো আপনি ঠিক ক'রে নেবেন তো?"

"চেষ্টা করব। তারপর বলুন।"

"নানা ধরনের স্টোন রঙ আছে। কাদাখোঁচার ডিম Yellowish stone, Coot-এর ডিম Buffy stone, গাংচিল আর বাটানের ডিমও Buffy stone."

"কুট কি পাখি?"

"যার সংস্কৃত নাম কারণ্ডব।"

"ও।"

"পাশে লিখে রাখুন, গাংচিল আর বাটানের ডিমে ছিটছিট থাকে। এইবার আসুন খাকী রঙে। খাকী রঙের ডিম হয় Quail-দের। যাদের বটের বলে। তবে খাকীতে নানা রঙের আমেজ থাকে। Quail আছেও তো অনেক রকম। তাই খাকীর সঙ্গে কখনও লালচে, কখনও পীতাভ, কখনও ক্রীম মিশে থাকে। হুক্‌না‌র ডিমও এই ধরনের।"

"হুক্‌না? সে আবার কি রকম পাখি?"

"ইংরেজী নাম Indian Courser। শুকনো জায়গায় বালির চড়ায় থাকে সাধারণত। গায়ের রঙও Sandy Brown। চোখের উপর সাদা সাদা দাগ। আগেই বলেছি, যে সব পাখি বালিতে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে, তাদের ডিম হয় খাকী, Greenish খাকী বা ওই ধরনের। এই দলে ফেলতে পারেন Lapwing মানে টিট্টিভদের, Pipit মানে বগেরিদেরও। এদের ডিম ছিটছিটও। এই বগেরিদের সগোত্র হচ্ছে আবার ভরতপাখির দল—Finch Lark, Sky Lark, Crested Lark প্রভৃতি। এরাও মাটিতে ডিম পাড়ে। এদের ডিমও ওই ধরনের Greyish, Greyish Yellow বা Yellowish White. নানা রকম শেড আছে। এইবার আসুন লালের কোঠায়। ঠিক লাল-ডিম কারও নেই। তবে বাদামী, Brick red, লালচে, ফিকে গোলাপী, Salmon এই সব আছে। লিখুন, বাদামী রঙের ডিম হচ্ছে কালো তিতিরের। এদের ডিম চকোলেট রঙেরও হয়। Painted তিতির, হিন্দীতে যাকে পতীলু বলে, এদের ডিমও বাদামী। চমৎকার Bronze Brown হচ্ছে জলপিপির ডিম। ছিটছিট

আছে। হুক্‌নার ডিমও Brown হয় অনেক সময়। আর Florican যাকে হিন্দীতে লীখ বলে, তাদের ডিমও বাদামী।"

"লীখ।"

"হ্যাঁ।"

ডানা দ্রুতবেগে টুকছিল। বৈজ্ঞানিক তার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "হ'ল?"

টোকা শেষ ক'রে ডানা বললে, "বলুন।"

কিন্তু একটা দমকা হাওয়া এসে গোলমাল ক'রে দিলে সব।

কবি টেবিলের উপর কয়েকখানা কাগজ রেখে গিয়েছিলেন, সেইগুলো উড়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

"ধরুন, ধরুন—"

বৈজ্ঞানিক ও ডানা দুজনেই উঠে ছুটোছুটি ক'রে কুড়োলেন কাগজগুলো।

দেখা গেল, একটা কবিতা লেখা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "পড়ুন তো কবিতাটা, নিশ্চয় কোনও পাখির বিষয়েই লিখেছেন। এই নীরস আলোচনার পর—আপনার নিশ্চয় নীরস লাগছে খুব?"

"না। আমার তো বেশ লাগছে।"

শিশুসুলভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন অমরেশবাবু।

"সত্যি, এগুলো নীরস নয় মোটেই, এতে একবার যদি রস পান তা হ'লে আর—আচ্ছা কবিতাটা পড়ুন।"

ডানা পড়তে লাগল।

একলা ঘরে দুপুরবেলায়
    লিখছি চিঠি তোমায় প্রিয়,
চিড়িক চিড়িক ডাকছে চড়াই
    চুনুক চুনুক ডাকছে কি ও।
স্বর্ণলতায় ফুটছে যা রং
শঙ্খচিলের কণ্ঠে সারং
এর ছবি কি আঁকতে পারি
    নয়কো এ যে অঙ্কনীয়।
একলা ডালে বসন্ত-বউ
    ডাকছে কারে আকুল ডাকে
দূরের বনে নিবিড় ছায়ায়
    বউ-কথা-কও সাধছে কাকে
তপ্ত বায়ে কাঁদছে কি সুর
রোদের বীণায় কাঁদছে দুপুর
বাজায় পায়ে বহ্নি-নূপুর
    কোন্ মোহিনী নর্তকী ও।
ফটিক জলের ব্যাকুল ডাকে
    আকুল বিরাট ঔষধি যে

তীক্ষ্ণ সুরের শায়ক হেনে
চাইছে ও কোন্ দৌপদীকে
পথ চেয়ে কার আকুল পাখি
'চোখ গেল' যে বলছে ডাকি
ধাপে ধাপে চড়ছে যে সুর
নয়কো তাহা বর্ণনীয়।
বর্ণনীয় নয়কো জানি।
বলতে তবু চাইছি সবি
অসম্ভবের স্বপ্ন দেখি
ছন্দ-পাগল অন্ধ কবি
লুকিয়ে যাহা মর্মে বাজে
ভাষায় তাহা ফুটছে না যে
এ রূপকথার অরূপ বাণী
আন্দাজে তা বুঝেই নিও।

"অনেকগুলো পাখি লক্ষ্য করেছেন দেখছি ভদ্রলোক। চড়াই, শঙ্খচিল, বসন্ত-বউরি, বউ কথা-কও, চোখ-গেল, ফটিক জল। চমৎকার হয়েছে কবিতাটা, নয়?"

"হ্যাঁ"—ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছিল। কোনক্রমে 'হ্যাঁ' কথাটা উচ্চারণ ক'রে সে কাগজ দুখানা সরিয়ে রেখে দিলে। রূপচাঁদ যে গ্রামোফোন ও রেকর্ডগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেটার দিকেও আড়চোখে চেয়ে দেখলে একবার। তার মনে হ'ল, দুটো বিরাট গর্ত যেন মুখ ব্যাদান ক'রে আছে তার সঙ্কীর্ণ পথের দু পাশে। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

"ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। চমৎকার ছন্দটি।"

"ব্রাউন তো হয়ে গেল। এর পর—"

"হ্যাঁ, এর পর লিখুন ফিকে লাল—উইদিন ব্রাকেট Pale Pink নাইটজারের ডিম ফিকে লাল। নাইটজারের বাংলা নাম জানি না, হিন্দী নাম ডাভাক। সাদা শকুনের ডিম Pale Brick Red. সাদা শকুন দেখেছেন? অতি কুৎসিত পাখি, ডিমগুলি কিন্তু চমৎকার। Pale Brick Red-এর উপর কালোর ছিটেফোঁটা হ'ল? এইবার লিখুন সাদার লিস্ট। চোর পাখি, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, Tickel's Flower Pecker—ইনি পাখিদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্ত-বউরি, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল, নীলকণ্ঠ, বাঁশপাতি, মাছরাঙা, ধনেশ, তাল-চোঁচ, প্যাঁচা সবরকম—কেবল কালো প্যাঁচার ডিমে একটু ক্রীমের আভাস থাকে, শকুনি—এক সাদা শকুনি ছাড়া, কিন্তু সাদা শকুনির ডিমও সাদা হয় অনেক সময়। তারপর লিখুন গরুড়, সাপমার। এদের ডিম নীলচে হয় আগেই বলেছি। কোড়ল, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, হাড়গিলে, সিল্‌হি, দীঘৌচ, বুশ কোয়েল (Bush Quail), মানিকজোড়, সোনাজঙ্ঘা, ডোকহর, কালীশ্যামা। কালীশ্যামার ডিম অন্য রঙেরও হয় আগেই বলেছি। তারপর লিখুন পিট্টা। পাশে নোট ক'রে নিন যে, চোরপাখি, ফিঙে, গরুড় এদের ডিমে সাদার উপর ছিটছিটও থাকে। আর ধনেশ, বামুন শকুনি, সিল্‌হি, এদের ডিম প্রথমে সাদা থাকে, কিন্তু তা দিতে দিতে ঠিক সাদা আর থাকে না, আর সোনাজঙ্ঘা আর ডোকহরের ডিম একটু ময়লাটে সাদা হয়। তারপর লিখুন—হ'ল আপনার?"

ডানা লিখতে লিখতে শুধু যে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, কবিতাটা পড়ার পর থেকে একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এসব লক্ষ্য করলেন না। করলে হয়তো ক্ষান্ত দিতেন।

"এইবার লিখুন, সাদার সঙ্গে অন্য যে সব রঙের আভা আছে। শ্যামাভ সাদা—ক্যারকাটা, সাতসয়ালি মানে মিনিভেট, চড়াই, সব ছিটছিট। Buzzard Eagle, যাকে দেশী ভাষায় বলে তিস্‌সা, আর খয়রার ডিম যে নীলাভও হয় তা আগেই বলেছি। তারপর আসুন—Pinky White—ফটিকজল, বুলবুল, সাধারণ চিল। ফটিকজলের সঙ্গে চিলের কি আকাশ-পাতাল তফাত! কিন্তু ডিমের রঙের ক্ষেত্রে মিলেছে এসে দুজনে। ভারি অদ্ভুত না? সারসের ডিমও Pinky White হয়, Pale green-ও হয়। এদের প্রত্যেকের ডিমে ছিটছিট। এর পর লিখুন Reddish white—লালমাথা বাজ, দর্জিপাখি এদের ডিম নীলাভও হয়। ডাহুক, ডাহুকের ডিম, ক্রীম রঙের হয় আগেই বলেছি। সকলের ডিমই ছিটছিট। তারপর লিখুন, পীতাভ সাদা—বগেরি, ভরত, তিলেবাজ, মাঠ-চিল সব blotched। গ্রেইশ হোয়াইট—শঙ্খচিল, যার স্বরে আনন্দবাবু সারং সুর শুনেছেন, আর Bustard Quail. তারপর লিখুন, কফি-সাদা—ময়ূর, এদের ডিম Pale creamও হয়। মোটামুটি এই হ'ল ফর্দ। এর থেকে কি বোঝা যায়? একটু গবেষণা করা যাক আসুন।"

বৈজ্ঞানিক হেসে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডানা টোকা শেষ ক'রে বললে, "একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, অধিকাংশ ডিমই ছিটছিট।"

"হ্যাঁ, অনেক ডিমই। এ বিষয়ে একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি। যত গাইয়ে পাখি আছে, সকলের ডিম ছিটছিট। ফটিকজল, বুলবুল, শ্যামা, কালীশ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরি, পাহাড়ীময়না, ভরত, দুর্গা-টুনটুনি—"

"আচ্ছা, কোকিলের কথা বললেন না?"

"ওহো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো! কোকিলেরা তো একটা class by themselves—ওরা আলাদা একটা শ্রেণীই—parasitic—বাংলায় কি যেন ভাল একটা নাম আছে—"

"পরভৃতিক?"

"হ্যাঁ, পরভৃতিক। এরা পরের বাসায় ডিম পাড়ে। আমাদের দেশেই কোকিল সতেরো রকমের আছে। আচ্ছা, এদের কথা বলছি, একটু বিশ্রাম ক'রে নিন আপনি।"

"চা ক'রে আনি?"

"আনুন।"

বৈজ্ঞানিক একটা কাগজে তাড়াতাড়ি নোট লিখতে লাগলেন। ডানা উঠে চা করতে গেল।

"এইবার শুরু করা যাক আসুন। কোকিলদের রঙের বৈজ্ঞানিক নাম Cuculidoe—এটা আবার দু-রকম sub family-তে বিভক্ত—থাক্, অততে দরকার নেই—আমরা যে চার রকম কোকিল এ দেশে সাধারণত দেখতে পাই, তার কথাই লিখুন। প্রথম, যাকে আমরা কোকিল বলি, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কোয়েল, পাশে একটু ফাঁক রেখে দিন, বৈজ্ঞানিক নামটা আমি পরে বসিয়ে দেব। এরা কাক কিংবা দাঁড়কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙও ওদের ডিমের রঙের মতই হয়—ফিকে নীলচে সবুজ গোছের। একটু ছোট। ছিটছিট থাকে।"

আর একবার ডেকে উঠল **কাঠঠোকরাটা**। উৎকর্ণ হয়ে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

"নিন নিন, শিগ্‌গির লিখুন। ওটাকে দেখতে হবে এক্ষুনি। কোকিল জাতের দ্বিতীয় নম্বর পাখি 'চোখ গেল' ইংরেজী নাম Brain-Fever Bird বা Hawk Cuckoo, কারণ হঠাৎ এদের দেখলে বাজ ব'লে ভ্রম হয়। এরা সাধারণত ছাতারে জাতীয় পাখিদের বাসায় ডিম পাড়ে। ছাতারেদের ডিমের মতই এদেরও ডিম নীল—ছিটছিটি নয়, কিন্তু চমৎকার নীল। তৃতীয় যে কোকিলএ দেশে দেখা যায়, তাকে আমরা বলি 'বউ কথা কও', এর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo এরা সাধারণতঃ হিমালয় অঞ্চলে বাচ্চা পাড়ে, এদেশেও হয়তো পাড়ে, ঠিক জানা নেই। যতদূর জানা গেছে, এরা হিমালয় অঞ্চলের পাখি Blue Chat অথবা Laughing Thrush-এর বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ নীল, কখনও ছিটছিটি থাকে, কখনও থাকে না। তারপর চতুর্থ কোকিল যা আমরা দেখতে পাই, তা হচ্ছে চাতক—Pied Crested Cuckoo—এদের সাধারণত বর্ষাকালেই বাংলা বিহার অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও এরা থাকে—বিশেষ ক'রে মাদ্রাজ অঞ্চলে। সিংহলেও প্রচুর আছে। আফ্রিকাতেও এ পাখি খুব দেখা যায়। অনেকের ধারণা এরা শীতকালটা কাটায় আফ্রিকায়, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। এ দেশেই ডিম পাড়ে। এরাও ডিম পাড়ে ছাতারেদের বাসায় কিংবা Laughing Thrush-এর বাসায়। ডিমের রঙ নীল, কিন্তু ছিটছিটি নয়।

আমি যে থিয়োরিটা খাড়া করেছি যে, গায়ক পাখিদের ডিমের গায়ে ছিটছিটি থাকে, এরা তার ব্যতিক্রম বলতে পারেন। কিন্তু এদের ডিমে ছিটছিট না থাকার কারণও আছে। এরা পরের বাসায় চুরি ক'রে ডিম পাড়ে, সেইজন্য তাদের ডিমের মত ডিম পাড়তে হয় এদের। এদের কথা যদি বাদ দেন, তা হ'লে কিন্তু এটা বেশ দেখা যায়, যেসব পাখি গায়ক অথবা শিল্পী অথবা চতুর অথচ মানুষ-ঘেঁষা তাদেরই ডিমের গায়ে ছিটছিটি থাকে। গায়ক পাখিদের নাম আগেই বলেছি। এইবার শিল্পীদের কথা লিখুন। বাসা তৈরি করবার সময় যারা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তাদেরই শিল্পী বলছি। চোরপাখি, ফটিকজল, বুলবুলি, শ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরী, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, দুর্গাটুনটুনি, দর্জিপাখি—এরা অনেক ভাল গায়কই শুধু নয়, ভাল শিল্পীও! এদের বাসা চমৎকার। তারপর যেসব পাখি খুব চতুর ব'লে বিখ্যাত, অথচ যারা মানুষ-ঘেঁষা—যেমন ধরুন কাক, দাঁড়কাক, চড়াই, হাঁড়িচাঁচা, চিল—এদের ডিমও ছিটছিটি এ সবের ব্যতিক্রম অনেক আছে, যেমন ধরুন ময়ূর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচারা খুব যে মানুষ-ঘেঁষা তা নয়, কিন্তু ওদের ডিমেরও চমৎকার বর্ণ-বৈচিত্র্য। তবু কিন্তু একটা কথা মনে হয়—"

বৈজ্ঞানিক চুপ ক'রে গেলেন।

"কি কথা?"

"মনে হয়, এরা শিল্পী-মানুষকে মুগ্ধ ক'রে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের ডিমকে বাঁচাতে চাইছে। এরা মানুষের শিল্প-বোধকে কোন না কোন উপায়ে তৃপ্ত করে। হয় গান গেয়ে, না হয় সুন্দর বাসা-বানিয়ে, না হয় ডিমের রঙ দিয়ে এরা আমাদের মুগ্ধ ক'রে যেন নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। ওদের গুণ দেখে আমরা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি মনে মনে। যাদের বাসা খুব সাধারণ কিংবা যাদের গানের গলা তেমন নেই, যাদের ডিম সাদা, যারা গর্তে বাসা বানায়, অথচ যারা মানুষের সান্নিধ্যে থেকে মানুষের প্রতাপের সহায়তা কামনা করে (কামনা করে কিনা জানি

না, এটা আমার থিয়োরি), তাদের দেখবেন প্রায়ই রূপ আছে। দেখতে চমৎকার। কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্তবৌরী, হুপো, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল, বাঁশপাতি, মাছরাঙা, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, পিট্টা, নানারকম হাঁস। ময়ূর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচাদেরও এই দলে ফেলতে পারেন। যারা চমৎকার নয়, তারা আবার অদ্ভুত—যেমন প্যাঁচা, শকুনি, হাড়গিলা, মানিকজোড়, সোনাজঙঘা প্রভৃতি। এরা অদ্ভুত রস দিয়েই বোধ হয় মানুষের রসবোধকে তৃপ্ত করে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের দৃষ্টি আকষর্ণ ক'রে এরা বিপদেও পড়েছে হয়তো একটু, কারণ মানুষও এদের উপর কম অত্যাচার করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বোধ হয় একমাত্র জীব যারা জ্ঞাতসারে এদের রক্ষণাবেক্ষণও করে নিজেদের রসবোধের তাগিদে। এরা বোধ হয় সেটা বুঝেছে, তাই মানুষের কাছাকাছি এসে নানা ভাবে তাকে আনন্দ দিচ্ছে আর তার বদলে আদায় করছে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ। অনেকটা সিমবায়োসিস ধরনের। পাখিদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপ। বেশির ভাগ সরীসৃপদের ডিম সাদাই হয়, তাই বোধ হয় অনেক পাখির ডিমও সাদা, আর যাদের ডিম সাদা তারা প্রায়ই ডিম পাড়ে গর্তে—লুকিয়ে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যাদের ডিম সাদা, তাদের ডিমেও মাঝে মাঝে রঙের ছিটেফোঁটা লাগছে। ডিমের রঙ বদলাচ্ছে এমন পাখি অনেক আছে—কালীশ্যামা, হাঁড়িচাঁচা এর অতি সাধারণ উদাহরণ। নানারকম রঙের ডিম হয় এদের। দর্জি পাখি, ভরত, বগেরি, টুনটুনি, নাইটজার, বাজ, তিলেবাজ, ময়ূর, রেন কোয়েল, জলমুরগি, কায়েম, সারস, হুক্‌না, গাঙচিল, কালো তিতির প্রভৃতি অনেক পাখি আছে যারা একাধিক বর্ণের ডিম পাড়ে। মনে হয়, ডিমের রঙ নিয়ে এরা যেন পরখ করছে, কোন্‌টা মানুষের পছন্দ হবে। অর্থাৎ পাখিরা যত আধুনিক হচ্ছে, তত যেন তাবা মানুষেব মনোহরণ ক'রে মানুষের বন্ধুত্ব কামনা করছে। মানুষের মধ্যেও যেমন বিশ্ব মৈত্রীর ভাব জাগছে ক্রমশ, মানুষ ক্রমশ যেমন হিংসার পথ ত্যাগ ক'রে প্রেমের পথ আনন্দের পথ বেছে নিচ্ছে, আনন্দ দিচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, পাখিদের মধ্যেও সেইরকম কিছু একটা হচ্ছে হয়তো। তা না হ'লে এত বর্ণ-বৈচিত্র্যের কোনও মানে হয় না যেন। এসব কিন্তু আমার কল্পনা। যুক্তির নিক্তিতে ওজন ক'রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এটাকে দাঁড় করানো শক্ত। প্রথমত, পাখিদের ডিমে পাখিরা সজ্ঞানে রঙ ফলায় না, যদিও অবশ্য ডিমের গায়ের রঙ ডিমটা ডিম্বকোষ থেকে বেরোবার পর যখন ডিম্বনালীতে আসে তখন লাগানো হয়, দ্বিতীয়ত—"

কাঠঠোকরাটা ডেকে উঠল আবার।

"চলুন, ওঠা যাক। বিজ্ঞানের অংশটুকু লেখা হয়ে গেছে। কল্পনার তো শেষ নেই। উঠুন। কাঠঠোকরাটাকে দেখা যাক। চলুন, আর দেরি করবেন না। আসুন।"

তড়াক ক'রে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক বারান্দা থেকে। ডানাও নাবল। পিছু ফিরে ডানার দিকে চেয়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমরা যেটার ডাক শুনলাম, সেটা হচ্ছে Golden-backed Wood-pecker. এ অঞ্চলে আর একরকম আছে, সেটাকে বলে মারহাট্টা Wood-pecker হিমালয় অঞ্চলে আরও দেখা যায় কয়েকরকম। এসব দেশেও আরও দু-একটা ছোট জাতের কাঠঠোকরা আছে। এই Golden-backed Wood-pecker-ই তিন রকম আছে—

আবার ডেকে উঠল কাঠঠোকরা।

সিঁড়িটা দিয়ে তড়বড় ক'রে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাড়াতাড়ি নাবতে গিয়ে ডানার শাড়িটা গেল জুতোর সঙ্গে আটকে। ঘাড় ফিরিয়ে তা দেখতে পেয়েই বৈজ্ঞানিক থমকে

দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর উঠে এলেন তাড়াতাড়ি এবং হাঁটু গেড়ে ব'সে ছাড়াতে লাগলেন সেটা।

"থাক্ থাক্ আমি নিচ্ছি ঠিক ক'রে"—ডানা প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

"তাতে কি হয়েছে! ছটফট করবেন না। বকলশের কাঁটার সঙ্গে আটকে গেছে পাড়টা। বকলশওয়ালা জুতোগুলো শাড়ির সঙ্গে খাপ খায় না ঠিক। এই হয়েছে।"

বৈজ্ঞানিক উঠে দাঁড়ালেন। ডানার মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন, "চলুন।"

ডানার গালের পাশটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ডানার পরনে ছিল সবুজ রঙের শাড়ি একখানা। বৈজ্ঞানিকের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, জাভায় একরকম সবুজ রঙের বনমুরগি আছে, তারা blush করে। মনে কোনও রকম আনন্দ বা উত্তেজনার সঞ্চার হ'লে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে তাদের। টার্কিদেরও হয়, ডানার কথা ভুলে এই কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে।

ডানার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আলোড়ন চলছিল। হঠাৎ তার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল এই শিশুপ্রকৃতির মানুষটিকে। দুরন্ত নদের মত দুর্দম বেগে ব'য়ে চলেছে যেন। কি গভীর আর কি পবিত্র! কোন অহমিকা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, কোন গ্লানি নেই। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে। সেই কম্পিত গহ্বরটা ভেসে উঠল মানসপটে। রত্নপ্রভার মুখটাও।

....কবি আসছেন দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

"বাটান একটাও নেই। কাদাখোঁচাদেরও দেখতে পেলাম না। বকের সারি ব'সে আছে কেবল। দু-একটা সাদা-মাথা খঞ্জনও দেখলুম। ভারি আনন্দ পেলাম আজ।"

"নতুন কিছু দেখলেন?"

"নতুন কিছু নয়, সবই পুরনো, কিন্তু চমৎকার। দোয়েল ডাকছে, চোখ গেল ডাকছে, কোকিল ডাকছে, দুর্গাটুনটুনি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে। মাঠে গম কাটা হচ্ছে, সরষে কাটা হচ্ছে। আমের মুকুলের গন্ধে আমোদিত চারিদিক। অশ্বত্থগাছগুলো ভ'রে উঠেছে সবুজ কচি পাতায়। সজনে গাছে সজনে ঝুলছে। গাছটা যেন সহস্র আঙুল বাড়িয়ে মাটিকে ছুঁতে চাইছে আবার। অপরূপ হ'য়ে উঠেছে নিমগাছটা। আমড়াগাছের ডালে ডালে সবুজ শিখায় লেগেছে সোনালী রঙ, মরকতমণির মত ছোট ছোট ফল ধরেছে। আতাগাছে পরশু পর্যন্ত কিছু ছিল না, আজ ভিড় ক'রে এসেছে কিশলয়ের দল তার গাঁটে গাঁটে। ঘেঁটুফুল ধরেছে, মনে হচ্ছে, সবুজ ছোট একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে যেন লাল ঘোমটার ভিতর থেকে। তেলাকুচো ফলগুলো পেকে টুকটুকে লাল হয়েছে...."

কবি সোৎসাহে ব'লে চলেছিলেন, আরও হয়তো বলতেন, কিন্তু বাধা দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"কবিতা লিখেছেন নিশ্চয়?"

"লিখেছি। একটা পাখির বিষয়ে।"

"কি পাখি? আসুন, বসা যাক এইখানটায়। এইখান থেকে চারিদিক দেখা যাবে বেশ, কাঠঠোকরাটাকে দেখবার সুবিধে হবে। কোন্ পাখির বিষয়ে কবিতা লিখলেন? বক ছাড়া তো বিশেষ কিছু দেখেন নি বলেছেন।"

"না, আর একটা পাখিও লক্ষ্য করেছি। আপনি সেদিন যে একটা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এর ছবি দেখেছিলাম। আমাদের দেশে পাখিটার নাম কানাকুয়া। বইয়ে লিখেছে—কুকো।"

"ও, দেখেছেন? ক্রো-ফেজাণ্ট (Crow Pheasant), চমৎকার পাখি, নয়? বেশ একটু বিশেষত্ব আছে।"

"অদ্ভুত ধরনের"—বলে উঠলেন কবি, "বেশ একটু রহস্যময়। আমাদের আশেপাশেই থাকে, কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে। কাক বা শালিকের মত খেলো হয়ে যায় নি। ও দিকটায় ব'সে ছিলাম, হঠাৎ দেখি, ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল, বেশ গম্ভীরভাবে ভারিক্কি চালে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্যাওড়াগাছের ওপাশে যে নির্জন জায়গাটুকু আছে সেইখানে। কালো রঙের সঙ্গে ডানার বাদামী রঙটা মানিয়েছে চমৎকার। কুকো নামটা ভাল নয়, কানাকুয়ো নামটাও না। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। ভাল হয় নি?"

"বেশ হয়েছে। ওরা কিন্তু জাতে কোকিল, তা জানেন?"

"হ্যাঁ, আপনার বইটাতে পড়লাম তাই। দেখলে মনে হয়, রিটায়ার্ড ডেপুটি বা মুন্সেফ গোছের, ফাজিল ফক্কোড় নয়, নিজের মতে নিজের পথে চলবার মত মনের জোর আছে ব'লে মনে হয়। নিজেই বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, যদিও কোকিল। ডাকে প্যাঁচার মত, কিন্তু নিশাচর নয়—"

"গুপ্ গুপ্ গুপ্ গুপ্"—হঠাৎ ডেকে উঠল বাদামী-কালো।

"আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। হ্যাঁ, এক রকম প্যাঁচার ডাকও অনেকটা ওই রকম, আপনি পড়াশোনা করেছেন দেখছি।"

"ওর বিষয়েই কবিতাও লিখে ফেলেছি একটা। শুনবেন?"

"নিশ্চয় শুনব। পড়ুন।"

কবি ডানার দিকে ফিরে দেখলেন, ডানা ঘাড় ফিরিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছে পরপারের দিকে। গালের পাশটা লাল হয়ে রয়েছে তখনও।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে কবি পড়তে লাগলেন—

বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।
বিদ্রোহ পিক, কোকিল অথচ কোকিল নয়,
সমাজ-বিধিকে অমান্য ক'রে থাকে।
কোকিলের মত ডাকবে না কুহু-কুহু
কিছুতেই নয়,—উঁহু—
দিনের আলোয় প্যাঁচার মতন ডাকবে
কোকিলের মত কালো কালো দুটো ডানা
পছন্দ নয়—না—না—
বাদামী রঙের শাল দিয়ে তাকে ঢাকবে,
আপনার মনে বেড়িয়ে বেড়াবে আস্তে সে
বন-বাদাড়ের ফাঁকে
বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।
পরের বাসায় ডিম সে কখনও পাড়বে না
আপনার ডিমে তা দিতে কখনও ছাড়বে না
বলুক যা খুশি লোকে,

কবি বিরহীর হৃদয় কখনও কাড়বে না।
অজানা বেদনা মনে যদি জমে এসে
হঠাৎ ফেলবে কেশে,
মনে হবে বুঝি ফেটে গেল কারো পাঁজর,
নিঝুম দুপুরে চমকাবে বারে বারে
সে কাশির ঝঙ্কারে
মনে হবে বুঝি বাজল কোথাও ঝাঁঝর!
লুকিয়ে তখন চুপ ক'রে ব'সে থাকবে সে
ঘন পল্লব শাখে
বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল করে?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।

কবি থামতেই বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "বাঃ পাখিটার মোটামুটি জীবন-চরিতই লিখে ফেলেছেন দেখছি। ওর যে 'ঝনন্' করে আর একটা ডাক আছে, সেটাও লক্ষ্য করেছেন উনি—। ...এ কি হ'ল!"

ডানার দিকে চেয়েই তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। কবিও দাঁড়ালেন। ডানা শুয়ে পড়েছে, চোখ বোজা, হাত দুটো মুঠো করা।

"ফিট হয়েছে"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

"তাই তো দেখছি! কি করা যায়?"—কেঁপে উঠল কবির কণ্ঠস্বর।

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ডানার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা সাপের মত সঞ্চারিত হতে লাগল ধীরে ধীরে।

"একটু জল দরকার"—বৈজ্ঞানিক বললেন, "চাকরটাকে খবর দেবেন? কিংবা চলুন, আমরা দুজনে ধরাধরি ক'রে ওঁকে বাসায় নিয়ে যাই। আমি পায়ের দিকটা ধরছি, আপনি মাথার দিকটা ধরুন।"

চিত্রটা কবির-কল্পনায় এমন বিসদৃশ ঠেকল যে, তিনি ব'লে উঠলেন, "না না, সে কি! চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাবেন কি! জল আমি এনে দিচ্ছি এখুনি।"

ছুটে গিয়ে নিজের চাদরটা তিনি নদীর জলে চুবিয়ে নিয়ে এলেন।

চোখে মুখে জলের ছিটে লাগাতেই উঠে বসেছিল ডানা। সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল সে নিজেই। এমন ব্যাপার আর কখনও তো ঘটে নি তার জীবনে! হঠাৎ বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল, তারপর সব অন্ধকার। শুয়ে পড়েছিল সে? আশ্চর্য!

"এখন কেমন লাগছে?"—কবি জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভালই।"

"একটু জল এনে দেব কি আপনাকে? তেষ্টা-টেষ্টা পায় নি তো? রোদের তাত বেড়েছে তো আজকাল।"

"না জলের দরকার নেই।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডানা তারপর সলজ্জ কণ্ঠে যা বললে, তা অপ্রত্যাশিত। বললে, "আপনি আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। ভাঁরি লজ্জা করে আমার।"

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কবি। তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর গলার কাছটা

কেমন যেন ব্যথা করতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে সহজকণ্ঠেই তিনি উত্তর দিলেন, "ও, আচ্ছা, তা বেশ।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "চলুন, যাই।"

"অমরবাবু স্ট্রেচার আনতে গেছেন। একটু ব'স।"

"স্ট্রেচারের দরকার কি? আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

উঠে পড়ল ডানা এবং হাঁটতে শুরু করল। কবিও অনুগমন করলেন।

"আমার কাঁধের উপর হাতটা রাখ না হয়। দুর্বল মনে হচ্ছে না তো?"

ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে ডানা বললে, "না। এমনিতেই যেতে পারব।"

"খুব আস্তে আস্তে চল তা হ'লে।"

কবির কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম উদ্বেগ ফুটে উঠল। তিনি হয়তো ডানাকে স্ট্রেচারের জন্য অপেক্ষা করতে আর একবার অনুরোধ করতেন, কিন্তু কোথা থেকে ঝঙ্কার দিয়ে ডেকে উঠল একটা পাখি। সুরের তুবড়ি ফুটল যেন শূন্যে। কুর কুর কুর কুর কুর কুর, চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল....। ধাপে ধাপে চড়তে লাগল সুর।

"কি পাখি ওটা?"

"পাপিয়া।"

"পাপিয়াই বুঝি 'চোখ গেল' পাখি?"

"হ্যাঁ।"

ডানা আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। কবিও চুপ ক'রে রইলেন। অন্য কোন কারণে নয়, তাঁর মনের ভিতর যা হচ্ছিল তা এত বিচিত্র এত গভীর এত কোমল যে, তাতেই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তিনি, কথা বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলেন না। বাসাটার কাছাকাছি এসে তাঁর চমক ভাঙল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে। দেখা গেল, তিনি স্ট্রেচার এবং লোকজন নিয়ে আসছেন। রত্নপ্রভাও সঙ্গে আছেন।

"ওঁকে হাঁটিয়ে আনছেন?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন শঙ্কিত কণ্ঠে।

"আমার আর কোনও কষ্ট নেই। কেন জানি না, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল তখন, এখন আর কোন কষ্ট নেই।"

কথা কটি ব'লেই ডানা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। রত্নপ্রভা গম্ভীর ভাবে একবার চেয়ে দেখলেন তার মুখের দিকে। কোনও কথা বললেন না। মনে মনে ডানার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন তিনি খুব, কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল না। আর একবার চাইলেন ডানার দিকে। চোখাচোখি হতেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর গম্ভীর মাংসল মুখটা। কোনও কথা বললেন না কিন্তু।

....বাসায় পৌঁছে বৈজ্ঞানিক স্ট্রেচার এবং স্ট্রেচার বাহকদের বিদায় ক'রে দিলেন। তারপর রত্নপ্রভার দিকে চেয়ে বললেন, "আমাদের চা খাওয়াও একটু তুমি। এখানে সব ব্যবস্থা আছে বোধ হয়, না?"

"আছে। আমিই ক'রে খাওয়াচ্ছি, উনি কষ্ট করবেন কেন?" ডানা উঠে ভিতরে গেল। রত্নপ্রভার গম্ভীর চোখে হাসির আভাস ফুটে উঠল আবার একটা। ডানার পিছু পিছু তিনি ভিতরের দিকে চ'লে গেলেন। কবি এবং বৈজ্ঞানিক ব'সে রইলেন বারান্দায়। পাপিয়াটা সমানে ডেকে চলেছে। বৈজ্ঞানিক এই প্রসঙ্গে কিছু বলবেন ভাবছিলেন কবিকে, কিন্তু বাধা পড়ল। পিওন হাজির হ'ল একটা। বললে, সে আনন্দবাবুকে খুঁজছে, টেলিগ্রাম আছে একটা।

কবি ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে পড়লেন টেলিগ্রামটা। বিনয়ের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। তাঁদের নেবার জন্যে লোক আসছে।

কবি চায়ের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাড়ি চ'লে গেলেন।

৮

বিনয়ের বিয়েতে যাবার ইচ্ছে কবির ছিল না। প্রথমত বিয়েবাড়ির গোলমাল ভালই লাগে না তাঁর ; দ্বিতীয়ত, ভয় হচ্ছিল, ডানাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মানস-সরোবরে যে অপরূপ পদ্মটি ফুটছে ধীরে ধীরে, তা ঝ'রে পড়বে এই সব টানা-হেঁচড়ায়। ডানার প্রেমে প'ড়ে তিনি যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তা ঠিক নয়। হাবুডুবু খাওয়ার বয়স পার হয়েছিলেন তিনি। মানসিক গঠনটাও তাঁর অন্য রকম, তবু তিনি প্রেমেই পড়েছিলেন। চন্দ্রের টানে যেমন জোয়ার আসে, ডানার সংস্পর্শে তাঁর মনে তেমনই এমন একটা ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল যা যে কোনও কবির পক্ষে পুলকপ্রদ, অন্য কোনও কারণে নয়, তা কাব্যসৃষ্টির অনুকূলে ব'লে। যা সৃষ্টির প্রেরণায় মনকে উন্মুখ ক'রে তোলে, স্পর্শে নিমেষে মনের মেঘে ইন্দ্রধনু ফুটে ওঠে, কল্পনাবীণায় লক্ষ সুরের সম্ভাবনা কাঁপতে থাকে, তাকে উপেক্ষা করা কবিমনের পক্ষে অসম্ভব, সাধারণ জীবের পক্ষে যেমন অসম্ভব খাদ্যকে উপেক্ষা করা। কাব্যই কবির জীবন, কাব্যেই তাঁর স্ফূর্তি, কাব্যলোকই তাঁর কাছে একমাত্র আনন্দলোক। কিন্তু কাব্যের আনন্দরূপ কবি-মনেও মূর্ত হয় না সব সময়ে, সরসী থাকলেই যেমন কমল ফোটে না। উনপঞ্চাশবায়ু-বাহিত অপরূপ উপলক্ষ এসে হাজির হয় অকস্মাৎ কোন অজানা আকাশ থেকে। শিহরণ জাগে, পাখি ডাকে, সাড়া প'ড়ে যায় কিশলয়দের নিদ মহলে, বাঁশী বেজে ওঠে বনে বনে, কাব্য সুরধুনী মর্ত্যে অবতরণ করেন স্বর্গলোক থেকে। আনন্দবাবু কবি-মন অবসন্ন হয়েছিল যেন এতদিন। ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখতেন বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। ডানার অভ্যাগমে মরা-খাতে বান এসেছে হঠাৎ, মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছে শুষ্ক তরু। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন নতুন ক'রে বিকশিত হয়েছে এই নতুন বৃন্তটির উপর। ডানার প্রেমেই তিনি পড়েছিলেন, কিন্তু সাধারণত প্রেমে পড়া বলতে যে ধরনের জৈবলীলা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। এ তার চেয়ে ঢের বেশি তীব্র। হঠাৎ কোন বাঁশীতে কোনও বংশীবাদক যদি নিজের মনের সুরটি প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে যান, তা হ'লে সেই বাঁশীর প্রতি তাঁর যে ধরনের টান হয়, ডানার প্রতি কবির টানটাও সেই ধরনের। যে বস্তুকে অবলম্বন ক'রে মন অবাস্তব কল্পলোকে উড়ে যেতে পারে, ডানা যেন সেই অপরূপ বস্তু, সেই নিখুঁত দেহ-শিল্প, যার মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিতভাবে। তাই ডানাকে ছেড়ে এখন কোথাও যাবার চিন্তা অসহ্য তাঁর কাছে। কিন্তু মন্দাকিনীকে কি যে বলবেন, তাও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। সত্য কথা বলা অসম্ভব। অনর্থকও। মন্দাকিনী তার ঠিক মর্মটি বুঝবেন না। রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই কবি বাড়ি পৌঁছলেন টেলিগ্রামটি নিয়ে। খবরটা শোনামাত্র উল্লসিত হয়ে উঠলেন মন্দাকিনী।

"যাক, শেষ পর্যন্ত খবর একটা পাওয়া গেল তবু। আমার ভয় হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত ভেসে গেল বুঝি আবার সব। কালই লোক আসছে? তা হ'লে তো রাজু ধোপার কাছে এখনই লোক পাঠাতে হয়, একটি গাদা কাপড় তার কাছে। ঠাকুরটাকেই পাঠাই না হয়—"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। মাত্র একটি দিন হাতে, অনেক কিছু ব্যবস্থা ক'রে যেতে হবে তাঁকে। গিয়েই তো ফিরে আসা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে। অন্তত মাস দুই থাকতে হবে সেখানে।

অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নি, ছাড়বে কি তারা সহজে? তা ছাড়া, খোকনের গ্রীষ্মের ছুটি সামনে। মামাদের আমবাগান ছেড়ে সে কি আর আসতে চাইবে? এখানকার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ক'রেই যেতে হবে। এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিন্তু মন্দাকিনী এক গুরুতর সমস্যায় প'ড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল।

আনন্দমোহন মন্দাকিনীকে খবরটি শুনিয়ে নিজের তেতলার ঘরটিতে গিয়ে ব'সে ছিলেন চুপ ক'রে। পালে হাওয়া লেগেছে, নৌকোটিকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এ কি সর্বনেশে মেঘ দেখা দিলে ঈশান কোণে! বিনয়ের বিয়েতে তাঁর যাবার ইচ্ছে নেই—এর আভাস মাত্র তো প্রকাশ করা যাবে না মন্দাকিনীর কাছে! অসুখের ভান করবেন?

মন্দাকিনী এসে প্রবেশ করলেন।

"ওগো, শুনছ, সুন্দরীকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? পোয়াতি গাই এমনভাবে ফেলেযাওয়া কি উচিত ঠাকুর-চাকরের হাতে? সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায় না? সেখানে আমাদের বেশ বড় গোয়াল-ঘর আছে।"

"পাগল নাকি! গাড়ি পাবে কোথায়? এখন কি আর সেদিন আছে, মানুষই গাড়িতে জায়গা পাচ্ছে না এখন, তা গরু—'

"তা হ'লে উপায়? ও কি, কোমরে হাত বুলোচ্ছ কেন?"

"কোমরটায় ব্যথা হয়েছে।"

"তা হ'লে তুমি থেকে যাও না হয়। ওখানে গিয়ে অত্যাচারে আবার বেড়ে যায় যদি। অত্যাচার হবেই, ভিড়ের বাড়ি তো। সেই ভাল। ঠাকুর তো রইল, লোকটা রাঁধে ভাল, মসলার হাতটা কম। তুমি থাকলে সুন্দরীর সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব। সেই ভাল।"

কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে কবি বললেন, "ওঁরা আবার মনে করবেন না তো কিছু? বিনয় হয়তো ভাববে—"

"কি আবার ভাববে? কোমরে ব্যথা নিয়ে যেতে হবে তা ব'লে?" কবি চুপ ক'রে রইলেন। মন্দাকিনী তাঁর দিকে এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যার অর্থ—বুড়ো বয়সে এমন হুজুকে হওয়ার কোন মানে হয় না।

কবি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। আকাশে ধপধপে সাদা স্তূপ-মেঘ জ'মে রয়েছে খানিকটা, আর সেই পটভূমিকায় বিরাট একটা পাখি ডানা মেলেছে। সাদার মাঝখানে কালো। চমৎকার দেখাচ্ছে। দূরবীনটা তুলে নিয়ে দেখলেন। দেখে কিন্তু হতাশ হয়ে গেলেন একটু। শকুনি। তখনই আবার মনে হ'ল, এতে দুঃখ করবার কি আছে? শকুনিও পাখি। সৃষ্টির মহাকাব্যে ওর স্থান দোয়েল-কোকিলের চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথাও মনে হ'ল। যুক্তি দিয়ে আমরা যা মানি, কার্যকালে তা মানি কি? নিরপেক্ষতার পোষাকী মুখোশটা দার্শনিকতা আস্ফালন করবার সময়ই ব্যবহার করি আমরা। প্রতি মুহূর্তের কাজে কিন্তু উৎসাহ পাই নিজেদের অতি-সঙ্কীর্ণ ভাল লাগার প্রেরণায়। পাপিয়া দোয়েলই আমাদের আনন্দ দেয়, শকুনি নয়। শকুনি অতি উপকারী পাখি জেনেও আমরা তাদের আমল দিতে চাই না ভাল-লাগার ক্ষেত্রে। অথচ উপকারী পাখির উপকারকে আমরা যে তুচ্ছ করি তাও নয়। এই চিন্তাটা অনেকক্ষণ আবিষ্ট ক'রে রাখল কবির মনকে। প্রাচীন গ্রীকদের কথা মনে পড়ল। তাঁরা তাঁদের সমাজব্যবস্থায় মোহিনী এবং কল্যাণী উভয়েরই গৌরবময় স্থান নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন। বিবাহ করতেন স্বাস্থ্যবতী নারী দেখে, যাঁরা সন্তানের জননী হয়ে গৃহলক্ষ্মীর বেদী অলঙ্কৃত করতেন, যাঁরা ছিলেন গার্হস্থ্যধর্মের প্রাণস্বরূপ, জাতির জন্য বীর

সন্তান মানুষ হ'ত যাঁদের কোলে। মোহিনী হওয়ার দায়িত্ব তাঁদের ছিল না। মোহিনীদের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র মাধুর্য বিশিষ্ট। তাঁদের কাজ ছিল মুগ্ধ করা। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পী কবি রাজা সেনাপতি ছাত্র অধ্যাপক সকলকেই প্রেরণা যোগাত ওই মোহিনীর দল। তাদের মুঞ্জরিত যৌবনশ্রী স্পর্শমণির মত সকল স্বপ্নকেই সোনার স্বপ্ন ক'রে তুলতে পারত। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, ডানা আর মন্দাকিনীকে অবলম্বন ক'রে মন তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ করেছে। সেই স্বপ্নলোকে সুন্দর হয়ে উঠেছে দুজনেই। ছন্দাবিষ্ট মন বন্দনা করছে দুজনকেই।

স্নিগ্ধ শ্যামল ছোট গ্রামখানি
বাঁধিছে শতেক বন্ধনে
দূর দিগন্তে কার হাতছানি
ডাকিছে অচেনা নন্দনে
চেনা-অচেনার আলো-আঁধারিতে
দোলে অপরূপ হিন্দোলা
পুরাতন মন বলে বারে বারে
নব সুর নব ছন্দ নে।

কত নিঃসাড় হ'ল যে উতলা
অশান্ত হ'ল শান্ত যে
কত লৌহের শান্তি অচলা
নাশিল অয়স্কান্ত যে
দোলে হিন্দোলা সীমা-অসীমায়
শুষ্ক তরু ও মঞ্জুরে
পরিচিত পথে পথ ভুলে যায়
অতীব প্রাচীন পান্থ যে।

কবিতাটা লিখে শান্তি পেলেন তিনি। ডানার প্রতি তাঁর মন যে আকৃষ্ট হয়েছে—এর একটা সঙ্গত অজুহাত আবিষ্কার ক'রে ফেললেন যেন। তাঁর মনে হ'ল, জীবনের এবং জাগতিক ব্যাপারের কোনও কিছুর উপরই তো হাত নেই তাঁর। বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে—এ যেমন তিনি রোধ করতে পারেন না, ডানার প্রতি এই আকর্ষণও তেমনই অনিবার্য। এও রোধ করার সাধ্য তাঁর নেই। সে চেষ্টা না ক'রে বরং আত্মসমর্পণ করাই ভাল। শুধু তাই নয়, নিয়তিনির্দিষ্ট এই বিধানকে মেনে নিয়ে সেটা উপভোগ করাই উচিত। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ একটি বিবেকের মোহে প'ড়ে আত্ম-নির্যাতন করার কোনও অর্থ হয় না। নিঃসাড়কে যে শক্তি উতলা করে, চক্রবালরেখায় যে অজানার আহ্বান উন্মুখ ক'রে তুলছে সমস্ত চিত্তকে, জড় লৌহকে চঞ্চল ক'রে তুলছে যে অচেনা চুম্বকের মায়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ নেই! কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে আনন্দ আছে। জীবনে আনন্দই তো কাম্য। হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। শিস দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন।

—

....অকস্মাৎ একটা তীক্ষ্ণ সুরে ছন্দিত হয়ে উঠল চারিদিক। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, পুরুষ টুনটুনিটা কল্‌কে ফুলের ডালে ব'সে মুখ উঁচু ক'রে ডেকে চলছে। কুচকুচে

কালো পোষাক প'রে বরবেশে সেজেছে। কাঁঠালগাছে গিয়ে বসল আবার। দুরন্ত দামাল একটা কালো প্রজাপতি যেন। কিংবা এক টুকরো কালো মেঘ। অন্তর্নিহিত বিদ্যুতের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে। আবার ডাকল। মনে হ'ল মূলতানের আলাপ যেন। টু হুইট টু হুইট টু হুইট—গুলতানি করতে করতে আবার ছুটে গেল আমগাছের দিকে। ওই টুনটুনি-বউ ব'সে আছে আমার মুকুলের আড়ালে। উড়ে গেল অন্য গাছে। আবার নতুন একটা সুরের ফোয়ারা ছড়িয়ে পুরুষ পাখিটা ছুটল তার পিছু পিছু। দুপুরের রোদ তপ্ত হয়ে উঠেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে একটা। মাঠে মাঠে গম যবের পক্ব স্বর্ণকান্তিতেও যেন যৌবনের আভাস ফুটেছে। হাওয়ায় দুলে দুলে তারা যেন উপভোগ করছে দামাল টুনটুনি-দম্পতীর প্রণয়লীলা। সামনে ডেকে চলেছে পুরুষ টুনটুনিটা। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ উতলা ক'রে তুলেছে প্রকৃতিকে। এক ঝাঁক প্রজাপতির মত উড়ে এল এক ঝাঁক উপমা কবির মনে, আকাশের কোন অদৃশ্য স্বপ্নলোক থেকে। ছন্দের আবেগে কাঁপতে লাগল মন। টেবিলে গিয়ে বসলেন। টুনটুনির উদ্দেশ্যে কবিতা লিখতে শুরু করলেন।

১

কুচকুচে রঙ ছোট্ট পাখি
  গাইল কি সুর মূলতানই?
বুকফাটা এ কান্না নাকি
  কিংবা কেবল গুলতানই!
নাইক মুকুট নাই জড়োয়া
নাই তবু তার কুছ পরোয়া
তম্বি ক'রে বেড়ায় যেন
  হাবশীদেশের সুলতানই।
আলোর বানে দিচ্ছে পাড়ি
  আঁধার নায়ের মাল্লা নাকি
কাশিম মিঞার খুঁজছে বাড়ি
  মরজিনার আবদুল্লা নাকি!

২

টুনটুনি-বউ কোথায় ওগো
  বসলে গিয়ে কার ডালে
রোদ-বাহারি গান শোন গো
  তাল দাও না তার তালে।
কান্না ও কি লক্ষ হিয়ার
মেঘদূত কি যক্ষ-প্রিয়ার
চোখের তারা কোন্ তন্বীর
  জীবন্ত তিল কার গালে?

সূর্যলোকের হাপর থেকে
  ছিটকে এল কয়লা নাকি
কিংবা এল দ্বাপর থেকে
  সেই কেষ্ট গয়লা নাকি।

৩

আলোক-ধোয়া কয়লা ও যে
    আগুন জ্বলে ওর বুকে
রাজার ছেলে গয়লা ও যে
    রাধার বাঁশী ওর মুখে
চিরন্তনের ওই নমুনা
গঙ্গাবুকে ওই যমুনা
বইছে সুখে তোয়াক্কা নেই
    আজ কাল বা পরশুকে।

মহাকালের শুভ্র ভালে
    মহাকালীর টিপটি যেন
সমুদ্রেরি ঊর্মিজালে
    মাটির ছোট দ্বীপটি যেন।

৯

সেদিন সহসা অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর থেকে ডানা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সঙ্গত একটা কারণ খুঁজে বার করবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে সে মনে মনে। হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে দুজন স্বল্পপরিচিত পুরুষের সামনে এমনভাবে নিজের শালীনতাকে ক্ষুণ্ণ করলে কেন সে? কোনও উঁচু জায়গা থেকে হঠাৎ পদস্খলিত হয়ে প'ড়ে গেলে অনেক সময় লোক যেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারও কি সেই ধরনের কিছু হয়েছিল? সেও কি নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও উচ্চলোকে সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল মনে মনে? কোথায়? ভাবাবেগের আতিশয্যে লোকে সংজ্ঞা হারায় শোনা গেছে। তারও কি তাই হয়েছিল? সেও কি কোনও অন্তর্নিহিত রুদ্ধ ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিল? কি ধরনের ভাবাবেগ? মনে তো পড়ে না কিছু! কিছুই নির্ণয় করতে পারছিল না সে। কিন্তু এ কথাও সে ভুলতে পারছিল না যে, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। এমন একটা কিছু যা উপেক্ষণীয় নয়, যা হয়ত ইঙ্গিতে এমন একটা সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছে যার নিগূঢ় মর্ম তার মর্মবাণীরই আভাস। বীজকে বিদীর্ণ করে যেমন অঙ্কুরের আগ্রহ, ঝড়ের প্রাবল্যে সূচিত হয় যেমন বায়ু-চাপের অসাম্য, তেমনই প্রবল অমোঘ কোনও শক্তি সেদিন ঘোষণা ক'রে গেছে তার অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব, জানিয়ে গেছে তার জাগরণের বার্তা।...

নিজের ঘরের বারান্দায় চুপ ক'রে ব'সেছিল সে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে। ফিট হওয়ার পর থেকে কেমন যেন দুর্বল বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে, যেন কতকাল অনাহারে আছে। হঠাৎ নদীর ধারের শিমুলগাছটা চোখে পড়ল। বিশাল বলিষ্ঠ গাছটা লাল লাল ফুলে ভ'রে রয়েছে। ফুল নয়, ওর বলিষ্ঠতাটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল। চোখে পড়ল ওর দুর্দম পৌরুষটা। মনে হ'ল, কত শীততাপ, কত বর্ষা, কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্রপাত সহ্য ক'রে যুগযুগান্ত দাঁড়িয়ে আছে ও মাথা উঁচু ক'রে। কি একটা পাখি যেন বাসা বাঁধছে ওর ডালে। অমরবাবু বই দিয়েছিলেন একটা পড়বার জন্যে, কোলের উপর ছিল সেটা এতক্ষণ, উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল সেটা। মন কিন্তু বসল না। চোখ বার বার ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল ওই বলিষ্ঠ

শিমুলগাছটাকে, আর মন উৎসুক হয়ে উঠল পাখির বাসাটা দেখবার জন্যে। বইটা রেখে উঠে পড়ল সে। নদীর ধারে শিমুলগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছেই সজনেগাছের উঁচু ডালে ব'সে ছিল একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আস্তে আস্তে ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে ড্য ড্য ড্য ধরনের শব্দ করছিল কিছুক্ষণ থেমে থেমে। ডানাকে দেখে হঠাৎ সেটা উড়ল পাখা মেলে উচ্ছ্বসিত কলরবে চতুর্দিক সচকিত ক'রে। ডানার মনে হ'ল, তাকে দেখে অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠল যেন—এসেছে, এসেছে, ও-ও এসেছে এবার। ডানা শিমুলগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল, নূতন ক'রে বিস্মিত হ'ল সে আবার শিমুলগাছের শিকড়গুলো দেখে, কেবল বিস্মিত নয় রোমাঞ্চিত হ'ল। বলিষ্ঠ শিকড়গুলো কি প্রবল শক্তিতে আঁকড়ে আছে মাটিকে, কি দুর্বার আগ্রহে ঢুকে গেছে মাটির ভিতর! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেগুলোকে। স্পর্শ ক'রে কেমন যেন আনন্দ হ'ল একটু। তারপর বসল তার উপরে। বর্ষাকালে নদীর স্রোতে মাটি ধুয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে শিকড়গুলো। নিশ্চল একটা অক্টোপাস যেন। নিশ্চল, কিন্তু সজাগ, অত্যন্ত সজাগ এবং সক্রিয়। প্রতি মুহূর্তে শোষণ করছে রস। প্রাণরস। একটু দূরে একটা গোদা চিল এসে বসল মাঠের উপর। নখে ক'রে কি যেন এনেছে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ডানা চেয়ে দেখতে লাগল মুগ্ধ বিস্ময়ে। এই হিংস্র পাখিটার হিংস্রতার মধ্যে একটা বিরাট সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে লাগল যেন সে। প্রত্যক্ষ করতে লাগল, কি বিচিত্র প্রেরণায় বিকশিত হচ্ছে জীবনের নব নব রূপ অভিব্যক্তিতে। চরাচরের সমস্ত কিছুই বাঁচতে চাইছে, উপভোগ করতে চাইছে নিজের অস্তিত্বকে নানাভাবে এবং তার জন্যে না করছে এমন জিনিস নেই। ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, সভ্য-অসভ্য, হিংস্র-অহিংস্র সব কিছুই হচ্ছে সে জীবনকে সার্থক করবার প্রেরণায়। সে বাঁচতে চায়, অমৃত চায় এবং সেই জন্যেই চায় এমন একটা আশ্রয়, যাকে অবলম্বন ক'রে সে হাত বাড়াতে পারে আকাঙ্ক্ষিত অমৃতের দিকে। পায়ের তলায় মাটির আশ্রয় না থাকলে আকাশের দিকে তাকানো যায় না, সাগরের রহস্য জানতে হ'লে তরণী চাই। আনন্দসুধা পান করতে হলে চাই একটা পাত্র। ডানার মনে হ'ল, তার তো কিছুই নেই। তার হঠাৎ সে যেন সেদিনের ফিটের কারণটা আবিষ্কার ক'রে ফেললে। মনে হ'ল, অন্তরের গহনলোকে তার গোপন সত্তা স্বপ্ন-প্রাসাদের শিখরে উঠে বোধ হয় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অমৃতের পিপাসায়, হঠাৎ পদস্খলন হয়েছিল তার সেখান থেকে। অলীক স্বপ্ন-প্রাসাদ স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল, কিন্তু শূন্য-লোক থেকে তার আকস্মিক পতনটা মূর্ত হয়ে রইল তার মূর্ছায়। সমস্ত চেতনাই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল তার সেদিন। অন্ধকার হয়ে গেল যেন চতুর্দিক।

...অবলম্বন? শূন্য দৃষ্টিতে সে নদীর দিকে চেয়ে ব'সে রইল। চিলটা উড়ে গেল। দূরে দেখা গেল একটা মাছরাঙাকে, দেখতে দেখতে কাছে চ'লে এল। সাদা রঙে কালোর ডোরা কাটা। জলের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে উড়ে আসছিল। সহসা স্থির হয়ে গেল শূন্যে, পাখা দুটো নাড়তে লাগল কেবল—তারপর হঠাৎ জলের উপর ছোঁ মেরে উড়ে চলে গেল আবার। পদশব্দ শুনে ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, অমরেশবাবু আসছেন হনহন ক'রে।

"আপনি এখানে? স্যাণ্ড পাইপার (Sand Piper) দুটোকে দেখছেন বুঝি? এই বোধ হয় লাস্ট ব্যাচ এইবার ওরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে। স্যাণ্ড পাইপারগুলো অবশ্য সবচেয়ে শেষে যায়, এপ্রিল মে পর্যন্ত থাকে।"

"কোন্‌গুলো স্যাণ্ড পাইপার? আমি দেখতে পাই নি তো।"

"ওই যে ওপারে জলের ধারে ধারে ঘুরছে। এইটে নিয়ে দেখুন।"

গলায় ঝোলানো বাইনাকুলারটা খুলে ডানাকে দিলেন তিনি। ডানা দেখতে লাগল।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। কিন্তু ওগুলো স্নাইপ নয়?"

"না। স্নাইপের মত, কিন্তু স্নাইপ নয়। স্নাইপের লক্ষণগুলো সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়!"

বাইনোকুলারটা বৈজ্ঞানিককে দিয়ে ডানা হেসে উত্তর দিলে, "সব মনে নেই। ফ্যান্‌টেল আর পিনটেল—এই দুটো কথা মনে আছে খালি।"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আচ্ছা, আর একদিন বলব এখন। আমাদেরই মনে থাকে না, আপনি তো মাত্র একদিন শুনলেন। এখন শুনুন যে জন্যে এসেছিলাম। দুটো রেডস্টার্ট ডিসেক্ট্ করেছিলাম, তাদের ওভারিগুলোর সেক্‌শন ক'রে স্টেন ক'রে মাউণ্ট ক'রে ফোটো তুলেছি, এগুলো আমার ওই মাইগ্রেশনের (Migration) প্রবন্ধের সঙ্গে রেখে দিতে হবে। প্রবন্ধটা তো আপনার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, টাইপ করা হয়ে গেছে।"

"ওর সঙ্গেই গেঁথে রাখতে হবে ফোটোগুলো।"

"আর কটা রেডস্টার্ট আছে? সবগুলোকেই ডিসেক্ট্ করবেন নাকি?"

"না, বাকিগুলোকে ছেড়ে দিলাম আজ। রিং পরিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটার পায়ে। অনর্থক কষ্ট পাচ্ছিল বেচারারা।"

"বেশ করেছেন।"

আনন্দিত হয়ে উঠল ডানা খবরটা শুনে। এতদিন সে অনুভব করছিল, রেডস্টার্টগুলোর অবস্থার সঙ্গে তার নিজের অবস্থার কোথায় যেন মিল আছে একটা।

"এবার আর একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করব।"

"কি?"

"এই তো ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হচ্ছে, এইবার পাখিরা বাসা বানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি নানা জায়গায় কয়েকটা বাসা বানিয়ে দেব ভাবছি, দেখা যাক, তার কোনটাতে কেউ আসে কি না! আপনার এখানেও দেব কয়েকটা, আপনিও লক্ষ্য রাখতে পারবেন।"

"পাখির বাসা আপনি কি ক'রে বানাবেন? যন্ত্র আছে নাকি কোন রকম?"

"না না, পাখির বাসা বানাব না ঠিক। আমি কাঠ দিয়ে এমন কয়েকটা আশ্রয় ক'রে দেব যার ভিতর ওরা বাসা বাঁধতে প্রলুব্ধ হবে, অবশ্য হবে কি না সন্দেহ কারণ ওরা ভারি চালাক। বিশেষত যারা গাছের ডালে কিংবা ঝোপে বাসা করে, তাঁরা কেউ আসবে না। বুলবুলি, ওরিওল (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছে কনকসখি), এরা কেউ আসবে না। তবে কতকগুলো মানুষ-ঘেঁষা পাখি আছে, যেমন—শালিক, চড়াই—এরা আসতে পারে। গাইয়ে পাখিদের মধ্যে দোয়েল, সিপাহী বুলবুল অনেকটা মানুষ-ঘেঁষা, কিন্তু ওরা আসবে না। আর আসতে পারে যারা স্বভাবত গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে, যেমন ধরুন বসন্ত-বউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা, ময়না, নীলকণ্ঠ হুপো (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন মোহনচূড়া), প্যাঁচা—ওহো, একটা জিনিস ভুলে গেছি তো এইখানে গেল বছর হুতোম প্যাঁচা দেখেছিলাম ওই দিকটায়। ওরা

নদীর ধারেই সাধারণত থাকে। এই সময়েই ওরা ডিম পাড়ে, আসুন তো, এখনই খোঁজ করা যাক।"

বৈজ্ঞানিক সহসা ঘুরে খানা-খন্দ বনবাদাড় ভেঙে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। এবড়ো-খেবড়ো নদীর পাড়, মাঝে মাঝে গর্ত, কাঁকর আর পাথরের টুকরো ছড়ানো চারিদিকে। এসবের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে বৈজ্ঞানিক এগিয়ে যাচ্ছিলেন! ডানার যেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে একবারও ফিরে তাকান নি, কিন্তু এটা বড় গর্ত লাফ দিয়ে পার হবার পর সহসা তাঁর খেয়াল হ'ল যে, ডানা বোধ হয় এটা লাফিয়ে পার হতে পারবে না। পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। দেখলেন, ডানা অনেক দূর পিছিয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে রইলেন। গর্তটার ওপারে ডানা এসে হাজির হ'ল একটু পরে।

"ওটা লাফিয়ে পার হতে পারবেন?"

"না।"

"তা হ'লে এক কাজ করুন, আপনি গর্তটার ভিতর নেবে এদিকে চ'লে আসুন। আমি হাত ধরে আপনাকে তুলে নিচ্ছি এদিক থেকে।"

তাই হ'ল। গর্তটার ভিতর ডানা কোন রকমে ছেঁচড়ে-মেচড়ে নেবে পড়ল, তারপর এগিয়ে গেল অমরবাবুর দিকে। অমরবাবু ঝুঁকে হাত বাড়ালেন। অমরবাবুর হাত ধরতে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা এল ডানার মনে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ আকর্ষণে পরমুহূর্তেই সে উপরে উঠে পড়ল।

"চলুন, আর বেশি দূর নেই। ওই উঁচু পাড়টার উপর যে গাছটা ঝুঁকে রয়েছে—"

দূরবীন দিয়ে দেখলেন একবার গাছটাকে।

"হ্যাঁ, গাছের গুঁড়িতে গর্তটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব বাসা আছে ওখানে, চলুন যাওয়া যাক।"

আবার অগ্রসর হতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। এদিকটার পথ আরও খারাপ। কেবল উঁচু-নীচু। বড় বড় পাথর প'ড়ে আছে চারিদিকে। পুরনো বাড়ির ভাঙা দেওয়াল একটা হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে রয়েছে এক দিকে। কারও বাড়ি ছিল বোধ হয় এখানে কোন কালে। ডানার চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—এই সত্যটাকে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে এই কষ্টটাকে ডানা তীব্রতর ক'রে তুলতে পারত, কিন্তু সে কথা তার মনেই হ'ল না। তার এসব কিছুই মনে হচ্ছিল না। অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল তার একটা। অতীত জীবনে ফিরে গিয়েছিল সে হঠাৎ। খুব ছেলেবেলায় সে তার বাবার সঙ্গে একবার একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। রাত কাটাতে হয়েছিল সেই পাহাড়ে একটা ডাকবাংলায়। মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। সেই অচেনা জায়গায় নিশীথ রাত্রে তার মনে যে অদ্ভুত অবর্ণনীয় ভাব জেগেছিল, সেইটে যেন ফিরে এল হঠাৎ আবার এই রৌদ্রালোকিত প্রখর মধ্যাহ্নে এতদিনের পর। তা ভয় নয়, দুর্ভাবনাও নয়। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে একা বিছানায় শুয়ে তার সমস্ত চিত্ত যেন একাগ্র হয়ে উঠেছিল, কিসের প্রত্যাশায় তা সে জানে না। কিন্তু উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে সে একটা কিছু আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল। কিসের, তা সে তখনও জানত না, আজও জানে না। কিন্তু প্রতীক্ষা করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, একটা অদ্ভুতপূর্ব কিছু ঘটবে। বুঝি এখনই গভীর রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে আরও নীরব বা সহসা সচকিত ক'রে দেখা দেবে সে। হয়তো সে রূপকথার রাজপুত্র, কিংবা আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য, মানস সরোবরের শ্বেতকমল বা কাব্যলোকের ওমর-

খৈয়াম....ধীরে ধীরে মর্মরধ্বনি উঠেছিল সূচীভেদ্য তমসার মর্ম ভেদ ক'রে, নিস্তব্ধতা ছন্দ পাচ্ছিল ধীরে ধীরে, সে চুপ ক'রে শুয়েছিল, বিনিদ্র নয়নে...।

"একটা মুশকিল হ'ল কিন্তু। ওঠা যাবে কি ক'রে?"

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে ডানা আত্মস্থ হ'ল। দেখলে বৈজ্ঞানিক উর্ধ্বমুখ হয়ে হেলানো গাছের গুঁড়িটার দিকে চেয়ে আছেন। উঁচু পাড়ের উপর হেলে আছে বিরাট বটগাছটা।

"ওই গর্তটা দেখতে পাচ্ছেন—ওই যে চওড়া কালো দাগটা যেখানে রয়েছে? ওখানে হুতোম প্যাঁচার পক্ষে আইডিয়াল বাসা হওয়া উচিত।"

দূরবীন লাগিয়ে দেখতে লাগলেন। ডানা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন একটা বিরাট বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নির্ভয়ে। বাঘটা এখন নির্নিমেষে চেয়ে আছে হুতোম প্যাঁচার বাসার দিকে, তার সমস্ত আগ্রহ এখন ওই দিকেই নিবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু হঠাৎ যদি সে তার দিকে ওই আগ্রহ নিয়ে দৃষ্টি ফেরায়—একটা শিহরণ ব'য়ে গেল তার সর্বাঙ্গে।

"ওটা প্যাঁচারই বাসা, বুঝলেন—ও, এই যে—"

হঠাৎ বৈজ্ঞানিকে লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন, মাটিতে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন কি যেন।

"এই যে পালক রয়েছে এখানে মাছের আঁশও রয়েছে। ও, কেটুপার পালকও রয়েছে দু-একটা। আর সন্দেহ নেই, ঠিক ওইটেই ওর বাসা। বাসার ভিতরটা একবার দেখা দরকার। কিন্তু মুশকিল, অত উঁচুতে ওঠা যায় কি ক'রে বলুন তো? একটা মই আনতে হবে আর কি।"

হঠাৎ তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"এক কাজ করবেন? এখনই তা হ'লে ডেফিনিট্লি বোঝা যায়।"

"কি বলুন?'

"আমার পিঠের উপর দাঁড়াতে পারবেন? আমি সামনেব দিকে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি এই পাথরটায় ভর দিয়ে। আপনি ওই শিকড়টা ধ'রে ওই খাঁজটায় পা দিয়ে আমার পিঠের উপর চড়ে দেখুন তো, ঠিক নাগাল পেয়ে যাবেন।"

এই প্রস্তাবে ডানা এত বিস্মিত হয়ে গেল যে, তার নির্বাক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্বাক হতে পারলে না সে। বরং তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"ছি ছি, কি যে ছেলেমানুষি করেন আপনি! আপনার পিঠের উপর দাঁড়াব কি?"

"ও আচ্ছা, থাক তা হ'লে।"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তিনি একজন মহিলার কাছে অসঙ্গত প্রস্তাব ক'রে ফেলেছেন—এ বোধটা সহসা জাগ্রত হ'ল তাঁর মনে। কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে ডানার মনে হ'ল, যেন কোনও ক্রীড়নক-লুব্ধ শিশুর হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিয়েছে কেউ। মায়া হ'ল তার।

"আপনার পিঠের উপর দাঁড়ালে আপনার লাগবে না?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি।

"কিছুমাত্র না। আপনি আর কত ভারী হবেন!"

"খুব হালকাও নই, মাস ছয়েক আগে আট স্টোন ছিলাম।"

"মোটে? ওতে কিছু হবে না আমার। রত্না পাক্কা দশ স্টোন। পরেশনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলাম আমরা একবার। হেঁটে উঠেছিলাম। কিছুদূর গিয়ে রত্না হাঁপিয়ে পড়ল। তখন কিছুদূর তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু কষ্ট হয়নি তো।"

ডানা অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। তার ভয় হচ্ছিল, চোখাচোখি হ'লে সে হেসে ফেলবে এবং তা হ'লে পরদাটা উড়ে যাবে হঠাৎ। কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল তার একটু।

বৈজ্ঞানিক বলতে লাগলেন, "আর কষ্ট হ'লেই বা কি! ওদেশের বৈজ্ঞানিকেরা পাখিদের বিষয় জানবার জন্যে কি কষ্টই যে করেছেন, তা যদি পড়েন, অবাক হয়ে যাবেন। হিউম সাহেব, রিপ্‌লে সাহেবের বইগুলো দেব আপনাকে, প'ড়ে দেখবেন। পড়লে অবাক হয়ে যাবেন। বনে জঙ্গলে, পর্বতে মরুভূমিতে, উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে, কোথায় না গেছে ওরা পাখিদের খবর জানবার জন্যে! আর আপনি এইটুকু কষ্টের কথা ভাবছেন? তা ছাড়া কষ্ট হবে না আমার, বিলিভ মি, আসুন।"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে সামনের পাথরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। চতুষ্পদ জন্তুর মত দেখতে হ'ল অনেকটা।

"আসুন, উঠে পড়ুন। ওই খাঁজটায় পা দিয়ে শিকড়টা ধরুন। তারপর পিঠে পা দিন আমার।"

ডানার মনে হ'ল, খরস্রোতে প'ড়ে গেছে সে, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই আর। তবু সে শেষ চেষ্টা করলে একবার এবং করতে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরও জটিল ক'রে ফেললে।

"দেখুন গুরুজনের গায়ে পা দেওয়াটা কি উচিত হবে?"

"গুরুজন! মানে? কে গুরুজন?"

"বিদ্যায় বুদ্ধিতে বয়সে সব বিষয়েই তো আপনি বড়।"

"গড়্!"

বৈজ্ঞানিক উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"তার চেয়ে সোজা ভাষায় বলুন না, আমি উঠব না। রত্না থাকলে উঠত কিন্তু। রত্নার আসবারও কথা আছে এখনই। মিস্ত্রির আর কাঠের বাক্স-টাক্স নিয়ে আসতে বলেছি তাকে"— তারপর হাতঘড়িটা দেখে বললেন, "এসেও গেছে হয়তো এতক্ষণ। আপনি যদি না উঠতে চান, তা হ'লে অবশ্য জোর করতে চাই না। আপনি পিঠ পেতে দিলে আমি উঠতে রাজি আছি। কিন্তু না, আমি চোদ্দ স্টোন, আমার ভার সহ্য করতে পারবেন না আপনি। চলুন যাওয়া যাক তা হ'লে। উঠে দেখলেই পারতেন কিন্তু। প্যাঁচাটা আছে কি না এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হ'ত আপাতত। রীতিমত আয়োজন ক'রে ডিমের খোঁজ পরে করতাম তা হ'লে।"

"আপনি যখন ছাড়বেন না, উঠছি।"

"হ্যাঁ আসুন।"

সোৎসাহে আবার পিঠ পেতে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিক। খাঁজে পা দিয়ে এবং শিকড় ধ'রে তাঁর পিঠের উপর উঠে পড়ল ডানা।

"দেখতে পাচ্ছেন গর্তটা?"

"হ্যাঁ।"

"হাত ঢোকাবেন না যেন, ঠুকরে দিতে পারে। এক কাজ করুন, ডাল-টাল ভেঙে নিন একটা, আর সেইটে ভিতরে ঢুকিয়ে দেখুন।"

ডাল ভাঙবার দরকার হ'ল না আর। গর্তের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই 'হিস্‌স্‌' ক'রে তর্জন ক'রে উঠল কি যেন গর্তের ভিতর থেকে।

"গর্তের ভিতর হিসহিস করছে কি যেন। সাপ হতে পারে।"

"হিসহিস করছে? তা হ'লে প্যাঁচা আছে ঠিক। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?"

"না।"

গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে ঘাড় ফেরাতেই আর একটা জিনিস চোখে পড়ল ডানার। তারা যেখানে ছিল, সেখানে নদীর পাড়টা খুব উঁচু। আর কিছুদূর গিয়ে পাড়টা খাড়া নেবে গেছে। নীচে গভীর খাদ একটা। তাতে জল ঢুকছে এসে। জলের এক ধারে চওড়া পাথর একটা এগিয়ে এসেছে ছোট বারান্দার মত। ডানা দেখতে পেলে, তার উপর ব'সে আছেন রূপচাঁদ আর সনাতন মল্লিক। সনাতন মল্লিক ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি। রূপচাঁদ রূপবীন দিয়ে তাদেরই দেখছেন বোধ হয়।

"নেবে পড়ুন তা হ'লে।"

ডানা নেবে পড়ল। নেবে প্রণাম করলে বৈজ্ঞানিককে।

"আরে, ছি ছি, ও কি, এটা কি হ'ল?"

ডানা কোনও উত্তর দিলে না। বৈজ্ঞানিক অপ্রস্তুত মুখে ক্ষণকাল থেকে সোৎসাহে যা বলতে লাগলেন, তা প্রণাম-বিষয়ক কিছু নয়।

"দেখলেন? বললাম, প্যাঁচা ঠিক আছে। এগুলো খুব সম্ভবত হুতোম প্যাঁচা—কেটুপা জোলোনেন্‌সিস (Ketupa Zeylonensis), খুব বড় দেখতে। মুখটা বেড়ালের মুখের মত। দেখি যদি ধরতে পারি এটাকে। চলুন যাওয়া যাক এবার। রত্না বোধ হয় ব'সে আছে এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষায়।"

হঠাৎ ঘুরে চলতে শুরু ক'রে দিলেন তিনি। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। শিমুলগাছটার কাছাকাছি একটা বড় গাম্‌হার গাছ ছিল। দেখা গেল, তার উঁচু ডালে কাক বাসা বাঁধছে। বৈজ্ঞানিকই দেখতে পেলেন আগে।

"ওই দেখুন, কাক বাসা বাঁধছে। ওটাতে লক্ষ্য রাখবেন। কোকিল এসে ঠিক ডিম পেড়ে যাবে ওতে।"

"কি ক'রে বুঝব তা?"

"কাক যখন ডিম পাড়বে, তখন দেখবেন, পুরুষ-কোকিলটা কাকের বাসার কাছাকাছি এসে খুব ডাকাডাকি করছে। কোকিলের ডাক কাকেরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। ডাক শুনলেই বাসা ছেড়ে তাড়া করে কোকিলটাকে। স্ত্রী-কোকিল লুকিয়ে থাকে আশেপাশে। সে তখন শূন্য বাসায় এসে ডিম পেড়ে চ'লে যায়। অনেক সময় কাকের ডিম ফেলে দিয়ে নিজের ডিমটি রেখে যায়।"

ভারি আশ্চর্য তো! কাকেরা নিজের ডিম চিনতে পারে না?"

"অনেক পাখিই পারে না। বেশি দূর যেতে হবে না, মুরগিরাই অপরের ডিমে বিনা আপত্তিতে তা দেয়। ডিউয়ারের (Dewar) 'বার্ডস্‌ অ্যাট দি নেস্ট্‌' (Birds at the nest) বইটা প'ড়ে দেখবেন। বইটা আছে আমার কাছে।"

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন দুজনে। ডানা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টিতে রূপচাঁদের মুখটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল তার মনে।...

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল, রত্নপ্রভাও আসছেন, সঙ্গে জন চারেক লোক রয়েছে। একজনের কাঁধে একটা মই, দুজন দুটো কাঠের বাক্স ব'য়ে আনছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে একজন ছুতোরমিস্ত্রি। রত্নপ্রভাকে দেখে বৈজ্ঞানিক বালকের মত ছুটে চ'লে গেলেন তাঁর দিকে।

"জান হুতোম প্যাঁচার সন্ধান পেয়েছি আজ আমরা। ও দিকের ওই বিরাট বটগাছটায় আছে, আমি বলি নি তোমাকে? ডিম পেড়েছে সম্ভবত। মইটা এনেছে, ভালই হয়েছে। যাবে এখনই?"

"এগুলো আগে টাঙানো হোক"—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন রত্নপ্রভা।

"ও হ্যাঁ। বাঃ, কাঠের গুঁড়িটা কেটে এটা বেশ চমৎকার হয়েছে তো!"

"তোমার বইয়ে যেমন ছবি আছে, ঠিক তেমনই করিয়েছি। কোথায় টাঙাবে ব'লে দাও।"

খেলনা পেলে শিশু যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, বাক্স দুটো পেয়ে বৈজ্ঞানিক তেমনি হয়ে উঠলেন। ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখছেন? এই গুঁড়ির টুকরোটা মাঝামাঝি লম্বালম্বি, মানে—Longitudinally চিরে তার ভিতর থেকে কিছু কাঠ কুরে বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। তারপর টুকরো কাঠ দুটো স্ক্রু দিয়ে জুড়ে বাইরে থেকে উপরের দিকে এই গর্তটা ক'রে দেওয়া হয়েছে পাখি ঢোকবার জন্যে। গাছের গুঁড়িতে গর্ত আর সুড়ঙ্গ ক'রে যে সব পাখি বাসা বানায়, যেমন—কাঠঠোকরা, বসন্ত-বউরি, ভগীরথ, তাঁরা হয়তো এতে এসে বাসা বানাতে পারে। এই বাক্সটাও ওই প্ল্যানেই তৈরি, তবে এটা তক্তা দিয়ে তৈরি। এইটে ওই তেঁতুলগাছটায় টাঙিয়ে দেওয়া যাক, আর এইটে, মানে—গুঁড়ি দিয়ে তৈরি যেটা, সেটা ওই আমগাছটায় দাও। এই শোন, এদিকে এস।"

শিশুর মত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। রত্নপ্রভার চোখের দৃষ্টিতে স্নেহস্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য চিকমিক করতে লাগল। ডানার দিকে এক নজর চেয়ে ঈষৎ মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

১০

ডানার কাছ থেকে তেমন কোনও সাড়া না পেয়ে রূপচাঁদ হতাশ হন নি, বিস্মিতও হন নি, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এ ধরনের মেয়েরা যে ধরনের সাড়া দেয়, তা প্রায়ই এত মৃদু, এত প্রচ্ছন্ন হয় যে, অনেক সময় বোঝাই যায়না। তা বোঝবার জন্যে শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকলেই যথেষ্ট হয় না, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও প্রয়োজন। ওর কাছে অমরবাবু আর আনন্দমোহন যে জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা ভেদ ক'রে কিংবা অবলুপ্ত ক'রে নতুন রকম একটা কিছু করার মানসিক ক্ষমতা রূপচাঁদের যে নেই তা নয়। কল্পনা তাঁর প্রচুর আছে, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেওয়ার মত অর্থ নেই। ওকে নিয়ে এখন কলকাতা-বম্বে-দিল্লী-দার্জিলিং-পুরী-ওয়ালটেয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারলে অনেকটা কাজ হ'ত। ওরই হিতার্থে এই ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে, সে ভানটা করতে হ'ত অবশ্য—রূপচাঁদ সে ভান করতেও পারতেন—কিন্তু টাকা কই? তা ছাড়া চাকরি এবং তৃতীয় বাধা বকুলবালা। এখানেই কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি সেটা? আপিসে কাজ করতে করতে, পথ চলতে চলতে, রাত্রে বকুলবালার পাশে শুয়ে শুয়ে প্রায়ই কথাটা ভাবনে রূপচাঁদ।

...চমৎকার জরির পাড় দেওয়া একখানা নীলাম্বরী শাড়ি নিয়ে সকালে সেদিন হাজির হলেন রূপচাঁদ ডানার কাছে। ডানা পড়ছিল।

"এই নাও।"

"কি ওটা?"

"তোমার জন্মদিনের উপহার।"

"আজ পঁচিশে ফাল্গুন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার জন্ম-তারিখ আপনি জানলেন কি ক'রে?"—একটু বিব্রত-ভাবে উঠে দাঁড়াল ডানা।"

"তুমি আমাকে যে 'বলাকা'টা পড়তে দিয়েছিলে, তাতেই লেখা ছিল। তোমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন কে একজন সতুদা।"

"ও বইটা আপনার কাছে আছে বুঝি? আমি খুঁজছিলাম কাল।"

"কাল দিয়ে যাব। শাড়িটা দেখ দিকি, পছন্দ হয় কি না?"

"কেন কিনতে গেলেন মিছিমিছি? ওসব শাড়ি-টাড়ি ভাল লাগে না আমার।"

রূপচাঁদ স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "তুমি এ কথা বলবে তা জানতাম। তবু না কিনে পারলাম না। ময়ূরের পেখম না হ'লে চলে না যে!"

"কিন্তু পেখম ধরে তো পুরুষ-ময়ূর, সেদিন পড়লাম।"

"ঠিকই পড়েছ।"

আবার চুপ ক'রে গেলেন রূপচাঁদ, কিন্তু ভাষাময় হয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—হ্যাঁ আমারই পেখম ওটা। দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, আনন্দিত হও।

পেখমের নিগূঢ় অর্থটা উপলব্ধি করবামাত্র ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল হঠাৎ। রূপচাঁদ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। মৎস্যশিকারী তিনি, ধৈর্যের তাঁর অভাব নেই। মিনিট দুই পরেই কিন্তু ফিরে এল ডানা। মনে হ'ল, যেন একটা মুখোশ প'রে ফিরেছে। ভাবলেশহীন মুখ। ডানার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে একটু আশ্বস্তই হলেন যেন রূপচাঁদ। আপাত-ঔদাসীন্যের যবনিকা মানেই যবনিকার ওপারে এমন একটা-কিছু ঘটছে যা অনাবৃত রাখতে লজ্জা করে। এইটেই তো চান রূপচাঁদ। কিন্তু সেই একটা-কিছুর স্বরূপটা কি?

"বড্ড গম্ভীর হয়ে গেলে যে হঠাৎ?"

হাসবার চেষ্টা করলে ডানা। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে।

রূপচাঁদ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "দেখ, জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারাটাই আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকেই আমাদের অমরাবতী প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যারা রসিক, তারা সেটা খুঁজে বার করতে পারে। যারা বেরসিক, তাদের সে সামর্থ্যই নেই মোটে। কিন্তু রসিকরা যখন নীতি বা ধর্মের প্যাঁচে প'ড়ে কৃচ্ছ্র সাধনের কসরৎ করে, তখন ব্যাপারটা শুধু হাস্যকরই হয় না, করুণও হয়ে পড়ে। তোমার মত মেয়ের কাছে যে রসের দাবি নিয়ে আসি, সে দাবি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, তা বিশ্বপ্রকৃতির দাবি—একুটু অন্তত মনে রেখো।"

স্থূল কথাটার মর্মটুকু ডানার কাছে এক নিশ্বাসে ব'লে ফেলে রূপচাঁদ যেন ঈষৎ হালকা বোধ করতে লাগলেন। প্রকাণ্ড একটা বোঝা নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দিয়ে কুলী যেমন আরাম বোধ করে, তেমনই যেন আরাম বোধ করলেন তিনি একটা। তিনি আশা করেছিলেন, ডানা

এরও কোন উত্তর দেবে না। কিন্তু ডানা ঈষৎ হেসে সংযতকণ্ঠে যা বললে, তাতে বিস্মিত হ'লেন তিনি। ডানার হাসিটা অতি মধুর লাগল তাঁর।

"তা কি আর জানি না!"—ডানা বললে,—"কিন্তু আপনি জিনিসটার একটা দিকই দেখছেন কেন? দুই আর দুই যোগ ক'রে চার হয় এটা যেমন সত্যি, এক আর তিন যোগ ক'রে চার হয় সেটাও তেমনই সত্যি। পাঁচ থেকে এক বাদ দিলেও চার হয়। চার সংখ্যায় অসংখ্য রকম উপায়ে পৌঁছানো যায়।"

"ঠিক বলেছ। বাঃ!"—হঠাৎ উল্লসিত হবার ভান করলেন রূপচাঁদ।

"আপনি এখন বসবেন কি? চা ক'রে আনব?"

"তুমি এখন কি করবে?"

"আমাকে অমরবাবুর একটা লেখা টাইপ করতে হবে। বিকেলেই চেয়েছেন।"

"ও, তা হ'লে আমি উঠি। আচ্ছা, অমরবাবুর কাজটা ভাল লাগছে তো?"

"খুব ভাল লাগছে।"

"ভাল লাগলেই ভাল। আচ্ছা উঠি তবে এখন। কাল 'বলাকা'টা দিয়ে যাব।"

'রূপচাঁদ উঠে পড়লেন।'

পরদিন ডানার বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সনাতন মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গে'ল হঠাৎ। সনাতন মল্লিকের সাঙ্গোপাঙ্গোদের দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ। এদের নিয়ে কোথায় চলেছেন ভদ্রলোক? জনকয়েক সাঁওতাল প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক। বন্দুকধারীও আছে জন দুই।

"কোথা চলেছেন মল্লিক মশাই এই দুপুরে? শিকারে নাকি?"

"কাক মারতে।"

"হঠাৎ এ খেয়াল?"

"খেয়াল নয়, চাকরি। শ-খানেক কাক মেরে আনতে হবে—হুকুম হয়েছে।"

"কি হবে?"

"রিসার্চ, রিসার্চ—"

"কাক নিয়ে?"

"কাক বক শালিক চিল শকুন কেউ বাদ যাবে না। আপনি যান নি নাকি ইদানিং?"

"না, একটু ব্যস্ত ছিলাম।"

"গিয়ে দেখে আসুন। বার-বাড়িটা কশাইখানা ক'রে তুলছে একেবারে। মরা পাখিদের ডানা ঠোঁট পালক মাপা হচ্ছে। পেট চিরে চিরে চামড়া ছাড়িয়ে দিনরাত রিসার্চ চলছে পরশু থেকে। আর বউটাও জুটেছে তেমনই মশাই। পাগল স্বামীকে তুই কোথায় সামলে-সুমলে রাখবি, না, তুইও সমানে উবু হয়ে ব'সে ব'সে পাখির পালক মাপছিস ওর সঙ্গে!"

"তাই নাকি?"

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড। দেখে আসুন না গিয়ে।"

মুচকি হেসে রূপচাঁদ বললেন, "রিসার্চ করবার মত দামী একটা চিড়িয়া তো পেয়েছেন। কাক বক নিয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন ভদ্রলোক?"

চোখ মটকে সনাতন মল্লিক বললেন, "সে রিসার্চও চলছে, সেদিন তো দেখলেনই স্বচক্ষে। তা চলুক না, তুই বড়লোকের ছেলে, বদখেয়ালে দু-দশ হাজার ওড়া না, পাখির পিছনে এমন ক'রে লেগেছিস কেন?"

দুম ক'রে আওয়াজ হ'ল একটা। কলরব ক'রে এক দল কাক উড়ল একটা গাছ থেকে। যে লোকটি বন্দুক ছুঁড়েছিল, সে অপ্রস্তুত মুখে বললে, "লাগল না।"

"আরে, কাক মারা কি সহজ কথা!"—মল্লিক মশাই ব'লে উঠলেন, "ওপারে যাওয়া যাক চল। এপারে আর পাওয়া যাবে না, সব ভড়কে গেছে, একটু থিতুক। ও অঞ্চলটা ঘুরে আসি ততক্ষণ। আচ্ছা, চলি তা হ'লে। উঃ, রোদের তাত দেখেছেন এরই মধ্যে?"

সদলবলে চ'লে গেলেন মল্লিক মশাই। রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ডানাকে 'বলাকা'টা ফিরিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি। ডানার সঙ্গে দেখা হয় নি। কপাট বন্ধ ছিল। বন্ধ দ্বারে অনেকক্ষণ করাঘাত করাতে চাকরটা বেরিয়ে এসে খবর দিল যে, মাইজীর শরীর খারাপ, তিনি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

বৈজ্ঞানিক-পৃষ্ঠারূঢ়া ডানার ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল হঠাৎ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়ালেন আবার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটি সিগারেট বার ক'রে ধরালেন সেটি নিপুণভাবে। তারপর আবার চলতে লাগলেন।

১১

নিজের তেতলার ঘরটিতে ব'সে কবি কবিতা লিখছিলেন। মন্দাকিনী চ'লে গেছেন। মন্দাকিনীর চ'লে যাওয়াটাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মনে কত কি যে হচ্ছে, তার ঠিক নেই। মন্দাকিনীই যেন বার বার নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করছে মনে। মন্দাকিনী না থাকলে যে ডানাকে নিয়ে তাঁর সমস্ত কল্পনা মেতে উঠবে তিনি মনে করেছিলেন, সে ডানার কাছে যেতেই ইচ্ছে করছে না যেন তাঁর। স্টেশনে ট্রেনের জানলায় মন্দাকিনীর মুখটা বার বার মনে পড়ছে। তাঁর কথাগুলোও—'সাবধানে থেকো, আমি যত শিগ্‌গির পারি চ'লে আসব।' মন্দাকিনীর চিন্তার সঙ্গে ডানার কথাও মিশছিল এসে তাঁর অজ্ঞাতসারে। শব্দের ঝঙ্কারে আর ছন্দের রিলে যে অর্থটা কবিতায় পরিস্ফুট হচ্ছিল, তা হয়তো ঠিক তাঁর মনের কথা নয়, তবু তিনি তন্ময় হয়ে লিখে যাচ্ছিলেন।—

নানা সুরে তারা ব'লে যায়
পুনরায় ফিরে আসব তো
ব'লে যায় তবু চ'লে যায়
জীবনের লীলা শাশ্বত।

হাসি করে রোজ অশ্রু-স্নান
হয় হিমাংশু অংশুমান
সূর্য-হিমানী-প্রণয়-গান
রঙিন মেঘের বাষ্প তো।

এসেছ কে তুমি নন্দিতে
অপরাজিতার স্বপ্ন কি
আলো-আঁধারির সন্ধিতে
গোধূলি-বেলার লগ্ন কি।

জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ
কাঁপায় প্রাণ, ভরায় বুক
নবীন ফুল সে উৎসুক
বলে আমি ভালবাসব তো।

১২

তিন-চার দিন থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে একটা। ধুলো বালি ঝরাপাতা উড়িয়ে একটা দুর্দান্ত পাগল যেন নেচে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দুপুরে ঘরের কপাট জানালা বন্ধ ক'রে ডানা একা বসেছিল চুপ ক'রে। এ কদিন কেউ আসে নি। বৈজ্ঞানিক নানা রকম পাখির বাসা বানিয়ে গাছে গাছে টাঙিয়ে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়। অনেকগুলো পাখি-ওলা লাগিয়েছেন নাকি পাখি ধরবার জন্যে, এখানে চিড়িয়াখানা বানাবেন নাকি একটা। কাক মারবার জন্যে শিকারীও বেরিয়েছে নাকি। প্রবন্ধ তৈরি হচ্ছে বোধ হয় আর একটা। হুতোম প্যাঁচাটাকে ধরবার কি হ'ল? হঠাৎ মনে হল, আনন্দবাবুও আসেন নি। এই বিশ্রী হাওয়ার জন্যেই বেরুতে পারছেন না বোধ হয় ভদ্রলোক। তাঁর সেই কবিতাটা এখনও ডানার কাছে প'ড়ে আছে। ডানা উঠে গিয়ে কবিতাটা বার ক'রে আর একবার পড়লে। কার উদ্দেশ্যে কবিতাটা লিখেছেন ভদ্রলোক? রূপকথার অরূপ বাণীর অর্থ কাকে বোঝাতে চাইছেন উনি? উইম্‌পোল স্ট্রীটের ব্যারেটের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের মানসীর কথা। অন্যমনস্ক হয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাইরের এলোমেলো হাওয়ার মত মনের ভিতরও এলোমেলো চিন্তার হাওয়া উঠল যেন একটা। একটা অতৃপ্ত ক্ষুধার অস্পষ্ট রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের প্রচ্ছন্ন লোকে। মনে হ'ল, কে যেন কোথায় তার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে আছে। যেতে হবে...। হঠাৎ সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি কয়েকদিন আগে এই রকম কি একটা বলেছিলেন যেন! তিনি আছেন কি? কয়েকদিন খোঁজ নেওয়া হয় নি। হঠাৎ কপাট খুলে বেরিয়ে পড়ল সে দুপুররোদে। এগিয়ে গেল নদীর ধারের সেই ঘরটার দিকে। ঘরটার পাশে যে করবীগাছ আছে একটা, তা নজরেই পড়ে নি এতদিন! গোছা গোছা ফুল ধরেছে। এলোমেলো হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠেছে গাছটা। কিন্তু সেই অস্থিরতার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে যেন। মনে হচ্ছে, যেন কোনও শ্যামাঙ্গিনী তরুণী নৃত্য করছে, নৃত্য করতে করতে আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে অঞ্জলি ভ'রে ডাইনে বামে ঊর্ধ্বে নিম্নে। করবীফুলগুলো ঠিক যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। সে দিকে চেয়ে সেই দুপুর-রোদে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। এলোমেলো হাওয়াটা হু-হু ক'রে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল, উড়ে গেল মাথার কাপড়টা, চুলগুলো উড়তে লাগল। একটা অদৃশ্য ঘূর্ণাবর্ত যেন মেতে উঠল তাকে ঘিরে। সেই ঘূর্ণাবর্তে কতকগুলো ছেঁড়া কাগজ আর শুকনো পাতা নাচতে নাচতে চলে গেল পাশ দিয়ে। চু-কির-কির-কির-কির—তীক্ষ্ণ সুরের ফোয়ারা ছুটিয়ে উড়ে গেল বরবেশে সজ্জিত কালো টুনটুনিটা। সমস্ত প্রকৃতি অদ্ভুত এক আনন্দে ভরপুর যেন। ডানারও দেহের অণু-পরমাণুতে স্পন্দিত হয়ে উঠতে লাগল নাচের ছন্দ। হঠাৎ নজরে পড়ল, বালির চড়া ভেঙে সন্ন্যাসী আসছেন। পরিধানে মলিন গৈরিক, হাতে কমণ্ডলু। নগ্ন পদ, নগ্ন শির। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে হয় না, প্রকৃতির এই রুদ্র তাণ্ডব তাঁর মনকে একটুও স্পর্শ করছে। নির্বিকার চিত্তে ঋজুদেহে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন। সম্রাট যেন। ডানাও এগিয়ে গেল।

"আপনি এই রোদে কোথায় বেরিয়েছিলেন?"—ডানাই প্রশ্ন করলে।

"ভিক্ষে করতে।"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী।—"তুমি?"

চুপ ক'রে রইল ডানা। সন্ন্যাসী যে ভিখারী এই বোধটা আঘাত করল সজোরে তাকে। ভিক্ষা করা যে অতিশয় হীন বৃত্তি! ভিক্ষুক ইনি? হোঁচট খেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, তারও যেন তেমনই হ'ল। ইংরেজী পড়া সংস্কারের পাথরে খুব জোরেই হোঁচট খেল সে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে।

"এই রোদে কোথায়?"—হেসে জিজ্ঞাসা করলেন সন্ন্যাসী।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"আমার কাছে? কেন?"

"এমনিই।"

সন্ন্যাসী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ডানাও ঢুকল গিয়ে তাঁর পিছু পিছু। সন্ন্যাসীর ঘরে ডানা ইতিপূর্বে একদিনও ঢোকে নি। ঘরটা ভাঙা, সে শুনেছিল। কিন্তু কত ভাঙা, তার তা ধারণা ছিল না। ঢুকে অবাক হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে ব'সেই আকাশ দেখা যায়। চালে খাপরা খুব কম আছে। যা আছে, তাও ঠিক স্থানে নেই, মেঝেটা এককালে পাকা ছিল, এখন কিন্তু সিমেণ্ট উঠে গেছে। মাঝখানে একটা চৌ-কোণা পাথর বসানো হয়েছিল কোন কালে, সেইটেই অক্ষত আছে এখনও। সেই মেঝেরই এক ধারে একটি কম্বল পাতা, তারই এক পাশে আর একটি কম্বল পাট করা রয়েছে, আর রয়েছে একটি ঝোলা। সেইটেই বোধ হয় যুগপৎ বাক্স এবং বালিশের কাজ করে। ঘরের আর এক ধারে কয়েকটি ইট পেতে উনুন করা রয়েছে। আর এক ধারে মাটির ছোট কলসী একটি, তাতে খাবার জল থাকে বোধ হয়, পাশে একটি মাজা-ঘষা পিতলের ঘটি চকচক করছে।

সন্ন্যাসী ডানার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "এস, ব'স। ওই কম্বলটার উপরই ব'স। কোনও দরকার আছে নাকি?"

ডানা কম্বলটার এক পাশে গিয়ে বসল। সন্ন্যাসী কমণ্ডলুটা টাঙিয়ে রাখলেন দেওয়ালের একটা পেরেকে।

"তেমন কোনও দরকার নেই। কয়েকদিন আপনাকে দেখি নি, তাই ভাবলাম, খোঁজটা নিয়ে আসি, একা ব'সে ব'সে ভাল লাগছিল না। আচ্ছা, আপনি ভিক্ষা করেন কেন?"

সন্ন্যাসী কলসী থেকে জল গড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে হাসি-ভরা চোখে চাইলেন ডানার দিকে। তারপর বললেন, "আমি যে পথের পথিক, সে পথে এই নিয়ম।"

"আপনি যে বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে আপনার কিছু টাকা আছে?"

"তা আছে। তার থেকে টাকা বার করি মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিক্ষা করি ঠিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নয়, নিয়ম ব'লে।"

"নিয়ম? বুঝতে পারলাম না ঠিক।"

"মিলিটারিদের যেমন ড্রিল করা নিয়ম, ডাক্তারি পড়তে গেলে যেমন মড়াকাটা নিয়ম—এও তেমনই।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডানা বললে, "ভিক্ষা করলে কি আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না? মাপ করবেন, আমার যা শিক্ষা সেই অনুসারেই বলছি।"

"তোমার আত্মসম্মান জিনিসটাকে বড় খাটো ক'রে দেখ, তাই পদে পদে সেটা ক্ষুণ্ণ হয়।"

"খাটো ক'রে দেখি মানে? বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আজ তোমার ডান হাত যদি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে যে, বাঁ হাতের কাছে কিছু নিলেই তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, তা হ'লে যে রকম বিপদ উপস্থিত হয়, তোমাদেরও তাই হয়েছে। তোমার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার প্রকাণ্ড একটা তফাত আছে, এ কথা মেনে নিলেই মুশকিল হবে। যদি মেনে নিতে পার যে, তুমি আমি একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তা হ'লে আর সঙ্কোচের কারণ থাকে না।"

"সত্যিই কি সেটা মেনে নেওয়া যায়?"

"প্রত্যক্ষ করলেই মেনে নেওয়া যায়। অণুবীক্ষণ দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা যেদিন জীবাণু প্রত্যক্ষ করলেন, সেই দিনই তাদের মেনে নিলেন। যেদিন তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, তুমি আর তোমার বাইরের বিশ্ব অভিন্ন, সেদিন তোমারও সংশয় থাকবে না।"

"কিন্তু সত্যিই কি সেটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব?"

"সম্ভব বইকি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে একদিন।"

খোলা দ্বারটা দিয়ে সন্ন্যাসী বাইরের দিকে চাইলেন। ডানার মনে হ'ল, তাঁব দৃষ্টি দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গিয়ে নিমেষে কি যেন দেখে এল একবার। তারপর নিজের কমণ্ডলু থেকে দুটি ছোট কলা বার ক'রে একটি ডানার হাতে দিয়ে বললেন, "নাও, এটি তুমি খাও। তুমি আসবে ব'লেই বোধ হয় একটি কলা বেশি পেয়েছি আজ।"

"আমি এখনই খেয়েছি। আপনিই দুটো খান।"

"তুমি অতিথি, তোমাকে না দিয়ে কি আমি খেতে পারি? ক্ষিধে না থাকে তো পরে খেও, নিয়ে যাও।"

"আপনি আর কিছু খাবেন না?"

"না।"

"ওই একটিমাত্র কলা খেয়ে থাকতে পারবেন?"

"তা পারব।"

"আমি না এলে দুটো কলাই তো খেতেন?"

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, "তা খেতাম। তুমি খেলেও আমারই খাওয়া হ'ল।"

কলসী থেকে জল গড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার হাত পা মুখ ধুতে লাগলেন। ডানা চুপ ক'রে ব'সে রইল। সন্ন্যাসীর কথাগুলো কে যেন তার কানের কাছে চুপিচুপি ব'লে গেল আবার—'সম্ভব বই কি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে একদিন।'

"আচ্ছা, আপনি কি পেরেছেন?"—ডানা জিজ্ঞাসা করলে হঠাৎ।

"কি?"

ঝুলি থেকে একটি গামছা বার ক'রে হাত-মুখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলেন।

"আপনি আর বাইরের বিশ্ব যে অভিন্ন, এই সত্য কি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন?"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, "নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই। তা ছাড়া আমি কি পেরেছি বা পারি নি—এ প্রশ্ন অবান্তর। আমি হিমালয়-চূড়ায় উঠতে পারি নি, তা প্রত্যক্ষও করি নি, তবু তা যে আছে এ কথা তোমাকে মানতে হবে।"

"কিন্তু যাঁরা হিমালয়-চূড়ায় উঠেছেন বা হিমালয়-চূড়া দেখেছেন এ রকম লোক আছেন, তাই সেটা নিঃসংশয়ে মানা যায়।"

"সর্বভূতে সেই এক অদ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ করেছেন এ রকম লোকও কম নেই—এ কথাও

যেদিন বুঝবে, সেদিন এ সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকবে না।"

"সে-রকম লোক কোথায় আছেন?"

"খুঁজে বার করতে হবে। তোমার সত্যকার জিজ্ঞাসা যেদিন জাগবে, সেদিন খোঁজবার পথও পাবে।"

ডানা চুপ ক'রে রইল। ডানার মুখের দিকে চেয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "মনে হচ্ছে, কোনও একটা মতলবে তুমি এসেছিলে, কি বল তো সেটা?"

ডানা আর একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্তত করে বললে, "আমার সব কথা শোনেন নি বোধ হয় আপনি?"

"না।"

ডানা নিজের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে শেষে বললে, "এখন পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে আশ্রয় পেয়েছি একটা। এঁরা খুবই ভদ্রতা করছেন আমার সঙ্গে। অমরবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু সবাই—"

রূপচাঁদবাবুর কথাটা ব'লে সে থেমে গেল নিমেষের জন্যে।

"অমরবাবু একটা চাকরিই দিয়েছেন আমাকে। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে আছি। তবু কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করছি সর্বদা। কোথায় একটা ক্ষুধা যেন অতৃপ্ত রয়েছে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা কর্তব্য আছে, যা করা হয় নি। সেই ক্ষুধাটা যে কিসের, কর্তব্যটা যে কোথায়, তা ঠিক করতে পারছি না। তাই মনে করলাম, আপনার কাছে আসি। কেন যে আপনার কথা মনে হ'ল, তা বলতে পারি না, কিন্তু মনে হ'ল যে আপনি হয়তো কিছু উপদেশ দিতে পারবেন।"

সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "দেখ, উপদেশ দেওয়ার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই। এইটুকু শুধু জানি যে, সবাইকে একদিন না একদিন সচেতন হতে হবে। তুমি, আমি, এই নিখিল বিশ্ব যাঁর অনন্ত লীলার প্রকাশ, তাঁকে জানবার আগ্রহ অভিনব ক্ষুধারূপে অনুভব করতে হবে সবাইকে একদিন। অনিত্য মোহের কষ্টিতে ঘ'ষে নিত্যকে চেনবার আকুলতাই নিয়ত ব্যক্ত হচ্ছে রূপে রূপে জীবনে মরণে জন্মজন্মান্তরে। তুমিও হয়তো সেই ক্ষুধাই অনুভব করছ, কে জানে?"

"ভগবানকে জানবার ক্ষুধা বলছেন?"—ডানা প্রশ্ন করলে।

"সেটা তুমিই ঠিক করবে, কিসের ক্ষুধা তোমাকে আকুল করছে! তোমার ক্ষুধাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার ক্ষুধা আমাকে বিপথেও তো নিয়ে যেতে পারে?"

"কোনও পথই বিপথ নয়। একমাত্র যে পথ, যে পথ সবাইকে ধরতে হবে একদিন, তার বহু গলি—গলির গলি আছে। ক্ষুধাকে অনুসরণ ক'রে চলতে থাক, ঠিক পথে পৌঁছে যাবেই একদিন না একদিন। ক্ষুধাটা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তার আগুনে অখাদ্যও হজম হয়ে যাবে।"

"কোন কিছুই পাপ নয় তা হ'লে আপনি বলছেন?"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বললেন, "আমি কিছুই বলছি না। কোনও একটা কাজ পাপ কি না তা নির্ভর করে তোমার নিজের পাপপুণ্যবোধের উপর। মা-কালীর কাছে পাঁঠাকে বলিদান দেওয়া কারও কাছে পুণ্য, কারও কাছে পাপ। যাঁরা দিব্যদৃষ্টি লাভ

ক'রে যোগী হয়েছেন, তাঁদের কাছে আবার পাপ-পুণ্যের প্রশ্নই অবান্তর। তাঁরা অনাসক্ত। পদ্মপত্রে যেমন জল লেগে থাকতে পারে না, তাদের মনেও তেমনই পাপ-পুণ্য লাভ-ক্ষতি এসব স্থান পায় না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

—গীতার এই শ্লোকটিতে মনের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনও ক্ষুধা নেই। কিন্তু এই সর্বসংকল্প সন্ন্যাস লাভ করবার আগে ক্ষুধার নির্দেশেই অনেক দুর্গম পথ চলতে হবে। সেই পথে যেটা তোমার বিবেকের কাছে পাপ ব'লে মনে হবে, সেইটেই ত্যাগ করবে তুমি।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার হেসে বললেন, "পুরাতন বিবেকের কাছে পুণ্য ব'লে যা মনে হয়েছে সেটাও কিছুদিন পরে হয়তো আবার ত্যাগ করতে হবে নতুন বিবেকের নির্দেশে। পুরাতন ক্ষুধা নতুন খাবার দাবি করবে। পুরাতন খাবারে তৃপ্তি হবে না তার তখন।"

"ক্ষুধাটা যে কিসের, তাইতো বুঝতে পারছি না?"—একটু অধীর কণ্ঠেই বললে ডানা।

"পারবে। চিন্তা কর, বুঝতে পারবে বইকি। বুঝতে হবেই। নিজেকেই বুঝতে হবে, আর কেউ বুঝিয়ে দিতে পারবে না। তোমার মধ্যে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শিষ্য, তিনি গুরু, তিনি নিজেকেই নিজে নতুন ক'রে উপলব্ধি করবেন তোমার মধ্যে আবার। তুমিই কর্ত্তা, তুমিই কর্ম, তুমিই কার্য, তুমি কারণ।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মাহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

কিন্তু এ উপলব্ধি হবার আগে ভোগের পথে মোহের পথে হয়তো ঘুরতে হবে কিছুদিন। ঘোরাটা প্রয়োজনও হয়তো। তামসিক জীবনের পর রাজসিক জীবনই স্বাভাবিক পরিণতি। তারপর আসবে ; আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং মোহটা তুচ্ছ নয়। কিছুই তুচ্ছ নয়।" সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এল। ডানা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "মোহ সম্বন্ধে কি যেন বললেন, বুঝতে পারলাম না।"

"মোহটা হচ্ছে তাঁকে চেনবার কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথর সোনা নয়, কিন্তু সোনার পরিচয় ওর থেকেই পাওয়া যায়। যে কোনও জিনিসেই আমরা মুগ্ধ হই না কেন, কিছুদিন পরেই তার নেশাটা কেটে যায়। কারণ মোহ নকল আলো, আসলে ওটা অন্ধকারই। ওই মোহই আমাদের জানিয়ে দেয় যে আমরা ভুল পথে গেছি। মন ব'লে ওঠে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনওখানে।"

"তা হ'লে মোহটাও দরকারী জিনিস?"

"এক হিসেবে দরকারী বইকি। মুক্তির স্বাদ পেতে হ'লে খানিকটা বন্ধন-ভোগ দরকার। মোহ মানে আসক্তি, বন্ধন, যুক্তিহীন অনুরক্তি। যে কোন রকম আসক্তিই খারাপ। উপনিষদ বলছেন, যাঁরা অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক, তারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যারা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁরা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তোমার যদি অনুরক্তি হয়, তা হ'লেও অন্ধকার। অনুরক্তি জিনিসটাই খারাপ। সত্য দর্শন হওয়ামাত্র অনুরাগ বিরাগ সব লুপ্ত হয়ে যায়। সত্যের সঙ্গে তখন একাকার হয়ে যায় দ্রষ্টা। হারিয়ে ফেলার ভয় থেকেই তো অনুরাগের জন্ম—কিছুক্ষণ পরে হারিয়ে ফেলব, এই বোধ থেকেই দু হাত দিয়ে প্রিয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে চায় সবাই। সত্যকে উপলব্ধি

করলে সে ভয় আর থাকে না। কারণ তখন উপলব্ধি হয়, সবার মধ্যেই আমি এবং আমার মধ্যেই সব।"

বাইরের হাওয়াটা উদ্দামতর হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা কোকিল ডেকে উঠল, কিক্, কিক্, কিক্। একরাশি ধুলোবালি হু-হু ক'রে উড়ে এল খোলা দ্বার দিয়ে, আর তার সঙ্গে বহুদূর থেকে ভেসে এল ঘুঘুর কণ্ঠস্বর। ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু। ভীষণা প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুচ্ছ ক'রে প্রণয়ীর মোহ কোমল সুরে আবেদন জানিয়ে চলেছে প্রণয়ীকে। ডানা উন্মনা হয়ে আরও কিছুক্ষণ ব'সে রইল। ছন্নছাড়া পাগলের মত তার মনটা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঝড়ো হাওয়াটার সঙ্গে।

"আচ্ছা, আপনারও মোহ আছে?"—তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

"আছে বইকি। মায়াবিনী প্রকৃতির ছলাকলার কি অন্ত আছে? প্রতি পদক্ষেপেই যে তার একটা না একটা রঙিন ফাঁদ পাতা রয়েছে! তা কি এড়ানো সহজ?"

"আপনার তো কিছুই নেই, তবু কিসের মোহ আপনার?"

"আপাতত এই স্থানটার মোহ কাটাতে পারছি না দেখছি"—মলিন হেসে বললেন সন্ন্যাসী।

"এর আগে এখানে ছিলেন কখনও আপনি?"

"ছিলাম বইকি। সে অনেক কথা।"—ব'লে একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপ হেসে বললেন, "সেসব কথা না-ই বা শুনলে। থাক। এটা মোহ, না কর্তব্য, তা-ও ঠিক করতে পারছি না।"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। তার মনে হতে লাগল, কি যেন একটা রহস্য আবৃত ক'রে রেখেছে এই লোকটিকে। হয়তো সে আবার প্রশ্ন করত, কিন্তু বাধা পড়ল। চাকরটা এসে উঁকি দিলে দ্বার-প্রান্তে।

"আনন্দবাবু এসেছেন, খুঁজছেন আপনাকে।"

ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল একটু। তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে? চলুন না?"

"পরে আসব কোন সময়ে।"

একটু ইতস্তত ক'রে ডানা চ'লে গেল একাই। গিয়ে যা দেখলে, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। কবির সর্বাঙ্গে রঙ, মুখে আবীর।

ডানাকে দেখে তিনি বললেন, "আজ বসন্তোৎসব। সমস্ত প্রকৃতি রঙে রসে রূপে মেতে উঠেছে! এস, তোমাকেও একটু রঙ মাখিয়ে দিই। আপত্তি আছে কি?"

কি যে বলবে ডানা ভেবে পেল না। মাথা হেঁট ক'রে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। তার কানে গালে ফুলে উঠল লজ্জারুণ ভাতি। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল শুধু যে ভয়ে তা নয়, আনন্দেও। চিরন্তনী নারী পুলকিত হয়ে উঠল চিরন্তন পুরুষের আহ্বানে।

"দিই একটু?"

"দিন, ছাড়বেন না যখন।"

কবি ডানার মুখে চুলে আবীর মাখিয়ে দিয়ে পকেট থেকে বার করলেন রঙের শিশি। বালকের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মন্দাকিনী চ'লে যাওয়ার পর তাঁর মনে যে

ঔদাসীন্য এসেছিল, তা হঠাৎ কেটে গেল যেন। সমস্ত দিন আজ রঙ খেলে বেড়িয়েছেন। ডানার কাপড়ে বেশ ক'রে রঙ দিয়ে একটু দূরে স'রে দাঁড়ালেন।

"বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে।"

ডানা লজ্জায় ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। রঙে তার কাপড় জামা ভিজে গিয়েছিল একেবারে। কাপড়-জামা বদলে বাইরে এসে দেখে, কবি চলে গেছেন। বারান্দার টেবিলের উপর রঙের শিশিটা রয়েছে আর তার তলায় চাপা রয়েছে একখানা কাগজ। কাগজটা খুলে দেখলে, একটা কবিতা রয়েছে।

গৈরিক হরিতে পীতে
পুষ্পে ফলে ছন্দে গীতে
        বহু বর্ণ বহু শিখা জ্বালি
বসন্ত আরতি করে যার,

যার লাগি সাজিয়াছে
মাঠে মাঠে গাছে গাছে
        কিশলয় মঞ্জরীর ডালি
রচিয়া বিচিত্র উপহার,

তারই মূর্তি রক্তরাগে
সন্ধ্যার মেঘেতে জাগে
        আগুনের প্রদীপ্ত আলোকে
কোকিলের জ্বলন্ত নয়নে,

রঙ্গনে পলাশে ফোটে
টিয়া চন্দনার ঠোঁটে
        সহেলীর পালকে পালকে
তন্ময় সে কি স্বপ্ন চয়নে,

সে যে সিন্দূরের শোভা
পদ্মরাগ মনোলোভা
        শোণিতের বরণে চর্চিত
শিবানীর রক্তজবা সে যে,

সেই বর্ণে জগদ্ধাত্রী
বালার্ক-অরুণ-গাত্রী
        যুগে যুগে হতেছে অর্চিত
মানবের মনোমন্দিরে যে,

তার ছন্দে তারি সুরে
নিকট যেতেছে দূরে
সুদূর যে নিকটেতে আসে,
পুরাতন হয় যে নবীন,

অতীত ও বর্তমান
গাহে ভবিষ্যের গান,
বক্ষে ধরি তাহারি সুবাসে
শুষ্ক বীজ তপস্যায় লীন,

এস, সখি, সমারোহে
বসন্ত-উৎসবে দোঁহে
পূজা করি কুঙ্কুমে আবীরে
সে চির-যৌবন দেবতার,

ওগো, সখি, নীলাঞ্জনা
হও আজি অবন্ধনা
অশঙ্কিত কঙ্কণে মঞ্জীরে
ঝন্‌ঝনিয়া তোল ঝনৎকার,

জড়তা কাটিয়া যাক
অচঞ্চল শিহরাক,
ভাষা দাও স্থাবরে জঙ্গমে
অকুণ্ঠিত হও সুলোচনা

হও সখি, আত্মহারা
বন্ধহীন রসধারা
উদ্বেলিত অধর-সঙ্গমে
নবতীর্থ করুক রচনা।

ডানা দু-তিনবার পড়লে কবিতাটা। এলোমেলো হাওয়াটা থেমে গেল হঠাৎ। মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি। ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রিক্তপত্র একটা অশ্বত্থগাছের শাখায় ব'সে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে একটা ফিঙে ডাকছে। পাশে ব'সে আছে আর একটা ফিঙে। তারই সহচরী বোধ হয়।

১৩

রূপচাঁদ আপিসে গিয়েছেন। দুপুরের রোদ খাঁ-খাঁ করছে চতুর্দিকে। বকুলবালা উঠোনে গুলি খেলছেন চণ্ডীর সঙ্গে। চণ্ডী ছেলেটি স্কুল পালিয়ে প্রায়ই আসে তাঁর কাছে। তার জন্যে

নানারকম খাবার তৈরি ক'রে রাখেন বকুলবালা। যেদিন চণ্ডী আসে না সেদিন কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েন তিনি। চণ্ডী যে পরের ছেলে, তার যে নিজের বাপ-মা আছে—একথা বকুলবালা যে জানেন না তা নয়, কিন্তু মানেন না। চণ্ডীকে আসতেই হবে রোজ। নানাভাবে প্রলুব্ধ হয়ে চণ্ডী আসেও। শুধু খাবার নয়, অন্য প্রলোভনও আছে ; বকুলবালা মাঝে মাঝে তাকে পয়সা দেন। সেই পয়সায় চণ্ডী তার সেই সব শখ মেটায় যা মা-বাপের পয়সায় মেটে না সহজে। ছবি, ঘুড়ি, লাট্টু এসব তো কিনেইছে. মাঝে মাঝে সিগারেটও কেনে। একটা টিয়াপাখিও কিনে দিয়েছেন তাকে বকুলবালা খাঁচাসুদ্ধ।

"ওই, বেইমানি করছিস ফের! ভাল ক'রে মাপ্ আবার্। থাম্, আমি মাপছি।"

নিজেই হেঁট হয়ে মাপতে লাগলেন বকুলবালা গাব্বু থেকে তাঁর গুলিটা কতদূরে আছে। গাছকোমর বাঁধা, মাথার চুলগুলোও চুড়ো ক'রে বেঁধেছেন তিনি. মুখটা লাল হয়ে উঠেছে দুপুরের তপ্ত হাওয়ায়।

কৃষ্ট প্রিয়া।

দুজনেই সোৎসুকে মুখ তুলে চাইলেন আমগাছটার দিকে।

"বুলবুলিটা এসেছে বোধ হয়।"

"হ্যাঁ, ওই যে।"

"কই?"

"ওই যে সরু ডালটায় ব'সে আছে।"

এইবার দেখতে পেলেন বকুলবালা।

"চমৎকার দেখতে তো! গালের কাছে কি টুকটুকে রঙ—ওমা, কি সুন্দর!"

"পাখি-ওয়ালাটা বলছিল, এর নাম নাকি সিপাহি বুলবুল।"

"সিপাহীর মতই তো দেখতে। ঘোড়সোয়ার সিপাহীদের মাথায় টুপি তো ঠিক ওই রকমই। সেবার এসেছিল দেখিস নি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত?"

চণ্ডী ঘাড় উঁচু ক'রে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল পাখিটার দিকে। পাখি কিন্তু বেশিক্ষণ সে সুযোগ দিলে না তাকে। উড়ে গেল। পাতার আড়াল থেকে আর একটা পাখিও উড়ল।

"ও মা, দুটো ছিল!"

"কিছুতেই বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে না ওরা। জাফরের কাছে এই পাখি যদি দেখি কোনদিন, আনতে বলব মাসীমা?"

"বলিস। কিন্তু হলদে পাখিটা ম'রে গিয়ে থেকে আর পাখি কিনতে ইচ্ছে করে না। কিচ্ছু খেলে না একেবারে। আয়,—আচ্ছা, তুই আগে টিপ কর্।"

আবার শুরু হ'ল গুলিখেলা।

"বাচ্চাবেলা থেকে পুষতে হয়। ধাড়ি পাখি পোষ মানে না"—টিপ করতে করতে চণ্ডী বললে।

"হলদে পাখির বাচ্চা কোথায় পাব বল্?"

"গণশা বলছিল যে, গেল বছর হলদে পাখির বাসা দেখেছিল সে এক জায়গায়।"

একটু থেমে চণ্ডী বললে, "নদীর ধারে অমরবাবুদের যে আমবাগান আছে সেই বাগানে। সে গাছে ফিঙেরও বাসা ছিল নাকি।"

"ফিঙে পাখির দরকার নেই। গণশাকে বলিস, হলদে পাখির বাচ্চা যদি পায় এনে দেয় যেন আমাকে।"

চণ্ডীর টিপ ব্যর্থ হ'ল। বকুলবালা টিপ করতে লাগলেন।

"বলব। কিন্তু অন্য পাখি যদি পেয়ে যায়? নীলকণ্ঠের বাচ্চা ধরেছিল একবার গণশা।"

"না, অন্য পাখি চাই না।"

টকাস্ ক'রে চণ্ডীর গুলিটা মেরে গর্বোৎফুল্ল মুখে চাইলেন বকুলবালা চণ্ডীর দিকে।

তুমি আর একবার হলদে পাখি কিনেছিলে, না মাসীমা?"

"সেবারও বাঁচে নি। ঠাণ্ডা লাগল, না কি হ'ল, সকালে দেখি, ম'রে প'ড়ে আছে খাঁচায়।"

"বার বার ম'রে যাচ্ছে, কি দরকার তা হ'লে ও পাখি পুষে? তার চেয়ে নীলকণ্ঠ পোষ এবার একটা। চমৎকার দেখতে।"

চোখ মুখ কুঁচকে আবার টিপ করছিলেন বকুলবালা। চণ্ডীর কথায় আগুনের ঝলক ছুটে বেরুল তাঁর চোখ থেকে।

"না, আমি হলদে পাখি পুষব। নীলকণ্ঠ আবার মানুষে পোষে, যেমন ক্যারকেরে গলার আওয়াজ, তেমনি ঝগড়ুট্টি।"

চণ্ডী চুপ ক'রে রইল। বকুলবালার গুলি এবার লাগল না। চণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ থেমে সে জিজ্ঞেস করলে, "হলদে পাখি খুব ভাল গান গায়, না?"

"নিশ্চয়। কি মিষ্টি গলার স্বর! শুনিস নি তুই?"

"শুনেছি, কিন্তু দোয়েলের গলা ওর চেয়েও মিষ্টি।"

"দোয়েল ওর মতন 'খোকা হোক' বলতে পারে?"

"হলদে পাখি 'খোকা হোক' বলে বুঝি?"

"হ্যাঁ, কি মিষ্টি ক'রে যে বলে!"

হঠাৎ বকুলবালার লজ্জা হ'ল এবং সেই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে তিনি ধমকে উঠলেন।

"মার্ না, কি বাজে বকবক করছিস্!"

চণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল তার।

"অমরবাবু কি কাণ্ড করছেন জানেন মাসিমা? কাক বক শালিক টিয়া মারছেন ক্রমাগত। অনে—ক মেরেছেন।"

"কেন? ওসব পাখি তো খায় না শুনেছি।"

"খাবেন না। ওদের পালক, পা, ঠোঁট মাপছেন। এখানে মিউজিয়ম হবে নাকি। জ্যান্ত পাখিও ধরেছেন অনেক। অনেক পাখিওয়ালা এসেছে, তারা নানারকম ফাঁস নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে বাগানে।"

"তাই নাকি?"

উৎসাহে বকুলবালার চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠল।

"যাবি একদিন? চ-না।"

"কোথায়?"

"অমরবাবুর বাড়ি। দুপুরবেলা উনি যখন আপিসে থাকবেন, আমরা দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে চল্ না, গিয়ে দেখে আসি কি হচ্ছে।"

রূপচাঁদের শিক্ষা সত্ত্বেও বকুলবালার কৌতূহলী মন বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"কে আবার দেখবে?" পাশের গলিটা দিয়ে টুক ক'রে চলে গেলে কেউ দেখতে পাবে না। আর পেলেই বা কি, বড় জোর বকবে একটু।"

ঠোঁট উলটে বুড়ো আঙুলটা তুলে ধরলেন বকুলবালা। চণ্ডী হেসে ফেললে। তার মুখের হাসি কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। রূপচাঁদের গলাও।

"মেসোমশাই এলেন নাকি। আমি পালাই।"

খিড়কি দরজাটা দিয়ে চণ্ডী এক ছুটে বেরিয়ে গেল। রূপচাঁদকে বড় ভয় করে তার।

বকুলবালা খিড়কি-দরজার খিলটা দিয়ে সদর-দরজাটা খুললেন। রূপচাঁদই এসেছিলেন।

"এমন অসময়ে ফিরলে যে আজ?"

"আপিসের কাগজ ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি। ও কি, মুখ অত লাল কেন? রোদে রোদে ঘুরছিলে নাকি?"

"গুলি খেলছিলাম উঠোনে।"

"একা একা?"

"চণ্ডী এসেছিল, তোমার সাড়া পেয়েই পালাল। কি ভীতু ছেলে বা বা!"

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ঘরে ঢুকলেন এবং একটা বড় খাম নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আপিসের কাগজ নিতে তিনি আসেন নি, এসেছিলেন 'বলাকা' বইখানা নিতে। বইখানা একটা বড় খামের মধ্যে রেখেছিলেন তিনি। আপিসে একটা কথা মনে হওয়াতে নিজের বইটা নিতে এসেছেন এই দুপুরের রোদ মাথায় ক'রে। একটা কন্‌স্টেব্‌ল পাঠাতে পারতেন কিন্তু এসব ব্যাপারে চাকর-বাকরের উপর বিশ্বাস করা সমীচীন মনে করেন না তিনি। তা ছাড়া কন্‌স্টেব্‌ল পাঠিয়ে লাভও হ'ত না। নিরক্ষরা বকুলবালা 'বলাকা' খুঁজে বার করতে পারত না।

যাবার সময় তিনি ব'লে গেলেন, "আমাকে হয়তো সাহেবের সঙ্গে টুরে বেরুতে হবে।"

"কবে?"

"তারিখ ঠিক হয় নি এখনও।"

রূপচাঁদ চ'লে গেলেন। বকুলবালা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন হঠাৎ। তাঁর মনে হ'ল, অমরবাবুর বাড়িতে গিয়ে পাখি দেখবার পথটা সুগম হ'ল তা হ'লে।

আপিসের শেষ ফাইলটি ক্লিয়ার ক'রে রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ দোয়াতদানিটার দিকে চেয়ে। তারপর ঘণ্টাটি টিপলেন। একজন কন্‌স্টেব্‌ল সেলাম ক'রে এসে দাঁড়াল।

"সতুবাবুর দোকান থেকে এক কাপ চা আনাও দেখি মিশিরজী।"

"বহুৎ খুব।"

একটু পরেই চা এসে পড়ল। চা পান শেষ ক'রে রূপচাঁদ মিশিরজীকে বললেন, "আমি একটা বই আর একখানা চিঠি দিচ্ছি তোমাকে, সবজিবাগে নদীর ধারে যে মাঈজী থাকেন তাঁকে দিয়ে এস। তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা কর, চিঠিটা লিখে ফেলি আমি।"

"বহুৎ খুব।"

কন্‌স্টেব্‌ল চ'লে গেল।

রূপচাঁদ চিঠি লিখতে লাগলেন।

ডানা,

সেদিন সকালে তোমার 'বলাকা'টা দিতে গিয়েছিলাম। তোমার দেখা পাই নি। তোমার চাকরের মুখে শুনলাম, তোমার শরীর ভাল নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে সম্ভবত। আনন্দমোহন তোমাকে রঙে চুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল শুনলাম। সকলকেই সেদিন রঙে চুবিয়েছে ও। জলে ভিজেই শরীরটা বেভাব হয়েছে বোধ হয় তোমার। জলের সঙ্গে রঙ মেশানো থাকলে আরও বেশি বেভাব হওয়ার সম্ভাবনা। ঘাবড়ালে চলবে না। তোমাদের ওপর দিয়েই তো এখন নানা রঙের খেলা চলবে। বিশ্বনাট্যমঞ্চে তোমরাই যে রঙ্গিণী। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে সহসা যে সুরটা বেজে উঠেছিল আমার কণ্ঠে, সেটা সত্যিই আমার মনের সুর, এবং একেবারে বিশুদ্ধ সুর। বিশুদ্ধ মানে স্বাভাবিক, পবিত্রও বলতে পার। কিন্তু সমাজ নামক এমন একটি আজব জিনিস তৈরি করেছি আমরা যে, প্রকাশ্যে বিশুদ্ধ সুর আলাপ করবার সাহস নেই অনেকেরই। বিশুদ্ধ সুরের কালোয়াতি করতে গিয়ে চার্বাক, স্পাইনোজা প্রভৃতি বড় বড় ঋষিকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিশ্চিহ্ন করাটাই এখনও ভদ্র সমাজে সভ্যতা ব'লে গণ্য। কিন্তু অসাধারণ মানব-মানবী পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবেও বরাবর। তোমাকে অসাধারণের দলে ফেলেছি ব'লেই তোমার কাছে এ-ধরনের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না। সমর্থ পুরুষের নিতান্ত স্বাভাবিক প্রেরণার সত্য মূল্য তোমার মত নারীই দিতে পারে ব'লে বিশ্বাস করি। তবে এটাও বিশ্বাস করি যে, তোমার পছন্দ-অপছন্দর একটা মাপকাঠি আছে নিশ্চয়ই, (সেদিন তোমার চার-এর উপমাটা বেশ লেগেছিল) এবং তা দিয়ে তোমার অজ্ঞাতসারেই হয়তো তুমি মাপছ অনেককেই। আমি সেই সৌভাগ্যবানদের দলে পড়েছি কি না অর্থাৎ আমাকেও তুমি মেপেছ কি না জানি না, কিন্তু সেটা জানবার স্বাভাবিক কৌতূহল একটা আছে।

তোমার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা গদ্যে বলা যাবে না। আনন্দমোহনের মত বাংলা কবিতা লেখবার ক্ষমতা আমার নেই। কলেজ-জীবনে ইংরেজীতে কবিতা লেখার শখ ছিল। মাঝে মাঝে লিখেওছি। অনেক দিন পরে আজ আবার চেষ্টা করলাম। তোমার সম্বন্ধে যা আমার মনে হয়েছে, তা ইংরেজী কবিতায় লিখে পাঠাচ্ছি। ভাল যদি না লাগে, ছিঁড়ে ফেলে দিও। আর একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি। আমি বিবাহিত লোক, সে কথাটা মনে রেখো। তুমি কি করবে বা করবে না, তা তুমিই ঠিক ক'রো। একটি অনুরোধ শুধু করছি অর্থাৎ একটি জিনিস করতে মানা করছি। হৈ-চৈ ক'রো না। তা যদি কর, তা হ'লে আমাকেও হয়তো আত্মরক্ষার জন্যে এমন সব অবাঞ্ছনীয় কাজ করতে হবে, যা আমি এখন করবার কল্পনাও করি না। কবিতাটি এই—

Evening speaks in golden clouds
Morning speaks in light
Flowers speak in scented petals
Lightening speaks in flight.

The manner in which they express
Is simple plain and sweet
But what we do, we human beings ?
We know not how to do it.

When the heart is full and feelings melting
We try to hide and alter
When the eyes speak the tongue denies
Words fail or falter.

I know not how to word my feelings
How to call my Muse
I wish I had the knack of Nature
To sing in Light and Hues.

হয়তো এর ছন্দে গোলমাল আছে, কিন্তু বক্তব্যটা আশাকরি সুস্পষ্ট হয়েছে। এর বেশি কিছু আর বলবার নেই। ইতি—আর. সি.

চিঠি লেখা শেষ ক'রে রূপচাঁদ চিঠিটা খামে পুরে খামটি বেশ ভাল ক'রে জুড়ে দিলেন। তারপর ডাকলেন কন্‌স্টেব্‌লকে।

"মিশিরজী, এই চিঠিটা এবং বইটি মাইজীকে দিয়ে এস। মাইজীর হাতে দেবে, আর কারও হাতে দিও না যেন। মাইজী যদি না থাকেন, ফিরিয়ে নিয়ে এস। সাইকেলটা নিয়েই যাও। আমি এইখানেই আছি।"

কন্‌স্টেব্‌ল চ'লে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে খবর দিলে যে, মাইজীর হাতেই সে চিঠি এবং বই দিয়ে এসেছে।

"সেখানে আর কেউ ছিল নাকি?"

"জী, না।"

রূপচাঁদ আরও কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বাড়ির কাছে এসে দেখেন, বিস্রস্তবাসা বকুলবালা একটা লোমওঠা কুকুরের পিছনে ঢিল নিয়ে ছুটছেন। যে ঢিলটা তিনি ছুঁড়েছিলনে, আর একটু হ'লেই সেটা রূপচাঁদকেই লাগত।

"কি, ব্যাপার কি?"

"মেরেই ফেলব মুখপোড়াকে আজ"—বকুলবালার মুখ লাল, চোখের দৃষ্টিতে ধক্‌ধক্ ক'রে আগুন জ্বলছে।

"হল কি?"

"তোমার জন্যে হালুয়াটি ক'রে পেয়ারাগাছে উঠেছিলাম কয়েকটা পেয়ারা পাড়বার জন্যে, মুখপোড়া কখন সুট ক'রে ঢুকে সমস্ত হালুয়াটি খেয়ে গেছে!"

ক্ষুধার্ত রূপচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "যাক, চল, মুড়ি-টুড়ি আছে তো তাই খাওয়া যাবে।"

"মুড়ি আবার কখন কিনলাম!"

রূপচাঁদের ইচ্ছে করতে লাগল, তার চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন, কখন কিনেছ তা জানতে চাইছি না, আছে কি.না জানতে চাইছি।

কিন্তু সে ইচ্ছে দমন ক'রে হাসিমুখে বললেন, "চল, ঘরে যা আছে তাই খাওয়া যাবে।"

"শুধু পরোটা কি খেতে পারবে?"

"তরকারি নেই কোনও?"

"তরকারি ওবেলা সব ফুরিয়ে গেছে। এবেলা আনতে হবে। তরকারি নেই বলে'ই তো হালুয়া করতে গেলুম।"

"দু-একটা আলু-পটলও নেই?"

"কচু আছে আধখানা।"

এই ব'লে শিশুর মত খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"ধ্যেৎ, তার চেয়ে চল, গুড় দিয়ে খাবে।"

"বেশ, চল।"

১৪

রত্নপ্রভার কাণ্ড দেখে ডানা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমরবাবুও হয়েছিলেন। তিনি আশা করেন নি যে, রত্নপ্রভা নিজে মরা কাকের ডানা, পা, লেজ, ঠোঁট মাপতে বসবেন। রত্নপ্রভা কিন্তু বেশ উৎসাহ সহকারেই মাপতে বসেছিলেন। যদিও এতে অমরবাবুর সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হচ্ছিল, কারণ রত্নপ্রভা সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাপতে পারছিলেন না, ব'লে দেওয়া সত্ত্বেও গোলমাল ক'রে ফেলছিলেন মাঝে মাঝে, তবু অমরবাবুর বেশ লাগছিল। ডানা একধারে কাগজ পেন্সিল নিয়ে মাপের অঙ্কগুলো টুকে নেবার জন্যে বসেছিল। তার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করছিল ; শুধু তাই নয়, তার মনে হচ্ছিল, এতগুলো প্রাণী হত্যা ক'রে কি লাভ হবে শেষ পর্যন্ত? অমরবাবু সত্যিই যদি এ অঞ্চলের কাকেদের (Corvus Spendens) আর একটা উপ-শ্রেণী (Sub-Species) বার করতে পারেন, তাতেই বা কি? হয়তো বিজ্ঞান জগতে ওঁর একটু নাম হবে ; কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, না, ঠিক নামের জন্য উনি এত করছেন না, উনি করছেন নিজের একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যে। একটা অদম্য শিশুসুলভ কৌতূহল মাতিয়ে রেখেছে ভদ্রলোককে। ছোট ছেলের মত ছটফট করে বেড়াচ্ছেন সর্বদা। একটা কাকের পেটে কয়েকটা ডিম পাওয়া গেছে, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন যেন উনি। ডিমসুদ্ধ গোটা কাকটাকেই উনি একটা কাচের জারে রেখে দিচ্ছেন একটা ওষুধে ডুবিয়ে। এমন বিশ্রী গন্ধ ওষুধটার! জারে লেবেল লাগিয়ে অমরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার রত্নপ্রভার দিকে। শেষ কাকটির মাপ নিচ্ছিলেন তিনি।

"না না, ভুল হচ্ছে, ল্যাজের মাপটা ক্যালিপার্স দিয়ে নাও। ছাড়িয়ে নাও বেশ ক'রে আগে। হ্যাঁ। তারপর ওই মাঝখানের পালক দুটোর মাঝখানে একটা পয়েন্ট নাও, তারপর সবচেয়ে লম্বা পালকটার টিপ পর্যন্ত মাপ। হ্যাঁ, হয়েছে। ঠোঁটটা ঠিক ক'রে মেপেছ তো বেস অভ দি স্কাল (Base of the skull) থেকে সোজা লাইনে? দাঁড়াও, দেখে নিচ্ছি আমি।"

নিজের ভুলের জন্যে রত্নপ্রভা খুব বেশি অপ্রস্তুত হয়েছেন, তা মনে হ'ল না। তাঁর মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল শুধু। ক্যালিপার্স দিয়ে কাকের লেজটা মেপে পাশের কাগজে টুকে রাখলেন। অমরবাবু সেগুলো ঠিক হয়েছে কি না দেখে তবে ডানাকে টুকতে দেবেন।

হাত ধুয়ে এসে অমরবাবু নিজে হাতে আবার মাপতে লাগলেন।

"আর নেই তো?"—রত্নপ্রভা বললেন।

"না, এইটেই শেষ।"

"তা হ'লে আমি চায়ের চেষ্টা দেখি একটু।"

"এইখান থেকেই ব'লে দাওনা কাউকে। ভিখারী করুক না।"

"ভিখারী পারবে না। এত খাটুনির পর ভাল করে চা খেতে হবে একটু। কত্তা করে কি বলেন?"

ডানার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চলে গেলেন রত্নপ্রভা। বৈজ্ঞানিক মাপজোপ শেষ করে ডানার দিকে ফিরে বললেন, "ঠিকই আছে। আপনি টুকে নিন এ ফিগারগুলো।"

"পুরুষ-কাক—ডানা ২৬৬ মিলিমিটার; ঠোঁট ৫০.৫ মিলিমিটার; ল্যাজ ১৬৪ মিলিমিটার; নখ—মানে টারসাস্ ৪৮ মিলিমিটার ; সবসুদ্ধ কটা হ'ল দেখুন তো।"

ডানা গুণে বললে, "পুরুষ-কাক কুড়িটা, স্ত্রী-কাক ষোলটা।"

সনাতন মল্লিক উঁকি দিলেন দ্বারপ্রান্তে।

'আরও কাক কি মারতে হবে?"

"না। কোনও পাখিই মারবার দরকার নাই আর। এটা যে ব্রীডিং সিজন্ তা খেয়াল ছিল না আমার। আসছে বছর আবার দেখা যাবে। মরা কাকগুলো কি করলেন?"

"পুঁতিয়ে দিয়েছি।"

"যে পাখিওয়ালাগুলো এসেছে, তারা কিছু ধরতে পেরেছে কি?"

"ফেরে নি তারা এখনও। তবে সেদিন যে পেঁচাটা দেখে এসেছিলেন, সেটা ধরা পড়েছে ডিম সুদ্ধ।"

"অ্যাঁ, তাই নাকি! কোথায় সেটা?"

"বার-বাড়িতে। আনতে বলব?"

"নিশ্চয়!"

কিন্তু অমরবাবুর আর তর সইল না। নিজেই তিনি বেরিয়ে গেলেন হুড়মুড় ক'রে।

ডানা বসে রইল। তার আগেকার চিন্তার সূত্র ধ'রেই ভাবতে লাগল, বিজ্ঞানেব উন্নতিকল্পেও কি জীবহত্যার সমর্থন করা চলে? সে জানত না যে, এ নিয়ে বিদ্বৎ-সমাজে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই না জেনেও স্বাধীনভাবে ডানা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে প্রত্যেক মানুষকে যথাসম্ভব অহিংস হতে হবে। হিংস্র হবার চরম ক্ষমতা আছে ব'লেই হতে হবে। সে শক্তিশালী ব'লেই সংযমী হতে হবে তাকে। যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রাণীহত্যার কারণ সে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সম্বরণ করাটাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হওয়া চাই, অন্য কোনও কারণে নয়, আত্মরক্ষার জন্যই। সে কোথায় যেন পড়েছিল—কোন পাঠ্য পুস্তকেই সম্ভব—যে, জীবজগতের জন্মমৃত্যুর হার এমন একটা কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত যে, তার বেশি রকম ওলট-পালট করতে গেলে সমগ্র জীবজগতেরই সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ছে, ততই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে অদরকারী ব'লে কিছু নেই। সুতরাং অস্বাভাবিক উপায়ে কোনও কিছু ধ্বংস করা মানেই প্রকৃতির নিয়মে বাধা দেওয়া এবং তার পরিণাম শুভ নয়, অশুভ। যে 'ফাংগাস' (চলতি ভাষায় যাকে আমার 'ছাতা' বলি) এতদিন নানা রকম ঘৃণ্য রোগের হেতু ব'লে গণ্য হচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে রোগ সারাবারও উপাদান আছে। মানুষ যদি ইতিপূর্বে কোনও উপায়ে এই 'ফাংগাস'দের নির্মূল ক'রে দিতে পারত, তা হ'লে 'পেনিসিলিন' বা ফাংগাস-জাত অন্যান্য মূল্যবান ওষুধগুলি মানবসমাজ পেত না। মানুষের নিজের প্রয়োজনের জন্যই হয়তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীর বেঁচে থাকা দরকার। সব কথা

আজ জানা যায় নি ব'লেই অনেক জীবকে আমরা অদরকারী বা অনিষ্টকারী মনে করি, পরে হয়তো জানা যাবে যে, তারা উপকারীও। এই জন্যেই, এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাই সভ্য মানুষ স্বভাবত অহিংস। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর একটা স্বাভাবিক হার প্রকৃতির প্রয়োজনবশতই ঠিক হয়ে আছে। অস্বাভাবিক উপায়ে সে হার নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তথাকথিত সভ্য মানুষ হয়তো নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। হঠাৎ রূপচাঁদের চিঠিটার কথা মনে পড়ল তার। চিঠিটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় নি সে। এ ধরনের চিঠি ইতিপূর্বে পেয়েছে সে আরও দু-একবার, বর্মায় থাকতে। সে জানে, এর একমাত্র প্রতিষেধক ঔদাসীন্য। যেন কিছুই হয় নি, এ রকম তো হয়েই থাকে—এই গোছের একটা ভাব দেখানো। রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে খুব সহজভাবেই সে কথা কইবে ভেবে রেখেছে। রূপচাঁদ প্রশ্ন না করলে চিঠিটার উল্লেখও সে করবে না। প্রশ্ন যদি করেন, তখন যা হোক একটা উত্তর দিলেই হবে। চিঠিটা পেয়ে সে যে বিব্রত বা বিচলিত হয়েছে, এটা সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। চিঠিটার কথা এখন মনে প'ড়ে গেল, কারণ রূপচাঁদবাবু চিঠিতে স্বাভাবিক কথাটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। ব্যাপারটা যেন বেশ জট পাকিয়ে গেল ডানার মনে। জীবনে স্বাভাবিক হতে চাওয়াটাই যদি কাম্য হয়, তা হ'লে রূপচাঁদবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। আর অস্বাভাবিকতাই যদি সভ্যতা হয়, তা হ'লে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে মেনে নিতে হবে। অমরবাবুর পক্ষী নিধনে আপত্তি করা চলবে না। তার মন পরস্পরবিরোধী দুটো ধর্মকেই প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে কেন—স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা দুটোই বিস্বাদ লাগছে কেন? তৃতীয় একটা কিছু আছে না কি, যা স্বাভাবিকও নয় অস্বাভাবিকও নয়, যা শুধু মনুষ্যোচিত। কি সেটা?...সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।...

সোরগোল করতে করতে বৈজ্ঞানিক ঢুকলেন দুজন লোককে নিয়ে। দুজনের মাথায় দুটো প্রকাণ্ড খাঁচা। মুরগি-ব্যবসায়ীরা বাঁশের তৈরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে সব খাঁচায় মুরগি রাখে, সেই রকম দুটো খাঁচায় বেশ বড় দুটো পেঁচা রয়েছে।

"বুঝলেন, একটা নয়, দুটো পাওয়া গেছে। আর আমি যা আন্দাজ করেছিলাম, কেটুপাই ঠিক। লক্ষ্য ক'রে দেখুন—পা পালক দিয়ে ঢাকা নয়। আর ওই ডিমটাও দেখুন—একটি মাত্রই ছিল, এরা একটার বেশি পাড়েও না সাধারণত, বড় জোর দুটি। ডিমের রঙ কেমন চমৎকার দেখেছেন? সাদার উপর একটু ক্রীমের আভাস। প্রায় দু ইঞ্চি হবে, নয়? একেই বলে ব্রড ওভাল (Broad Oval), এটাকে রেখে দিতে হবে ভাল ক'রে।"

কোণের আলমারি থেকে কার্ড-বোর্ডের বাক্স বার করলেন একটা। তার ভিতর তুলো দেওয়া ছিল। তুলোর উপর ডিমটি সন্তর্পণে রেখে আরও খানিকটা তুলো দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর ফিরে এসে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন পেঁচা দুটোকে। ডানাও দেখতে লাগল। এমন ঘনিষ্ঠভাবে পেঁচা সে দেখে নি কখনও।

"কেটুপারা হচ্ছে ফিশ আউল, বুঝলেন। কয়েক রকম কেটুপা আছে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের চেহারা, রঙ আর পা। টারসাসগুলো উলঙ্গ, মানে পালকহীন। বাইরে থেকে কোন্‌টা স্ত্রী কোন্‌টা পুরুষ বোঝবার উপায় নেই। এদের বাসা থেকে বার করলে কি সেই চামড়ার দস্তানাটা প'রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—সনাতন মল্লিক বললেন,—"ভাগ্যে দস্তানাগুলো দিয়েছিলেন, তা না হ'লে বার করাই যেত না।"

"আমি জানি কিনা।"

"রত্নপ্রভা প্রবেশ করলেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। অমরবাবু সনাতন মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন, "মল্লিক মশাই, আপনিও একটু চা খেয়ে যাবেন তো?"

"আজ্ঞে না, আমার এখনও আহ্নিক হয় নি।"

"ও, তাই নাকি, তা হ'লে আপনি বাড়ি যান, বাড়ি যান। এতক্ষণ কষ্ট ক'রে আপনার থাকবার কোনও দরকার ছিল না তো।"

সত্যিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন অমরবাবু।

সনাতন একটু হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আজ্ঞে না, কষ্ট কি?"

"যান আপনি। আজ আনন্দবাবু আসেন নি দেখছি। তিনি বলছিলেন, পেঁচাটা যদি ধরা পড়ে, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। আপনি তো ওই দিকেই যাচ্ছেন—না, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে, একটা চাকর পাঠিয়ে দিন বরং।"

"আমিই যাবার পথে খবর দিয়ে যাচ্ছি। আমার রাস্তাতেই তো পড়বে।"

সনাতন মল্লিক চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা চায়ের আসর পেতে ব'সে প্রথমেই একটি সুখবর দিলেন।

"আমাদের আস্তাবলের আলসেতে একটা শালিক বাসা বাঁধছে বোধ হয়। খড় মুখে ক'রে ক'রে নিয়ে আসছে দেখলাম।"

"তাই নাকি?"

বৈজ্ঞানিক উৎসাহিত হয়ে উঠে পড়লেন।

কবি বাড়িতে ছিলেন না।

তিনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শহরের বাইরে একটা বাগানে। বসন্ত শেষ হচ্ছে, তারই শোভা দেখছিলেন তিনি। সবাই যেন এবার ফুল ফোটাতে ব্যস্ত। অনেক আমগাছ এখনও মুকুলে ভরা, আমও ধরেছে অনেক গাছে। সজনে গাছে কচি কচি ডাঁটা ঝুলছে, ফুলের স্তবকও রয়েছে এখনও। দূরে রাংচিত্তিরের বেড়া, তাতেও ফুল। ঘনশ্যাম সোজা ডাঁটাগুলোর গাঁটে গাঁটে ছোট ছোট আগুনের শিখা উঁকি দিচ্ছে যেন। কৃষ্ণচূড়া লালে লাল। কর্ণিকার গাছে পাতা দেখা যায় না, আপাদমস্তক সোনার ফুল। কত রকম পাখিই যে ডাকছে! দোয়েলের গিটকিরি-ভরা গান আকুল ক'রে তুলেছে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতকে। যে রিক্তাভরণা বসন্তশ্রী চ'লে যাবার আগে ফুলে ফলে কিশলয়ে সালঙ্কারা হয়ে উঠেছে, সহসা দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত যেন মাদকতার সঞ্চার করেছে তাতে। কোকিলও ডাকছে। ক্রমাগত ডাকছে, বিরাম নেই। তার অবিরাম আহ্বানকে ব্যঙ্গ ক'রে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণকণ্ঠী কোকিলের ভর্ৎসনা—কিক্ কিক্ কিক্। পাপিয়ার সুরলহরী আকাশ স্পর্শ করেছে যেন। মনে হচ্ছে মর্তের আকুতি অমর্তলোকে গিয়ে পৌঁছল বুঝি। ট্র, টুরু টুরু—কয়েকটা বুলবুলি উড়ে গেল। ছোট্ট একটু জলতরঙ্গ বেজে উঠল যেন্ একবার। একটু দূরের একটা গাছে ভারি চমৎকার একটা সুর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন কবি। কাছে গিয়ে দেখেন ফিঙে এবং ফিঙে-গিন্নী প্রেমালাপ করছেন। মিষ্টি সুরের মাঝে মাঝে কেররর-গোছের মিষ্টি ঝনৎকারও আছে একটু। দূর থেকে শুনলে মনে হয়, দু রকম পাখি ডাকছে বুঝি! ছাতারেগুলো কচবচ করছে একটা গাছের নীচে শুকনো পাতার ভিতর। লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বকর-বকর করছে ক্রমাগত। শালিক-দম্পতি খড় কুটো মুখে তুলে বাসা বানাতে ব্যস্ত। দূরের একটা প'ড়ো বাড়ির কার্নিসে বার বার উড়ে উড়ে যাচ্ছে খড় মুখে নিয়ে। ছোট ভগীরথও একটা গাছের ডালে ঠোঁট দিয়ে দিয়ে গর্ত করছে, কুরে কুরে বাসা তৈরি করছে। দূরের আমগাছটায় টিয়া বসল এসে এক ঝাঁক।

হঠাৎ কবির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। একটা লোক গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। মানুষ নয়, মার্জার যেন একটা। হঠাৎ জালটা ঘুরিয়ে ফেলল সে একটা ঝোপে। সমস্ত পাখি উড়ে গেল আশপাশের গাছগুলো থেকে।

"কে তুমি হে, কি করছ এখানে?"

এগিয়ে গেলেন কবি। লোকটা জাল গুটিয়ে নিচ্ছিল, কোনও জবাব দিলে না প্রথমে।

"কি করছ, জাল ফেলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পাখি ধরব।"

"কেন?"

"অমরবাবুর চাই। পাখি পিছু এক টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন।"

"ও!"

পাখি-ওয়ালা জাল কাঁধে ফেলে অন্য দিকে চ'লে গেল। কবি খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তার প্রস্থান-পথের দিকে। জাল দিয়ে পাখি ধরার কথা ইতিপূর্বে অনেকবার শুনেছেন তিনি, খাঁচার ভিতর বন্দী পাখিও দেখেছেন, তবু কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন তিনি, বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ আবার কিক্ কিক্ ক'রে উঠল কোকিল সুন্দরী। খিক খিক ক'রে হেসে উঠল যেন। টুর্‌র্‌র্ ক'রে সাড়া দিলে বুলবুলি। এক ঝাঁক গো-শালিক কলবর করে উঠল। কবির মনে হ'ল, ওই পাখিওয়ালাকে উদ্দেশ্য ক'রে ওরা নিজেদের ভাষায় কিছু বলছে যেন প্রত্যেকেই। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে ওদের বক্তব্যটা যেন নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন তিনি। একটা গাছের তলা একটু পরিষ্কার ছিল, সেইখানে বসলেন আবার। পকেট থেকে খাতা কলম বেরুল। পাখিদের বক্তব্যটা কবিতায় প্রকাশ করতে হবে। তাঁর মনে হ'ল পাখিরা যেন বলছে—

১

তোমাকে চিনি...
আমাদের তুমি চিনতে চাও কি ও পাখি-ওলা?
দূর হ'তে তুমি কারও শোন গান,
        কারও দেখ রঙ, কাহারও দোলা,
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি
মোদের সুনীল উদার আকাশটি?
            আকাশ খোলা
            ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

২

রঙ বা সুরের তুফান তুলিয়া
        কেউবা টিয়া,
        বাহার দিয়া,
কেউবা কোয়েল, কেউবা দোয়েল, কেউবা পাপিয়া
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা

ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৩

সুরের নেশায় কেউবা হারায়ে ফেলেছি দিশা,
কাহারও ফটিক-জলের তৃষা,
কেহবা জাগিয়া কাটাই নিশা—
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৪

কাহারও পালকে ইন্দ্রধনুর বরণ ঘটা
কাহারও রূপালী, কাহারও আবার
সোনার ছটা
সরল জটিল অনেক ধরন
বিবিধ বরণ চঞ্চু চরণ
লাল, নীল, শাদা, কালো বা কটা
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৫

হয়তো একদা প'ড়ে যাব ধরা ফাঁদেতে তোমার,
খাঁচাটি তোমার জানি না কেমন
হয়তো লোহার, হয়তো সোনার
হয়তো একদা ভুলাব তোমারে পেখম তুলি
হয়তো শিখিব তোমারি বুলি
খাইব তোমারি ছাতু বা ছোলা
তোমারি দাঁড়েতে দুলিব দোলা
দয়া ক'রে শুধু যেও না ভুলি
ছিল আমাদের আকাশ খোলা,
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন কবি। ডানার কথা মনে পড়ল। সেদিন রঙ মাখিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে আর তিনি ডানার কাছে যান নি। রঙ দিতে দিতে মনে হচ্ছিল, ডানা যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে নিরুপায় হয়ে রঙ দেওয়াটা সহ্য করছে। উৎসবটা উপভোগ করে নি। তাঁরও উৎসব তাই জমে নি সেদিন। এটাও তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন যে, জোর ক'রে উৎসব জমানো যায় না। আনন্দটা স্বতোৎসারিত না হ'লে তা নিরানন্দের চেয়েও পীড়াদায়ক। ডানা কেন অমন ক'রে আছে? পাখিগুলো পাখিওয়ালাটাকে যে চক্ষে দেখছে, ডানাও হয়তো ঠিক সেই চক্ষেই দেখছে আমাকে। ভাবছে, আমি কবি নই, আমি একটা ফাঁদ। তার ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন সে উৎসবে যোগ দেবে হয়তো। প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হবে। প্রতীক্ষাতেও আনন্দ আছে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল, সত্যিকার উৎসব কবে জমবে? কবে ডানা বুঝতে পারবে যে, অপরকে বঞ্চিত করলে নিজেকেও বঞ্চিত হতে হয়? প্রকৃতির প্রাঙ্গণে নিত্য নব উৎসবের যে ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়েছে অহরহ, ঘরের দ্বার বন্ধ ক'রে রেখে কতকাল তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে সে? দ্বার একদিন খুলতেই হবে। কিন্তু কবে?"...

"চিঠ্‌ঠি হ্যায়।"

চমকে উঠলেন কবি। ফিরে দেখলেন, চন্দনচর্চিত তাঁর মৈথিল ঠাকুরটি একটি চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি যে এখানে থাকবেন, তা ঠাকুরটিকে ব'লে এসেছিলেন। চিঠিটি সনাতন মল্লিকের।—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আনন্দবাবু, আপনাকে এক জোড়া হুতোম পেঁচা দেখাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত অমরেশবাবু বাড়িতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম। আপনার দেখা না পাইয়া এই চিঠিটি লিখিয়া যাইতেছি। নিবেদন ইতি।

ভবদীয়

শ্রী সনাতন মল্লিক

চিঠিটির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি উঠে পড়লেন। হয়তো সোজা অমরবাবুর বাড়িই যেতেন, কিন্তু ঠাকুরটি অদ্ভুত ভাষায় আর একটি খবর দিলে।

"রেন্না হোইয়ে গিয়েসে।"

"কটা বেজেছে?"

"বারহ্‌ বজ্‌ গিয়া।"

"তবে চল, বাড়িই যাই।"

১৫

গত কয়েকদিন থেকে রূপচাঁদ মনে মনে একটি ব'ড়ে হাতে করে কোথায় সেটি বসাবেন ভাবছিলেন। সনাতন মল্লিকের আগমনে তাঁর সে সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল। রূপচাঁদ যুক্তিপন্থী জড়বাদী লোক, দৈব-টৈবের ধার বিশেষ ধারেন না, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ক্ষণিকের জন্য তিনি বিচলিত হলেন একটু। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে হ'ল, এর মধ্যে দৈবের কোন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে নাকি! মনে হওয়াতে কিন্তু আনন্দিতই হলেন। সমস্ত যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর মন কোন এক অজানা দেবতার আনুকূল্য লাভের আশায় লোলুপ হয়ে উঠল। এ ভাবে লোলুপ হয়ে ওঠাটা যে অযৌক্তিক, তা তাঁর মনেই হ'ল না।

শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক অবশ্য রূপচাঁদকে সাহায্য করতে আসেন নি, এসেছিলেন নিজের কাজে। তিনি যদিও অমরবাবুর একটা কাছারির ম্যানেজার ব'লেই বিখ্যাত, তবু তাঁর নিজেরও বিষয় সম্পত্তি আছে কিছু। যদিও যৎসামান্য, তবু সেটাকে কেন্দ্র ক'রেই একটা ফৌজদারী মামলায় প'ড়ে গেলেন তিনি। সিংহেশ্বর দারোগা যদি ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেয়, তা হ'লে খুনের দায়ে পড়তে হবে তাঁকে। বিপদে পড়লে সনাতন মল্লিকের বুদ্ধি প্রখরতর হয়ে উঠে। সিংহেশ্বর দারোগার কাছে না গিয়ে তিনি সোজা চ'লে গেলেন রূপচাঁদবাবুর আপিসে। তাঁর মনে হ'ল, রূপচাঁদ যখন পুলিস অফিসের বড়বাবু, তখন তিনি দারোগারও দারোগা।

রূপচাঁদ হাসিমুখে মল্লিক মশায়ের কথা শুনলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। নিশ্চয় করবেন। মল্লিকের মুখের দিকে হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর বললেন, "আপনি অমরকে দিয়েও যদি একটু চেষ্টা করেন তা হ'লেও তো হয়ে যায়। অমরকে খুবই খাতির করে সিংহেশ্বর দারোগা।"

"তা জানি"—মৃদু হেসে বললেন মল্লিক মশাই—"কিন্তু পাখি নিয়ে উনি এমন উন্মত্ত যে, এ সব কথা ওঁর কাছে পাড়াই মুশকিল।"

এইবার ব'ড়েটি চালালেন রূপচাঁদ।

মুচকি হেসে বললেন, "বিশেষ ক'রে পাখির ডানা নিয়ে বলুন। সেদিন স্বচক্ষেই তো দেখলেন।"

এর উত্তরে মল্লিক কোনো কথা বললেন না, তাঁর মুচকি হাসিটি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে গেল শুধু।

"না না, হাসির কথা নয়"—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেলে এবার—"বন্ধু হিসেবে এর প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত আমাদের।"

"কি প্রতিকার করবেন? আপনি আমি কি প্রতিকার করতে পারি বলুন? যার হাতে অত টাকা—"

কথাটা শুনে রূপচাঁদ দ'মে গেলেন একটু মনে মনে। বস্তুতান্ত্রিক লোক তিনি টাকার ক্ষমতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে অনেক টাকা আছে এ সংবাদটা মোটেই আনন্দজনক নয় তাঁর কাছে। তাঁর ধারণা, টাকা দিয়ে প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। কাকে কিনতে কত সময় এবং কি পরিমাণ অর্থ লাগে, সেইটে কেবল নির্ভর করে প্রতি স্ত্রীলোকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধের উপর। আর কোন তফাত নেই। অমরেশ যে বড়লোক তা রূপচাঁদ জানতেন, কিন্তু তার ঠিক কত টাকা আছে এ খবরটা ঠিক তিনি জানতেন না। ঈষৎ কৌতূহল হ'ল।

"অনেক টাকা আছে নাকি ওঁর?"

"নেই? বাংলা বিহার উড়িষ্যা সব জায়গাতেই কিছু না কিছু জমিদারি আছে যে। নগদ টাকাও আছে বেশ। বাপের, শ্বশুরের, মামার—তিন জায়গারই বিষয় পেয়েছেন কিনা। ত্রিবেণী-সঙ্গম। অগাধ জলের মাছ উনি।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র লোক অবশ্য রাশ টেনে ধরতে পারেন—ওঁর পরিবার।"

মল্লিক মশাইও কথাটা স্বীকার করলেন।

"তা পারেন বৈকি, একশো বার পারেন। কিন্তু করছেন না তো কিছু বরং ওঁর গোড়েই গোড় মিলিয়ে—"

"আমরা সেদিন যেটা দেখলাম, সে খবরটা উনি জানেন না বোধ হয়। আমাদের উচিত খবরটা ওঁর কানে তুলে দেওয়া। আমার দ্বারা অবশ্য অসম্ভব সেটা, কোন কৌশলে আপনি যদি পারেন।"

"আমি? ও বাবা! কে পড়তে যাবে ওই বাঘিনীর পাল্লায়!"

"বাঘিনী নাকি? মনে তো হয় না দেখে?"

"আপনার মনে হবে কেন, হবার কথাও নয়, যার ঘাড়টি মটকায় সে-ই জানতে পারে।"

"ঘাড় মটকায় নাকি?"

"খুব মটকায়। এখানকার জমিদারি তো ওঁরই বাপের, উনিই সব দেখা শোনা করেন, পান থেকে চুনটি খসবার জো নেই কারও। লেখাপড়া তেমন জানেন না বটে, কিন্তু সমস্ত জমিদারীর হিসাবপত্র একেবারে নখাগ্রে।"

"সেইজন্যেই তো আমার আরও আশা হচ্ছে যে নিজের স্বামীর পান থেকে চুন খসার খবরটা পেলে উনি ছেড়ে কথা কইবেন না। খবরটা আপনি পৌঁছে দিন কোন রকমে, বুঝলেন? আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন।"

কথাটা ব'লে রূপচাঁদ এমনভাবে চাইলেন মল্লিক মশাইয়ের দিকে যে মল্লিক পুলকিত না হয়ে পারলেন না।

"নবুর মাকে দিয়ে খবরটা বলাতে পারি অবশ্য। এমনভাবে বলবে, যেন গুজব শুনেছে একটা। সেটা কিছু অসম্ভব নয়।"

"নবুর মা-টি কে?"

"ওঁর ঝি।"

ক্ষণকাল নীরব থেকে রূপচাঁদ বললেন, "উপকারটি করুন তা হ'লে। অমরেশ আমাদের বন্ধুলোক, কিন্তু এসব ব্যাপার সামনাসামনি তো বলা যায় না কিছু। অথচ—"

রূপচাঁদ এমন একটা ভাব করলেন যে, মল্লিক মশাই যদি নবুর মাকে দিয়ে রত্নপ্রভার কানে খবরটা তোলেন তা হ'লে তিনি, মানে রূপচাঁদই, যেন ব্যক্তিগতভাবে বাধিত হবেন। মল্লিকমশাই রূপচাঁদের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এসেছেন, রত্নপ্রভার উপর তাঁর নিজেরও একটা আক্রোশ আছে, তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

"বেশ, নবুর মাকে বলব আমি। দু-চার দিনের মধ্যে চ'লেও যাচ্ছে ওঁরা।"

"কারা?"

"অমরবাবুরা।"

"কোথায়?"

"ওদের জমিদারী দেখতে। নানা জায়গায় সম্পত্তি আছে তো। একটা জরুরি তারও এসেছে নাকি কোথা থেকে।"

"ডানাও সঙ্গে যাচ্ছে নাকি?"

"প্রাইভেট সেক্রেটারি যখন, যাওয়া তো উচিত।"

রূপচাঁদের মনটা ঝম্পনোন্মুখ বিড়ালের মত একাগ্র হয়ে উঠল সহসা।

"সিংহেশ্বর দারোগাকে আজই খবর পাঠাব আমি। আপনিও নবুর মাকে লাগান আজই, দেরি করবেন না। দেরি করবেন না, বুঝলেন?"

"আচ্ছা।"

"মল্লিকমশাইয়ের কেমন যেন অস্পষ্টভাব মনে হ'ল যে সিংহেশ্বর দারোগাকে সপক্ষে আনার মূল্য হিসাবেই যেন তাঁকে এ কাজটি করতে হবে।"

"উঠি তবে।"

"নবুর মায়ের কথাটা ভুলবেন না।"

"না."

মল্লিকমশাই চ'লে গেলেন। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন রূপচাঁদ। একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হতে লাগল তাঁর। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়েছিলেন। তারই একটা ঘটনা মনে প'ড়ে গেল। একটা সর্পসঙ্কুল গুহার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে সিন্দবাদের মানসিক অবস্থা যে রকম হয়েছিল, তাঁরও যেন সেই রকম হ'ল। চতুর্দিকে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। প্রত্যেকটা মনোহর, প্রত্যেকটা বিষধর। প্রত্যেকের ফণার দুপাশে জ্বলজ্বল করছে চোখ, না, মণি? রূপচাঁদের শরীরের শিরায় উপশিরায় অগ্নিস্রোত বইতে লাগল যেন। পর-মুহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে। না, আত্মহারা হ'লে চলবে না। স্থির মস্তিষ্কে অগ্রসর হতে হবে। আপিসের কাজে মন দিলেন আবার।

১৬

দ্বিপ্রহরটা ভারি অদ্ভুত মনে হ'ল কবির কাছে। মনে হ'ল, দ্বিপ্রহরের রূপটা চোখেই পড়ে নি এতদিন। দিবসের পূর্ণ যৌবন যেন অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোথাও কোনও সাজসজ্জা নেই, কোনও কলরব নেই। মানুষ, গাছ, পশুপক্ষী সকলেই যেন সংযত হয়ে আছে, একটা আত্মসম্বরণের সুর যেন ফুটে উঠেছে চারিদিকে। আত্মসম্বরণ, না, আত্মবিস্মৃতি?—সহসা মনে হ'ল তাঁর? পূর্ণ যৌবন তো আত্মবিস্মৃত। নিজের মহিমার সম্পূর্ণ খবর সে নিজেও জানে না, অপরকে জ্ঞাতসারে জানাবার চেষ্টাও করে না তাই। সকালে অমরেশবাবুর বাড়ি গিয়ে প্যাঁচা দুটো দেখেও এই কথা মনে হচ্ছিল তাঁর। ওদের অটল গাম্ভীর্য, প্রচ্ছন্ন প্রতাপ, ওদের শ্বাপদসুলভ স্থূলতার সঙ্গে পক্ষীসুলভ লঘুতার সমন্বয়—এ সমস্তর সম্বন্ধেই ওরা উদাসীন। আমাদের মনে যে ভাব ওরা উদ্রেক করেছে, তার খবর ওরা নিজেরাই জানে না। ডানার কথা মনে হ'ল। সকালে যখন গিয়েছিলেন, ডানা তখন ছিল না সেখানে। না থাকাতে একটু আরামই পেয়েছিলেন মনে মনে। সেদিন অমন জোর ক'রে রঙ দেওয়ার পর থেকে নিজেই যেন অপরাধী হয়ে আছেন নিজের কাছে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এই সঙ্কোচটাকে তিনি যদি প্রশ্রয় দেন, তা হ'লেই পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তিনি তো অন্যায় কিছু করেন নি, তাঁর মনে কোন পাপ নেই, সেদিন নিছক আনন্দের প্রেরণায় রঙে রসে মেতে উঠেছিলেন তিনি, তার মধ্যে স্থূল কিছু ছিল না। উঠে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। এ সঙ্কোচের বাধাকে সরাতে হবে, এখনই সরাতে হবে। ডানাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তিনি রূপরসিক কবি, মাংসলোলুপ পশু নন। তার দেহে, তাঁর যৌবন-শ্রীতে যে সৌন্দর্য ক্ষণিকের লীলায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তারই তিনি উপাসক।

...হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের আর একটা চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর এই সৌন্দর্য-পূজার ফলে ডানার মনোজগতে যদি একটা বিপ্লব ঘ'টে যায়, তা হ'লে তার পরিণাম কি হবে? এ রকম বিপ্লব ঘটতে পারে কি? না পারার কোনও হেতু নেই। বয়সের পার্থক্য প্রেমের অন্তরায় নয়। বৃদ্ধের সঙ্গে যুবতীর প্রেমের অনেক কাহিনী শোনা গেছে। আর এ কথাও সুবিদিত যে, কোনও নারী যখন কোনও পুরুষকে ভালবেসে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন দেহ সম্বন্ধে শুধু যে কোনও সঙ্কোচ থাকে না তা নয়, সমস্ত দেহ-মন দয়িতের কাছে নিবেদন করতে না পারলে তার তৃপ্তি হয়

না,—আত্মসমর্পণ অসম্পূর্ণ থেকে যায় সুতরাং—। হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন তিনি। ভাবলেন, আমার নিজের মনে যখন ও-ধরনের কোনও চিন্তা জাগে নি, তখন ডানার মনেও জাগবে না।

খুকু নেই, খুকু নেই, খুকু নেই—

গাছের উপর থেকে পাখি ডেকে উঠল একটা। চেয়ে দেখলেন, হাঁড়ি চাঁচা পাখি। এই পাখি তো চ্যা-চ্যা-চ্যা ক'রে ডাকে, ওই ডাকের জন্যই ওর হাঁড়ি চাঁচা নাম সম্ভবত। অমন মিষ্টি করেও ডাকতে পারে নাকি?

খুকু নেই, খুকু নেই—

কি চমৎকার দুলে দুলে ডাকছে। সত্যিই কি খুকু নেই বলছে? কান পেতে শুনলেন। এবার মনে হ'ল, যেন 'কু অক্ রিং' 'কু অক্ রিং' বলছে। কবি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই পাখিটা কিন্তু উড়ে গেল। উড়তেই তার ঝোলা লেজের বাহার দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা জাপানী পাখা যেন। কালোর চারিদিকে চওড়া সাদা পাড়। অতি সাধারণ পাখি তবু একে ভাল ক'রে দেখেন নি কোনদিন। দেখেছেন, কিন্তু চেনেন নি। তখনই আবার মনে হ'ল চেনা সহজ কি? যার চ্যা-চ্যা ডাক 'খুকু নেই' হয়ে যায় এবং সেই 'খুকু নেই' 'কু অক্ রিং' শোনায় পর-মুহূর্তে, তার পরিচয় কি সহজে পাওয়া যাবে? অমরবাবু যে বইটা দিয়েছেন, সেই বইটা উলটে দেখতে হবে একটু। এই প্রসঙ্গে মনে হ'ল, একটা পাখির ব্যাপারেই যখন এত হেঁয়ালি, মানুষের ব্যাপারে সে হেঁয়ালি না জানি আরও কত জটিল। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি ডানার বাসার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যে অপ্রত্যাশিত রূপ তিনি এই সামান্য পাখিটার মধ্যে দেখলেন, ডানার মধ্যেও তেমনিই একটা কিছু পাওয়া যাবে কি না এই ধরনের একটা ঔৎসুক্য তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, একটা শব্দ শুনে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তিনি দেখলেন—একটি স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোর বালক ডানার বাড়ির পিছন দিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে, ঝোপ-জঙ্গল ভেদ ক'রে মাঠামাঠি দৌড়চ্ছে। কবি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। ভদ্রঘরের বয়স্ক মেয়েকে এমনভাবে ছুটতে কখনও দেখেন নি তিনি। মাথার খোঁপা এলিয়ে পড়েছে পিঠে, পরনের শাড়ি গাছকোমর ক'রে বাঁধা। বকুলবালা আনন্দমোহনকে দেখেই ছুট দিয়েছিলেন, দূর থেকে আনন্দমোহন তাঁকে চিনতে পারলেন না। চণ্ডীর সঙ্গে বকুলবালা চুপিচুপি দুপুরবেলা বেরিয়েছিলেন, অমরবাবু পাখিদের জন্যে কাঠের যে সব বাসা বানিয়ে নানা গাছে টাঙিয়ে দিয়েছেন তাই দেখবার জন্যে। ডানার বাসার সামনের গাছেই টাঙানো ছিল কাঠের বাক্স একটা, চণ্ডী দূর থেকে সেইটে দেখাচ্ছিল বকুলবালাকে।

কবি গিয়ে দেখলেন, দূর থেকেই দেখতে পেলেন ডানা নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে। এক ফালি রোদ এসে পড়েছে তার বাঁ কাঁধের উপর। শাড়ির জরি-পাড়টা জ্বলছে রোদ লেগে, কমলা রঙের শাড়িটা যেন আগুনের শিখা। অনেকক্ষণ চুপ করে দেখলেন তিনি, তারপর এগিয়ে গেলেন।

"পড়া হচ্ছে না?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললে, "আসুন। অনেক দিন আসেন নি।"

"কি পড়ছ?"

"পাখির বই একটা।"

"অমরবাবু দিয়েছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

কবির সঙ্কোচ কেটে গেল। সহজ সুরেই আলাপ করতে লাগলেন তিনি।

১৭

জরুরি তার এসেছিল রত্নপ্রভার বাপের বাড়ি থেকে। পয়লা বৈশাখ সেখানে খুব উৎসব। সেই উপলক্ষে যেতে হবে। যেতেই যখন হচ্ছে, তখন বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্মগুলোও মিটিয়ে আসবেন ঠিক করেছেন অমরবাবু। কিছুদিন আগেই এটা ঠিক করেছিলেন তিনি। কিন্তু পাখির ব্যাপারে সম্প্রতি এত মেতে উঠেছিলেন যে, কথাটা মনে ছিল না। মনে পড়াতে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এখানকার ব্যাপারগুলোর কি হবে ভেবে। এতগুলো পাখি ধরা হয়েছে, নানা গাছে পাখির বাসা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো আস্ত পাখি বম্বে পাঠান হয়েছে ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাছে, পাখির ঘর তৈরি করবার জন্য নানা রকম খাঁচা করতে দিয়েছেন, ইট পোড়ান হচ্ছে, তিনি না থাকলে এসব দেখবে কে? মল্লিক পারবেন না। অথচ তাঁকে যেতেই হবে। এখানকার ব্যাপারের সমস্ত ভারটা ডানার উপরেই দিয়ে যেতে চান তিনি। কোন্ পাখিকে কি খেতে দিতে হবে, তার ফর্দ এবং বই ডানাকে তিনি দিয়েছেন। পাখির যেসব বাসা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোন্ কোন্ পাখি আসা সম্ভব তারই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এখন। হাতে বই ছিল একটা। হঠাৎ বললেন, "দেখুন, ডিউয়ারের (Dewar) এ বইখানা আমি নিয়ে যাব। আপনি বরং নোটই ক'রে নিন।"

ডানা কাগজ-পেন্সিল বার ক'রে বসল।

"পাখিরা সাধারণত কোন্ কোন্ জায়গায় বাস করে, তারই একটা মোটামুটি ফর্দ আছে এতে। লিখুন, বড় হেডিং দিন—বাড়ি। তারপর সাব-হেডিং দেওয়ালের গর্তে বা ফাটলে। লিখুন—চড়াই, হুপো (মানে মোহনচূড়া), শালিক, কুট্‌রে-প্যাঁচা অবশ্য পুরনো বাড়িই আশ্রয় করে বেশি, নীলকণ্ঠ, দোয়েল, খঞ্জন (মানে Pied Wegtail)—যেগুলো এ দেশে থাকে। তারপর সাব-হেডিং—পারলে বা কড়ি-বরগার ফাঁকে—কালিশ্যামা, পায়রা, ঘুঘুও অনেক সময়, শালিক। আবার সাব-হেডিং—উঁচু ছাদ (যেমন চার্চের ছাদ)—শকুনি, ইন বলেছেন ছাদের উপর টিট্টিভও নাকি কখনও কখনও বাসা বাঁধে, আমি কখনও দেখি নি। আমাদের নদীর ধারের বাড়িটায় লক্ষ্য রাখবেন একটু। তারপর সাব-হেডিং দিন—বাইরের দিকের দেওয়ালে, পারলের কাছে—তাল-চোঁচ, মানে Indian Swift, সোয়ালো, ক্র্যাগ মার্টিন—"

"সোয়ালো কোন্‌গুলো বলুন তো, দেখেছি কি? ক্র্যাগ মার্টিন কি এদেশী পাখি?"

"সোয়ালো আপনাকে দেখিয়েছি। ল্যাজে সরু তারের মত—Wiretailed নাম সেইজন্যে। জগদানন্দবাবু ওর বাংলা নাম দিয়েছেন 'নকুটি'। ক্র্যাগ মার্টিনের পুরো নাম হচ্ছে ডাস্কি ক্র্যাগ মার্টিন (Dusky Crag Martin), আমিও খুব বেশি দেখি নি এ অঞ্চলে। তারপর লিখুন—কড়ি বা বরগা থেকে, কিংবা কোন তার থেকে যেসব পাখি বাসা ঝুলিয়ে দেয়—টুনটুনি, বাবুই, বারান্দার টবের গাছে যারা বাসা বাঁধে—দর্জিপাখি, বুলবুল। বাড়ি এবং বাড়ির আশপাশ হয়ে গেল। এইবার বাইরে যাওয়া যাক। নদীর তীরে যারা গর্ত ক'রে বাসা বাঁধে—গাংশালিক, বাঁশপাতি (গ্রীন ব্লুটেল্‌ড্‌ও), মাছরাঙা (কমন পায়েড, হোয়াইট-ব্রেস্টেড)। গাছে যারা গর্ত ক'রে বাসা বানায়—বসন্তবউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা (গোল্ডেন ব্যাক্‌ড—সেদিন যেটা দেখলাম, আর পায়েড, মারহাট্টা)। এরা গাছের গুঁড়িতে বা ডালে নিজেরাই গর্ত বানায়। আর কতকগুলো পাখি থাকে, তারা গাছের গুঁড়িতে যেসব ফাটল বা গর্ত থাকে, তাতে বাসা

বানায়—যেমন পাওয়াই (দু রকমই—গ্রে-হেডেড, ব্ল্যাক-হেডেড), এরাও শালিক জাতীয়, সাধারণ শালিকও এসব জায়গায় বাসা বানায়, চড়াই, কালিশ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, হুপো, প্যাঁচা, টিল, মানে ছোট ছোট হাঁস। হয়েছে?"

ডানা তাড়াতাড়ি লিখে যাচ্ছিল, চোখ তুলে একটু হেসে বললে, "টিল বললেন?"

"হ্যাঁ, টিল। কুম্‌ব্‌ ডাকও লিখুন। কুম্‌ব্‌ ডাক বুঝলেন তো? নাক্‌টা যাকে বলে। এইবার সাব-হেডিং হবে—ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের নীচের দিকে—"

ডানা লেখা শেষ ক'রে বলল, "হয়েছে, এইবার বলুন।"

বাধা পড়ল। রত্নপ্রভা এসে ঢুকলেন। চকিতে বৈজ্ঞানিকের এবং ডানার দিকে চেয়ে নীরবে একটা চেয়ার টেনে বসলেন তিনি। মিনিট কয়েক আগে নবুর মার মুখে তিনি পল্লবিত কাহিনীটি শুনেছেন, ডানা নাকি বৈজ্ঞানিকের পিঠে উঠে নদীর ধারে একটা গাছ থেকে ফুল পাড়ছিল। কাহিনীটি সালঙ্কারে বিবৃত করার ফলে নবুর মায়ের চাকরিটি গেছে। রত্নপ্রভা সঙ্গে সঙ্গে দূর ক'রে দিয়েছেন তাকে।

রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "ডানাও চলুক না আমাদের সঙ্গে। তোমার লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে পারবে।"

"অসম্ভব। এখানে তা হ'লে দেখা-শোনা করবে কে? ওর উপরই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি এখানকার। অতগুলো পাখির বাসা টাঙানো হয়েছে, কোন্‌ পাখি কোথায় বাসা বাঁধে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তো?"

"একা একা ওঁর ভাল লাগবে কি?"

"তা লাগবে"—ডানা হেসে বললে।

"আনন্দবাবুও থাকবেন। তাঁর উপরও ভার দিয়ে যাব। নিন লিখুন। এইবার লিখুন—যেসব পাখি ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা গাছের নীচের দিকে বাসা বানায়।"

রত্নপ্রভা উঠে গেলেন। তিনি যা জানতে এসেছিলেন, তা জেনে গেলেন। নবুর মা ইঙ্গিতে যা প্রকাশ ক'রে গেল তা যদি সত্য হ'ত, তা হ'লে ডানাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক উল্লসিত হয়ে উঠতেন। স্বামীর উপর ক্ষণিকের জন্যও সন্দেহ হয়েছিল ব'লে অনুতাপ হ'ল তাঁর। রাগও হ'ল। নবুর মাকে আবার ডাকতে পাঠালেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক আরম্ভ করলেন, "ঝোপে-ঝাড়ে বা গাছের নীচের দিকে—সাব-হেডিং দিয়েছেন? এইবার লিখুন—ছাতারে, হোয়াইট আর সবজে মুনিয়া, বুলবুল, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, বাবুই, টুনটুনি। হ'ল? তারপর লিখুন—কুয়োপাখি, আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন বাদামী-কালো, ঘুঘু, আরও কয়েকটা নাম আছে, থাক্‌ সেগুলো। এইবার সাব-হেডিং দিন—যে সব পাখি গাছের উপরে মগডালের কাছাকাছি বাসা বাঁধে—সবরকম চিল, কাক, হাড়িচাঁচা, ফটিকজল, ফিঙে, শকুনি, সবরকম বাজ, হরিয়াল, বক, সারস, মুগুক, পানকৌড়ি, গগনভেড় ইত্যাদি। আরও অনেক নাম আছে, সেসব এখানে দেখতে পাবেন না। তারপর সাব-হেডিং দিন—যারা ফসলের ক্ষেতে কিংবা নলখাগড়ার বনে কিংবা বড় বড় ঘাসের ঝোপে বাসা বানায়—হলদে-চোখ ছাতারে, বুলবুল, দর্জিপাখি, রেনওয়ার্বলার (হিন্দীতে যার নাম ফুৎকি), টুনটুনি, নীল বগলা, যার ইংরেজি নাম Purple Heron. এইবার লিখুন—উঁচু পাহাড়ের খাঁজে বা ফাটলে যারা বাসা বানায়—চিল, শকুনি, বাজ, নীল পায়রা। এইবার লিখুন, ও, হয় নি বুঝি এখনও?"

"হয়েছে। বলুন।"

"লিখুন—মাটিতে যারা বাসা বানায়—কালিশ্যামা (কদাচিৎ), বগেরি, ভরতপাখির দল,

নাইট্‌জার, ময়ূর, বনমুরগি, বটের, তিতির, সারস, হুকনা, বাটান, কাদাখোঁচা, টিট্টিভ, গাংচিল (হুইস্কার্ডগুলো নয় কিন্তু)। এইবার সাব-হেডিং দিন—ঝিলে বিলে যারা বাসা বানায়—জলমুরগি, কূট অর্থাৎ কারশুব (এ দেশে যাদের বাবাজী বলে), জলপিপি, পানডুবি অর্থাৎ Dabchick, Whiskered Tern, গুঁপো, গাংচিল বললে কি খুব খারাপ শোনাবে?"

ডানা লেখা শেষ ক'রে হেসে বললে, "এর অনেক পাখি কিন্তু চিনি না।"

"সালিম আলি আর হুইসলার বই দুটো রেখে যাব। দেখে নেবেন। ছবি দেখলে চিনতে কষ্ট হবে না।"

কবি এসে হাজির হলেন।

"আসুন, আসুন, আপনারই প্রতীক্ষা করছি। আমার অবর্তমানে আপনি আর ইনি আমার পাখিগুলোর তদারক করবেন। পাখিদের সম্বন্ধে যদি নতুন কিছু দেখেন, লিখে রাখবেন।"

"আমি লিখব কবিতায়, তা আপনার কাজে লাগবে না তো।"

"বেশ, আপনি কবিতাতেই লিখবেন। ইনি লিখবেন গদ্যে। দুটো মিলিয়ে দেখা যাবে, আমার সঙ্গে কোন্‌টা বেশি মেলে।"

ডানার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল।

কবি বললেন, "আমার সঙ্গে কিছু মিলবে না। আপনি সেদিন প্যাঁচার জাতি বংশ নখ পালক নিয়ে অত বক্তৃতা করলেন, কিন্তু আমার কবিতায় যা ফুটল সে একেবারে অন্য জিনিস।"

"কবিতা লিখেছেন নাকি?"

"এনেওছি সঙ্গে।"

"পড়ুন।"

কবি পকেট থেকে কবিতার খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

দেখেছি তোমার মাঝে বিহঙ্গের অম্বর-বিলাস
মার্জারের শব্দহীন সুগোপন শিকারান্বেষণ
তীক্ষ্ণ তব নখ-চঞ্চু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাধা-বিদারণ
চীৎকার-ছুরিকাঘাতে নিশীথের স্তব্ধতা-বিনাশ
কর যবে হে পেচক,
শান্তরে অশান্ত কর, কেঁপে ওঠে মৃত্তিকা আকাশ।
অতি স্বচ্ছ দিবালোকে শুনি গান অসংখ্য পক্ষীর
হিংস্র শ্বাপদেরা জানি অন্ধকারে করে সঞ্চরণ
উভয়ের প্রাণধর্ম করিয়াছ তুমি সংহরণ
অন্ধকার প্রাসাদের দ্বারপাল, হে গুরু-গম্ভীর,
শক্তিধর, হে পক্ষী-পাঠান,
হে অদ্ভুত, হে বলিষ্ঠ, হে বাহন জীবন-লক্ষ্মীর।

"চমৎকার হয়েছে তো!"—বৈজ্ঞানিক বললেন,—"প্যাঁচার চরিত্রটা বেশ ফুটেছে।"

"বেশ ফুটেছে?"—ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

ডানা হাসিমুখে চুপ ক'রে রইল ক্ষণকাল, তারপর বললে, "সত্যিই বেশ হয়েছে।"

কবিতার কথা কিন্তু চাপা প'ড়ে গেল পর-মুহূর্তেই।

বৈজ্ঞানিক কবিকে বললেন, "কোন্ কোন্ পাখি কোন্ কোন্ জায়গায় বাসা বানায়, তার মোটামুটি ফর্দ দিয়ে গেলাম একটা এঁর কাছে। লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের তৈরি বাসাগুলোতে কোনও পাখি আসে কি না।"

"বেশ।"

"পাখিদের খাবার যদি বাসার চারিধারে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত তা হ'লে খাবারের লোভে পাখিগুলো আসত অন্তত। তারপর বাসা পছন্দ হ'লে হয়তো থেকেও যেত। দাঁড়ান, পাখিদের খাবারেরও আইডিয়া একটা দিয়ে দিই আপনাদের।"

বৈজ্ঞানিক উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বই খুঁজতে লাগলেন।

কবি ডানাকে বললেন, "কি টুকছিলে এতক্ষণ? দেখি—"

ডানা খাতাখানা এগিয়ে দিলে। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল কবির।

এই সব রাবিশ লিখে যেতে হচ্ছে ওকে প্রত্যহ। ডানাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত করাতে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। এখন কষ্ট হতে লাগল। খাতাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ব'সে রইলেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল, ছ্যাকড়াগাড়িতে ঘোড়াই জোতা উচিত ছিল অমরবাবুর, ময়ূরকে এ কাজে লাগানোটা ঠিক হয় নি। আর কিছু নয়, অশোভন। ময়ূরের কথায় মনে পড়ল ময়ূরবাহন কুমার কার্তিকেয়কে। তারপরই মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈন্যাপত্যমুপেত্য বঃ
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীবীর্য্যবিভূতিভিঃ।

যিনি নিজের বীর্যপ্রভাবে বন্দিনী দেববালাদের বেণী বিমোচন করতে পারেন, তিনিই ময়ূরবাহন হওয়ার উপযুক্ত।

একগাদা বই নিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"এই বইগুলো আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। অনেক রকম খবর পাবেন এগুলোতে।"

বইগুলো খুলে খুলে প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে শুরু করলেন। দিতে দিতে সক্ষোভে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক, "সত্যি, আমরা কিছুই করছি না, এরা কত রকম ভাবে পাখির বিষয়ে লিখেছেন দেখুন। ইনি কেবল পাখির ওড়া নিয়েই বই লিখেছেন একটা। ইনি লিখেছেন গান নিয়ে। পাখির বাসা নিয়ে, ডিম নিয়ে, দেশভ্রমণ নিয়ে, খাদ্য নিয়ে এঁদের কৌতূহলের আর অন্ত নেই। রিপ্লে সাহেব হামিং বার্ড দেখবার জন্যে ডাচ নিউগিনি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। আমরা কি করলাম জীবনে?"

"আপনিও করুন না। বাধাটা কিসের?"—হেসে বললেন কবি।

"অত টাকা কোথায় মশাই? আমার যদি টাকা থাকত, আমিও নিউগিনি গিয়ে থেকে আসতাম কিছুদিন।"

"আপনার টাকা নেই বলেন কি?"

"যা আছে তা যথেষ্ট নয়। প্যাসিফিকের দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়াতে গেলে নিজের ছোটখাট একটা জাহাজ থাকা দরকার। আমি একা তো যেতে পারব না। রত্নাকে চাই। তা ছাড়া আরও লোকজন চাই। ভাল একজন ফোটোগ্রাফার চাই। দোভাষীও দরকার প্রতিপদে। খরচ অনেক।"

"কিন্তু আপনার তো আয়ও অনেক শুনেছি।"

"খরচ নেই? চারটে স্কুলের সমস্ত খরচ দিতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় কাছারি আছে,

কর্মচারী আছে। আমার মায়ের নামে একটা হাসপাতাল করিয়ে দিতে হবে, তাতেই দশ-বারো লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাবে। জগুচকের প্রজারা ধরেছে, তাদের জমিতে বাঁধ দিয়ে একটা লক্‌গেট ক'রে দিতে, প্রতি বছর বানে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ক'রে দিতেই হবে। পাখির পিছনে খুব বেশি টাকা খরচ করব কোথা থেকে? এখানে যা ফেঁদেছি, তাতেই লাখ খানেক বেরিয়ে যাবে। এইটেই অপব্যয় মনে হচ্ছে।"

বৈজ্ঞানিকের মুখে অপ্রতিভ হাসি ফুটে উঠল একটা। তারপর সে ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি।

"এই বইটাও আপনি পড়বেন আনন্দবাবু,—Hunters and the Hunted, বিশেষত পাখির অধ্যায়টা। আপনার কল্পনারও অনেক খোরাক আছে ওতে।"

"বেশ, রেখে যান।"

১৮

চরের দৃশ্য জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। রৌদ্রালোকে দিবা দ্বিপ্রহরে যা ছিল অসহ্য, জ্যোৎস্নালোকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাই হয়ে উঠেছে মনোরম। এও অসহ্য মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীর। একটা বালুস্তূপের উপর ব'সে ব'সে তিনি ভাবছিলেন, অনুভূতির এ বিকার কবে অবলুপ্ত হবে? চক্রবাল-রেখালগ্ন বৃক্ষশ্রেণীর রূপ বদলে গেছে, সবুজের লেশমাত্র নেই, সব কালো। নদীতীরের হেলে-পড়া গাছটাকে মনে হচ্ছে, একটা বিরাট সরীসৃপ যেন মাথা তুলেছে নদী থেকে. বীভৎস নয়, অদ্ভুত। অদ্ভুত ব'লেই কিন্তু খারাপ লাগছে সন্ন্যাসীর। অন্য কোনও কারণে নয়, এই অনুভূতির মধ্যে নিজের অপূর্ণতার প্রমাণ আছে ব'লে। যা অপ্রত্যাশিত, তাই অদ্ভুত। এ ব্যাপারটাকে অপ্রত্যাশিত কেন মনে হচ্ছে তাঁর? নিত্যপরিবর্তনশীল বহির্লীলার অন্তরালে যিনি শাশ্বত অক্ষর, তিনি তো অপ্রত্যাশিত নন, তাঁকে চিনতে বার বার ভুল হচ্ছে কেন? চোখ বুজে ব'সে রইলেন সন্ন্যাসী। মনে মনে বলতে লাগলেন, হে নিগূঢ়, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষলোকে অসংখ্য তোমার রূপ—কখনও ভীষণ, কখনও সুন্দর ; অসংখ্য তোমার ভাষা—কখনও সরব, কখনও নীরব ; অসংখ্য তোমার নির্দেশ—কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট ; অসংখ্য তোমার আশ্বাস—কখনও সহজ, কখনও দুরূহ। তুমিই প্রলোভন, তুমিই সংযম। ভোগেও তোমার আনন্দ, ত্যাগেও তোমার আনন্দ। রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়, সবুজে কালোতে, পাপে পুণ্যে তুমিই ওতপ্রোত। কল্পনায় যা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে তা প্রতিভাত হচ্ছে না কেন? চোখ বুজে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ, দৃষ্টি প্রেরণ করলেন অন্তরের অন্তস্তলে, কল্পনাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে দেখতে চেষ্টা করলেন।

...টিহি—টিট্টিহি—টিট্টিহি। টিট্টিভ পাখিটা ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল। দূর থেকে শোনা যেতে লাগল কেবল—টিটি, টিটি, টিটি। সন্ন্যাসীর ধ্যানলোকেও পৌঁছল সে ডাক ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে, এবং রূপান্তরিত হ'ল ব'লে ধ্যানের একাগ্রতাও নষ্ট হ'ল। তিনি শুনতে লাগলেন—চিঠি, চিঠি, চিঠি। ভিন্ন খাতে বইল চিন্তাধারা, মানসপটে মায়ের মুখখানা ফুটে উঠল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন, তাঁর দিকে ফিরে বলছেন—বাক্সর তলায় চিঠিখানা আছে, প'ড়ে দেখিস বাবা। ওতেই লেখা আছে সব কথা। বাক্সর তলা থেকে চিঠিখানা বার ক'রে নিয়েছেন তিনি। পড়েওছেন। কিন্তু...। বাবার মুখখানা মনে পড়ল। চোখ দুটো নির্নিমেষে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। পাঞ্জাবে চাকরি করতে করতে হঠাৎ তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেকালের স্বদেশী-আন্দোলনে। দীক্ষিত হয়েছিলেন অগ্নি-মন্ত্রে। সন্ন্যাসী যদিও রিভল্‌ভার

হাতে তাঁকে দেখেন নি কোনদিন, তবু যখনই তাঁকে মনে পড়ে তখনই একটা বিশেষ ছবি ফুটে ওঠে। অন্ধকার রাত্রে তিনি যেন একা হেঁটে চলেছেন বিরাট এক প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে। বলিষ্ঠ দক্ষিণ মুষ্টিতে ধ'রে আছেন পিস্তল। নির্জন প্রান্তর—বন্ধুর, উপলাকীর্ণ। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চলেছেন তিনি।...মনে হয়, আজও চলেছেন যেন। আর তিনি ফিরে আসেন নি। অর্থাভাবে দেশের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি ক'রে ফেলেন মা। গঙ্গার ধারের ওই প'ড়ো ঘরটাই নাকি বিক্রি করেন নি কেবল। অমরেশবাবু কি জানেন এ কথা?—সহসা মনে হ'ল সন্ন্যাসীর। মা যাঁকে সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন, তিনি আবার সেটা বিক্রি করেছিলেন আর একজনকে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে অমরেশবাবুর শ্বশুর কিনেছিলেন। অমরেশবাবুর শ্বশুরও বেঁচে নেই। সুতরাং গঙ্গার ধারের ওই প'ড়ো বাড়িটার প্রকৃত মালিক কে—এ কথা অমরেশবাবু হয়তো জানেনই না। জানবার প্রবৃত্তিও নেই সন্ন্যাসীর। বাবার মুখটা আবার জেগে উঠল মনে! মনে হ'ল, অন্ধকারে চলতে চলতে হঠাৎ যেন তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। পিতার পথ চেয়ে কতদিন যে কেটেছে তাঁদের! শোকে দুঃখে মা মারা গেলেন অবশেষে। তারপর এলেন সাধু অলখবাবা। তিনি বলেছিলেন, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধেই তো সমস্ত মানবজাতির অভিযান। কিন্তু সর্বাগ্রে ঠিক করা চাই, কি অসত্য, কোন্‌টা অন্যায়? যা সৎ নয়, তাই অসৎ, তাই অসত্য। যা অসত্য, তাই অন্যায়, তাই অযৌক্তিক। যা সৎ তাই চিৎ, তাই আনন্দ, তাই আমি। এই আমিকেই আবিষ্কার করতে হবে আগে, এই আবিষ্কারের পরিপন্থী যা কিছু, তার বিরুদ্ধেই করতে হবে সংগ্রাম। এই আমির সন্ধানেই তো কাটল অনেক দিন। কত তীর্থে, কত মন্দিরে, কত আশ্রমে, কত আখড়ায়!

টিট্টিহি—টিট্টিহি—টিট্টিহি।

টিট্টিভের ডাক শোনা গেল আবার। আবার চিঠিখানার কথা মনে পড়ল। ওই চিঠিখানাই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। এখনও কিন্তু করা হয় নি কিছু। মাঝে মাঝে মনে হয়, কি হবে হাঙ্গামা করে? যেমন আছে থাক্ না। তাঁর নিজের তো কোনও প্রয়োজন নেই। চিন্তাটা কিন্তু নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না কিছুতে। অদৃশ্য কাঁটার মত কেবলই যেন খচখচ করছে। মনে হচ্ছে, তাঁর নিজের প্রয়োজন নেই সত্য, শুধু যে প্রয়োজন নেই তা নয়, ও একটা জঞ্জাল, বাধা, কিন্তু তাঁর এই মনোভাব তো নির্বিকার মনোভাব নয়। কোন কিছুকেই বাধা ব'লে মনে হবে কেন? তা ছাড়া এটাও তো ঠিক যে, তাঁর হয়তো কাজে লাগবে না কিন্তু অপরের কাজে লাগতে পারে। এটাও ঠিক যে, অযোগ্য লোকের হাতে পড়লে অকাজেও লাগতে পারে। হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন তিনি। মনে হ'ল, একটা জালে যেন আটকে গেছেন। না, এসব চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আবার চোখ বুজলেন। অন্তরের অন্তস্থলে প্রেরণ করলেন দৃষ্টি। দূরে দূরে বহুদূরে গোপন সত্তার গভীরে চ'লে গেল মন, অবলুপ্ত হয়ে গেল বাহ্য জগৎ, নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন তিনি।

সন্ন্যাসী যখন চোখ খুললেন, চন্দ্র তখন পশ্চিম-গগনে ঢ'লে পড়েছে, পূর্বাকাশে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। প্রভাতের বেশি বিলম্ব নেই আর। উঠে পড়লেন তিনি। উঠতেই টিট্টিহি-টিট্টিহি শব্দ করে কয়েকটা টিট্টিভ কলরব ক'রে উড়ল। কাছেই তারা একটা বালুস্তূপের আড়ালে ব'সে ছিল, সন্ন্যাসী দেখতে পান নি। সন্ন্যাসী বালির চড়া ভেঙে নদীর ধারে এলেন, তারপর বাঁশের সঙ্কীর্ণ সাঁকোর সাহায্যে নদী পার হয়ে নিজের আস্তানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হন নি। অন্তরের যে

জ্যোতির্ময় লোকে এতক্ষণ তিনি বিহার করছিলেন, তারই প্রভায় তখনও তাঁর মন আবিষ্ট হয়ে ছিল। তাই তিনি লক্ষ্য করলেন না যে, তাঁর ঘরের কপাটটা খোলা রয়েছে। কপাট অবশ্য খুবই জীর্ণ, তবু তাতে শিকল ছিল, যাবার সময় রোজই তিনি শিকলটা তুলে দিয়ে যান, আজও গিয়েছিলেন। কপাট খোলা কেন? এ প্রশ্ন তাঁর মনে যদিও জাগল না, কিন্তু ঘরে ঢুকে তিনি বিস্মিত হ'লেন। ঘরের এক কোণে অন্ধকারে কে যেন ব'সে রয়েছে!

"কে?"

"আমি, ডানা।"

"তুমি এ সময়ে এখানে কেন?"—রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী।

"ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি।"

"ভয়? কিসের ভয়?"

ভয়টা যে কিসের, তা ডানা সোজাসুজি বলতে পারলে না। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "বলছি, বসুন।"

আসনটা পেতে সন্ন্যাসী বসলেন। ভগ্ন বাতায়নপথে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল, সেই জ্যোৎস্নালোকে ডানার আনত মুখখানি দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই ধরনের একখানি মুখ কোন এক মন্দিরের গাত্রে তিনি যেন চিত্রিত দেখেছিলেন। ভীত সঙ্কুচিত, কিন্তু একাগ্র। দেবতার কাছে বক্তব্যটা নিবেদন করতে বাধছে কিন্তু তাই ব'লে নিবেদন করবার আগ্রহটা কম নয়—এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

কি বলবে, তা ডানাও সত্যি ভেবে পাচ্ছিল না। নিজের আচরণে নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল সে। যে ঔদাসীন্যের বর্মে নিজেকে আবৃত ক'রে রূপচাঁদের প্রণয়-অভিযানকে ব্যাহত করবে সে ভেবেছিল, কার্যকালে তা কোনও কাজেই লাগল না। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। পালিয়ে আসার লজ্জাটাই সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছিল তাকে। নিজের দুর্বলতার এত বড় অকাট্য প্রমাণ তার জীবনে আর কখনও এমন নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে ওঠে নি।

সন্ন্যাসী নীরবে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। নীরবতাটাই যেন প্রশ্ন করেছিল, চুপ ক'রে আছ কেন, কি বলবে, ব'ল?

বলতেই হ'ল শেষকালে।

"রাতদুপুরে রূপচাঁদবাবু হঠাৎ এসেছিলেন আমার ঘরে।"

"কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে ডানা বললে, "কি জানি!"

"জান নিশ্চয়, তা না হ'লে পালিয়ে এলে কেন?"

ডানা নতমস্তকে ব'সে রইল চুপ ক'রে।

সন্ন্যাসী বললেন, "অন্যায় করেছ। নিজেকে বুঝতে পার নি। তুমি অভয়, তুমি ভয় পাবে কেন?"

কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য ডানা বুঝতে পারলে না। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললে, "ভয় করল যে।"

"তার মানেই—নিজেকে বুঝতে পার নি। দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি।"

ঘরের কোণে ছোট একটা ডিবে ছিল, সেইটে জ্বেলে ফেললেন তিনি। জ্বেলেই দেখতে পেলেন, ডানার পাশে কাগজের ঠোঙায় লাল লাল আপেল রয়েছে কয়েকটা।

"ওগুলো এনেছ কেন?"

"আমার জন্যে রূপচাঁদবাবু এনেছিলেন এগুলো। আমি আপনাকে দেবার ছুতো ক'রে পালিয়ে এসেছি তাঁর কাছ থেকে।"

সন্ন্যাসী আবার গিয়ে বসলেন। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ভয় পেয়ে পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই কিন্তু।"

"পাপকেও ভয় করব না?"

"ভয় করবে কেন? জয় করবে। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতিস্বীকার করা হ'ল।"

"আপনি নিজেও কি পলাতক নন? সংসার থেকে আপনিও তো পালিয়ে এসেছেন।"

কথাগুলো ব'লেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ডানা। সন্ন্যাসীকে কটু কথা বলতে সে আসে নি। আহত আত্মসম্মানের জ্বালায় কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। সন্ন্যাসীর উত্তর শুনে কিন্তু আরও অপ্রতিভ হ'ল সে।

"আমি যে খুব একটা মহৎ ব্যক্তি—একথা তো তোমাকে বলিনি কোনদিন। আমিও তোমারই মত দুর্বল। ঠিকই ধরেছ তুমি, আমিও পলাতক। কিন্তু অনেকদিন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কিনা তাই কথাটা ভাল ক'রে বুঝেছি যে, পালিয়ে কোন লাভ হয় না। কারণ, ভয়ের হেতু বাইরে কোথাও নেই, আছে আমাদেরই ভিতরে, আমাদেরই বোঝবার ভুলে। পাপ বা পুণ্য, ভীষণ বা সুন্দর, ভাল বা মন্দ আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞতার সৃষ্টি। সংস্কারবশে আমরা নিজেরাই নানা রঙে রঙিন ক'রে দেখি সব জিনিসকে। আলকাতরা মাখিয়ে কাউকে করি কালো, আবার কুঙ্কুম মাখিয়ে কাউকে করি লাল। আবার নিজের সৃষ্টি কালোকে দেখে নিজেরাই শিউরে উঠি, লালকে দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হই। আসলে কেউ লালও নয়, কেউ কালোও নয়।"

ডানা হেসে বললে, "আসলে কে যে কি, তা জানি না। কিন্তু রূপচাঁদবাবুর উদ্দেশ্যটা এত স্পষ্ট মনে হ'ল যে—"

সন্ন্যাসী হেসে প্রশ্ন করলেন, "মনে হ'ল, তার কারণ, রূপচাঁদের উদ্দেশ্য তোমার মনকে প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করে নি, আতঙ্কিতও করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষারই আর একটা রূপ। যে লালসা রূপচাঁদবাবুর মনে জেগেছে তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে! কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশি হতে। ভয় না পেয়ে খুশি হ'লেও খুব যে বেশি একটা অপরাধ হ'ত, তা মনে করি না। ভয়, খুশি—দুই-ই মনের বিকার। ভয় পেয়ে তুমি বরং রূপচাঁদবাবুকে আরও বেশি প্রশ্রয় দিয়েছ।"

কথাগুলো শুনে ডানা বিস্মিত হ'ল।

"আমার তা হ'লে রূপচাঁদবাবুর কাছে থাকাই উচিত ছিল বলছেন?"

"যা বললাম তত্ত্ব হিসাবে সেটা সত্যি যদি উপলব্ধি করতে, তা হ'লে নিজেই বুঝতে পারতে সেটা, কারও উপদেশের দরকার হ'ত না। এই আপেলগুলোতে দাঁত বসিয়ে যখন রসাস্বাদন কর কিংবা কোনও তৃষিতকে জলদান ক'রে যখন তৃপ্তিলাভ কর, তখন যেমন দ্বিধা বা সঙ্কোচ হয় না, এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তেমনই সহজভাবে নিতে পারতে। নির্বিকার নও ব'লেই গোল বেধেছে। সংসারের তুলো দিয়ে কান বন্ধ করেছ ব'লেই মহাসঙ্গীতের ঐকতান শুনতে পাচ্ছ না। অসম্পূর্ণ শোনার ফলে বেসুরো লাগছে, কোনটা খারাপ কোনটা ভাল মনে হচ্ছে।"

"কাম ক্রোধ কি খারাপ নয় তা হ'লে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আগেই তো বললাম, নির্বিকার চিত্তে খারাপ ভাল কিছু নেই। আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত। সকলেই আনন্দ চায়, নানা ভাবে সবাই সেটা পেতে চাইছি। সাধারণ লোকের বাইরের জীবনটাকে যদি বাঁশী বলি, তা হ'লে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতিকে সেই বাঁশীর ছিদ্র বলা যেতে পারে। অধিকাংশ লোকই আনন্দ পাবার আশাতেই নানা সুর আলাপ করছে ওতে। সাধারণ বাঁশীতে গোটা কয়েক মাত্র ছিদ্র থাকে, মহাজীবনের বাঁশীতে কিন্তু অসংখ্য ছিদ্র, অসংখ্য রাগরাগিণীর আলাপ চলে তাতে। চলছেও। ওর কোনটাকে ভাল, কোনটাকে মন্দ বলার অর্থ হয় না। নিজেদের রুচিভেদে সাধনভেদে আমরা ভাল খারাপ ভাগ ক'রে নিয়েছি কেবল। আসলে ভাল খারাপ কিছু নেই।"

"শাস্ত্রে কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে রিপু বলেছে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে একটা।"

ডানার বিস্ময় কেটে গিয়েছিল ব'লেই হোক কিংবা বিস্ময়ের সংঘাতে হোক, তর্ক করবার প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সহসা।

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রও সংস্কার-মুগ্ধ মানুষেরই তৈরি। সংস্কারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রও বদলেছে যুগে যুগে। তা ছাড়া ওদের রিপু বলবার কারণ একটা আছে বইকি। তুমি গান-বাজনা করেছ কখনও?"

"কিছু কিছু করেছি। সেতার বাজিয়েছিলাম কিছুদিন।"

"গানের উপমা দিয়েই বলি তা হ'লে। ওড়ব জাতীয় বৃন্দাবনী সারঙ্গে গান্ধার এবং ধৈবত লাগে না। গান্ধার এবং ধৈবত বৃন্দাবনী সারঙ্গের পক্ষে রিপু। তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে কাম-ক্রোধেরাও রিপু।"

ডানা হেসে বললে, "আধ্যাত্মিক উন্নতিই তো মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

"তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার পথও অনেক এবং অনেক সময় পরস্পর-বিরোধীও। শুনেছি, সহজিয়া মতে পঞ্চকাম উপভোগই সাধনার পথ। কাম উপভোগ ক'রে ক'রেই তাঁরা নিষ্কাম হতে চান।"

"কি রকম?"

"তাঁরা বলেন যে, আসক্তি আমাদের, বদ্ধ করে, তা-ই আমাদের আবার মুক্তিও দেয়। তাঁদের কথা, 'রাগেণ বধ্যতে লোকে রাগেণৈব বিমুচ্যতে'। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তি স্বাদ'। বন্ধন মানেই—বাসনার বন্ধন। সুতরাং বাসনা-কামনা খুব অবহেলার জিনিস নয়। সবই নির্ভর করছে তোমার মনের উপর, তোমার চাওয়ার আন্তরিকতার উপর।"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। গভীর নীরবতা ঘনিয়ে এল একটা। ডানা নতমুখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইল। ধীরে ধীরে তারপর তার মনে যে প্রশ্নটা জাগল তা এতই অদ্ভুত যে, কথায় সেটা প্রকাশ করা উচিত কি না তা ঠিক করতেই আরও খানিকক্ষণ গেল। প্রকাশ করাই ঠিক করলে সে শেষ পর্যন্ত। তার কৌতূহলী নারীপ্রকৃতি এই সন্ন্যাসীটিকে যাচিয়ে নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে মৃদু হেসে বললে, "মনে করুন, আন্তরিকভাবে আপনাকেই যদি চাই, পাব?"

সন্ন্যাসী শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এত ছোট জিনিস চাইবে তুমি?"

"আমার কাছে তো আপনি ছোট নন।"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"বলুন, পাব?"

"তা আমি কি ক'রে বলব? তোমার আন্তরিকতার উপর নির্ভর করবে তা। পেলে কি না তাও নিজেই বুঝতে পারবে।"

'আন্তরিকতার পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হই, তা হ'লে সম্পূর্ণরূপে পাব তো?"

"পাবে ব'লেই তো মনে হয়।"

"আপনার দেহটাকে যদি ভোগের সামগ্রী ক'রে তুলি, তা হ'লেও আপনি আপত্তি করবেন না?"

"সম্পূর্ণরূপে আমাকে যদি পাও, তা হ'লে আমার এই ভঙ্গুর দেহটা তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার কাছে। আর এই তুচ্ছ জিনিসটা নিয়ে যদি তুমি উন্মত্ত হতে চাও ক্ষণিকের আনন্দে, তা হ'লেও আমি আপত্তি করব না, এখনই আমার ওই গায়ের কাপড়টা নিয়ে যদি গায়ে জড়াতে চাও তাতেও যেন আপত্তি করব না।"

সন্ন্যাসী হাসতেই ডানাও হেসে উঠল। বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল। মেঘটা কেটে গেল।

"তর্ক ক'রে আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই দেখছি। বাজে কথা থাক্, আপনার মতটা কি, তাই বলুন?"

"সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবে তো?"

"নিশ্চয়।"

"আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। আমি সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি শুধু।"

"কি সন্ধান করছেন?"

"উপলব্ধিকে। আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি—আমি কে, এই বাইরের জগৎটা স্বপ্ন কি না, এই স্বপ্ন-জগতের ভালমন্দ পাপপুণ্য স্বপ্নেরই মত অলীক কি না?"

"সত্যিই যদি সে উপলব্ধি হয় আপনার, তাতে লাভটা কি হবে?"

"পরমানন্দ। যেসব সুখ দুঃখ প্রতি মুহূর্তে কম্পিত করছে মনকে, হঠাৎ যদি উপলব্ধি করি সেসব অলীক, তা হ'লেই তো দুঃস্বপ্নটা ভেঙে যাবে, মুক্তি পাব।"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। ডানাও চুপ ক'রে রইল। শেষরাত্রির আলো-আঁধারিতে আবার একটা নিবিড় নীরবতা ঘনিয়ে এল কিছুক্ষণের জন্য! ডানাই কথা বললে একটু পরে।

"আপনি যে পথের পথিক, সে পথের নিয়ম কি? সে পথে কামিনী কাঞ্চন ত্যাজ্য, না, পূজ্য?"

"বিষবৎ ত্যাজ্য। একাগ্র ধ্যানই হচ্ছে আমার পথ। সংযমের পথ থেকে একচুল বিচলিত হ'লেই আমার পতন। তাই সংসার থেকে আমি পলাতক। রাজর্ষি জনকের মত মনের জোর আমার নেই।"

একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর চোখে মুখে। ডানা মুচকি হেসে বললে, "তা হ'লে কোন্ ভরসায় এখনই বলছিলেন যে, আমি যদি চাই আপনি ধরা দেবেন?"

"তোমার অজ্ঞতার ভরসায়। আন্তরিকভাবে চাওয়া যে কাকে বলে, তা তোমার জানা নেই ব'লেই অত সহজে কথাগুলো বলতে পেরেছিলে। কায়মনোবাক্যে চাওয়াটা নিতান্ত সহজ নয়।"

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "আমি এখন কোন্ পথে যাব, তাই ব'লে দিন।"

"সেটা তোমাকে নিজেই খুঁজে বার করতে হবে। আমার বিশ্বাস, কেউ তা কাউকে ব'লে দিতে পারে না। অন্তত আমি পারব না।"

"আধ্যাত্মিক পথের কথা বলছি না, রূপচাঁদবাবুর হাত থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাই, বলুন?"

"তার উপায়ও তোমাকেই বার করতে হবে। একটি কথা শুধু বলতে পারি—পালিয়ে যাওয়া তার উপায় নয়। রূপচাঁদ জাতীয় লোকদের অভাব নেই পৃথিবীতে। এক রূপচাঁদের কবল থেকে পালিয়ে গেলেও আর এক রূপচাঁদের কবলে পড়তে হবে। নিজের চরিত্রকে নিজের মনের বর্মাবৃত করা ছাড়া উপায় নেই, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি।"

"আমার চরিত্রে বা মনে কোনও দুর্বলতা নেই। কিন্তু ধরুন, তিনি যদি জোর ক'রে আমার গায়ে হাত দেন, কিংবা—"

"তাতেও কিছু আস যায় না, তোমার মন যদি ঠিক থাকে।"

"খুব এসে যায়, আপনি পুরুষমানুষ তাই বুঝতে পারছেন না। পরপুরুষের অবাঞ্ছিত স্পর্শের চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু নেই আমাদের জীবনে।"

"তা জানি। কিন্তু এও জানি, ওর প্রতিকার তোমারই হাতে।"

"আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকত, তা হ'লে আমি প্রতিকার করতে পারতাম। এমন একদিন ছিল, যখন বন্দুকধারী দরোয়ান আমাদের গেটে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। কিন্তু সে সামর্থ্য আমার নেই আপাতত।"

"তোমার চাকরটা নেই?"

"ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। ওই জীর্ণ শীর্ণ ছোঁড়াটা থাকলেও যে কিছু করতে পারত, তা মনে হয় না।"

"টাকা পেলেই তোমার সমস্যার সমাধান হবে মনে কর?"

"তা তো হবেই। কিন্তু অত টাকাই বা পাই কোথায় বলুন? আমি বলছিলাম, আপনি যে কদিন এখানে আছেন, আমার বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে যদি থাকেন—"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "না, তা হয় না। আমি একা থাকতে চাই। কারও সান্নিধ্য আমার সাধনার পক্ষে অনুকূল নয়।"

হঠাৎ এক যোগে কলরব ক'রে উঠল পক্ষীকূল। সন্ন্যাসী দ্বারের দিকে ফিরে দেখলেন, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

"সকাল হয়ে গেল নাকি?"—ডানা সবিস্ময়ে বললে।

"হ্যাঁ, এইবার যাও তুমি।"

"আপনিও একটু চলুন আমার সঙ্গে।"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, "বেশ, চল।"

বাসায় পৌঁছে ডানা ভিতরে ঢুকে গেল, সন্ন্যাসী বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডানা ভিতরে গিয়ে দেখলে, কেউ নেই। বেরিয়ে এসে বললে, "চ'লে গেছেন।"

"আমিও যাই তা হ'লে।"

সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

ডানা আবার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই রূপচাঁদের ছোট চিঠিটা দেখতে পেলে এবার। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াসু,

ভীতি উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ভয় পেলে দেখে কিন্তু খুশি হয়েছি। নির্ভয় হওয়ার আগে ভয়ই তো থাকে। চললাম— আর. সি.

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই চেয়ে রইল খানিকক্ষণ কাগজের টুকরোটার দিকে। তারপ কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সেটা।

১৯

রূপচাঁদও ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন মনে মনে। নিজের ব্যর্থতার লজ্জায় তিনি ম'রে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু সে লজ্জাটা স্বীকার করতে চাইছিলেন না নিজের কাছেও। নিজের অক্ষমতা নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধছিল তাঁর। তিনি ভাবছিলেন, ও কিছু নয়, ও রকম হয়েই থাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন রকম কৌশল করতে হবে আর একটা। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন তিনি, যার মূল লক্ষ্য ঐহিক সুখ, সেই সুখলাভের বিবিধ প্রচেষ্টা যে শিক্ষাকে বহুমুখী করেছে, তারই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ভাবছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অহঙ্কৃত ধারণা থাকাতে অন্য রকম কিছু ভাবতে পারছিলেন না। যে স্থূল বাস্তব-বিজ্ঞান-মোহ মদদৃপ্ত করেছিল বিস্‌মার্ক-হিটলারকে, উদ্বুদ্ধ করেছিল নীটশের দর্শন, তা রূপচাঁদকেও যুক্তি যোগাচ্ছিল। ডারবিনের ভক্ত রূপচাঁদও ভাবছিলেন, ছলে বলে কৌশলে জয়লাভ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এবং সে ছল বল কৌশল যথাসময় যথাস্থানে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। নিজের সঙ্গেই তর্ক করছিলেন তিনি। বার বার সেই পুরাতন কথাটাই আবৃত্তি করছিলেন—জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করবার চেষ্টা করাই জীবের একমাত্র ধর্ম। সঙ্কোচ, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, উদারতা, অহিংসা প্রভৃতির স্থান মানবজীবনে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, ও-গুলো মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। ও গুলোও অস্ত্র। বহুরূপী গিরগিটি যেমন প্রয়োজন অনুসারে গায়ের রঙ বদলাতে পারে, অনন্তরূপী মানুষও তেমনই প্রয়োজন অনুসারে মহৎ, লাজুক, পরোপকারী, অহিংস সাজতে পারে। কখনও সে জ্ঞাতসারে সাজে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক থাকা চাই। জয়লাভ করাই লক্ষ্য। আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়ায় বা কবিত্বের কুয়াশায় লক্ষ্যটাকেই হারিয়ে ফেলে যারা, তারা ওই সন্ন্যাসীর মত কৃচ্ছ্রসাধন বা আনন্দমোহনের মত কবিতা লিখেই মরে খালি। ওই রোগা সন্ন্যাসী বা পানসে আনন্দমোহনকে ভয় নেই রূপচাঁদের। ওই সন্ন্যাসী যদি বিবেকানন্দের মত পুরুষসিংহ হতেন কিংবা আনন্দমোহন যদি উদ্দাম বায়রন হতেন, তা হ'লে ভয়ের কারণ ছিল। ছন্দের আর ভাবের ফুলঝুরি কাটলে নারীর মন পাওয়া যায় না। রূপচাঁদের ধারণা, ওমরখৈয়াম আর হাফেজ সারাজীবন কেবল প্যানপ্যান ক'রেই মরেছে, সাকীকে পায় নি। নারী আত্মসমর্পণ করে পৌরুষের পদপ্রান্তে—তা তিনি শিবই হোন, বিবেকানন্দই হোন, বায়রনই হোন বা চেঙ্গিস খাঁই হোন। আমি কি? হঠাৎ মনে হ'ল রূপচাঁদের। এই জৈবিক জীবনদর্শনের নিকট তাঁর মূল্য কতটুকু? পৌরুষের কোন্ পরিচয় দিয়ে ডানাকে তিনি মুগ্ধ করবেন? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। উত্তরটা ঠিক যোগাল না। মনে হতে লাগল, ডানার মনের প্রবণতা যে কোন্ দিকে, তা এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি তিনি ঠিক। অর্থের প্রতি সব নারীরই (নরেরও) স্বাভাবিক লোভ আছে একটা, ডানার কি নেই? হঠাৎ মনে হ'ল, টাকার কুমীর অমরেশটা চ'লে যাওয়াতে সুবিধাই হয়েছে। হয়েছে কি? ডানা ওর সঙ্গে গেল না কেন? টাকার প্রতি লোভ থাকলে

যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। টাকার প্রতি লোভ নেই হয়তো। হয়তো ও ব্যতিক্রম। রূপ চায় হয়তো, হয়তো যশ, কিংবা প্রতিপত্তি, কিংবা—না, ঠিক বোঝা যায় নি এখনও, ঘনিষ্ঠতর পরিচয় না হ'লে বোঝাও যাবে না।...ডানার সুন্দর মুখখানা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল মনে। যে রূপের স্বপ্নে তন্ময় হয়ে টিশিয়ান ভেনাসের ছবি এঁকেছিলেন, তাজমহলের কল্পনা করেছিলেন শাহজাহান, কবিতা লিখেছিলেন কালিদাস, যে অজানার আকর্ষণে সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলেন কলম্বাস, হিমালয় অভিযান করেছিলেন ইয়ং-হাজ্‌ব্যাণ্ড (Young-husband), যে রূপ অজস্র ভঙ্গীতে সহস্র লীলায় ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হচ্ছে প্রকৃতির অরণ্যে-পর্বতে, সমুদ্রে-আকাশে, নদীতে-নির্ঝরে, মরুতে-মরীচিকায়, জীবনের বিচিত্র বিকাশে, যে রূপ ছন্দিত স্পন্দিত আনন্দিত, সেই রূপের স্বপ্নে রূপচাঁদও তন্ময় হয়ে গেলেন চার্বাকীয় নিষ্ঠাসহকারে। তাঁর ক্ষুধিত মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুলোকেই সুধার সন্ধান করতে লাগল। অতীন্দ্রিয় লোকের কথা তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু আস্থা নেই তাঁর অরূপ কোনও কিছুর উপরই, এমন কি অরূপরতনের উপরেও না। যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বোঝা যায় তিনি জানেন, তাই এখনও ধরা হয় নি, ছোঁয়া হয় নি, বোঝা যায় নি। সেইটেকেই আয়ত্তের মধ্যে আনার তপস্যা করতে হবে আগে। তপস্যা মানে যোগ্যতা অর্জন। হবে কি তা? হতেই হবে। যখন হবে...। বাসনার আকাশে রূপচাঁদের মন পাখা মেলে উড়তে লাগল। পাশে বকুলবালা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। ছোট ছেলের মত নাকও ডাকছিল তাঁর। রূপচাঁদ পাশ ফিরতেই তাঁর ঘুমটা ঈষৎ ভেঙে গেল যদিও, কিন্তু রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধ'রে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমন্ত পত্নীর বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে অদ্ভুত একটা আরাম অনুভব করলেন রূপচাঁদ। তবু কিন্তু ডানার স্বপ্নেই আবিষ্ট হয়ে রইল তাঁর মন। বস্তুর ক্ষুধাও অল্পে তুষ্ট হয় না, বস্তুজগতেও সে ভূমাকে ধরতে চায় আকাঙ্ক্ষার জাল পেতে।

২০

অমরেশবাবু সস্ত্রীক চ'লে গেছেন। কবি একা নিজের ঘরটিতে ব'সে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। একটু আগেই তিনি একটা পাখির বই প'ড়ে শেষ করেছেন। অমরেশবাবুর সাহচর্যে এসে এবং তাঁর দেওয়া বই প'ড়ে প'ড়ে পক্ষীজগৎ সম্বন্ধে তাঁর একটা অকৃত্রিম কৌতূহল জাগছিল ক্রমশ। ডানাকে দেখে যে কারণে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, এই পাখিদের দেখেও অনেকটা সেই কারণে তিনি মুগ্ধ হচ্ছিলেন। ভাষা ভঙ্গী গতির একটা নবতর সৌন্দর্য্য মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর কবিসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল। রিপ্লে (Repley) এবং সিট্‌ওয়েল (Sitwell) সাহেবের বই দুটো প'ড়ে কাল সারা রাত তিনি বার্ড অব প্যারাডাইসের স্বপ্ন দেখেছেন। ওদের নামকরণ করেছেন পরম পাখি। ওদের বিচিত্র রূপ, ওদের অদ্ভুত গান, ওদের নৃত্যভঙ্গী ফুল-ফল-পাথর দিয়ে সাজাবার প্রবৃত্তি ওদের যেন ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ওরা যেন ঠিক পাখি নয়, পক্ষীরূপী কোনও শিল্পী-সম্প্রদায়। মনুষ্যরূপী পশু থাকা যদি সম্ভব হতে পারে, এই-বা অসম্ভব হবে কেন? বইটা মুড়ে রেখে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি ব'সে ব'সে। নিউগিনিতে ঘন ঝোপে কষ্ট ক'রে তিনিও যেন পরম পক্ষী-দম্পতীর নাচ দেখেছিলেন রিপ্লে সাহেবের সঙ্গে ব'সে ব'সে। পুরুষ পাখিটির সমস্ত গা কালো মখমলে মোড়া, মাথার উপর ছোট ত্রিভুজাকৃতি রৌপ্য-ধবল তিলক একটি। সেই তিলকের পিছন থেকে সরু সরু লম্বা তারের মত কয়েকটা চুল চ'লে গেছে পিঠের দিকে। প্রত্যেকটি চুলের আগায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালকে তৈরি থুপনি ঝুলছে। বুকের উপর ছোট্ট একটি ঢাল বাঁধা

আছে যেন। সূর্যালোকে তার থেকে কখনও সবুজ, কখনও তাম্রাভ রঙ ছিটকে পড়ছে। দুলে দুলে নাচছে,—ঠিক যেন মানুষ। তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন কবি। অনেক কাজ আছে তাঁর, তবু ব'সে রইলেন। অমরেশবাবুর পাখিগুলোর তদারক করতে হবে, ডানার কাছে যেতে হবে একবার, মন্দাকিনীর চিঠির জবার দিতে হবে। বিয়েবাড়িতে কি আয়োজন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কি রকম যে নাকাল হচ্ছে, তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন মন্দাকিনী। আনন্দনাড়ুর জন্য নারকেলই পাওয়া যাচ্ছিল না, অনেক কষ্টে অগ্নিমূল্য দিয়ে নাকি যোগাড় হয়েছে। কলকাতা থেকে যে সব নতুন কাপড় এসেছ তার পাড়গুলো মোটেই ভালো নয়, খোকনের জামার ছিট মোটেই পছন্দ হয় নি অথচ দাম নিয়েছে একটি গাদা, কন্যাপক্ষ নমস্কারী নিয়ে নানা বায়নাক্কা তুলেছে নাকি—এই রকম বহু খবর দিয়েছে মন্দাকিনী। আনন্দবাবু এবং সুন্দরীর সম্বন্ধে যে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন, সে কথাও বার বার জানিয়েছেন। উভয়ের সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণও চেয়েছেন অবিলম্বে। সুন্দরীকে রোজ চরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, তার গোবরের যে পাতলা ভাবটা ছিল সেটা গেছে কি না, মৈথিল ঠাকুরটা রান্নাবান্না কেমন করছে, আনন্দবাবুর সর্দিটর্দি আর হয়েছে কি না—এমনই নানা প্রশ্ন করেছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীকে একটা উত্তর দিতে হবে, আজই দেওয়া উচিত, মনে হচ্ছিল কবির। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর। ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতেই ভাল লাগছিল। দূরে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে, গাছে ফুলও ধরেছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় খানিকটা সবুজ খানিকটা হলদে, সকালের রোদ এসে পড়েছে তাদের উপর, এবং সমস্তটার উপর ফুটে উঠেছে পরম পাখির স্বপ্নটা। এমন একটা সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিছুতেই। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। বুলবুলির সাড়া পাওয়া গেল। বাগানের ঝোপের মধ্যে টুর টুর টুর টুর কুড়ুক কুড়ু শব্দ পেয়েই কবি বুঝলেন, বুলবুলি এসেছে। কদিন থেকে আসছে ওরা ওই ঝোপটায়। ওদের নিয়ে কবিতা লেখবারও চেষ্টা করেছিলেন, কবিতা কিন্তু শেষ হয় নি। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে খাতাটা তুলে নিলেন।

ওরে, তোরা চুপ কর্
খোকা বুঝি হেসেছে
বাতাসেতে ফুট তুলে
কার সুর ভেসেছে।
ও মা, না তো, আতাবনে
বুলবুলি এসেছে
টুরু টুরু টুরকি টুরু টুরু টুরকি
আতাবন রাতারাতি হ'ল মধুপুর কি!

পছন্দ হয় নি। কেটে দিয়ে আর একটা শুরু করেছিলেন ভিন্ন ছন্দে।

ওই শোন্ ওই শোন্
টুরু টুরু টর
বুলবুলি এসেছে রে
ওরে চুপ কর্
ফোটে যেন খই
কই কই কই

ওই যে বসল উড়ে
বেড়াটার পর।
সারা মন ওঠে নেচে
শুনে গান তোর
ভুলে যাই দুষ্টুরে
তুই ধান-চোর
ওরে চঞ্চল
বল্ বল্ বল্
কোন্ ঝোপটির মাঝে
বেঁধেছিস ঘর।

এটাও পছন্দ হয় নি, এটাও কেটে দিয়েছেন। খাতাটা টেবিলে রেখে দিয়ে আবার তিনি চাইলেন বাইরের দিকে। ওই যে বেরিয়েছে বুলবুলি দুটো। আমের ডালে উড়ে বসল। বাঃ চমৎকার জায়গাটি বেছে নিয়েছে তো! উপরে-নীচে আশে-পাশে গোছা গোছা আমের মুকুল দুলছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কর্ণিকার পুষ্পের স্বর্ণকান্তি, রোদও এসে পড়ছে এক ফালি, চমৎকার লাগছে দেখতে। পরমুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল বুলবুলিরা। বসল গিয়ে ভাঙা কার্নিসটার ধারে। শ্যাওলাপড়া বিশ্রী জায়গাটা। কিন্তু ওখানেও ওদের উৎসাহ উপছে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। একজন আবার ফুড়ুৎ ক'রে আর একটু উপরে উঠে বসল ল্যাজটি ঘুরিয়ে! ল্যাজের তলায় টুকটুকে লাল অংশটুকু দেখা গেল ক্ষণিকের জন্য, তৎক্ষণাৎ ঘুরে বসল আবার। উড়ে গেল। উড়তে উড়তেও যেন লাফাচ্ছে। হঠাৎ যেন নতুন দৃষ্টি খুলে গেল কবির। ওদের তুলনায় নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। তাঁর যে এই জানালার ধারটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না, মনোমত পরিবেশকে আঁকড়ে থাকবার এই যে লুব্ধ প্রবৃত্তি, এটা—এই স্থাণুতাটা যেন মৃত্যুরই নামান্তর মনে হ'ল তার। প্রাণের ধর্ম গতি। সে চলবে, থামবে না। মনে হওয়া মাত্রই উঠে পড়লেন তিনি। ডানার কাছে যেতে হবে। ডানার কাছ থেকে ফিরে এসেই চিঠি লিখতে হবে মন্দাকিনীকে। সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় ছাড়তে লাগলেন। কাপড়টা ছেড়েই হঠাৎ কিন্তু আবার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর মনে হ'ল, বুলবুলির কাছে ঋণ-স্বীকার না করলে অধর্ম হবে সেটা। চোখ বুজে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

আমার মনের ভুলগুলি
শুধরে দিলে বুলবুলি
আটকে থাকা নয় কিছু
চললে পরেই হয় কিছু
হয় উঁচু বা নয় নীচু
কোথাও গিয়ে ঠেক্ না রে—
ছাড়তে হবে ঘুলঘুলি
শিখিয়ে দিলে বুলবুলি
পায়ের দড়ি পাকাস কে
পথের দিকে তাকাস কে
চাইতে হবে আকাশকে
ডানা মেলেই দেখ্না রে।

কবিতাটা লিখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন আবার। কবিতাটা কোটের পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আলোয়ানটা টেনে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলেন, যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। পথে যেতে যেতে আর একটা অদ্ভুত কথাও মনে হ'ল। মনে হ'ল, যে সুষমা ডানার অঙ্গে নেমেছে, তাও হয়তো পাখির মতই একটা কিছু, একটু পরেই উড়ে যাবে। উড়ে গিয়ে বসবে হয়তো কোন কার্নিসের উপর, তারপর উড়ে যাবে হয়তো আকাশে, নক্ষত্রের জ্যোতির্ময়. লোকে গিয়ে বসবে হয়তো ক্ষণকালের জন্য, তারপর আবার...। কল্পনার আকাশে ডানা মেলে উড়তে লাগল তাঁর মন।

কিছুদূর গিয়ে দেখা হ'ল মল্লিক মশাইয়ের সঙ্গে। মল্লিকের চেহারাটা কেমন যেন মনে হ'ল। মুখ শুষ্ক, চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিও কেমন স্বাভাবিক নয়। কবিকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, "ওঁদের কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছেন আপনি?"

"না, পাই নি তো! অমরবাবু গিয়েই একটা চিঠি লিখবেন বলেছিলেন দোয়েল পাখির বিষয়ে। আপনি পেয়েছেন নাকি কিছু?"

"আমি পেয়েছি। কাণ্ড দেখুন!"

মল্লিক মশাই পকেট থেকে একটি রেজেষ্ট্রি করা খাম বার ক'রে দিলেন। কবি খাম থেকে চিঠি বার ক'রে দেখলেন, রত্নপ্রভার চিঠি। গোটা গোটা গোল অক্ষরে রত্নপ্রভা লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আনন্দমোহনবাবুকে সমস্ত হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিয়া অপিস-ঘরের চাবিটি দিয়া দিবেন। আমরা তাঁহাকেই হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার হইবার জন্য অনুরোধ করিব। আপনার ছয় মাসের বেতন অদ্য মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। টাকাটি পাইলে আনন্দমোহনবাবুকেই একটা রসিদ দিয়া দিবেন। নমস্কার। ইতি—

শ্রী রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। বেশ একটু বিব্রত বোধ করছিলেন তিনি। চিঠিটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা চুলকে বললেন, "আমি তো কিছু জানি না। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

যদি ব্যাপারটা কি এবং কেন তাঁকে তাড়ানো হ'ল মল্লিক মশাই সম্পূর্ণই বুঝেছিলেন, তবু তিনি বললেন, "কি জানি! খেয়াল আর কি! স্ত্রীবুদ্ধিও বলতে পারেন। যাক, ভালই হ'ল, আমি বাঁচলুম। এ বয়সে ওসব ঝামেলা পোষায়ও না। আপনি তা হ'লে কবে সব বুঝে নিচ্ছেন বলুন?"

"আমি! আমি কোনও চিঠি পাই নি। তা ছাড়া আমিই কি পারব ওসব?"

"সে আপনি ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। আমাকে খালাস ক'রে দিন। আমি কালই আপনাকে চাবি-টাবি দিয়ে দেব। এখন চলি।"

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মল্লিক মশাই হনহন ক'রে চ'লে গেলেন এবং দেখতে দেখতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। নিজেকে অকস্মাৎ একটা নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে আবিষ্কার ক'রে কৌতূহলও জাগল একটু মনে। তিনি হবেন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার! অদ্ভুত কাণ্ড!

কবি ডানার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে যখন পৌঁছলেন, ডানা তখন স্নান সেরে চুল শুখাচ্ছিল রোদের দিকে পিঠ ক'রে। কবি দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল, আলোকের

থেকে অন্ধকারের একটা প্রপাত নামছে যেন! ডানা তাঁর পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল, সম্বৃত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কবি এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "বাঃ, চমৎকার!"

"কি চমৎকার?"

"তোমার চুলের শোভা। অনেক দিন এমন শোভা দেখি নি।"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে মাথার কাপড় একটু টেনে ঘরে ঢুকে গেল। একখানা চিঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এল একটু পরে।

"মিসেস সেনগুপ্ত একটা চিঠি লিখেছেন, পড়ে দেখুন।"

কবি দেখলেন, এটিও রেজেষ্ট্রী চিঠি। খুলে পড়লেন—

সুচরিতাসু,

বিশেষ প্রয়োজনে এই পত্র লিখিতেছি। স্থির করিয়াছি, মল্লিক মহাশয়কে হরিপুরার ম্যানেজারি-পদ হইতে অব্যাহতি দিব। আনন্দবাবু যদি এই কার্যের ভার লইতে সম্মত হন, আমরা নিশ্চিন্ত হই। তাঁকে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না, কর্মচারীরাই সমস্ত করিবে। তিনি কেবল একটু নজর রাখিবেন। তাঁহার মত একজন সচ্চরিত্র অভিজ্ঞ বিদ্বান লোক যদি একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহাতেই যথেষ্ট কাজ হইবে। তাঁহাকে বেতন হিসাবে কিছু দিবার স্পর্ধা আমাদের নাই, প্রণামীস্বরূপ যদি কিছু গ্রহণ করেন আমরা কৃতার্থ হইব। তুমি ভাই আমার হইয়া একটু অনুরোধ করিও। তিনি যদি বরাবর কাজ করিতে রাজী না-ও হন, তাহা হইলে আমরা যতদিন না ফিরি তত দিন অন্তত যেন কাজটা চালাইয়া দেন, কারণ আমরা মল্লিক মহাশয়কে জবাব দিয়াছি। তিনি অবিলম্বে যেন মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি এবং হিসাবপত্র বুঝিয়া লন। আর বেশি কিছু লিখিবার নাই। উনি তোমাকে যে সব কাজ দিয়া আসিয়াছেন, সেগুলি ভালভাবে করিও। টাকার প্রয়োজন হইলে সদর-নায়েব জগৎবাবুর কাছে চিঠি লিখিয়া পাঠাইবে। তাঁহাকে এই মর্মে লিখিত উপদেশ দিয়া আসিয়াছি। টাকা লইয়া তাঁহকে একটা রসিদ দিয়া দিও। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। আনন্দবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইবে। ইতি—

শ্রীরত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

চিঠিটা প'ড়ে কবি বললেন, "এ মহা মুশকিল হ'ল দেখছি।"

"মুশকিল আর কি!"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"একটু-আধটু দেখাশুনা করবেন।"

"কিন্তু তাও কি পারব? আমি কবি, বৈষয়িক তো নই।"

"খুব পারবেন।"

"তুমি বলছ পারব?"

"না পারবার কি আছে এতে?"—ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু যেন ধমকের সুরেই বললে ডানা।

"বেশ। তা হ'লে তাই হোক। চেষ্টা করা যাক। তোমার চাকরটা আছে কি?"

"না। কেন?"

"একটু চা খেতুম।"

"আমিই ক'রে দিচ্ছি।"

"একটা খাতা দিয়ে যাও। কবিতা লিখি ততক্ষণ একটা।"

একটা খাতা দিয়ে ডানা ভিতরের দিকে চ'লে গেল। স্টোভে তেল ছিল না। উনুন ধরাতে

হ'ল। খানিকক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে ডানা দেখলে, কবি কবিতা লেখা শেষ করছেন।

"নিন।"

"কবিতাটা আগে শোন।"

"পড়ুন। চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"যাক। তুমি পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ব'স ভাল ক'রে।"

ডানা বসতেই কবি শুরু করলেন—

আয়, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী যেন কালিন্দী-তরঙ্গ দলে তোলে শিহরণ,
আলোকের শুভ্র বৃন্তে ফুটিল কি তমস্কান্তি কৃষ্ণ শতদল,
প্রত্যক্ষ জীবন আর পরোক্ষ মরণ—
কাজল নয়ন মাঝে হাসি অশ্রু করে টলমল,
শিব-সুন্দরের বক্ষে নৃত্যপরা কালীর চরণ,
ময়ূর-মানস-পটে নবোদিত মেঘের বরণ,
অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল
কবিচিত্ত করিল হরণ।

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

আসন্ন-নগ্নতা ভীতা অসম্বৃতা কৃষ্ণা যেন কৌরব-অঙ্গনে,
শুক-কলরব-মুগ্ধা মধুমত্তা মাতঙ্গিনী বল্লরী মোদিতা
সহসা চকিতা যেন দৈত্য-আগমনে ;
অন্তলোকে ধ্যানলগ্না ওজস্বিনী আঁধার কবিতা
সংযম-প্রস্তর ভেদি' সমুচ্ছ্রিতা শত প্রস্রবণে
খুঁজিল প্রকাশ যেন শব্দহীন বিবাট গর্জনে'
বিমুগ্ধ বিমূঢ়া ক্ষুব্ধা অকুণ্ঠিত মত্তা প্রলোভিতা
কে ছুটেছে আত্ম-বিসর্জনে।
অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

"বুঝতে পারলাম না ভাল"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"বড় খটমট হয়েছে। বিষয়টা কি?"

কবি হেসে উত্তর দিলে, "অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল! তুমি সংস্কৃতের ছাত্রী, তোমার কানেও খটমট লাগল?"

লাল হয়ে উঠল ডানার কানের পাশটা। সে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু ভান করছিল না-বুঝতে পারার।

"কি যে বাড়াবাড়ি করেন আপনি! লোকে শুনলে কি বলবে!"

এ ধরনের কথা ডানার মুখে কবি ইতিপূর্বে শোনেননি। শুনে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "বাড়াবাড়ি তোমার মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, কিছু হ'ল না ; লোকের কথা ভেবে ভয় পাবার দরকার নেই। এখনই আমি যে লোকে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। এমন কি তুমিও—মানে, তোমার স্থূল দেহটাও—ছিল না সেখানে।"

ডানা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের বই-খাতাগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল। কবি চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন, "বেশ, তোমার যদি আপত্তি থাকে, তোমাকে কবিতা আর দেখাব না।"

"না না, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এমনিই বলছিলাম"—হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে ডানা।

"আপনি আমার বাবার বয়সী, আপনি যদি আমার সম্বন্ধে দু-একটা কবিতা লেখেনই, তাতে মনে করবার কি আছে। কিন্তু সখী বলেছেন কেন, বুঝলাম না।"

কবি হেসে ফেললেন।

"তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়ে হতে, তা হ'লেও তোমার এলোচুল নিয়ে কবিতা লেখবার সময় তোমাকে সখী সম্বোধন করতুম। কাব্যলোকে বয়সের হিসাবটা সামাজিক মাপকাঠি দিয়ে হয় না। স্থূল বস্তুজগতের কোন মাপকাঠিরই দাম নেই সেখানে। কাব্য-বৃন্দাবনে সবাই সখী। অনেকদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম তার সবটা মনে নেই, প্রথম চার লাইন আছে—

সন্ধ্যার মেঘে যে স্বর্ণ লাগে
স্যাকরা তাহার বোঝে না মর্ম
কুসুমে কুসুমে যে বর্ণ জাগে
রঙ-রেজ তার জানে না ধর্ম।

একটু আগে বুলবুলিকে দেখে যে কারণে কবিতা লিখছিলাম, তোমার কালো চুলের রাশি দেখেও ঠিক সেই কারণেই কবিতা লিখেছি। বুলবুলিও নয়, কালো চুলের রাশিও নয়, ওদের অবলম্বন ক'রে মনের ভিতর কে যেন ছন্দ জাগিয়ে তোলে। ওগুলো বৃন্ত, সেই বৃন্তে ফুল হয়ে ফোটে কি একটা যেন। কবির লক্ষ্য বৃন্তও নয়, ফুলও নয়, সেই কি-যেন-কি-টা।"

এ কথা শুনে ডানার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এতে তার আত্মসম্মান একটু আহত হ'ল যেন। সে যে কবির কবিতার বিষয় হতে পেরেছে, এতে একটু বিব্রত বোধ করলেও ভিতরে ভিতরে সে খুশি হয়েছিল বইকি। তাকে নয়, তাকে অবলম্বন ক'রে যা কবিমানসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাই কবিতার হেতু—এ কথা শুনে একটু মর্মাহতই হয়ে গেল সে। মৃদু হেসে বললে, "তাই নাকি?"

"নিশ্চয়। আর একটা কথাও শুনে রাখ। যে কবিতা লেখে, সে আমার এই দেহটা নয়। সেও যেন কি-একটা-কি মাঝে মাঝে ভর করে এসে আমার উপর।"

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আবার। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, ডানার গ্রীবাভঙ্গীতে যে অপরূপ শ্রী ফুটেছে তা শুধু রক্তমাংসের সমন্বয় নয়, তা যেন কোন অজ্ঞাত শিল্পীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, আরও কোনও শিল্পীর নবতর সৃষ্টিতে মূর্ত হবার আশায় অপেক্ষা করছে।

২১

বসন্ত শেষ হচ্ছে।

নিজের বাপের বাড়িতে রত্নপ্রভা স্বামীর ঘরে ঢুকে একটা বই খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বহু রকম পাখির বহু রকম ঠোঁটের ছবি। চওড়া, সরু, লম্বা, ছোট, উপরের দিকে বাঁকানো, নীচের দিকে বাঁকানো, চামচের মত, ছাঁকনির মত...বইটা নতুন এসেছে। বেশ মোটা বই। পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগলেন রত্নপ্রভা। কত ছবি, কত লেখা...। খানিকক্ষণ পরে তাঁর মনে হ'ল গহন অরণ্য। গ্রন্থটা নয়, তাঁর স্বামী। বিশাল বিরাট অরণ্য। প্রতি পদক্ষেপেই নতুন কিছু চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে একটা অজানা ভয়ে গা ছম ছম করে। আবার পরিচিত শব্দ শুনে, প্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ভয় কেটে যায়। কত রকমের গাছ-পালা, পশু-পাখি, কত ধরনের শব্দ গন্ধ রূপ রস, আর এই সমস্তটাকে ঘিরে একটা অজানা রহস্য, কখনও গাম্ভীর্যে অটল, কখনও শিশুর মত সজীব। অজানাটা যদিও জানা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিঃশেষ হতে চাইছে না , মনে হচ্ছে, যেন কত কি আছে আরও। সহসা রত্নপ্রভার সমস্ত চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠল। অরণ্যটা যে তাঁর একার, আর কারও নয়—এই অনুভূতি আনন্দিত ক'রে তুলল তাঁর সমস্ত সত্তাকে। একটা নবীন উৎসাহ জাগল তাঁর মনে, হোক জটিল, হোক দুর্গম, তবু সমস্তটা আয়ত্ত করতে হবে তাঁকে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে তা করবার জন্যে।

পাশের ঘরে বৈজ্ঞানিক নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দোয়েল পাখির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলেন একটা। আনন্দবাবুকে ব'লে এসেছিলেন, কিন্তু লেখবার সময় ক'রে উঠতে পারেননি এতদিন। দোয়েলরা নিশ্চয়ই ডাকতে শুরু করেছে খুব সেখানে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। তারপর নিজের ডায়েরি খুলে দেখলেন। দোয়েলের গান তো তিনি শুনেই এসেছেন—প্রথম গান শুনেছিলেন ১০ই ফাল্গুন, এতদিন ধুম লেগে গেছে নিশ্চয়। তন্ময় হয়ে লিখতে লাগলেন আবার। পাশে চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

কবি কবিতা লিখছিলেন নিজের ঘরটিতে ব'সে! গঙ্গা এবং শান্তনুর পৌরাণিক গল্পটা উদ্দীপ্ত করছিল তাঁর কল্পনাকে। তাঁর মনে হচ্ছিল, গঙ্গাই বুঝি বসন্তের বেশে এসেছিল পৃথিবী-শান্তনুর কাছে। এইবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে।

ফুটিছে ঝরিছে ফুল অরণ্যে উদ্যানে ;
গঙ্গা-বাসন্তিকা যেন আপন সন্তানে
ভাসাইছে কাল-স্রোতে লীলায় কৌতুকে।
পৃথিবী-শান্তনু চেয়ে ছিল শুষ্ক মুখে
নিষ্ঠুরা প্রেয়সী পানে।

"আর নয়—না—না"
সহসা ধ্বনিল যেন শান্তনুর মানা
আতঙ্কিত কলকণ্ঠে—"ক্ষান্ত দাও প্রিয়া।"
"চলিলাম আমি তবে" সুমিষ্ট হাসিয়া
কহিলেন সুরধুনী।

মর্ত্য-পাশ হতে
চ'লে হায় বাসন্তিকা, জাগে নদী-স্রোতে
কল্লোল-ক্রন্দন মৃদু ; থাকিয়া থাকিয়া
আর্তকণ্ঠে হাহাকার করিছে পাপিয়া।
শিশু ভীষ্ম প'ড়ে আছে মাতৃহারা হায়
শিশু গ্রীষ্ম জাগিতেছে দিগন্ত-সীমায়।

রূপচাঁদ নদীতীরে একা নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি যাওয়াতে তিনি নিজে যেন ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু হতাশ হন নি। সীমাহীন সমুদ্রে পথ-হারা হয়ে কলম্বাস হাল ছাড়েন নি, রূপচাঁদও ছাড়েন নি, তিনিও আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলেন। পর্যবেক্ষণ করছিলেন বাতাসের গতি। যদিও আশ্বস্ত হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে যাবেই। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি।

বকুলবালাও স্বপ্ন দেখছিলেন। চণ্ডীর বন্ধুটি হলদে পাখির বাচ্চা যোগাড় ক'রে দেবে বলেছে। মার্বেল খেলার জন্য ভাল একটা 'চ্যাম্পিয়ান' মার্বেলও এনে দেবে বলেছে চণ্ডী। চণ্ডীর বন্ধু সত্যিই যদি হলদে পাখির বাচ্চা এনে দেয়, কি মজাই যে হবে! এবার আর ছাতু খাওয়াবেন না তিনি। ফড়িং ধরবার ব্যবস্থা করাতে হবে। চণ্ডী ঠিকই বলেছে, বাচ্চা-বেলা থেকে না পুষলে পোষ মানে না পাখি। পাখিদের বাসা বানাবার জন্যে অমরবাবু গাছে গাছে যে সব বাক্স টাঙিয়ে দিয়েছেন, তাঁর একটাতেও কোনও হলদে পাখি বাসা বাঁধতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

মন্দাকিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ছোট ভাই বিনয়কে নিয়ে। বিনয় সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে এসেছিল. তার মাথার দিকে চেয়ে মন্দাকিনী হেসে লুটিয়ে পড়ছিলেন। ভগ্নী নন্দরাণীকে ডেকে বলছিলেন, "ওলো নন্দ, বিনুর চুলের বাহার দেখে যা। একবার বিয়ের নামেই এই, বিয়ে হয়ে গেলে না জানি কি করবে ছেলে!"

স্নেহে গ'লে পড়েছিলেন তিনি যেন। যে বিনুকে তিনি এতটুকু থেকে মানুষ করেছেন, তাকে ঘিরেই রঙিন হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁদের বাড়ির পাশের সজনেগাছটায় একটা দোয়েলও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না মন্দাকিনীর।

সন্ন্যাসী একা ব'সে ছিলেন নদীর পরপারে বালুস্তূপের উপর। তিনি সহসা যেন নিজেকে ফিরে পেয়ে ভারি তৃপ্তি বোধ করছিলেন। গত কয়েকদিন থেকে একটা কথা কাঁটার মত খচখচ করছিল তাঁর মনের মধ্যে। সেদিন শেষরাত্রে ডানার সঙ্গে তিনি যে সব আলোচনা করেছিলেন, তার প্রকৃত মর্ম ডানা যদি বুঝতে না পেরে থাকে, যদি তাঁর অতি-সরল অভিমতকে ঘোলা দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে থাকে, তা হলে হয়তো সে তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই পোষণ করছে। এই চিন্তাটা পীড়িত করছিল তাঁর মনকে। কিন্তু এখনই একটু আগে দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে, কে তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করছে—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থ নিজেকে তিনি চেনেন নি এখনও। তিনি যে

কি এবং কে, তার নির্ভুল প্রমাণ তো তাঁর নিজের চেতনার মধ্যেই রয়েছে। অপরের সমর্থন বা প্রতিবাদে তার মূল্য তো এতটুকু পরিবর্তিত হবে না। সুতরাং ডানা তাঁর সম্বন্ধে কি ভেবেছে বা ভাবে নি—এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। ওই শস্যক্ষেত্র কিছুদিন আগে সবুজ ছিল, এখন স্বর্ণকান্তি। কিছুদিন পরেই আবার রিক্তাভরণ হবে। কোনও অবস্থাতেই তো সে সঙ্কুচিত নয়, তার এই পরিবর্তন কার মনে কি ভাবোদ্রেক করছে তা জানবার জন্যে কিছুমাত্র আগ্রহও নেই ওর। নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন যেন, কারও স্তুতিনিন্দায় বিচলিত হবার ওর প্রয়োজনই নেই। খানিকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থেকে তার পর শস্যক্ষেত্রকে প্রণাম করলেন তিনি। যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে ভারি তৃপ্তি হ'ল তাঁর।

ডানাও খুঁজছিল।

সে যথারীতি কর্তব্যকর্ম ক'রে যাচ্ছিল সব। পাখিগুলির তদারক করছিল, দেখে বেড়াচ্ছিল কোনও পাখি কোথাও বাসা বাঁধবার আয়োজন করেছে কি না, অমরবাবু যে সব বই রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি প'ড়ে 'পাখিদের পালক' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধও লেখবার আয়োজন করছিল, কবির কবিতা শুনছিল, রূপচাঁদবাবুকে এড়িয়ে চলছিল, সন্ন্যাসীর গতিবিধি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিল দূর থেকে। কিন্তু আসলে সে খুঁজছিল নিজেকে। খুঁজছিল নিজের সেই বিশেষ আকাশটিকে, যেখানে পক্ষ বিস্তার ক'রে সত্যিই আনন্দ পাবে সে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। কবির মনে হচ্ছিল যেন মধ্য-রাত্রি, রহস্যময় মধ্য-রাত্রি। নিশীথ-গগনের অসংখ্য নক্ষত্রমালাই সহসা যেন কোনও মন্ত্রবলে একত্রিত হয়ে সূর্যের রূপ ধারণ করেছে। তাঁর জানলা দিয়ে যে রৌদ্রোজ্জ্বল দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সেটা যেন বাস্তবের নয়, রূপকথালোকের। যদিও বাল্যকাল থেকে বহুবার তিনি এ দৃশ্য দেখেছেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর পূর্ব-জীবনের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ আছে। ওই কর্ণিকার, পলাশের, কৃষ্ণচূড়ার উদ্দাম অথচ নীরব বর্ণসমারোহকে ঘিরে ফটিকজলের যে তীক্ষ্ণ করুণ সুর মাঝে মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে তা যে পার্থিব—এ কথাও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কবি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সহসা আজ পরম মুহূর্তে আবিষ্কার করেছেন পরম সত্য—সে সত্য শুধু অপরূপ নয়, অবর্ণনীয়। ভাষায় তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর অন্তরলোকে একটা অস্ফুটভাব রূপায়িত হচ্ছিল কেবল অসম্বদ্ধ লীলায়, মনে হচ্ছিল, ছন্দবন্ধনে বাঁধলেই ওর অপরূপ অসীমতা খণ্ডিত হবে। মনের মধ্যে তবু ছন্দ জাগছিল, গুঞ্জন করছিল কবিতার মিল। ফটিকজল পাখি 'ফটি—ক জল' সূক্ষ্ম সুন্দর তীক্ষ্ণ সুরে যেন তাঁকে বলছিল, তুমি চুপ ক'রে আছ কেন, তুমিও তোমার গান গাও না! তোমার মনে যদি সুর থাকে, কণ্ঠে তার ফুটবেই কিছুটা। সবটা নাইবা ফুটল! তা ছাড়া, সবটা তুমি ফোটাতে পারবে, এত অহঙ্কারই বা কেন তোমার? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই কি সবটা ফোটাতে পেরেছেন একসঙ্গে?

পাখির সুরে তিরস্কৃত হয়ে লজ্জিত হলেন কবি। কবিতার খাতাটা বার ক'রে নীরবে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

রোদ নয়, রোদ নয়, সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে
তারি টানে তারি পানে ছুটেছে সুরের বেগ
পুলকিত বিহগের স্বরে,
সে সোনার মেঘ হতে নামিছে ফটিক-জল-ধারা
বৃক্ষলতা করে স্নান, পুষ্পে বর্ণ হ'ল মাতোয়ারা
চঞ্চল পতঙ্গদল, মুখরিত পাখি আত্মহারা
মানুষ ঘুমোয় শুধু ঘরে!
ওরে কবি, দ্বার খোল্—বাহিরে বারেক দাঁড়া এসে
সোনার স্বচ্ছ মেঘ নামিয়াছে তোরই দ্বারদেশে
রুদ্রের অন্তর হতে বাহিরিল যে মোহন বেশে
দেখ্ তারে দু'নয়ন ভরে
রোদ নয়, রোদ নয়. সোনার স্বচ্ছ মেঘ
নামিয়াছে ধরণীর 'পরে।

কবিতাটা লিখে কবির সত্যিই মনে হতে লাগল যে, বাইরে যে কড়া রোদ দিগ্-দিগন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে তা রোদ নয়, তা সোনার স্বচ্ছ মেঘ, যে মেঘ থেকে ফটিকজল নামে। কপাট

খুলে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই অনবদ্য অপরূপ প্রকাশকে অভ্যর্থনা করবার দায়িত্ব তো তাঁরই, তিনি যে কবি। সাধারণ মানুষ কপাটে খিল লাগিয়ে বৈশাখের এই পরম প্রকাশকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু তিনি কি পারেন? বেরিয়ে পড়লেন? বেরিয়ে প্রথমেই মনে হ'ল, কোথাও কেউ নেই, চতুর্দিক খাঁ-খাঁ করছে যেন। তিনি যেন অকস্মাৎ কোনও রূপকথালোকের নিদমহলে ঢুকে পড়েছেন। প্রখর রৌদ্রালোকিত নিদমহল। আপাদমস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ঢাকা—ওটা কি কর্ণিকার বৃক্ষ? অপ্সরীই বা নয় কেন? ওই যে দূরে রক্তশিখার মত দেখাচ্ছে, ওটা পলাশ, না, শিমুল, না, ধরণীর মর্মভেদী কামনা? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। একটা তপ্ত হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে, এসে তাঁকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল।

'ফটি—ক জল'—ফটি—ক জল—

কবির চমক ভাঙল। কোথা থেকে ডাকছে পাখিটা? দূরের ওই বড় গাছটা থেকে নিশ্চয়। ঘন পত্রপল্লবের মাঝখানে উঁচুতে ছোট্ট একটি ডালে ব'সে আছে বোধ হয়। কয়েক দিন আগে দেখেছিলেন তিনি পাখিটিকে। অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতের পর দেখেছিলনে। ছোট্ট পাখি, সুন্দর দেখতে। কালো, সাদা আর সবুজাভ হলুদের অপরূপ সমন্বয় পুরুষটির গায়ে, সঙ্গিনীটির গায়ে কিন্তু কালোর ছোঁয়াচ নেই। পুরুষ-পাখিটিকে দেখে মনে হয়েছিল, অমানিশীথিনীর কালোর সঙ্গে যেন স্বর্ণকান্তি সূর্যালোকের দ্বন্দ্ব চলেছে ওর সারা অঙ্গ জুড়ে ; মনে হয়েছিল, পুরুষ-পাখিটি তামসিকতার কালোকে জয় করতে পারে নি, সঙ্গিনীটি কিন্তু পেরেছে, তার সারা গায়ে কেবল সবুজ আর হলুদের দ্যুতি, কালোর আভাসমাত্র নেই।

'ফটি—ক জল'—ফটি—ক জল—

কবি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। দিন কয়েক আগে ফটিকজলকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন একটা। তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল, কবিতাটা এখন একবার পড়া দরকার। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে কথা ভুলে গেলেন আবার। অসংলগ্নভাবে মনে পড়ল অমরেশবাবুর জমিদারিতে কোথায় যেন খুন হয়ে গেছে একটা। জমিদারের ম্যানেজার হিসাবে তাঁকে হয়তো থানায় যেতে হবে। একজন গোমস্তাকে তিনি যেতে বলেছেন ; কিন্তু সে যদি এসে বলে যে, তাঁকে যেতে হবে, তা হ'লে—। বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন তিনি। অমরেশবাবুর স্ত্রী এ কি বিপদে ফেলে গেলেন তাঁকে? সঙ্গে সঙ্গে ডানার কথাও মনে হ'ল তাঁর। শুধু তাঁকে নয়—ডানাকেও বিপদে ফেলে গেছেন ওঁরা। দুজনকে দুরকম 'টাস্‌ক' দিয়ে গেছেন যেন। এই বিপন্ন ভাব সত্ত্বেও কিন্তু মনে মনে ঈষৎ আনন্দিত হলেন তিনি। ডানার সঙ্গে একই কারাগারে বন্দী হয়ে আছি কেবল অর্থাভাবে—এই ধারণাটা মনে স্পষ্ট হওয়া মাত্র ডানার সম্বন্ধে একটা নূতন ধরনের আত্মীয়তা-বোধ মনে জাগল। কিন্তু এতে আনন্দিত হওয়াটা অনুচিত—এ কথাও মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। একটু লজ্জিত হলেন।

'ফটি—ক জল'—

কবিতার খাতাটা খুলে পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে, কর্তব্যে অবহেলা ক'রে ধরা প'ড়ে গেছেন যেন। কবিতাটায় অনেক কাটাকুটি ছিল, তবু পড়তে কষ্ট হ'ল না তাঁর।—

বৈশাখী দুপুরের নিদারুণ আলোতে
সবুজাভ হলুদে সাদাতে ও কালোতে
সাজিয়া আসিল কে অজানারে চাহিয়া

ফটিকজলের গান বারে বারে গাহিয়া
সাথে ল'য়ে সঙ্গিনী তন্বী শ্যামলীকে
আলোকের রূপ ওর সারা মন ভরিয়া
পালকের কালো তবু যায় না যে সরিয়া
হয়তো বা আশা আছে ওরই গাঢ় কালিমা
প্রেয়সীর অন্তরে জাগাইবে লালিমা
শস্যের সুষমায় সাজাইবে পলিকে।

বেরিয়ে পড়লেন আবার। দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ব'সে আছে একদল গরু, অর্ধনিমীলিত নয়নে রোমন্থন করছে, একটা ছোট বাছুর কেবল লেজ তুলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। তাঁর সুন্দরীও কি আছে ওদের মধ্যে? কর্তব্যবোধেই যন্ত্রচালিতবৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু গরুগুলির কাছাকাছি গিয়ে যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা গরু নয়—গাছের উপর এক ঝাঁক হাঁড়িচাঁচা পাখি। দুটো পাখি দুলে দুলে কি মিষ্টি ক'রেই না ডাকছে। 'খুকু নেই' বলছে কি? না, 'কু অক্ রিং', না, 'ববো লিং'? সহসা কবির মনে হ'ল, ওরা যেন পরস্পরকে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন, ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি খেলার সময় যেমন বলে। দুষ্টু কিশোরী মেয়ের মতই দেখতে তো। সারাটা দুপুর এ-গাছ ও-গাছ ক'রে বেড়াচ্ছে, কখনও মগডালে মগডালে, কখনও ঘন পাতার আড়ালে আড়ালে। ফল চুরি করছে, অন্য পাখির ডিম চুরি করছে, পোকামাকড় যা পাচ্ছে খেয়ে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে উঁচু ডালে ব'সে দুলে দুলে বলছে—ধর দিকিন, ধর দিকিন। স্নেহরসে কবির মন সিক্ত হয়ে উঠল। বিভূতি বাঁড়ুজ্জের 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা যেন। পরমুহূর্তেই কোকিল ডেকে উঠল একটা। তারপর, শোনা গেল—'ফটি—ক জল'। দূরে স্বর্ণাভরণভূষিতা কর্ণিকার বীথিতে নীরব সমারোহে যে বর্ণ-বাণী প্রস্ফুটিত হয়েছে, তারই প্রভাব যেন উন্মত্ত ক'রে তুলেছে কৃষ্ণচূড়ায় পুষ্পগুচ্ছকে। ওরা যেন রঙের ভাষায় ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কবির আবার মনে হ'ল, তিনি রূপকথা-লোকে প্রবেশ করেছেন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশ্বস্ত আনন্দিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হ'ল, তিনি দূর প্রবাস থেকে সহসা নিজের দেশে ফিরে এসেছেন যেন। এই পাখির ডাক, ফুলের ভাষা, রৌদ্রমণ্ডিত নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বৃক্ষে লতায় তৃণে গুল্মে সহস্র ইঙ্গিতভরা অসংখ্য আবেদন—এই তো তাঁর নিজস্ব পরিবেশ। এরই ক্রোড়ে, এই বৈচিত্র্যের দোলায়, এই সহজ সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতেই তো মানুষ হয়েছেন তিনি। কত জন্ম, কত জন্মান্তর, কত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার কত সংঘাত আন্দোলিত করেছে তাঁকে এই প্রকৃতির কোলেই। মায়াবিনী সভ্যতার পিছু পিছু কোথায় গিয়েছিলেন তিনি এতদিন ঘর ছেড়ে? জটিল অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন এতকাল কিসের মোহে? নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ ক'রে কোথায় চলেছে মানুষ। কোথায় এর পরিণতি! হঠাৎ এক ঝলক তপ্ত হাওয়া তাঁকে ঘিরে ছোট্ট একটু নাচ নেচে দূরে ছুটে চ'লে গেল কতকগুলো শুষ্ক পাতাকে নাচিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, বৃদ্ধ বটের পত্রপল্লবে সাড়া জাগিয়ে। মুগ্ধ কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলেবেলার সাথী একজন যেন পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে ছুটে পালাল। ও তো এখনও তেমনি দুষ্ট, তেমনি চঞ্চল, তেমনি উত্তপ্ত, তেমনি উদ্দাম আছে। তিনিই কি বুড়ো হয়ে গেলেন না কি? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তর প্রতিবাদ ক'রে উঠল। দেহটা হয়তো অপটু হয়েছে, মনে তো একটুও বুড়ো হয় নি। তাঁর ইচ্ছে করতে লাগল ওই দমকা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে। একটু ছুটলে ক্ষতি

আর কি হবে। বড় জোর হাঁপিয়ে পড়বেন একটু। কেউ দেখতে পেলে হয়তো হাসবে, পাগল ভাববে। তাতেই বা ক্ষতি কি! ঊর্ধ্বপুচ্ছ কচি বাছুরটা তাঁর দিকে একছুটে চ'লে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁর সামনে। যেন বলতে লাগল—ছুটবে? বেশ তো, এস না। কবি সত্যিই ছুটতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। রাস্তার বাঁকে পিওনকে দেখতে পেয়ে তাঁর গতিবেগ আড়ষ্ট হয়ে গেল, টান পড়ল ভব্যতার নিগড়ে। সহজ মন্দ গতিতেই এগিয়ে গেলেন তিনি পিওনের দিকে। পিওনও তাঁর দিকেই আসছিল, তাঁর চিঠি ছিল একখানা। বেশ মোটা একখানা খাম তাঁর হাতে দিয়ে পিওন নিজ গন্তব্যপথে চ'লে গেল। কবি চিঠিখানার ঠিকানা দেখেই বুঝলেন, অমরেশবাবুর চিঠি। হাতের লেখাতেই ভদ্রলোকের চরিত্র পরিস্ফুট। গোটা গোটা বড় বড় বলিষ্ঠ অক্ষর। বেশ মোটা চিঠি। খামটা ছিঁড়েই কবির মনে হ'ল, এ চিঠি এখানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। বেশ লম্বা চিঠি। প্রথমেই চোখে পড়ল—"একটা দোয়েল পাখি আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আমি আরও খানকয়েক বই পাঠালাম। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয়ে আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়। এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে—" এইটুকু প'ড়েই কবির মনে হ'ল, চিঠিখানা নিয়ে ডানার কাছে যাওয়াই উচিত। যা এতক্ষণ মনের প্রত্যন্তদেশে গোপন ইচ্ছা ছিল, তা এইবার কর্তব্যরূপ পরিগ্রহ ক'রে দ্বিধামুক্ত হ'ল। চিঠিখানা হাতে ক'রে দুপুর রোদে মাঠ ভেঙে তিনি ডানার বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। কবি বাইরে যদিও একটা সপ্রতিভতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে মনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রূপকথালোকের যে অবাস্তব চিত্রটা সহসা তাঁর মনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল তার প্রভাব তখনও কাটে নি। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন চিরন্তন রাজপুত্র, চিরন্তনী রাজকন্যার উদ্দেশ্যে তেপান্তর মাঠ ভেঙে চলেছেন। যে মেঘ ফটিকজল বর্ষণ করে, সে তার স্বচ্ছ স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করেছে চতুর্দিক, তাঁর বয়স যেন অনেক ক'মে গেছে, তাঁর কবিতা যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁকে।...

কল্পনার পক্ষীরাজে চ'ড়ে তিনি যখন সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটাতে এসে হাজির হলেন, তখনও তাঁর ঘোর কাটে নি। শিকল-তোলা দরজাটার দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চমকে উঠলেন চাকরটার সাড়া পেয়ে।

"মাইজী বেরিয়ে গেছেন।"

ঘোর কেটে গেল। মুখ দিয়ে কিন্তু কথা বেরুল না তবু।

"আপনি কি বসবেন?"—চাকরটাই প্রশ্ন করল আবার।

"হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল। কোথায় গেছেন মাইজী?"

জোর ক'রে কথা কটা বলতে পেরে যেন আত্মস্থ হলেন তিনি। মনের একটা অজানা গুরুভার যেন নেবে গেল।

"তা ঠিক জানি না বাবু। মাইজী আমাকে ডাকঘরে পাঠিয়েছিলেন খাম-পোস্টকার্ড আনতে। এসে দেখছি, বেরিয়ে গেছেন তিনি। কাছাকাছিই গেছেন কোথাও। আপনি বসেন তো একটু বসুন। আসবেন এখুনি।"

কপাটটা খুলে দিলে সে। কবি ভিতরে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল, টেবিলের উপর তিনখানা মোটা মোটা পক্ষী-বিষয়ক বই রয়েছে। অমরেশবাবু পাঠিয়েছেন নিশ্চয়। কবির একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল। অমরেশবাবু শুধু পাখিদেরই খাঁচায় পোরেন নি। তাঁকে

এবং ডানাকেও পুরেছেন। অদৃশ্য যন্ত্র দিয়ে তাঁদেরও ঠোঁট নখ পালক মাপছেন কি না কে জানে?

অমরেশবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনে হ'ল, লোকটির প্রতি সুবিচার করেন নি তিনি। তাঁকে কখনও অবজ্ঞাভরে, কখনও অনুকম্পা সহকারে তিনি যেন দয়া ক'রে সহ্য ক'রে এসেছেন, তাঁর প্রকৃত মহত্ত্বের আলোকে কখনও তাঁকে বিচার করবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর মনে হ'ল, চেষ্টা করলে তিনি অভিভূত হয়ে যেতেন। অসুরের মত বলিষ্ঠ, শিশুর মত কৌতূহলী, ঋষির মত জ্ঞানবৃদ্ধ, রাজার মত ধনী, অগ্নির মত পবিত্র এই লোকটির অনন্যতায় তাঁর অন্তত মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল। তিনি কবি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হওয়াতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন একটু। মুগ্ধই হয়েছেন তিনি মনে মনে, কিন্তু বাইরে ভান করছেন ঠিক উল্‌টোটা। কি দরকার এ চাতুরির? আত্মসম্মানের মুখোশটা বজায় রাখার জন্যে? চিঠিখানার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। পকেট থেকে বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

প্রিয় আনন্দমোহন বাবু,

একটা দোয়েলপাখি আমাদের কুঠিঘরের দেওয়ালের ফোকরে বাসা করেছে শুনে খুব আনন্দিত হলাম। শ্রীমতী ডানাকে আরও খানকয়েক বই পাঠাচ্ছি। তাতে দোয়েলের কথা কিছু কিছু পাবেন তিনি। দোয়েলের বিষয় এখন আমার যতটুকু মনে পড়ছে, আপনাকেও জানাচ্ছি। দোয়েলের গান খুব শুনছেন নিশ্চয়। এখানেও দোয়েলরা খুব মেতে উঠেছে। আমাদের রেডিওর এরিয়েলটা এখানকার একটি দোয়েল-গায়কের প্রধান রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। ওর ওপর ব'সে কত গানই শোনায় ও! সম্ভবত প্রেয়সীকেই শোনায়, কিন্তু মাঝ থেকে আমরাও লাভবান হই। কি বলেন? একজন ইংরেজ লেখক—ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছেন যে, পাখিরা নাকি তাদের প্রেয়সীদের ভোলাবার জন্যে গান গায় না। ময়ূর নাকি ময়ূরীকে মুগ্ধ করবার জন্যে পেখম মেলে নৃত্য করে না! ওরা যা করে, সবই নাকি অকারণ পুলকে করে। কার্যকারণের যোগাযোগ মানতে চান না ভদ্রলোক। অকারণ পুলকে যে পাখিরা গান করে না তা নয়, লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, অনেক সময় এই দোয়েলই অহেতুক আনন্দে গান গেয়ে চলেছে! কিন্তু ওর অধিকাংশ গানের লক্ষ্য যে ওর প্রিয়া—এ কথা অস্বীকার করা শক্ত। লরেন্স বলেছেন, সৌন্দর্য ব্যাপারটা রহস্যজনক। ওর কোনও হেতু নেই। বিজ্ঞান জোর ক'রে একটা হেতু বার করবার চেষ্টা করেছে, কারণ বিজ্ঞানীদের একটা হেতু-বাতিক আছে। আছে তা মানছি। কিন্তু ওই লরেন্সই ওই প্রবন্ধেই বলছেন যে, জীবন্ত যৌবনই সৌন্দর্য। অর্থাৎ তিনিও রূপের প্রকাশকে যৌন অভিব্যক্তির সঙ্গে না জড়িয়ে পারেন নি। বিজ্ঞানকে গাল দিতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি তাদের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। যাক ও-কথা, এখন দোয়েলের কথা শুনুন।

পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজপুতানা, সিন্ধু, কচ্ছ প্রদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র দোয়েল স্থায়ী বাসিন্দা। পার্বত্য প্রদেশেও আছে ; চার হাজার ফুট, কখনও কখনও পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। হিমালয়েও এক হাজার ফুট পর্যন্ত এদের বাসা এবং ডিম পাওয়া গেছে। এদের চালচলন লক্ষ্য করেছেন কি কিছু? নিশ্চয়ই করেছেন। দোয়েল পাখির সম্বন্ধে অমন সুন্দর কবিতা যখন লিখেছেন, তখন দেখেছেন নিশ্চয় ওদের ভাল ক'রে। কিংবা কি জানি, না দেখেও হয়তো ভাল কাব্য রচনা করতে পারেন আপনারা, এর অজস্র প্রমাণ তো বিশ্বসাহিত্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উর্বশী অথবা শেক্‌স্পীয়ার মিডসামার

নাইটস্ ড্রীম দেখেন নি নিশ্চয়। যাক, আবার বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করছি আপনার। দোয়েলের কথা হচ্ছিল, তাই হোক। দোয়েল হচ্ছেন—ইংরেজী গ্রন্থকারের ভাষায়—"A bird of groves and delight to move about on the ground in the mixed chequer of sunshine and shade"—এর সংক্ষেপে বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, আমাদের দোয়েল হচ্ছেন কুঞ্জবিহারী, (নিকুঞ্জবিহারী বললেও ক্ষতি নেই) কাননের আলো-ছায়ার ঝিলিমিলিতে বিহার করতে ভালবাসেন। একজন বিদেশী গ্রন্থকার লিখেছেন যে, দোয়েল ঘন ঝোপের ভিতর ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে না (thick undergrowth it dislikes) ; কিন্তু আমি দু-তিনবার একে ঘন ঝোপে দেখেছি। অবশ্য শীতের সময়। সে সময় বেচারারা একটু মন-মরা হয়েই থাকে। গলা দিয়ে সুর পর্যন্ত বেরোয় না ভাল ক'রে। তবে ছোট-খাটো পরিচ্ছন্ন জায়গাই বেশী পছন্দ করে এরা। আমাদের বাড়ির সেই ছোট্ট জায়গাটুকু ভারি ভাল লাগে ওদের—সেই যেখানে আয়না বসিয়েছিলাম, মনে আছে নিশ্চয় আপনার। এখানকার বাগানেও দোয়েল আছে একটা—সে তো আমার গিন্নীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ক'রে ফেলেছে। গাছের তলায় তলায় তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোরাফেরা করে আহারের খোঁজে, তার পর উড়ে হয়তো একটা ডালে বা বাগানের দেয়ালের ওপর বসল, ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কোনও গাছের তলায় কোনও পোকামাকড় নড়ছে কি না দেখতে পাওয়া মাত্রই বোঁ ক'রে নেবে সেটি সংগ্রহ ক'রে গলাধঃকরণ করা হ'ল, তারপর আবার উড়ে গিয়ে বসা হ'ল সেই ডালে বা দেওয়ালের ওপর। ফুল তুলতে তুলতে আমার গিন্নী হয়তো খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন, দোয়েলের ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং তার চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যা ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—ও, আপনি! খাবার সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছি আমি। আপনার ওই ফুলগাছগুলো যে-সব পোকামাকড় নষ্ট করছে তাদেরই সাবাড় করছি! এই ধরনের বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব। তারপর হঠাৎ উড়ে গিয়ে এরিয়েলের ডগায় ব'সে গান ধ'রে দিলে একখানা, মনে হ'ল, আমাদের বাগানে আমরা যে ওকে থাকতে দিয়েছি তারই কৃতজ্ঞতায় ও যেন উচ্ছ্বসিত এবং সেইটেই যেন ওর গানের মুখ্য প্রেরণা। দোয়েলের গানের যে কত মূর্ছনা, কত উত্থান-পতন, কত লালিত্য, কত বৈচিত্র্য তা তো আপনি রোজই শুনছেন। দিনকয়েক চেষ্টা ক'রে আমাদের এখানকার দোয়েলের গানের ধরনটা আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই হয় নি অবশ্য, কারণ গানের সুরটাই আসল, তা লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এর থেকে ধরনটা হয়তো একটু বোঝা যাবে। কিছুটা টুকে পাঠাচ্ছি।—

ও পি পি পিঁ পি পি—চিঃ...

(দু মিনিট)

ও জা—গো শিগ্‌গির শিগ্‌গির শিগ্‌গির

(সঙ্গে সঙ্গে উড়ল)

পিঁ—কেরেঃ পিঁ—কেরেঃ পিঁ কেরেঃ...

(৫ মিনিট)

পি পি পি—কই তুমি—কই তুমি—কই তুমি—কি কি কি

(তিন মিনিট)

প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—প্রি—য়া—প্রি—য়া...

(দুই মিনিট)

পি ই ই ইঃ—পি ই ই ইঃ

(মিনিট খানেক)

পি—ত্রিও—ত্রিও—ত্রিও—ত্রিও—ত্রিও—চি—চি—চি

(ডাকতে ডাকতে উড়ল)

কি যে—কি যে—কি যে কি যে—কি এ কি এ কি এ—ক্রিকিক্ ক্রিকিক্...

(মিনিট খানেক)

পি পি পি—কি করছ যে কি করছ যে—দুত্তোর—দুত্তোর—

(দু মিনিট প্রায়)

এ—কি রেঃ এ কি রেঃ—এ কি রেঃ—চোখ গেল—চোখ গেল...

(তিন মিনিট)

এ ছাড়া আরও কত রকম যে ডাক আছে তা আমাদের অক্ষর দিয়ে লেখাও শক্ত। আমার ইচ্ছে আছে, দোয়েল পাখির জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে একটি ছোট বই লিখব। ডেভিড ল্যাকের (David Lack) 'দি লাইফ অব দি রবিন' বইখানা দেখেছেন কি? ওখানে আমার শেল্‌ফে আছে, ইচ্ছে করেন তো দেখতে পারেন। ওই ধরনের বই একটা লেখবার ইচ্ছে আছে। হয়ে উঠবে কি না জানি না। এ দেশে নানা বাধা। একটা বাধা হচ্ছে জনসমাগম। বহু বেকার লোকের বাস এ দেশে, তাদের কোনও কাজ নেই। লোকের বাড়িবাড়ি ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানোই একমাত্র কাজ। যখন-তখন হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ছে, দূর ক'রে দেওয়া যায় না, প্রাণ খুলে আপ্যায়িত করাও যায় না। অসময়ের বৃষ্টি বা ঝড়ের মত। মহা বিরক্তিকর। তবু একটু একটু ক'রে লিখছি। ওই ডেভিড ল্যাকের বইয়ে আর একটা কথাও দেখবেন এবং সম্ভব হ'লে মিলিয়ে দেখবেন—যা তিনি রবিন রেডব্রেস্টের সম্বন্ধে লিখেছেন, তা দোয়েলের সম্বন্ধে খাটে কি না! আমার মনে হচ্ছে খাটে। কথাটা হচ্ছে এই যে, পাখিরা সব সময়ে প্রিয়ার মনোরঞ্জন করবার জন্যেই যে গান গায় তা নয়। ডেভিড ল্যাক লক্ষ্য করেছেন যে, কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্টের নিজস্ব এলাকায় যদি অন্য কোনও পুরুষ রবিন রেডব্রেস্ট এসে পড়ে, তা হলে আগন্তুক পাখিকে লক্ষ্য ক'রে এলাকার মালিক গানের তুফান তোলে। অর্থাৎ ঝঙ্কারের মাধ্যমেই তাকে হুঙ্কার দেয়। মানুষের সঙ্গে ওইখানেই ওদের তফাত। এলাকার স্বত্বে কেউ যদি অবাঞ্ছিত দাবি করে—আমরা গালাগালি দিই, মোকদ্দমা করি ; কিন্তু পাখিরা গান গেয়ে ওঠে। এবং সেই গানের মর্যাদাও রক্ষা করে ট্রেস্‌পাসার পাখিটি। ও, এটা যে আপনার এলাকা বুঝতে পারি নি ঠিক, সো সরি মুখের এই রকম একটা কাঁচুমাচু ভাব ক'রে স'রে পড়ে সে। সব পাখি অবশ্য এতটা বিনীত নয়, দু-একজনকে মারধোর ক'রেও তাড়াতে হয়। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, এদের নিজস্ব এলাকার মালিকানা কে ঠিক ক'রে দেয়? এরা নিজেরাই ঠিক করে। কোনও অনধিকৃত এলাকা যে আগে দখল করতে পারে সে এলাকা তারই হয়—পক্ষী জগতে এই নিয়ম মেনে নিয়েছে সবাই। একাধিক দোয়েলের পায়ে বিভিন্ন রঙের 'রিং' পরিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আপনারাও লক্ষ্য করতে পারেন, ডেভিড ল্যাক যেমন করেছেন। দোয়েলের বিষয় আরও কয়েকটা কথা জানিয়ে দিয়ে পত্র শেষ করি। দোয়েলের প্রধান খাদ্য হচ্ছে পোকা-মাকড়। ওদের যদি খাঁচায় পুষতে চান, তা হ'লে ছোলা, ছাতু বা ফল খাওয়ালে চলবে না,—ওরা টিয়া-চন্দনার মত

বৈষ্ণব-প্রকৃতির নয়, রীতিমত শাক্ত। সেই জন্যেই বোধ হয় রাধাকৃষ্ণ বুলি ওদের শেখানো যায় না। এদের প্রকৃতিতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার আছে। এরা ছাতারের মত দল বেঁধে থাকতে পারে না। এমন কি নিজের প্রিয়ার সঙ্গেও এদের খুব যে একটা মাখামাখি আছে তা নয়। যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে এরা গানের ঝরনা বইয়ে দিতে পারে, কিন্তু দিনরাত প্রিয়ার সঙ্গে লেপটে থাকতে রাজি নয় এরা। মেজাজটাও এদের একটু ঝাঁঝালো রকমের, ইংরেজীতে যাকে বলে pugnacious। অর্থাৎ এদের ধরন-ধারণ চাল-চলন সবই প্রকৃত আর্টিস্টের মত। এরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, কারও সঙ্গেই গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকতে চায় না। ফিন্ সাহেব লিখেছেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রস আইলাণ্ডে নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে দোয়েল পাখি দেখা যায় এবং তারা মানুষ দেখলে নাকি পালায় না। বড় দোয়েলকে ধ'রে খাঁচায় পোষা বেশ শক্ত, সহজে পোষ মানে না, ম'রে যায়। এর একটা কারণ বোধ হয়, যে-পোকামাকড় ওদের খাদ্য তা প্রত্যহ জোটানো শক্ত। একজন সাহেব কিন্তু খাঁচায় দোয়েল দম্পতিকে পুষেছিলেন, খাঁচায় তারা নাকি ডিম পেড়ে বাচ্চাও লালন করেছিল—ফিন্ সাহেব লিখেছেন। ওদের লেখা বই যখনই পড়ি, একটা কথা বার বার মনে হয়। প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওদের কি অদম্য কৌতূহল। অগাধ বিদ্যা আর শিশুসুলভ কৌতূহলের মণিকাঞ্চন-যোগ হয়েছে ওদের প্রতিভায়। আমাদের দেশে কত ফুল, কত পাখি, কত রকমের গাছ ; কিন্তু সে সম্বন্ধে কারও কোনও কৌতূহলই নেই। দু-চারটে পাখি বা গাছের নাম অনেকে অবশ্য জানেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে যা কিছু তা সব 'জংলি' বা 'কি জানি'র পর্যায়ে। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা আরও অজ্ঞ। একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, কিন্তু সে চেষ্টাই কারও নেই। সবাই চাকরি কিংবা ব্যবসা ছাড়া আর যা কিছু করেন তা অতিশয় নিম্নস্তরের পরচর্চা। ভাবলে দুঃখ হয়। কি আশ্চর্য দেখুন, কথায় কথায় আমিও বেশ পরচর্চায় মেতে উঠেছি। এটা বোধ হয় আমাদের মজ্জাগত দোষ। চিঠি অনেক লম্বা হয়ে গেল। আর আপনার সময় নষ্ট করব না। পাখির বিষয় নতুন কি কবিতা লিখলেন? পাঠাবেন? পাখি আকর্ষণ করবার জন্যে আপনারা যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে কোনও পাখি আকৃষ্ট হয়েছে কি না জানাতে বলবেন শ্রীমতী ডানাকে। আমার ছোট চিড়িয়াখানার চিড়িয়ারা আশাকরি সুস্থ আছে। যদি কাউকে অসুস্থ দেখেন ছেড়ে দেবেন। প্যাঁচাটা কেমন আছে? ও খুব মাংসাশী লোক। মালিটাকে ব'লে এসেছি ইঁদুর ধ'রে দিতে। ইঁদুর যদি রোজ না পাওয়া যায় বাজার থেকে মাংসের কিমা কিনে দেবেন। এখানকার ব্যাপার মিটিয়ে ফিরে যেতে আমার বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজকর্ম চালাবার জন্যে আপনাকে একটা 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' পাঠালাম এই সঙ্গে। রত্নপ্রভা এই সঙ্গে আপনাকে হাজার টাকার ক্রস্‌ড় চেকও পাঠাচ্ছেন। সে বলছে, এটা পারিশ্রমিক নয়—প্রণামী। শ্রীমতী ডানার চেকটা কাল বা পরশু পাঠাবে সে।

আপনারা আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন। সব খবর দিয়ে উত্তর দেবেন ইতি—

আপনাদের

অমরেশ

কবি চেকটার দিকে চেয়ে রইলেন। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল তাঁর। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। ডানার টেবিলে চিঠি-লেখার যে প্যাডখানা ছিল, সেইটে টেনে নিয়ে তিনি লিখলেন—

কবির তপস্যা-লোকে এসেছে অপ্সরী
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি'।
কখনও সে মদিরাক্ষী টলমল-পান-পাত্র হাতে
যৌবন-হিল্লোলে দুলি' আসিয়াছে জ্যোৎস্না-নীল রাতে
কভু চুপে চুপে
এসেছে ভক্তের রূপে ;
প্রশংসার বাণী-রূপে কভু এসেছে সে
উচ্ছ্বসিত রসিকের বেশে ;
জনতার রূপ ধরি করিয়াছে কভু অভিষেক,
আদেশ করেছে কভু, কখনও সে 'চেক'।
বারম্বার তার কাছে পরাভব করেছি স্বীকার
তবু আমি কবি নির্বিকার
গুটি-কারাগার-মাঝে কিছুদিন থাকি শূন্য-গতি
তারপর একদিন উড়ে যাই মুক্ত প্রজাপতি।

কবিতাটির দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে কবি চেকটি মনি-ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ঠিক পর-মুহূর্তেই ডানা এসে ঘরে ঢুকল।

"ও, আপনি এসেছেন। ভালই হয়েছে। আমি আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। তালগাছে যে বাক্সটা আমরা টাঙিয়েছি, তাতে একজোড়া শালিক বাসা বাঁধছে। ও কি, কবিতা লিখলেন বুঝি?"

কবি কবিতাটা প'ড়ে শোনালেন.

"হঠাৎ এ ভাব মনে এল যে আপনার?"

"এল।"

"চলুন, শালিকের বাসাটা দেখবেন।"

"চল। ফিরে এসে চা খাব কিন্তু।"

"বেশ।"

দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

কবি অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে-ফিরে বাসাটা দেখলেন। সত্যিই এক শালিক-দম্পতি খড়কুটো মুখে নিয়ে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

"দেখছেন? ভারি মজা লাগছে আমার।"

"আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।"

"কেন?"

"মানাচ্ছে না একটুও। মনে হচ্ছে যেন এক সাঁওতাল দম্পতিকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে কলকাতা শহরের দোতলা ফ্ল্যাটে। মনে হচ্ছে—ওটা যেন ফাঁদ, বাসা নয়।"

"কি যে আপনার আজগুবি কল্পনা। চলুন, চা ক'রে দিই আপনাকে।"

ডানা হেসে কথাটা বললে বটে, কিন্তু কথাগুলো হঠাৎ কেমন যেন তার মনে গেঁথে গেল।

"তাই চল।"

দুজনে আবার বাসার দিকে ফিরলেন।

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

২

পরের দিন সকালে উঠেই ডানার সর্বপ্রথম মনে পড়ল শালিকের বাসার কথাটা। তাড়াতাড়ি চোখ-মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তালগাছটার উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই যা চোখে পড়ল, তাতে চমকে উঠল সে। বাসা থেকে একটা সাপের খোলস ঝুলছে। পাখি দুটো কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, দেখতেই পেল না। মহা মুশকিল হ'ল তো! ওদের বাসায় সাপ ঢুকেছে না কি! তাড়াতাড়ি গিয়ে চাকরটাকে ডেকে নিয়ে এল। চাকরটা খানিকক্ষণ উর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বলল, "ঢিল ছুঁড়ে দেখব?"

"ঢিল ছুঁড়বি? যদি ওরা ভেতরে ডিম পেড়ে থাকে! তুই গাছে উঠতে পারবি না?"

"না।"

"তা হ'লে উপায়?"

চাকরটা তালগাছটার তলায় গিয়ে গাছটাকে নাড়া দিতে চেষ্টা করল। গাছ নড়ল না একটুও।

"মই জোগাড় করতে পারিস কোথাও থেকে?"

"মই নিয়ে কি হবে?"

"মই লাগিয়ে তুই উঠতে পারিস।"

"সে আমার দ্বারা হবে না। ওখানে উঠে জান দেব না কি? সত্যিই যদি সাপ থাকে আর সে যদি তাড়া ক'রে আসে—ওরে বাবা, সে আমি পারব না মাইজি।"

ডানার মনে হ'ল, সাপের খোলসটা দুলছে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল তার। দিনের আলোয় তার চোখের সামনে এত বড় একটা সর্বনাশ হতে থাকবে আর সে কিছুই করতে পারবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে খালি! না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

"তুই একটা মই যোগাড় ক'রে আন তো। তুই উঠতে না চাস আমি উঠব।"

"মই আমি কোথায় পাব?"

"আমি আনন্দবাবুকে একটা চিঠি দিচ্ছি। চিঠিটা নিয়ে তুই ছুটে চ'লে যা। তিনি নিশ্চয়ই একটা মই যোগাড় ক'রে দিতে পারবেন। চট ক'রে যাবি আর আসবি।"

ডানা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে কবিকে একটা চিঠি লিখল—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহা মুশকিলে পড়েছি। তালগাছে শালিক পাখির বাসায় সাপ ঢুকেছে। একটা মই চাই। একটা লোকও যদি পাঠাতে পারেন ভাল হয়। আপনাকে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না, একটা মই পেলে আমিই সব ঠিক ক'রে নেব। আপনি আসবেন না কিন্তু। এলে খুব রাগ করব। বিপদে পড়লে পুরুষদের সাহায্য ছাড়াও যে আমরা সামলে নিতে পারি, দোহাই আপনার, সেটা যাচাই করবার সুযোগ দিন। ইতি—

ডানা

আগের দিন ছিমছাম কৃত্রিম মানুষের তৈরি বাসায় শালিক-দম্পতিকে দেখে কবির মনে যে বেসুর বেজেছিল, সেইটেই তাঁকে পরদিন প্রভাতে একটি কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করল। উপলক্ষ হ'ল একটি দাঁড়কাক। দাঁড়কাকটি তাঁর বাড়ির সামনের একটি ডালে ব'সে তারস্বরে চীৎকার করছিল। মন্দাকিনী থাকলে তার ওই শ্রুতিকঠোর খা-খা-খা শব্দ কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না, কাকটাকে তাড়িয়ে ছাড়তেন। কবি কিন্তু উদ্বুদ্ধ হলেন এবং ছন্দে গেঁথে দাঁড়কাককে খামখা উপদেশ দিতে ব'সে গেলেন। প্রথম দু লাইন লিখেই তাঁর মনে হ'ল, ভাবটি যেই জ'মে আসবে অমনি ঠিক খুনের মামলার নথিপত্র নিয়ে কুঁজো গণেশ গোমস্তা হাজির হবে এসে। সম্ভাবনাটা মনে জাগতেই ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। রাগও হ'ল, মনে হ'ল এলেই দূর ক'রে দেব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করলেন যে, মনের সুরটাও কেটে যাবে তা হ'লে। গণেশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাও বিদায় নেবে। কিন্তু উপায়ই বা কি! গণেশকে কি ক'রে ঠেকাবেন তিনি, সত্যিই যদি এসে পড়ে সে! হঠাৎ মনে পড়ল, একটা উপায় আছে। ঠাকুরকে ডাকলেন। চন্দনচর্চিত মৈথিলী ঠাকুরটি দ্বারপ্রান্তে এসে নিজস্ব বাংলায় সসম্ভ্রমে বললে, "আমাকে ডাকিয়েসেন বাবু?"

"দেখ, কেউ যদি এখন আসে ব'লো যে, বাবুর শরীরটা ভাল নেই, এখন দেখা করবেন না কারও সঙ্গেও।"

"বেশ। ভাত তো রান্না করিয়েসি, দু-চারঠো রোটি কি বানাব? শরীর যখন খারাব—"

"না, ভাতই খাব।"

ঠাকুর চ'লে গেল। জানলা দিয়ে কবি চাইলেন বাইরের দিকে। দাঁড়কাকটা তখনও ডাকছিল। কবি তাকে উদ্দেশ ক'রে লিখলেন—

বলিষ্ঠ দাঁড়কাক,
যা আছিস তাই থাক্
　　বুলবুলি হবি কোন্ দুঃখে
শুনে লেগে যায় তাক
তোর ওই হাঁকডাক
　　রূপ দেয় রুষ্টে ও রুক্ষে।

মনে আছে কবি কি দিয়েছিল তোরে গাল
ময়ূরের পেখমেতে হয়েছিলি নাজেহাল!

দেখিস খবরদার
করিস না যেন ধার
　　অভাব কিসের তোর কচ্ছ
কুচকুচে কালো গায়ে
আলো যে পিছলে যায়
　　কুচকুচে চোখ তোর স্বচ্ছ!

শৌখিন পাখিদের মিহি সুর ছাপিয়ে
গলা ছেড়ে হাঁক দে রে চারিদিক কাঁপিয়ে

ন্যাকামিকে তাড়িয়ে
সা রে গা মা ছাড়িয়ে
ছোটা তোর বেসুরের অশ্ব
রে হাবসি-সম্রাট,
তোর ঠাঁট তোর বাট
একেবারে তোর যে নিজস্ব।
ওরে ওরে দাঁড়কাক
যা আছিস তাই থাক্
কালো-কোলো বোম্বেটে পক্ষী
বুলবুলি দোয়েলের
টুনটুনি কোয়েলের
হ'স না নকল যেন লক্ষ্মী।

ডানার চাকর আনন্দবাবুর বৈঠকখানায় এসে কড়া নাড়তেই ঠাকুর গিয়ে হাজির হ'ল। সে যেন ওৎ পেতে ব'সে ছিল।

"বাবুর তবিয়ত খারাপ। মুলাকাত হোবে না।"

"মাইজি আমাকে একটা মই নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"মই? মানে সিঁড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"সিঁড়ি তো হামাদের নাই।"

"কাদের আছে?"

"রূপচন্দবাবুর বাসায় খুব লম্বা সিঁড়ি দিখিয়েছি একটা। সিথায় গেলে মিলতে পারে।"

"ও, আচ্ছা—"

রূপচাঁদবাবু আপিসে চ'লে গিয়েছিলেন।

যথারীতি চণ্ডী এসেছিল বকুলবাবার কাছে। সে একটি দুঃসংবাদ বহন ক'রে এনেছিল। অনেক চেষ্টা ক'রেও গণশা এবার নাকি হলদে পাখির বাসা আবিষ্কার করতে পারে নি। অথচ এই হলদে পাখির বাসা আবিষ্কারের উপর চণ্ডীর ভবিষ্যৎই নির্ভর করছিল। বকুলবালা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি সে হলদে পাখির বাচ্চা এনে দিতে পারে তা হ'লে 'এয়ার-গান' কিনে দেবেন একটা। চণ্ডীকে অবশ্য তিন-সত্যি করতে হয়েছিল যে, সে এয়ার-গান দিয়ে কাক ছাড়া আর কোনও পাখি মারতে পারবে না। বেড়াল, নেউল, শেয়াল, ক্ষ্যাপা কুকুর এসব মারতে পারে, কিন্তু কাঠবেড়ালী, ছাগলছানা বা গরু-বাছুরকে কিছু বলতে পাবে না। চণ্ডী এসব শর্তে রাজি ছিল, কিন্তু গণশা যা বললে তাতে তো এ বছর এয়ার-গান পাবার আশা দুরাশা।

বকুলবালা একটা ধনুকে ছিলে পরাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য দুর্বৃত্ত কাককুলকে শাসন করা। বকুলবালা একটু আরাম ক'রে বারান্দায় তোলা-উনুনটি নিয়ে রাঁধতে চান, (গরমে ওই ঘুপসি রান্নাঘরে টেকা যায় নাকি!) কিন্তু কাকের দৌরাত্ম্যে তা হয়ে উঠছে না। একটু নড়বার জো নেই—কখনও মাছভাজাটা নিয়ে পালাচ্ছে, কখনও দুধে মুখ দিচ্ছে। জ্বালাতন হয়ে উঠেছেন তিনি। তিনি আজ ঠিক করেছেন, তীর-ধনুক দিয়ে কাক তাড়িয়ে তবে রাঁধতে বসবেন। তীর ধনুকটা পাশেই থাকবে, তা হ'লে মুখপোড়ারা ভয়ে আর আসবে না।

চণ্ডীর মুখ থেকে দুঃসংবাদটি শুনে তিনি শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন একটু। ভাবটা—তুমি যে একটি অপদার্থ তা আমি বরাবরই জানি।

মুখে বললেন, "ছিলেটা পরা তো, আমি বাঁখারিটা ভাল ক'রে বাঁকিয়ে ধরছি। খুব কস্‌-কসিয়ে বাঁধবি।"

চণ্ডী যথাসাধ্য শক্ত ক'রে দড়িটা বেঁধে ফেললে।

"এইবার একটা তীর ছোঁড়্ দিকি। ওই কাকটাকে মার্। মুখপোড়া সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে আমাকে।"

"তীর কোথায়?"

"ওই যে। সকাল থেকে তো তীরই বানাচ্ছিলাম। একা হাতে বাঁশ চিরে তৈরি করেছি। তুমি তো এই এতক্ষণে এলে।"

চণ্ডী ধনুকে তীর যোজনা ক'রে লক্ষ্য করতেই কাকটা স'রে পড়ল। আশেপাশে আরও যা দু-একটা ছিল, তারাও উড়ে গেল।

"এই হচ্ছে ওদের ওষুধ।"

বকুলবালার চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল।

"দেখি, দেখি, আমাকে দে তো—"

একটা কাক অনেক দূরে মিত্তিরদের চিলেকোঠার ছাদে এসে ব'সে ছিল আবার। বকুলবাবা তীর-ধনুক আঁচল দিয়ে ঢেকে গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন সে দিকে।

"এইবার মারুন।"—ফিসফিস ক'রে চণ্ডী বললে।

বেশ বাগিয়ে তীর ছুঁড়লেন বকুলবালা। আর একটু হ'লেই লাগত, একেবারে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কাকটা কা-কা ক'রে পাড়া মাতিয়ে তুলল।

"তীরটা খুঁজে নিয়ে আয়।"

একছুটে বেরিয়ে গেল চণ্ডী এবং একটু পরেই তীরটা নিয়ে এল। এ সব ব্যাপারে সে ওস্তাদ একজন।

"রেখে দে ঠিক জায়গায়। গুছিয়ে রাখ্।"

চণ্ডী বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল।

বকুলবালা এবার হলদে পাখির প্রসঙ্গে এলেন।

"গণশা এবার হলদে পাখির বাসা দেখতেই পায় নি?"

"অমরবাবুর আম বাগানে গণশা গেল-বছর হলদে পাখির বাসা দেখেছিল। এ বছর সে বাগানে হলদে পাখিই নাকি দেখা যাচ্ছে না। গণশা বলছিল, অমরবাবুর লোকেরা নানা রকম ফাঁদ পেতে, জাল ফেলে, বন্দুক আওয়াজ ক'রে সব পাখিদের ভড়ক দিয়েছে, এ বছর ওরা হয়তো এ অঞ্চলে বাসা বাঁধবে না।"

"দুৎ তা কি কখনও হতে পারে?" এখানকার পাখি কি বাসা বাঁধবার জন্যে দিল্লী মক্কা চ'লে যাবে? গণশাটা বোকা, কিছু জানে না। তুই নিজে খুঁজিস একটু।"

"আমি যে হলদে পাখির বাসা চিনিই না।"

"পাখির বাসা চেনা আর শক্ত কি! পাখির বাসা দেখিস নি কখনও?"

"আমাদের ঘরের আলসেতে একবার শালিক বাসা বেঁধেছিল। কাকের বাসাও দেখেছি। বাবুই পাখির বাসাও দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রকম যে। হলদে পাখির বাসা দেখি নি কক্‌খনও কিনা!"

"গণশা তো দেখেছে, তাকে জিজ্ঞেস করিস না।"

"আচ্ছা।"

এমন সময় বাইরের দুয়ারে ডাক শোনা গেল, "বাবু বাড়ি আছেন?"

"দেখ্ তো কে এল এমন অসময়ে?"

চণ্ডী বেরিয়ে গেল। ডানার চাকরকে সে চিনত। আনন্দবাবুকে লেখা ডানার চিঠিখানা নিয়ে ফিরে এল সে।

"অমরবাবুর বাগান বাড়িতে যে মেয়েটি আছেন তিনি একটা সিঁড়ি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন আনন্দবাবুকে। আনন্দবাবু এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"চিঠিটা পড় তো।"

ডানার সম্বন্ধে দু-একটা কথা রূপচাঁদের মুখে বকুলবালা শুনেছিলেন। মেয়েটি নাকি বেশ লেখাপড়া জানা, অমরবাবু দু শো টাকা মাইনের চাকরি দিয়েছেন নাকি ওকে। ডানার সম্বন্ধে বকুলবালার বেশ একটা কৌতূহল ছিল, চিঠিটা শুনে তো আরও বেড়ে উঠল। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বেশ লিখেছে তো চিঠিখানা। নিশ্চয়, পুরুষদের সাহায্য নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কল্পনানেত্রে তিনি যেন শালিক পাখির বাসায় প্রবিষ্ট সাপটাকে দেখতে পেলেন। অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় একবার এ ধরনের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তাঁদের পায়রার খোপে সাপ ঢুকেছিল। সহসা তাঁর সমস্ত শক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

বললেন, "চণ্ডী, তুই তীর-ধনুকটা সঙ্গে নে। চাকরটাকে ডাক্, মইটা সঙ্গে নিয়ে চলুক, আমরাও যাই চল্।"

ডানাকে দেখে বকুলবালা সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, মেম-সাহেব-গোছ হোমরা-চোমরা কিছু দেখবেন। খড়কে-ডুরে-পরা, ছিপছিপে-গড়ন ইনিই ডানা না কি! মুখখানি তো চমৎকার! নিতান্ত ছেলেমানুষও। খুব ভাল লেগে গেল।

"নমস্কার।"

সপ্রতিভভাবে নমস্কার ক'রে ডানা এগিয়ে গেল।

"আপনাকে তো চিনতে পারছি না!"

"আমি বকুলবালা। আমার স্বামীর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

"কে আপনার স্বামী?"

বকুলবালা চণ্ডীর দিকে ফিরে বললেন, "বল্ না রে।"

"রূপচাঁদবাবু।"

"ও, রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী আপনি! আসুন, আসুন। আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। ওই দেখুন—"

বকুলবালা দোদুল্যমান সাপের খোলসটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

"সব শুনেছি আমি। আনন্দবাবুর কাছে মই ছিল না। লোকটা ঘুরে আমার বাড়ি গিয়েছিল। তার হাতে আপনি যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, সেটা চণ্ডী আমাকে প'ড়ে শোনালে। আমি নিজে লিখতে পড়তে কিছু জানি না, 'ক' অক্ষর গোমাংস যাকে বলে তাই। কিন্তু আপনি চিঠিতে যা লিখেছেন তা শুনে এত ভাল লাগল যে, থাকতে পারলাম না, নিজেই চ'লে এলাম। সত্যিই তো, তুচ্ছ সব ব্যাপারের জন্যে পুরুষমানুষের সাহায্য কেন নিতে যাব আমরা? চলুন, দেখা যাক। ওরে, মইটা দে তো এইবার আমাকে।"

ডানাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বকুলবালা মইটা চাকরের হাত থেকে নিয়ে নিজেই সেটা অবলীলাক্রমে ব'য়ে নিয়ে গেলেন তালগাছটার কাছে। মইটা যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর পেশীর দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল ডানা। অনেক দিন আগে সার্কাসে এই রকম মেয়ে দেখেছিল সে। মইটা তালগাছে লাগিয়ে ডানার দিকে ফিরে বকুলবালা বললেন, "আসুন আপনি।"

বকুলবালার গাছকোমর বাঁধাই ছিল, মাথার খোঁপাটা এলিয়ে বেণীটা লুটিয়ে প'ড়েছিল পিঠের উপর। কৌতূহল ঝলমল করছিল চোখের দৃষ্টিতে। অদ্ভুত দৃশ্য! ডানা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল তাঁর দিকে।

বকুলবালা হঠাৎ ডানার দিকে ফিরে অনেকটা যেন জবাবদিহি সুরে আবার বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, চাকরকে দিয়ে মই বইয়ে আনা কেন তবে, ও কি পুরুষমানুষ নয়? এর উত্তরে আমি বলব, ওদের মাইনে দিয়ে যখন রেখেছি তখন খাটিয়ে নেব বইকি। ওরা যখন থাকবে না, তখন নিজেরাই সব করব। কি বলেন? আসুন, সিঁড়ির নীচের দিকটা চেপে ধরুন, আমি উঠি।"

ডানা এগিয়ে গেল। বকুলবালার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যদিও প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু তাঁর সরল সপ্রতিভ আলাপে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল। রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী এমন চমৎকার মানুষ, অথচ আলাপ হয় নি এতদিন!

"বেশ জোরে চেপে ধ'রে থাকুন।"

"আপনি উঠছেন তো, কিন্তু সত্যিই যদি সাপ থাকে!"

"থাকলেই বা, কি করবে আমার! চণ্ডে, ওই বাঁখারিটা প'ড়ে আছে, আমায় দে তো। কিছু দূরে উঠে খোঁচা দিয়ে দেখব প্রথমে। সাপ থাকলে হয় ফোঁস করবে, না হয় বেরিয়ে পড়বে।"

চণ্ডী বাঁকারিটা এনে দিতে বকুলবালা তলোয়ার গোঁজার মত ক'রে কোমরে সেটা গুঁজে নিলেন। তারপর উঠতে লাগলেন। ডানা মইটা ধ'রে রইল শক্ত ক'রে। আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগল শালিক পাখিরা। দু-একটা পাখি উড়ে এসে ঠোকরাবারও চেষ্টা করতে লাগল বকুলবালাকে। বকুলবালা কোমর থেকে বাঁকারিটা খুলে তলোয়ার-চালানোর ভঙ্গীতে আস্ফালন করতে করতে উপরে উঠতে লাগলেন।

"আর বেশি উঠবেন না। এবার খোঁচা দিয়ে দেখুন, ভিতরে কিছু আছে কি না।"

বকুলবালা তর্ তর্ ক'রে বেশ অনেকখানি উঠে পড়েছিলেন। পাখির বাসা তাঁর বাঁখারির নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তিনি সাপের খোলসটায় প্রথমে খোঁচা দিলেন, খোঁচা দিতেই প'ড়ে গেল সেটা। বাসার ভিতর খোঁচা দিলেন, কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সোজা তিনি উঠে গেলেন এবং বাসার ভিতর উঁকি মেরে দেখলেন। ডানা সোৎসুকে উর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে ছিল, বকুলবালা কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি তার দিকে প্রেরণ ক'রে বললেন, "সাপ-টাপ কিছু নেই। চারটি নীল রঙের ডিম রয়েছে। পেড়ে আনব?"

"না না, পাড়বেন কেন! বাচ্চা হবে, তখন দেখা যাবে। আপনি নেবে আসুন?"

বকুলবালা অকম্পিত চরণে দ্রুতগতিতে নেবে এলেন।

"আচ্ছা, সাপের খোলসটা ওখানে গেল কি ক'রে তা হ'লে?"

ডানা সমস্যাটার সমাধান করতে পারছিল না কিছুতে। বকুলবালা সমাধান ক'রে দিলেন। বললেন, "ওই মুখপোড়ারাই নিয়ে গেছে হয়তো মুখে ক'রে। কে শত্রু, কে বন্ধু, সে বোঝবার

বুদ্ধি কি ওদের আছে! দেখুন না, আমাকেই তেড়ে তেড়ে ঠোকরাতে আসছে, অথচ আমি ওদের বাসা থেকে সাপ তাড়াতে যাচ্ছি। ওদের ঘটে বুদ্ধি থাকলে ভাবনা ছিল কি!"

"চলুন, একটু চা খাওয়াই আপনাকে।"

"এ সময় কেউ আবার চা খায় না কি? চা খাব সেই পাঁচটায়, উনি আপিস থেকে ফিরে এলে।"

"তবু চলুন, বসবেন একটু।"

"তা বসছি একটু, চলুন।"

বকুলবালা ঘরে ঢুকেই অবাক হ'য়ে গেল ডানার টেবিলের উপর মোটা মোটা বই দেখে।

"এই সব আপনি পড়েন?"

"পড়ি মাঝে মাঝে। অমরেশবাবু দিয়ে গেছেন, পাখির বিষয়ে কিছু জানবার দরকার হ'লে উলটে-পালটে দেখি।"

"এতে সব পাখির কথা আছে না কি? সব পাখির বই?"

"হ্যাঁ। অনেক রকম পাখির ছবিও আছে, দেখুন না।"

"হলদে পাখির ছবি আছে?"

"হলদে রঙের পাখি তো অনেক আছে, কোন্‌টার কথা আপনি বলছেন?"

"বেনেবউ।"

"ও, বুঝেছি। খুব ভাল ছবি আছে, দেখাচ্ছি আপনাকে।"

ডানা ছবি বার ক'রে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বকুলবালা। চণ্ডীও সমান উৎসাহে বইটা আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু বকুলবালার ধমক খেয়ে ছেড়ে দিতে হ'ল বেচারাকে।

"তুই ছাড়্ না, আমি আগে দেখে নিই তারপর তোকে দেখাচ্ছি। অমন আদেখলাপনা করিস নেক? বাঃ, চমৎকার তো! ঠিক যেন জ্যান্ত পাখিটি ডালে ব'সে রয়েছে! এর একটা বাচ্চা পোষবার খুব শখ আমার, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না।"

ডানা বললে, "আমরা লোক বহাল করেছি সব রকম পাখির বাচ্চা সন্ধান করবার জন্যে। হলদে পাখির বাচ্চা যদি পাই দেব আপনাকে পাঠিয়ে।"

"দেবেন? সত্যি বলছেন? তিন সত্যি করুন।"

বকুলবালা উদ্ভাসিত চক্ষে ডানার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

এতটা ছেলেমানুষি ডানা প্রত্যাশা করে নি। সেও ছেলেমানুষের মত হেসে ফেললে, হেসেই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভও হ'লে একটু।

"তিন সত্যি করবার দরকার কি? পেলে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।"

বকুলবালার জেদ চ'ড়ে গেল হঠাৎ।

"না, আপনি তিনবার বলুন—দেব দেব দেব। বলতেই হবে আপনাকে।"

বকুলবালার চোখের দিকে চেয়ে ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে। শুধু তিন সত্যি ক'রেই নিস্তার পেলে না সে, গায়ে হাত দিয়ে দিব্যিও করতে হ'ল তাকে। আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরল হাসিতে চোখ-মুখ ঝলমল করতে লাগল বকুলবালার।

"এবার যাই ভাই। ওঁর আসবার সময় হ'ল আপিস থেকে, খাবার টাবার কিচ্ছু করা হয় নি এখনও। এই চণ্ডী, ওঠ্।"

চণ্ডী সবিস্ময়ে নানা রকম পাখির ছবি দেখছিল। কি অদ্ভুত সব পাখি!

"এটা কি পাখি?"

"ধনেশ।"

বকুলবালা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন।

"ধনেশ আবার পাখির নাম হয় নাকি! ধনেশ বলতেই মনে পড়ে আমাদের গাঁয়ের ধনেশ ময়রাকে—মোটা কালো গোলগাল, দেখলেই মনে হ'ত একটা তরমুজ বুঝি হেঁটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই বলত, পানতোয়া খাবে? চল তা হ'লে দোকানে। আমি তাকে দেখলেই ছুটে পালাতাম। এ তো অদ্ভুত পাখি দেখছি, ঠোঁটের ওপর একটা আবের মত রয়েছে।...চণ্ডী, তুই উঠবি কি না বল্, না উঠিস তো আমি একাই চললাম।"

বকুলবালা চণ্ডীর সঙ্গে চ'লে গেলেন। ডানা একা ব'সে ব'সে বকুলবালার কথাই ভাবছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার মেয়েটিকে। অনিবার্যভাবে রূপচাঁদের কথাটাও তার মনে হচ্ছিল। ওই রকম প্যাঁচোয়া লোকের এত সরল স্ত্রী! এমন চমৎকার সহজ সরল স্বাস্থ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পেয়েও ওঁর এমন কাঙালপনা কেন? মনে হ'ল, সহজ সরল ব'লেই হয়তো মনের মিল হয় নি। হাবভাবময়ী লীলাকুশলা হ'লে হয়তো পছন্দ হ'ত। হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল। ছুটতে ছুটতে বকুলবালাই এসে হাজির হলেন আবার।

"একটা কথা আপনাকে মানা করা হয় নি। ওঁর কাছে যেন ভুলেও কক্‌খনও বলবেন না যে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"কেন?"

"ওরে বাবা! খেয়েই ফেলবেন তা হ'লে আমাকে। কোথাও যাওয়া উনি পছন্দ করেন না।"

"হলদে পাখির বাচ্চা যদি পাই, তা হ'লে পাঠাব কি ক'রে আপনাকে?"

"চণ্ডে আসবে নিতে। মাঝে মাঝে ও এসে খবর নিয়ে যাবে। এই চণ্ডে, ভুলিস না যেন।"

"না।"

চণ্ডী সাগ্রহে মাথা নেড়ে জানাল যে, কিছুতেই তার ভুল হবে না।

"চললুম। ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছি।"

বকুলবালার সমস্ত মুখ হাঁসিতে ভ'রে উঠল।

"চললুম ভাই, তা হ'লে।"

"আসুন। মাঝে মাঝে আসবেন লুকিয়ে। আমি রূপচাঁদবাবুকে কিছু বলব না।"

"আচ্ছা, আসব। চণ্ডে, চল্, আমরা ওই বাগানটার ভেতর দিয়ে যাই। রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ যদি দেখতে পেয়ে যায়। রোদ প'ড়ে গেছে তো, লোক চলাচল শুরু হয়েছে।"

"বেশ, তাই চলুন।"

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা চ'লে গেলেন। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন আর একবার। তারপর বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডানা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য মেয়েটি! বয়স বেড়েছে, কিন্তু মন বাড়ে নি। দেহটা যেন মনের ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না, হাঁপিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে খেয়ালও নেই। একটু যেন ঈর্ষা হ'ল। মনে হ'ল, আধুনিকতার অতিসভ্য জটিল মানসিকতা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের কারু-কলায় যার নিত্য নতুন রূপ বিকশিত, এই সরলতার কাছে হার মেনেছে। গাছের ফুলের কাছে কাগজের ফুল দাঁড়াতে পারে কখনও? অকারণ ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মনটা। তারপর মনে হ'ল, পাখির পালক

বিষয়ে যে প্রবন্ধটা সে ফেঁদেছিল, সেটা খানিকটা লেখা হয়ে প'ড়ে আছে। শালিক পাখির বাসাটা নিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটল, বকুলবালাকে নিয়ে কাটল আরও খানিকক্ষণ। এইবার পাখির পালক নিয়ে পড়া যাক। সময় কাটানোটাই যেন জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঘরে ফিরে পাখির পালক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। অমরবাবু একগাদা বই দিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অকূল পাথার। কিন্তু এ অকূল পাথারে কষ্ট হয় না, নব নব বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে মন। সাপ যে সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত, সেই সরীসৃপই যে বিবর্তিত হয়ে পাখিতে পারিণত হয়েছে—এ কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না, অথচ বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেছেন। সরীসৃপের গায়ের আঁশই নাকি পালকের রূপ ধারণ করেছে! সরীসৃপ-পূর্বপুরুষদের আঁশ পাখিদের গায়ে এখনও বর্তমান, পাখিদের নখও নাকি আঁশ থেকে হয়েছে, কোন কোনও পাখির ঠোঁটও। এদের ঠোঁট নাকি খোলসও ছাড়ে বছরে বছরে সাপের মত। এ সব কথা কল্পনাতীত ছিল তার, অথচ সবই বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফলে সত্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে-সরীসৃপ বুকে দিয়ে মাটিতে হাঁটত, সে-ই ক্রমশ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে হাঁটতে শিখল, তারপর লাফিয়ে গাছে চড়ল, তারপর উড়ল আকাশে। আকাশ পেরিয়ে আর কোথাও যাবে নাকি? কিংবা হয়তো গেছে, এখনও জানা যায় নি। আকাশচারী হয়ে এদের চঞ্চলতা তো বেড়েছে, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তিও বেড়ে গেছে বহুগুণ। ঘ্রাণশক্তি নাকি কমেছে। তাই এরা দুর্গন্ধ স্থানে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে, দুর্গন্ধ পোকামাকড়ও গিলে খায় স্বচ্ছন্দে। ঘ্রাণশক্তি ক'মে গিয়ে একটা বাধাই যেন অপসারিত হয়েছে, জীবনকে আরও তীব্রভাবে উপভোগ করতে পারছে ওরা। বস্তুত পাখির মত অমন স্বতস্ফূর্ত চঞ্চল প্রাণের প্রকাশ প্রকৃতির আর কোনও প্রাণীতে আছে কি? পাখির আসল পরিচয় ওর প্রাণলীলায়। যতক্ষণ জেগে থাকে স্থির থাকে না এক মুহূর্ত। নেচে গেয়ে লাফিয়ে উড়ে রঙের বাহার ছড়িয়ে ও যেন সর্বদাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমি শুধু বেঁচে নেই, আমি জীবনটাকে উপভোগ করছি। পালক ওদের এই অতিদ্রুত ছন্দ-মুখরিত বর্ণ-বিচিত্র জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। এই পালক ওদের গায়ের লেপ (ওদের পালক চুরি ক'রে আমরাও লেপ তৈরি করি), এই পালক ওদের যানবাহনও, পালকের সাহায্যেই ওরা ওড়ে। এই পালকের সাহায্যে ওরা শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষাও করে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সঙ্গে পালকের রঙ বেমালুম ভাবে মিলিয়ে দিয়ে ওরা শত্রুর চোখে ধুলো দেয়। জীবন্ত পাখিটাকে দেখতেই পাওয়া যায় না। মনে হয়, বুঝি ঝোপের ভিতর ওটা আলোছায়ার কারিকুরি—বনমুরগী নয়, কিংবা গঙ্গার চরে ওগুলো বালির ঢেউ—টিট্টিভ নয়। এছাড়া পালকের সাহায্যে ওরা প্রণয়লীলাও করে নানা রকম। পুরুষপাখি নানা বর্ণের পক্ষ বিস্তার ক'রে আহ্বান জানায় প্রণয়িনীকে। প্রণয়িনীও সাড়া দেয় পালকের ইশারায়। অনেক পাখি পালক দিয়ে বাসাও তৈরি করে ডিম পাড়ার সময়। মোট কথা, পাখির জীবনে পালক অপরিহার্য, ওই ওদের ব্যক্তিত্ব। দু জাতের দু রকম পাখি, পালকের জন্যই দু রকম, পালক ছাড়িয়ে ফেললে কোনও তফাত থাকে না আর বিশেষ। পালকের রঙের বিষয়েও একটা আশ্চর্য কথা চোখে পড়ল তার। সাধারণত প্রাণীদের শরীর থেকেই রঙ তৈরি হয়। পাখিরও হয়। কিন্তু অনেক পাখির পালকের এমন গঠন-বৈচিত্র্য যে, সূর্যালোকই সেই পালকে প'ড়ে ভেঙে যায় এবং সূর্যালোক-ভাঙা রঙ তখন প্রতিফলিত হয় পালক থেকে। আকাশে যেমন আমরা রামধনুর রঙ দেখি, অনেকটা তেমনই। রঙটা আলোর, পালকের নয়। সব পাখির পালকে অবশ্য এমন আলোর লীলা হয় না, কোন কোন পাখির

পালকের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই এ রকম হয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আর একটা কথা চোখে পড়ল। অদ্ভুত কথাটা। কোটি কোটি বৎসর ধ'রে পৃথিবীর জীবেরা নাকি বোবা ছিল, তাদের মুখে ভাষা ফুটেছে অনেক পরে।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মধ্যে এখনও অনেকেই মূক। তাদের কণ্ঠে ভাষা নেই। তাদের অনেকে শব্দ করে বটে, কিন্তু তা কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় না, হয় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে। পতঙ্গরা শরীরের এক অংশ অন্য অংশে ঘর্ষণ ক'রে শব্দ করে। মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট উভচরেরাই সর্বপ্রথমে কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েছিল। মত্ত দাদুরীরাই গান গেয়েছিল প্রথম এবং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রণয়িনীকে আহ্বান করা।

কবি এসে ঢুকলেন হুড়মুড় ক'রে।

"মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।"

"কি?"

"সেই খুনের ব্যাপারটার তদ্বির করতে এখন ছুটতে হবে আমাকে সদর এস. ডি. ও.-র কাছে। কি বিপদ বল দিকি! অমরেশবাবু এক ভীষণ ঘানিতে জুড়ে দিলেন আমাকে দেখছি। তোমাকেও। তোমার জন্যও একটা দুঃসংবাদ এনেছি। একটা হুতোম প্যাঁচা কিছু খাচ্ছে না। মালীর ভার্সন অবশ্য, তুমি গিয়ে একটু দেখে এস। মালীটা বেশ মুটিয়েছে দেখলুম। প্যাঁচার বরাদ্দ 'কিমা'টা ও-ই খাচ্ছে কি না কে জানে!"

ব'লেই কবি নির্নিমেষ হয়ে গেলেন ডানার মুখের দিকে চেয়ে—রোদের তাতে ডানার মুখটা রক্তিম হয়ে উঠেছিল।

"কি দেখছেন?"

"তোমাকে। চমৎকার দেখাচ্ছে। এই নিদারুণ রোদে একটা অদ্ভুত রূপ ফুটেছে তোমার। দাঁড়াও।"

ব'সে পড়লেন টেবিলের ধারে এবং খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন—

মরুভূমির তপ্ত বায়ে
　　গোলাপ ফোটে কাঁটার বনে
পথিক শুধু হারায় দিশা
　　অসম্ভবের আমন্ত্রণে
মরীচিকায় বয় নদী যে
　　স্বচ্ছধারা অলীক খাতে
কাঁটার বনে গোলাপ জাগে
　　পথিক-অলির প্রতীক্ষাতে।
লগ্ন জাগে কোন্ আকাশে
　　কোন্ বাঁশরীর কোন্ সুরে যে
বলতে পারে সেই কবি সে
　　কাছে থেকেও রয় দূরে যে।

কবিতাটা প'ড়ে ডানা বললে, "এটা কি হ'ল?"

"হ'ল একটা যা হোক কিছু। গোলাপের সঙ্গে প্রলাপ মেলাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, পারলাম না। হাতে সময় নেই এখন। চললুম। তুমি প্যাঁচাটার খবর নিও একটু।"

কবি চ'লে গেলেন। ডানা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কবিতাটা পড়লে আর একবার। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। অদ্ভুত প্রকৃতির ভদ্রলোক। বাপের বয়সী, অথচ ছেলেমানুষের মত মন। কোনও কুমতলব আছে ব'লে মনে হয় না, অথচ কেমন যেন...

হুতোম প্যাঁচাটার খবর নেওয়ার জন্যই ডানা বেরিয়ে পড়ল। এমন সময় বেরুতে হ'ল ব'লে খারাপ লাগতে লাগল খুব। একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, অর্থাভাবে প'ড়েই এই সব করতে হচ্ছে। তারপর মনে হ'ল, কবিও ওই কথাই বলেছিলেন। অর্থাভাব সকলকেই যেন ঘানি টানাচ্ছে, ঘানির চেহারাও নানারকম। অমরবাবুর কথা মনে হ'ল। অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা পাখি সম্বন্ধে যে সব গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, অর্থাভাবে তা করতে পারছেন না ব'লে অমরবাবুর মত বড়লোকও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন একদিন, মনে পড়ল। অদ্ভুত জিনিস এই টাকা। সকলেরই টাকার দরকার, সকলেরই টাকার প্রতি লোভ।

কক্‌রিং—কক্‌রিং—

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বাদামী রঙের ল্যাজ-ঝোলা পাখিটা আমগাছের ডালে দুলে দুলে ডাকছে। তারপর নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী আসছেন, তাঁর হাতে কি যেন একটা রয়েছে। কাছাকাছি হতে ডানা জিজ্ঞাসা করলে, "হাতে ওটা কি আপনার?"

"শাবল।"

"শাবল নিয়ে কি করবেন? ও, আপনার ওদিকের সেই খুঁটিটা প'ড়ে গেছে বুঝি? তা, আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমি কাল আমার চাকরটাকে পাঠিয়ে ঠিক ক'রে দেব। আমাকে একটু খবর পাঠালেই হ'ত, আমি আগেই করিয়ে দিতাম।"

সন্ন্যাসী কিছু না ব'লে মুচকে হাসলেন একটু। তারপর নিজের গন্তব্যপথে চ'লে গেলেন। ডানা তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হ'ল, এ লোকটি একেবারে স্বতন্ত্র। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না, নিজেকে নিয়েই আপন মনে আছেন ওই ভাঙা ঘরটাতে, অথচ এঁকে অগ্রাহ্য করবারও উপায় নেই। ডানার সমস্ত মনটা তো এঁকে ঘিরেই স্বপ্ন রচনা করছে। রূপচাঁদের লোলুপতা, কবির কবিত্ব, অমরেশবাবুর পক্ষীতত্ত্ব মাঝে মাঝে তার ভাল যে লাগে নি তা নয়, ওঁদের নিয়ে কিন্তু তার মন স্বপ্নরচনা করতে পারে না। ডানা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, কেন পারে না? সামাজিক বাধা আছে ব'লে? কিন্তু তা তো নয়। তা যদি হ'ত তা হ'লে সে বাধা তো এই সন্ন্যাসীর বেলাতে আরও প্রবল। তা ছাড়া সমাজের সঙ্গে মানুষের বাইরের আচরণেরই সম্পর্ক বেশি, মন তো স্বাধীন। তার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে যে জগৎ সে সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে বাইরের সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। না, কারণটা সামাজিক নয়, অন্য কিছু। খানিকক্ষণ পরে ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর চরিত্র রহস্যময় ব'লেই কি তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে? কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, কিই বা এমন রহস্যময়! অস্পষ্ট তো কিছু নেই। সোজাসুজি সন্ন্যাসী, ভাঙা কুঁড়েতে আপন খেয়ালে থাকেন, ভিক্ষে করেন, ভজন করেন, কাছে গেলে আলাপ করেন, কোন রকম বাজে ভড়ং নেই, আত্মগোপন করবার প্রয়াস নেই, তাক লাগিয়ে দেবার কসরৎ নেই। নিতান্তই সহজ সরল প্রাণ-খোলা লোক। ওঁর চেয়ে রূপচাঁদ ঢের বেশি রহস্যময়। কিন্তু রূপচাঁদকে ঘিরে মন স্বপ্ন রচনা করতে চায় না তো। কেন...? এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ডানা অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল, মল্লিক মশাই যে কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তা সে লক্ষ্যই করে নি।

"নমস্কার। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"নমস্কার। আমার কাছে? কেন, কিছু দরকার ছিল?"

"আনন্দবাবু শুনলাম আপনার বাসার দিকে এসেছেন, দরকারটা আমার তাঁর সঙ্গে। কোথায় তিনি?"

"আমার কাছে একটু আগে এসেছিলেন, কিন্তু কোথায় যেন একটা খুন হয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি এস. ডি. ও.-র কাছে গেলেন।"

"এস. ডি. ও.-র কাছে! সেখানে যাবার কিছু দরকারই ছিল না। রূপচাঁদবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। উনিই তো পুলিশ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। এই কথাটাই ওঁকে বলবার জন্যে আসছিলাম। আমার অবশ্য মাথাব্যথা হবার কথা নয়, ম্যানেজার এখন আমি নই, ম্যানেজার আনন্দবাবুই, কিন্তু ঘাঁৎঘোঁৎ ঠিক রপ্ত হয় নি তো ওঁর, তাই ভাবলাম—কথাটা ওঁকে ব'লে আসি। অমরবাবুর নিমক তো অনেক দিন ধ'রে খেয়েছি, ভাবলাম—যাতে ওঁদের একটু সুবিধা হয় সেটা করা আমার কর্তব্য। কর্তব্য নয়?"

কর্তব্য কি না তার উত্তর না দিয়ে ডানা বললে, "আচ্ছা, উনি এলে আমি বলব আপনার কথা!"

"বলবেন, নিশ্চয়ই বলবেন। রূপচাঁদবাবুকে আমি বলব। তবে আমি ডিটেল্স্ সব জানি না তো।"

"আচ্ছা।"

ডানা পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

মল্লিক মশাই বললেন, "এই তাঁ-তাঁ রোদে চলেছেন কোথা?"

"পাখিগুলোর তদারক করতে। শুনলাম, একটা প্যাঁচা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"একটি পাখিও বাঁচবে না। বনের পাখি কি অমন ভাবে রাখলে বাঁচে? আপনি বলবেন, চিড়িয়াখানায় বাঁচে কি ক'রে তা হ'লে? চিড়িয়াখানায় কত রকম ব্যবস্থা, কত রকম তদারক, গবর্মেণ্টের একটা আলাদা ডিপার্টমেণ্টই রয়েছে ওর জন্যে, তবু ম'রে যায়। আর আপনারা ভেবেছেন, মুন্সী আর গোটাকতক বদমাইস পাখিওলা আপনাদের চিড়িয়াখানা চালাবে! ছাগল দিয়ে বলদের কাজ হ'লে কি কেউ বলদ কিনত?"

"কিন্তু ওরা তো মোটামুটি ভালই চালাচ্ছে।"

"টিয়া ক'টা আছে গুনে দেখেছেন?"

"না, গুনি নি। গোটা দুই ম'রে গেছে।"

"মরে নি। মুন্সী বিক্রি করেছে। একটা কিনেছে আমার ছেলে আর একটা কিনেছে চণ্ডী—রূপচাঁদবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করে যে ছোঁড়াটা।"

ডানা অবাক হয়ে গেল।

"সত্যি?"

"আরও শুনবেন? পাখিদের যে ছোলা, ফল, মাংস, মাছ আপনারা কিনে দেন, তা কি ওদের দেয় ওরা? কিচ্ছু দেয় না, বিক্রি করে।"

"তাই নাকি?"

ডানার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। মনে হ'ল, অপরাধ তারই। অমরবাবু তার উপরেই বিশ্বাস ক'রে পাখি রেখে গেছেন, তারই উচিত সামনে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ানো। মুন্সীটা এত চোর! এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। যথেষ্ট মাইনে দেওয়া হয় তাকে।

"এই রোদে ছাতা না নিয়ে বেরিয়েছেন, মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে যে! আমার ছাতাটা নিয়ে যান না হয়।"

"না, থাক্। রোদে ঘোরা আমার অভ্যাস আছে।"

আর কোনও কথা না ব'লে ডানা হন হন ক'রে এগিয়ে গেল। মল্লিক মশাই তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর মাথা নাড়লেন। মুখে একটা বিচিত্র হাসিও ফুটে উঠল তাঁর।

৩

এক লোলুপ ক্ষুধার্ত বাঘের খাঁচার সামনে রক্ত-চর্চিত মেদ-মণ্ডিত একটা মাংসের প্রকাণ্ড টুকরো ঝুলছে আর সেটা না পেয়ে বাঘটা নিষ্ফল আক্রোশে খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরছে—ঠিক এ উপমা রূপচাঁদের সম্বন্ধে খাটবে না। মনে মনে তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরছিলেন ঠিকই, ডানা এখনও তাঁর নাগালের বাইরে আছে—এ কথাও মিথ্যা, তাঁর একাধিক চাল ব্যর্থ হয়েছে তাও তিনি মর্মে-মর্মে অনুভব করেছেন। কিন্তু খাঁচার গরাদেতে মাথা কুটে মরবার লোক তিনি নন। খাঁচার অস্তিত্বই ছিল না তাঁর কল্পনায়। এ ধরনের আজগুবি রূপকে তিনি বিশ্বাসই করেন না। তিনি একটু নির্লিপ্ত হয়ে ক্রেতা রূপচাঁদের কৃপণতাটা উপভোগ করছিলেন। ঠিক কত দাম দিলে যে মালটা পাওয়া যাবে তা বেচারা নির্ণয় করতে পারছে না কিছুতে। বহুকাল আগে রূপচাঁদ একবার নিলামে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন। একটা কাশ্মীরী শাল খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। পঞ্চাশ থেকে শুরু ক'রে ডাক দেড় শো পর্যন্ত উঠল। রূপচাঁদ ডাক দিলেন দু শো, প্রতিপক্ষ দু শো দশ হাঁকলেন। রূপচাঁদের জেদ চ'ড়ে উঠল, হেঁকে দিলেন তিন শো। প্রতিপক্ষ আবার দশ বাড়ালেন—তিন শো দশ টাকায় লোকটি আর একটু হ'লে নিয়ে নিয়েছিলেন শালটা। রূপচাঁদ হাঁকলেন পাঁচ শো। প্রতিপক্ষ আর বাড়তে সাহস করলেন না। রূপচাঁদ শালটা কিনে নিলেন। দমকা অত টাকা খরচ ক'রে তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল কিছুদিন ; কিন্তু তাঁর জন্যে তাঁর মনোকষ্ট হয় নি, ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ ক'রে তিনি প্রীতই হয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, ডানাও নিলামে চড়েছে। ঠিক কত দাম হাঁকলে যে তাকে পাওয়া যাবে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না। প্রতিপক্ষ অমরেশ ও আনন্দমোহন যে কত দাম হেঁকেছে তাও ঠাহর করতে পারছিলেন না তিনি। সেটা জানতে পারলে সুবিধা হ'ত। তবে আর একটা কথাও অবশ্য ঠিক যে, রূপচাঁদ নিছক ক্রেতাও নন। তিনি আর্টিস্টও। অতসী কাচের ভিতর দিয়ে যে কোনও মুহূর্তে রামধনু দেখতে পাওয়া যায় ব'লেই অতসী কাচের প্রতি তাঁর লোভ। লোভের সঙ্গে রামধনুর স্বপ্নটা জড়িয়ে থাকাতে লোভটা বেড়েছে সত্যি, কিন্তু একটু বিশেষত্ব লাভও করেছে। কারণ লোভটা কাচের প্রতি নয়, আকাশচারী রামধনুর প্রতি। নারীমাংসে বাজারে অপ্রতুল নয়। প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর ছাগমাংসও যেমন বাজারে বিক্রি হয়, নারী মাংসও হয়। কিন্তু তার প্রতি লোভ নেই রূপচাঁদের। তারা সুলভ ব'লে নয়, তাদের সংস্পর্শে এসে স্বপ্ন জাগে না ব'লে। নিতান্তই খেলো কাচ তারা—কেউ রঙিন, কেউ সাদা, কেউ পাতলা, কেউ পুরু, কিন্তু অতসী কাচের বিশেষত্ব নেই তাদের। আলোকে তারা রামধনু করতে পারে না, ডানা পারে। ডানা কাচও নয় ঠিক, দামী হীরের টুকরো। যখনই ডানার সান্নিধ্যে এসেছেন তখনই এটা অনুভব করেছেন তিনি। ওর চোখে শুধু দৃষ্টি নেই—মদিরাও আছে, ওর রূপ শুধু দেহেই নিবদ্ধ নয়—দেহাতীত রূপকথালোকে নিয়ে যাবার শক্তি আছে

তার। ওর কাছে গেলেই মনে হয়, বয়স ক'মে গেছে, দায়িত্বের বোঝা নেমে গেছে মন থেকে, কোনও কিছুর জন্যেই কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আর যেন। মল্লিকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা ভূমিকা রচনা করবার জন্যেই মল্লিককে পাঠিয়েছিলেন তিনি ডানার কাছে। তার কাছে যাবার একটা অজুহাত চাই তো! মল্লিককে সেই অজুহাতের পটভূমিকাটা তৈরি করবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। মল্লিকও সানন্দে রাজি হয়েছিল। ডানাকে, আনন্দবাবুকে, অমরেশবাবুর চিড়িয়াখানাকে, জমিদারকে ছারখার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি। এই মাগীকে (অর্থাৎ অমরেশ-গৃহিণী রত্নপ্রভা দেবীকে) দেখিয়ে দিতে হবে যে, মল্লিক ছাড়া তাঁদের এখানকার জমিদারি অচল। রূপচাঁদ অধীরচিত্তে মল্লিকের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে বাদামী-কালো পাখিটা ডেকে উঠল—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আর একটু দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিলে—গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্ গুপ্-গুপ্।

অদ্ভুত লাগল রূপচাঁদের।

৪

সমস্ত দিন 'লু' চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তবু হাওয়ার তাপ কমে নি। ঘরের বাইরে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট চেয়ার বার ক'রে ডানা ব'সে ছিল চুপ ক'রে। জাহাজে আসবার সময় ইঞ্জিনের কাছাকাছি বসলে যেমন মনে হয়, তেমনই মনে হচ্ছিল তার। জাহাজের কথা মনে হওয়াতে বর্মার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মা-বাবা-ভাইটির কথা। মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর কথা। নিজের মনের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। যারা একদিন তার অত্যন্ত আপন ছিল, আজ তাদের কথা ক্বচিৎ মনে পড়ে। যখন পড়ে তখনও ওদের খুব আপন ব'লে মনে হয় না, মনে হয় ওরা যেন অন্য জগতের লোক, ওদের সঙ্গে আত্মীয়তাটা মানতে হয় যেন নীতিশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। মৃত্যু ছিন্ন ক'রে দিয়েছে অন্তরের যোগ। এখন তার কাছে ঢের বেশী আপন অমরেশবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু (হ্যাঁ, রূপচাঁদের বর্বরোচিত লোলুপতাই যেন বেশী আপন করেছে তাকে), আর ওই ভগ্নকুটিরবাসী সন্ন্যাসী। রত্নপ্রভাকেও খুব ভাল লেগেছে তার। শ্রদ্ধা হয়েছে তাঁর উপর, কিন্তু সত্যিকার ভাল লেগেছে বকুলবালাকে। মন্দাকিনীর কথা শুনেছে সে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপও হয় নি, তবু তিনি আনন্দমোহনবাবুর স্ত্রী—এই পরিচয়টুকুই যেন ওই অচেনা মানুষটিকে আপন করেছে। নিজের লোক পর হয়ে যায়, পরলোক আপন হয়ে ওঠে মনের কি রহস্যময় নিয়মে, কে জানে! যারা চোখের সামনে সদাসর্বদা ঘোরাঘুরি করে, তারা যে সব সময় মনের মতন হয় তা নয়, কিন্তু আপন হয়। মনের মতন লোকও দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে আর আপন থাকে না। ইংরাজীতে প্রবচনই আছে—আউট অব সাইট আউট অব মাইণ্ড। ডানার মনে হ'ল, দৃষ্টিটা শুধু চোখের না ব'লে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বললে যেন আরও ভাল হতো। যা যতক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর তা ততক্ষণ আমার আপন, ভাল হোক মন্দ হোক তা ততক্ষণ আমার অধিকারভুক্ত, যেন আমার আপন সম্পত্তি, তাই তার সম্বন্ধে মমত্ববোধ প্রবল। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, খেই হারিয়ে গেল চিন্তার। মনে হ'ল ওই সন্ন্যাসী হয়তো ব্যাপারটা স্পষ্টতর করতে পারবেন। উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে। সন্ন্যাসীর কাছে যাবার একটা অজুহাত পেয়ে সে যেন ব'র্তে গেল মনে মনে।

ওঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু বিনা কারণে বার বার ওখানে যাওয়াটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হয় নিজের কাছেই। কিছুদূর গিয়ে আবার থেমে গেল সে। মনে হ'ল সন্ন্যাসী হয়তো ভাববেন যে, মিছিমিছি একটা অজুহাত সৃষ্টি ক'রে তাঁর কাছে গিয়েছে সে। একদিন স্পষ্টই যখন বলেছিলেন যে নারীর সান্নিধ্য তাঁর পক্ষে বিষবৎ ত্যাজ্য, তখন এমন ভাবে সেখানে যাওয়া কি উচিত? ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ তার কানে অদ্ভুত শব্দ এল একটা। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর...। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর...। ঠিক মনে হ'ল একটা মারবেল যেন পাকা শানের মেঝেতে প'ড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর গড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল ডানার। মনে হ'ল কোথায় যেন পড়েছে এই রকম ধরনের কি একটা। ঘরে ফিরে এল, আলো জ্বেলে হুইস্‌লারের বইটা ওলটাতে লাগল। একটু পরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল সে। নাইট্‌জার নামক নিশাচর পাখির ডাক ঠিক ওই রকম। হুইস্‌লার লিখেছেন—resembling the sound of a stone skimming over the surface of a frozen pond...নাইট্‌জারের কয়েকটা হিন্দী নামও অমরবাবু লিখে রেখেছেন ডানার চোখে পড়ল। চিপ্‌পাক, ডাবচুরী, ডাভাক্। একটা নামও পছন্দ হ'ল না তার। যে কখানা বই অমরবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন, সবগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল সে। পাখিটার বিশেষত্ব হচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় মুখ, বড় বড় পোকা টপটপ ক'রে গিলে ফেলতে পারে। দাক্ষিণাত্যে এর যা নাম, তার বাংলা হচ্ছে 'ব্যাঙপাখি' মন্দ না নামটা। পাখিটার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ওতে। পঠিতব্য যা কিছু ছিল সব প'ড়ে ফেলে ডানা টর্চ আর অমরবাবুর দেওয়া বাইনাকুলারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। পাখিটাকে দেখতে হবে। শুকনো নদীর খালের কাছে কাছে যেদিকে ঝোপঝাপ আছে, সেই দিকেই এগুতে লাগল। কিছুদুর এগিয়ে গেল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। অনিশ্চিতভাবে কতক্ষণ অগ্রসর হবে? কাছেই একটা উঁচু টিপির মতন ছিল। তারই উপরে উঠে বসল। ব্যাঙপাখি কাছাকাছি যদি থাকে কোথাও সাড়া পাওয়া যাবে ঠিক। অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে।

অনেকক্ষণ ব'সে থাকার পরও কিন্তু ব্যাঙপাখির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ডানা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। দু-একটা নক্ষত্র মিটমিট ক'রে জ্বলছে বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আছে। মেঘ নয়, ধুলো! প্যাঁচার চোখটা মনে পড়ল, অমন স্বচ্ছ চোখ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল মরবার আগে। কিছুতেই বাঁচাতে পারা গেল না পাখিটাকে।

চ্যাঁইস্—

ঠিক মাথার উপর দিয়ে লম্বা-ডানা পাখি উড়ে গেল একটা। ব্যাঙপাখিই বোধ হয়। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। একটু পরেই আবার শুরু হ'ল একটু দূর থেকে—

টুক্ টুক্ টুক্, টুক্ টুক্ টুক্ টুক্, টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুকিররররর...

মনে হ'ল যেন ব্যঙ্গ করছে। নাগালের বাইরে চ'লে গিয়ে খুক খুক ক'রে হাসছে যেন দুষ্ট ছেলের মত। ওদের স্বভাবটাই এই ধরনের। সারাজীবন ধ'রে যেন লুকোচুরি খেলছে সকলের সঙ্গে। দিনের আলোয় পারতপক্ষে বেরোয় না। দিনের বেলা পারিপার্শ্বিকের রঙের সঙ্গে এমন বেমালুম মিলিয়ে দেয় নিজেকে যে, দেখাই যায় না। বাদামী, পাঁশুটে, সাদা আর কালোর বিস্ময়কর সমন্বয়। একটু পরে আর একটা পাখি ডাকল, তারপর আর একটা, তার পর আর একটা। অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা ঐকতান শুরু হয়ে গেল। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট।

অজানা কোন এক জগৎ থেকে ভেসে আসছে যেন আনন্দ-কলরবের প্রতিধ্বনি, একদল ছেলে মার্বেল খেলছে, না হাসছে...?

হঠাৎ নজরে পড়ল, একজন কে যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর শুনতে পেল, গানও করছে গুনগুন ক'রে। টর্চ জ্বালতেই বুঝতে পারল, সন্ন্যাসীই আসছেন। উঠে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী তার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে চলে যাচ্ছিলেন পাশ কাটিয়ে।

"কোথা যাচ্ছেন অন্ধকারে?"—ডানা প্রশ্নটা না ক'রে পারল না।

"ওই বালির চরে যাচ্ছি।"

"ওখানে এত রাত্রে?"

"ওখানেই রাত কাটাব।"

"ওই চরে? একা?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "প্রায়ই তো ওখানে রাত কাটাই।"

"একা ভয় করে না আপনার?"

"একা তো থাকি না। আরও অনেকে থাকে।"

"আর কারা থাকে?"

"এক ঝাঁক টিট্টিভ, কীটপতঙ্গ, একটা প্রকাণ্ড সাপকেও দেখি মাঝে মাঝে। তা ছাড়া আকাশভরা নক্ষত্র, চাঁদ—একা থাকবার কি জো আছে!"

ডানার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল ক'রে উঠল।

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে!"

"তা বেশ, এসো একদিন। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে আমি যা পাই তা পাবে না।"

"কেন?"

"কেউ কাছে থাকলে অনিবার্যভাবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে হয়। মনের খানিকটা তাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, আর তা থাকলেই অনেক জিনিস সে দেখতে পায় না, অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির মৃদু সাড়া শোনা যায় না। বেশ, এসো একদিন। আমি চলি এখন।"

সন্ন্যাসী পুনরায় চরের দিকে অগ্রসর হলেন।

"অন্ধকারে যাচ্ছেন, টর্চটা নেবেন?"

"আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ। টর্চ দরকার হবে না।"

সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন। ডানা দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে।

কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু হ'ল দূর থেকে—টুক্-টুক্-টুক্-টুক্,—টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্—টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ররর...

সমস্ত দিনের 'লু' যে ধুলোকে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল তা বোধ হয় নেমে আসছিল আবার মাটির দিকে। যে আকাশ একটু আগে ঘোলাটে হয়েছিল তা স্বচ্ছ হয়ে আসছে ক্রমশ। নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে দু-একটা। পূর্বদিগন্তেও আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। দিন দুই আগেই পূর্ণিমা গেছে, একটু পরেই চাঁদ উঠবে তারই আয়োজন হচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। আকাশের দিকে চেয়ে যে কথাটা তার প্রথমেই মনে হয়েছিল, তারই একটা নতুন তাৎপর্য নতুন আলোকে যেন তার মনে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রবল ঝঞ্ঝা যে ধুলোকে সবেগে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেছিল, যার প্রাবল্যে আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, একটু আগে পর্যন্ত যা নক্ষত্রদেরও ঢেকে ফেলেছিল,

সে ধুলো আবার মাটিতে নেবে আসছে। আকাশে থাকতে পারল না তারা। আকাশের চিরন্তন অধিবাসীদের কোন ক্ষতিও করতে পারল না। নক্ষত্ররা যেমন ছিল তেমনই আছে, ধুলোরাই নেবে আসছে। জোর ক'রে কিছু করা যায় না। কুকুরকে সিংহাসনে বসালেই সে রাজা হয় না। সহসা আর একটা কথাও মন হ'ল তার সঙ্গে সঙ্গে। ধুলোরা আকাশে বেমানান, কিন্তু মাটিতে তাদের গৌরব। মাটির আসনেই তাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত, প্রতিষ্ঠা অবিসম্বাদিত। যথাস্থানে তাদের মহিমা আকাশের নক্ষত্রদের চেয়ে কিছু কম নয়। তারা আকাশে যেতেও চায় না, ঝড়ে তাদের ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত ক'রে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ডানার মনে হ'ল, মানব-সমাজেও এই ঝড় মাঝে মাঝে এসে সমস্ত বিশৃঙ্খল ক'রে দেয়। তার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল। তারপর মনে হ'ল তার নিজের স্থান কোথায়? সে নামছে, না, উঠছে? প্রশ্নটার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কারণ নামা-ওঠার মানদণ্ডটা ঠিক জানা নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে যা উন্নতি ব'লে মনে হয়, সত্যি তা কি উন্নতি? কে বেশি উন্নত—ওই সন্ন্যাসী, না, অমরবাবু? কল্পনাবিলাসী কবি কথায় কথায় ছন্দ মিলিয়ে কবিতা রচনা করতে পারেন ব'লেই কি উন্নত বলতে হবে তাঁকে? সংসারের সাধারণ বিচারে রূপচাঁদবাবুও তো মন্দ লোক নন। জীবনটাকে তিনি নিজের পছন্দ অনুসারে উপভোগ করতে চান। কে না চায়? কিন্তু রূপচাঁদবাবুকে উন্নত মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলবে কি! সে নিজেই বা কি! বাল্যকাল থেকে নিষ্ঠাভরে নিজের পানের চুনটি আগলানো ছাড়া আর কিই-বা বা সে করেছে! তার লেখাপড়া, সংস্কৃতি, সভ্যতা, বিবিধ আচরণ একটা মাত্র যে জিনিসের উদ্দেশ্যে বিকশিত হয়েছে, সংক্ষেপে তার নাম আত্মবিনোদন। বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ সকলেই আত্মবিনোদনের জন্য ব্যস্ত, প্রত্যেকের পথ শুধু আলাদা। ওই সন্ন্যাসী? তিনিও কি আত্মবিনোদন নিয়েই আছেন!

"টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ররররর..."

আবার শুরু হয়ে গেল 'নাইট্‌জার'দের ঐকতান। পূর্বদিগন্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত হয়ে উঠল ক্রমশ। চাঁদ উঠল। নদীর চরটা স্পষ্ট হয়ে এল। নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল ডানা। তার মনে হতে লাগল একটা সত্য যেন অস্পষ্টভাবে আভাসিত হচ্ছে তার মনের দিগন্তে। কিন্তু কি তার রূপ?

অনেকক্ষণ পরে ডানা যখন তার নিজের বাসায় ফিরে এল তখন সে এতই অন্যমনস্ক যে, বারান্দায় উপবিষ্ট রূপচাঁদকে দেখতেই পায় নি প্রথমে। বারান্দায় চন্দ্রালোকে চেয়ারের উপর যে একজন লোক ব'সে আছে তাই নজরে পড়ে নি তার। খুব কাছাকাছি এসে তাই সে চমকে উঠল রূপচাঁদের কথা শুনে।

"অনেকক্ষণ থেকে তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ।"

ডানার মনে হ'ল, রূপচাঁদ সহসা আবির্ভূত হলেন যেন। তিনি এতক্ষণ যেন অদৃশ্যভাবে ওৎ পেতে ছিলেন, যাদুমন্ত্রবলে কায়া পরিগ্রহ করলেন সহসা। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ব'লে মনে হ'ল যে, চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ল সে কিছুক্ষণের জন্য।

"আপনি!"

"হ্যাঁ গো, আমিই। অনেকক্ষণ থেকে ব'সে মশার কামড় ভোগ করছি। এক প্যাকেট সিগারেট শেষ ক'রে ফেললুম প্রায়। কোথা ছিলে বল তো?"

"গঙ্গার ধারে ব'সে ছিলাম।"

"একা?"

"হ্যাঁ, একা ব'সে নাইট্‌জারের গান শুনছিলাম।"

"নাইট্‌জারটা কি ব্যাপার। মানুষ, না আর কিছু?"

"নিশাচর পাখি একরকম। আপনি এ সময়ে যে?"

ডানার মানসিক স্বচ্ছন্দতা ফিরে এল আবার।

"নিশাচর পাখি সম্বন্ধে মোহ আছে নাকি। শুনে সুখী হলাম। আমিও নিশাচর কি না! আমি এসেছি একটা জরুরী দরকারে। অমরেশবাবুর জমিদারিতে যে খুনটা হয়ে গেছে সেটা সহজে মিটবে ব'লে মনে হচ্ছে না। পুলিশ অমরেশের ম্যানেজারকে আসামী ব'লে সন্দেহ করছে। যে কোনও মুহূর্তে অ্যারেস্ট করতে পারে। আনন্দমোহনকে একটু সাবধান ক'রে দিতে এলাম। ওর এখন একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। ওর বাড়িতে ওকে পেলাম না, ঠাকুরটা অদ্ভুত বাংলায় বললে 'ডেনা মাইজির কাসে গিয়েসেন।' এখানে এসে দেখি, এখানেও কেউ নেই। আনন্দ কি এসেছিল বিকেলে?"

"এসেছিলেন। এসেই চ'লে গেলেন সদরে। বললেন, ওই খুনের মামলা সম্পর্কেই এস. ডি. ও.-র সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"সদরে গেছে না কি! সেরেছে! তা হ'লে তো এতক্ষণ পুলিশের খপ্পরে প'ড়ে গেছে সে। কি মুশকিল! এই কবিগুলোর যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে! উঠি।"

চিন্তিতভাবে উঠে পড়লেন রূপচাঁদ। তাঁর ভয় হচ্ছিল, অভিনয়টা তিনি ঠিকভাবে করতে পারছেন কি না! ডানাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। খবরটা শুনে সত্যিই শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে।

"পুলিশ তাঁকে অ্যারেস্ট করেছে নাকি!"

"করাই সম্ভব। এস. পি. দারোগাকে যে রকম কড়া হুকুম দিয়েছে, তাতে তাই তো মনে হয়।"

"কে খুন হয়েছে?"

"একটি স্ত্রীলোক।"

"স্ত্রীলোক? তার সঙ্গে আনন্দবাবুর সম্পর্ক কি?"

"তা কি ক'রে বলব বল? কার সঙ্গে কোথা দিয়ে কার যে কি সম্পর্ক থাকে বলা শক্ত। পুলিশ আর আদালতে সেটা নির্ণয় করবে। আনন্দমোহনের সই-করা একটি চিঠি নাকি পাওয়া গেছে মেয়েটির ঘরে।"

"কি চিঠি?"

"নোটিশ একটা। মেয়েটি বিধবা এবং যুবতী। তার কিছু জমি আছে এঁদের জমিদারিতে। খাজনা বাকি অনেক দিনের। তাই সম্ভবত ম্যানেজার হিসাবে আনন্দমোহন বাকি খাজনার জন্য নোটিশ দিয়েছিল। কিন্তু কবি কিনা, তাই নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছে—নোটিশের ভাষাটা স্বভাবতই রুক্ষ, কিছু মনে ক'রো না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল, যদি চাও তো খাজনা কিছু মাপও ক'রে দিতে পারি।' এই চিঠি পাওয়ার দু দিন পরেই তার রক্তাক্ত লাস পুকুরধারে আবিষ্কার করেছে পুলিশ। তারপর তার ঘর থেকে বেরিয়েছে ওই চিঠি। পুলিশ সন্দেহ করছে নানারকম। আমি উঠি। খবরটা পেলে তোমাকে জানিয়ে যাব।"

রূপচাঁদ বাইক এনেছিলেন। মুচকি হেসে বাইক চ'ড়ে চলে গেলেন।

·

অনেক রাত্রে বাইকের ঘণ্টার ঝঞ্ঝনায় ঘুম ভেঙে গেল ডানার। বিছানায় উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সেই রইল। নিদ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি যে অবস্থাটা মানুষকে

অসহায় ক'রে ফেলে, কয়েক মুহূর্ত সেই অবস্থায় অসহায় হয়ে ব'সে রইল ডানা। বাইকের ঘণ্টার শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। ঝিল্লীধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'ল যেন। তারপর পদশব্দ পাওয়া গেল বারান্দায়।

"ডানা, ডানা—"

রূপচাঁদবাবুর গলা।

কাপড়-চোপড় সামলে উঠে দাঁড়াল ডানা। পিছনের ঘরে চাকরটা থাকে, তাকে উঠিয়ে দিলে।

"দেখ্ তো, বাইরে কে ডাকছে।"

চাকরকে দেখে রূপচাঁদ হতাশ হলেন একটু, কিন্তু সপ্রতিভভাবে বললেন, 'মাইজি কোথা? তাঁকে ডাক্, জরুরী দরকার আছে।"

ডানা বেরিয়ে এল।

"আনন্দবাবুর খবর পেলেন কিছু?"

"পেয়েছি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে, 'বেল' দেয় নি।"

"কোথায় তিনি এখন?"

"জেলে।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তার দিকে, সেই দৃষ্টিটা যেন ধাক্কা মেরে সম্বিত ফিরিয়ে দিলে তার।

"কি উপায় করা যায় তা হ'লে এখন?"

"সেইটে ঠিক করবার জন্যেই তো এলাম এত রাত্রে। কাল আমার আপিসের নানান ঝামেলা, সময় পাব না। চল, বসা যাক কোথাও। চা খাওয়াতে পারবে কি একটু? এই, জগন্নাথের দোকান চিনিস? তাকে উঠিয়ে আমার জন্য এক প্যাকেট কাঁইচি নিয়ে আয় তো। আমার নাম করলেই দেবে।"

পকেট থেকে পয়সা বার করে চাকরটাকে দিলেন তিনি। চাকরটা চ'লে যাচ্ছিল। ডানা তাকে থামিয়ে বললে, "শোন্। আমাদের নায়েব মশাইকেও ডেকে নিয়ে আয়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

ঘরের কোণে যে কমানো লণ্ঠনটা ছিল সেটা উস্কে দিয়ে টেবিলের উপর রাখলে সে, তারপর চিঠির প্যাডটা টেনে লিখলে—

হরসুন্দরবাবু,

এইমাত্র রূপচাঁদবাবু খবর এনেছেন যে, আনন্দমোহনবাবুকে নাকি পুলিসে ধরেছে। রূপচাদবাবু এখানে ব'সে আছেন। আপনি অবিলম্বে চ'লে আসুন।

ইতি—ডানা

চাকরটা চিঠি নিয়ে চ'লে গেল।

রূপচাঁদ বললেন, "অত ব্যস্ত হ'য়ো না। হরসুন্দরকে বৃথা ডেকে পাঠালে। হাত কচলানো ছাড়া আর কি করবে ও?"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে চায়ের টেবিলে দাঁড়িয়ে সে স্টোভটা জ্বালাতে গেল। স্পিরিটের স্বচ্ছ নীল শিখাটার দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ চমকে দেখলে রূপচাঁদ তার কাঁধের উপর হাত রেখেছেন। কখন যে নিঃশব্দচরণে এসেছেন তিনি, তা ডানা বুঝতে পারে নি। তার সমস্ত মুখটা কঠিন হয়ে উঠল।

খুব ধীরভাবেই কিন্তু হাতটা সে সরিয়ে দিলে, খুব সংযতকণ্ঠেই বললে, "এ সব কি?" ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

রূপচাঁদ বেরিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ তিনি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে ফেললেন একটা। হাত জোড় ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আত্মসম্বরণ করতে পারি নি। মাপ কর আমাকে।"

"ছি ছি, কি করছেন আপনি, উঠুন।"

'বল, আমাকে মাপ করেছ?"

"যার শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে সে-ই মাপ করতে পারে। আমার কাছে মাপ চেয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছেন কেন? আপনিই বরং মাপ করুন, আমি অসহায়।"

রূপচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, "আমার কথাটা তোমাকে বোঝাতে পারছি না ঠিক। একটু যদি ভেবে দেখ—একটু যদি অনুকম্পাসহকারে ভেবে দেখ—তা হ'লেই বুঝতে পারবে, সবচেয়ে অসহায় আমি। বাঘ বা সিংহের কবলে প'ড়ে লোকে যেমন ছটফট করে, আমিও তেমনিই একটা হিংস্র আবেগের কবলে প'ড়ে ছটফট করছি। তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারে না।"

ডানার নারীত্ব হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হ'ল এ কথা শুনে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হ'ল সে। সত্যিই তো, লোকটাকে সে মারতে কিংবা বাঁচাতে পারে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নির্দেশে বাঁদরের মত নাচাতেও পারে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। ঠিক এই ঘটনাটা যদি কোন আধুনিক বিদেশী ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মূর্ত হ'ত, কি করতেন তিনি! যা করতেন তা ডানার অবিদিত নেই, রূপচাঁদবাবুরও নেই সম্ভবত, তাই তিনি নাটকীয় ঢঙ ক'রে ব্যাপারটাকে সেই সম্ভাব্য পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। অথাৎ উনি ধ'রে নিয়েছেন (এবং আধুনিক বাস্তববাদী কবিরা এবং বিজ্ঞানীরা ওঁর এই ধারণাটাকে সমর্থনও করেছেন) যে, নারীকে পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিতে হবেই—ওইটেই তার সহজাত প্রবণতা এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করলেই সমস্ত আর্ট, সমস্ত বিজ্ঞান, এক কথায় আধুনিক সমস্ত চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সতীত্ব বা সংযমের, শ্লীলতার বা শালীনতার কোন মূল্য নেই, থাকা উচিতও নয় যেন'! যে যত বেপরোয়াভাবে উলঙ্গ হতে পারবে সে তত আধুনিক, সে তত আর্টিস্টিক। নারী মানেই পুরুষের লালসা-বহ্নির ইন্ধন, অন্য রকম কিছু হ'লেই যেন সে বেমানান। তাকে নানা রঙে রঞ্জিত হতে হবে, নানা ঢঙে সজ্জিত হতে হবে—ওই একই উদ্দেশ্যে। বিদ্যুদ্বেগে কথাগুলো মনে হ'ল তার, নিমেষে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত আগে যে উদ্বুদ্ধ নারীত্ব তাকে বরপ্রদা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়েছিল, এই নতুন আলোক সেই উদ্বুদ্ধ নারীত্ব কামাতুরা কুক্কুরীর রিরংসারই সমপর্যায়ভুক্ত ব'লে মনে হ'ল তার।

"আপনি এ ছাড়া যদি অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে না পারেন, তা হ'লে আমাকে চ'লে যেতে হবে এখান থেকে।"

"অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করা কি সম্ভব এখন?"

"চললুম তা হলে।"

রূপচাঁদবাবুর বাইকটা পাশেই ঠেসানো ছিল। ডানা হঠাৎ সেইটেতে চ'ড়েই বেরিয়ে গেল। বিস্মিত রূপচাঁদ তার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। পর-মুহূর্তেই তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন—কোথায় গেল ও? কোথায় যাওয়া সম্ভব? মাথা হেঁট ক'রে ভাবলেন একটু। তারপর ধীরে ধীরে পদচারণ করতে

লাগলেন। তারপর চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন একটা। ঘড়ি দেখলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে চেয়ারে এসে বসলেন আবার। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগলেন পায়ের পাতাটা। ঠিক করলেন, অপেক্ষাই করবেন। হঠাৎ মনে পড়ল, ডানা চা তৈরি করছিল। উঠে ঘরের ভিতর গেলেন। আবার স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করলেন। দু কাপ করলেন! এক কাপ নিজে খেলেন, আর এক কাপ ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। ঘড়িটা দেখলেন আবার। আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। এখনও ফিরল না?' ভ্রূযুগল আবার কুঞ্চিত হ'ল। বাইরের চেয়ারে গিয়ে বসলেন আবার। আবার পায়ের তলাটা নাচাতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর আবার পায়চারী শুরু করলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘড়ি দেখলেন, আরও মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। কোথায় গেছে ডানা? মনে হ'ল, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন অন্ধকারে। বেশিদূর যেতে হ'ল না। দেখলেন, তাঁর বাইকটা একটা গাছে ঠেসানো রয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হরসুন্দরবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখলেন, ডানাও তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছে। রূপচাঁদের দিকে চেয়ে খুব সপ্রতিভভাবে হেসে ডানা বললে, 'খবরটা পেয়ে আমি নিজেই ছুটে গিয়েছিলাম হরসুন্দরবাবুর কাছে। ভাগ্যে গিয়েছিলাম। উনি বাড়ি ছিলেন না। চাকরটা এই খবর নিয়ে ফিরে আসছিল। আমি বাড়ির ভিতর গিয়ে ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, উনি সিংহি মশায়ের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন, সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে এলাম ওঁকে। আমি ওঁকে এখনই সদরে চ'লে যেতে বলছি—"

হরসুন্দরবাবু বিপন্ন মুখে রূপচাঁদের দিকে চাইলেন।

বললেন, "এখন গিয়ে লাভ কি। কাল সকালের ট্রেনেই যাব না হয়। এখন গিয়ে কারু সঙ্গে দেখা হবে কি?"

ডানা উত্তেজিত হয়েছিল। বললে, "জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যচ্ছি—ক'টায় ট্রেন?"

হরসুন্দর আরও বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।

"ক'টায় ট্রেন বলুন না?"

রূপচাঁদ এতক্ষণ স্মিতমুখে চুপ ক'রে চেয়ে ছিলেন।

বললেন, "আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট একজন বাঙালী ভদ্রলোক। তুমি যদি যাও, সঙ্গে সঙ্গে 'বেল' দিয়ে দেবেন। তবে ট্রেনে গিয়ে সুবিধে হবে না, যদি বল রামেশ্বর বাবুর মোটরটা যোগাড় করি। অনুরোধ করলে এখনই পাঠিয়ে দেবেন। হরসুন্দরবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? আমিই চল না হয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তবে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আজ তো আর তাকে ছাড়বে না।"

ডানা বললে, "বেশ, কাল সকালেই যাব তা হ'লে। হরসুন্দরবাবুর সঙ্গেই যাব। আপনার তো আপিস আছে।"

রূপচাঁদ বললেন, "তা আছে। তবে দরকার হ'লে ছুটিও নেওয়া যায়। কাল দিনের ট্রেনে যদি যাও, আমার অবশ্য যাওয়ার দরকারই হবে না। আমি বরং এস. পি. কে বলব একবার।"

"তা হ'লে তাই ঠিক রইল। চলুন হরসুন্দরবাবু, আপনার গিন্নী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ফুলুরি ভাজা খাওয়ার জন্যে। রাতের খাওয়াটা আপনার ওখানেই সারব আজ।"

"চলুন চলুন। বেশ তো, খুব আনন্দের কথা।"

হরসুন্দরের মুখের বিপন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল। ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রূপচাঁদকে নমস্কার ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। রূপচাঁদ তাদের প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৫

হরসুন্দরবাবুর বাড়ি থেকে ডানা যখন বেরুল, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। চাঁদ উঠেছে। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। হরসুন্দরবাবু একটা চাকর আর একটা টর্চ সঙ্গে দিয়েছিলেন। কিছুদুর এসে ডানা চাকরটাকে বললেন, 'তুমি শোও গে যাও। টর্চটা সঙ্গে থাকলেই আমি চ'লে যেতে পারব।" চাকর চ'লে গেল। ডানা টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল, অর্থাৎ চিন্তা করতে লাগল, এখন কোথায় যাওয়া যায়। হঠাৎ ঠিক করলে, নিজের বাসাতেই ফিরে যাবে। রূপচাঁদবাবুর ভয়ে গৃহত্যাগী হতে হবে নাকি। দেখাই যাক না ভদ্রলোকের দৌড় কতদূর। ফিরে এসে দেখলে, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর কেউ কোথাও নেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন হতাশ হ'ল একটু। মনের নিভৃত প্রদেশে কে যেন আশা ক'রে বসেছিল যে, রূপচাঁদবাবু তার অপেক্ষায় এখনও অধীরভাবে পায়চারি করছেন মাঠে। তার পায়ের সাড়া পেয়ে চাকরটা উঠে বসল।

'রূপচাঁদবাবুর চাকর এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। জবাবের জন্যে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল, এই একটু আগেই চ'লে গেল।"

খামটা নিয়ে ডানা ঘরে ঢুকে পড়ল। লণ্ঠনটা উসকে চিঠিটা হাতে ক'রে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। কি লিখেছেন ভদ্রলোক! যা লেখা সম্ভব তা তার অজানা নেই...হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। অনেকদিন আগে কথাটা সন্ন্যাসী বলেছেন। হাসিমুখেই বলেছিলেন—'ওই রূপচাঁদবাবুর লালসা তোমার মনকেও প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করে নি, আতঙ্কিত করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্খারই আর একটা রূপ। যে লালসা ওঁর মনে জেগেছে তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশী হতে...।'

খামটা ছিঁড়তেই কয়েকখানা নোট বেরিয়ে পড়ল, আর একট টুকরো কাগজ। রূপচাঁদবাবু লিখেছেন—

ডানা,

একটু আগে ঠিক করেছিলাম, তুমি না ডাকলে আর তোমার কাছে যাব না। সে সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতে হ'ল। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল সকালে তুমি সদরে যাবে আনন্দমোহনের 'বেল' নেবার জন্যে। তোমার হয়তো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি জানি পুলিস সংক্রান্ত ব্যাপারে টাকা জিনিসটা দরকারী, তালা খুলতে হ'লে চাবি যেমন দরকারি। তোমার হাতে টাকা আছে কি না আমার জানা নেই। তাই আমার কাছে যা ছিল পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে ফেরত দিও। আমি নিজে পুলিস আপিসের বড়বাবু, আমার দ্বারা যতটা করা সম্ভব, বলা বাহুল্য, তা আমি করব নিশ্চয়ই ; কিন্তু একটা কথা ভেবে মনে হচ্ছে, ব্যর্থকাম হব। পুলিশ যেখানে টাকার গন্ধ পায় সেখানে শুষ্ক খাতিরে কাজ করে না। অমরেশবাবু বড় জমিদার, তাঁর ম্যানেজারকে তারা ফাঁসিয়েছে। অত বড় রুইকে তারা শুধু হাতে ছেড়ে দেবে ব'লে মনে হয় না। তবে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিজে যদি যাও, বঁড়শিটা হয়তো খুলে যেতে পারে। ইতি—

আর সি.

ডানা গুনে দেখলে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল নোটগুলোর দিকে। তারপর সেগুলো আর একটা খামে পুরে খামটা ভাল ক'রে জুড়ে দিলে। চাকরটাকে উঠিয়ে বললে, "জবাবটা রূপচাঁদবাবুকে দিয়ে আয়। চিঠিটা তাঁর হাতেই দিবি।"

চাকরটা ফিরে এল একটু পরে। দেখলে ঘরের কপাট বন্ধ। ভাবলে, মাইজি বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন। সে যদি ভাল ক'রে দেখত তা হ'লে বুঝতে পারত যে, কপাটে খিল বন্ধ নেই, বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। ডানা বেরিয়ে গিয়েছিল চরের দিকে।

ডানা টর্চটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু টর্চের দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে চরে। সে যে ঠিক সন্ন্যাসীর সন্ধান করছিল তা নয়, রূপচাঁদের ভয়ে ভীত হয়ে সে যে পলিয়ে এসেছিল তাও ঠিক নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তর্ক করছিল নিজের সঙ্গে। অতীতে যে জীবনকে সে পিছনে ফেলে এসেছে, সে জীবনেরই পুনরাবৃত্তি তার ভবিষ্যৎ জীবনে কি ক'রে আবার হবে, আবার নতুন ক'রে ভদ্রভাবে কোথায় সংসার পাতবে—এই অতি স্বাভাবিক চিন্তাটাও তার মনে সজাগ হয়েছিল না, কখনও থাকতও না। খরস্রোতা জীবননদীর তীরে ছোট্ট একটি গাছের মত বেড়ে উঠেছিল সে, হঠাৎ ধস ভেঙে প'ড়ে গেছে নদীর স্রোতে। যে শিকড় আগে স্থাণু মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করত, তা এখন করছে বহমান স্রোতের জল থেকে। প্রথমে কষ্ট হয়েছিল, এখন আর হয় না। ভেসে চলাটাকেই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভেসে এসেছে নতুন জগতে। নতুন জগতের বিজ্ঞানী, কবি, রূপচাঁদ, সন্ন্যাসীকে ঘিরে ঘিরে স্রোতাবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, দাঁড়াতে পারছে না। অস্থির মনও স্বপ্ন রচনা করে। তার মনও করছিল। বিজ্ঞানীকে, কবিকে এবং রূপচাঁদকে কেন্দ্র ক'রে তিন রকম স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছিল তার কল্পনা, যদিও জ্ঞাতসারে তার মনে হচ্ছিল অন্যরকম। মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীই বুঝি তার স্বপ্নের খোরাক জোগাচ্ছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে ঘিরে কোন বিশিষ্ট স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে ওঠে নি তার মনে। সে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবার উপাদানই পায় নি। ঘুরে ঘুরে তার কাছে এসেছে কিন্তু কিছুই সহ্য করতে পারে নি। অমরেশবাবুকে ঘিরে যে স্বপ্নলোক সে সৃষ্টি করেছিল শ্রদ্ধাই তার প্রধান উপকরণ, কবিকে ঘিরে যে জগৎ সে সৃষ্টি করেছিল তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ছিল কিছু অনুকম্পা, রূপচাঁদের জগতে ছিল রিরংসা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ছিল কেবল কৌতূহল। নিছক কৌতূহল নিয়ে স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করা যায় না, স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করবার জন্যও উপকরণ চাই, কৌতূহল সে উপকরণ সংগ্রহের প্রেরণা মাত্র দিতে পারে। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে যে কৌতূহল জেগেছিল, সে কৌতূহলও সব সময়ে একাগ্র থাকতে পারছিল না। চরে এসে সে সন্ন্যাসীকে খুঁজছিল না। আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ সন্ন্যাসী যে এখানে কোথাও আছেন এই ধারণাটা মনের প্রচ্ছন্নলোকে অস্পষ্টরূপে আভাসিত হচ্ছিল, একটা আবছা প্রত্যাশাও ছিল—হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জ্যোৎস্নালোকিত চরটাই কিন্তু পেয়ে বসেছিল তার মনকে। একটা অপরূপ আবির্ভাব যেন তার সমস্ত চৈতন্যকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। জ্যোৎস্না সে আগে অনেকবার দেখেছে, চরও দেখেছে, কিন্তু গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার সঙ্গে আকাশ-ভরা নির্মল জ্যোৎস্না আর দিগন্ত-বিস্তৃত শুভ্র চরের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কখনও সে দেখে নি। আকাশ যেখান চক্রবালরেখাকে স্পর্শ করেছে সেই দিকেই স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। সমস্ত জোৎস্না যেন তারস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠল। কলরব করতে করতে চরের উপর পাখি

উড়তে লাগল, মনে হ'ল চরটাই বুঝি বহু পক্ষীর রূপ ধ'রে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আগমনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল। একটা বালুস্তূপের আড়ালে বসে ছিলেন তিনি, উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল। পাখিদের এই হঠাৎ চাঞ্চল্য কেন জানবার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ডানাকে তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু এগিয়ে এলেন না, কোন সম্ভাষণও করলেন না। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডানাই এগিয়ে এল।

"ও, আপনি এখানে ব'সে আছেন বুঝি? আপনাকে দেখতেই পাই নি। পাখিগুলোকেও দেখতে পাই নি। ওগুলো টিট্টিভ মনে হচ্ছে।"

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, টিট্টিভই। তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছি।"

"ভাব ক'রে ফেলেছেন?"

"তোমার সঙ্গেও ভাব হয়ে যাবে যদি ওরা বোঝে যে, তুমি ওদের হিতৈষী।"

"সেটা কি ক'রে বোঝাব ওদের?"

"আপনিই বুঝবে। মন অন্তর্যামী।"

"তা হ'লে এখনই বোঝা উচিত ছিল। আমি তো ওদের কোনও অনিষ্ট চিন্তা কবি নি।"

"কিন্তু তোমার মত চেহারাওলা অনেকে করেছে। এই সেদিনই ভোরবেলা নৌকো ক'রে শিকারীরা এসেছিল হাঁসের সন্ধানে। হাঁসেরা অনেক আগেই চ'লে গেছে, অনর্থক কতকগুলো টিট্টিভকে মারলে ওরা।"

"মানা করলেন না আপনি?"

"মানা করলে শোনে না কেউ। উপদেশও শোনে না। সবাই আপন প্রবৃত্তি অনুসারে চলে। আমাকে তুমি যদি বল, আপনি এমন ছন্নছাড়া জীবনযাপন করছেন কেন, বিয়ে ক'রে সংসারী হোন—তোমার এ উপদেশ আমি শুনব না।"

"সত্যিই, এই ছন্নছাড়া জীবন ভাল লাগে আপনার?"

সন্ন্যাসী হাসলেন একটু।

তারপর বললেন, "ব'স। একটু আগে তুমি একটা অদ্ভুত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছ। না জেনেই করেছ বোধ হয়। ব'স, সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাক। আলোচনা করলে ব্যাপারটা আমার কাছেও বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পরিবেশটাও মনোমত হয়েছে। ব'স।"

এই ব'লে চুপ ক'রে গেলেন তিনি। তলিয়ে গেলেন যেন কোথায়। তারপর বসলেন আস্তে আস্তে। ডানাও বসল। অনেকক্ষণ কোনও কথা হ'ল না। নীরবতা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ডানার।

বললে, "পাখিগুলো এইবার থিতিয়ে বসেছে। খুব কাছেই বসেছে অনেকগুলো। ও-রকম ক'রে বসেছে কেন?"

"ডিম পেড়েছে ওরা। ডিমে তা দিচ্ছে। রাত্রেই ওরা ডিমে তা দেয়। দিনে বড় একটা বসতে দেখি না। দিনের বেলা নদীর ওপর উড়ে উড়ে মাছ ধরে খালি।"

"ওদের ডিম দেখেছেন আপনি?"

"হাত দিয়ে তুলে দেখি নি, দূর থেকে ব'সে ব'সে দেখেছি। দিনের বেলা আমিই তো ওদের ডিম পাহারা দি।"

নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে ডানা বললে, "ওরা বালির খাঁজে খাঁজে ডিম পাড়ে, নয়?"

"হ্যাঁ। কি ক'রে জানলে তুমি? এসেছিলে নাকি কোন দিন?"

"বইয়ে পড়েছি। ওরা দিনের বেলা ডিমে তা দেয় না কেন জানেন? রোদে বালি এত তেতে যায় যে তা দেবার দরকারই হয় না। ওদের ডিম পাহারা দেবারও দরকার নেই, বালির সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।"

"ওদের দরকারের জন্যে পাহারা দিই না, পাহারা দিই নিজের প্রয়োজনে। আমি যে ওদের বন্ধু সেটা ওদের বোঝার জন্যে। ওরা সেটা বোঝে। সেদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল।"

"কি?"

"ওই যে উঁচু বালির ঢিপিটা দেখছ, তার ওপারে কয়েক জোড়া বেশ বড় ধরনের টিট্টিভ আছে। টিট্টিভই বোধ হয়, বেশ বড় ঠোঁট, পিঠ আর ডানার উপরটা কালচে বাদামী, জলের ঠিক ওপর দিয়ে দিয়ে উড়ে যায়।"

"বুঝেছি, বোধ হয় স্কিমার (Skimmer)।"

"তা হবে। ওদের বাচ্চা হয়েছে ওখানে। দুপুরে ব'সে আছি সেদিন, হঠাৎ দু-তিনটে পাখি উড়ে এল, এসে আমার মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করতে লাগল। প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। তারপর মনে হ'ল, পাখিগুলো আমাকে বোধ হয় বলতে চাইছে কিছু। উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দাঁড়াতেই পাখিগুলো আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে ওই ঢিপিটার দিকে উড়তে লাগল। মনে হ'ল, আমাকে যেন ইঙ্গিত করছে অনুসরণ করতে। অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি, একটা সাপ ওদের একটা বাচ্চাকে ধরেছে। তাড়া দিলাম, নড়ল না। তখন বাধ্য হয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে মারতে হ'ল সাপটাকে।"

"কি সাপ?"

"কোনও চেনা সাপ নয়।"

"আহা, কেন মেরে ফেললেন বেচারীকে! ও তো কোনও দোষ করে নি, নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল।"

"আর্তকে রক্ষা করা কর্তব্য—শাস্ত্রের এই উপদেশ। ভৃগুপত্নী আর্ত দৈত্যদের রক্ষা করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন।"

"ভৃগুপত্নী মানে?"

"শুক্রের মা।"

"তাই বুঝি শুক্র দেবতাদের ওপর চটা?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আসল প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছি।"

"বলুন।"

"আমার মনে হচ্ছে, ব'লে কিই বা হবে! ভাবের সমুদ্রে কত বুদ্বুদই তো উঠছে, প্রত্যেকটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়ও না, প্রকাশ করবার দরকারও নেই।"

"না না, বলুন তবু।"

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই রইলেন। নীরবতাটা আবার পীড়া দিতে লাগল ডানাকে।

"বলুন না, কি বলতে চাইছিলেন!"

'তুমি তখন বললে, মন অন্তর্যামী, কিন্তু সে এক নজরে বন্ধু বা শত্রুকে চিনতে পারে না কেন? কেন ভয় পায়, কেন সন্দেহের চক্ষে দেখে, কেন যাচিয়ে নিতে চায়? ওটা একটু অদ্ভুত রহস্য। ওর আসল উত্তর কি জান? অর্ন্তযামীর শত্রু কেউ নেই, মিত্রও কেউ নেই, কারণ, এই নিখিল বিশ্বই অন্তর্যামী। সে-ই সব, তার আবার শত্রু মিত্র কি? তোমার ডান হাতটা কি তোমার মিত্র, না তোমার ডান পাটা তোমার শত্রু? ডান হাতেও তোমার, ডান পাও তোমার, তুমিই সবটা। তেমনই বাইরে যা কিছু দেখছ, সবই অন্তর্যামী, তিনিই প্রকাশিত হয়েছেন নানা রূপে, তাঁর কাছে ভেদাভেদ নেই কিছু।"

"তা হ'লে আমাদের মধ্যে যে অন্তর্যামী আছেন, তিনি একজনকে শত্রু, একজনকে মিত্র মনে করেন কেন?"

"ওইটেই তাঁর খেলা। অনেকে বলেন—লীলা।"

"তার মানে?"

"তিনিই যুধিষ্ঠির, তিনিই দুর্যোধন, তিনিই বেদব্যাস, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রই তিনি। এ না হ'লে মহাভারতের কাব্য জমত না। মহাকবি তিনি, অনন্ত তাঁর কাব্য, সে কাব্যের প্রতি ছত্রে নিজেকেই মূর্ত করছেন তিনি নানা ভাবে, নানারূপে, নানাছন্দে।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আমিও পারি না। আভাসে যতটুকু বুঝেছি বললাম। হয়তো ভাল ক'রে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কারণ ঠিক বুঝি নি। বুঝতে পারলেই তো মুক্তি!"

"কি বুঝতে পারলে?"

"যে তুমিই সেই।"

আবার নীরব হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। ডানাও চুপ ক'রে রইল।

মনে হতে লাগল, একটা অসীম পাথার যেন থৈ-থৈ করছে চারিদিকে।

৬

কবি হাজতে গিয়ে মন্দ ছিলেন না। তাঁর বিবেকে কোন গলদ ছিল না, মনে তাই কোন অশান্তিজনক আশঙ্কা জাগে নি। তিনি যে অবিলম্বে ছাড়া পেয়ে যাবেন—এ বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। পুলিসের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে এবং অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অভিনব পারিপার্শ্বিকে নীত হয়ে বরং একটু মজাই লাগছিল তাঁর। কোনও অদৃশ্য বিধাতা তাঁকে যেন দৈনন্দিন একঘেয়েমির বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতলোকে এনে হাজির ক'রে দিলেন, রূপকথার হারুন অল-রসিদ যেমন দিয়েছিলেন আবু হোসেনকে। আর একটা কথা ভেবেও পুলিকিত হচ্ছিলেন তিনি। ডানা নিশ্চয়ই খবরটা পাবে, পেয়ে উতলাও হবে নিশ্চয়। উতলা হয়ে জানলার গরাদ ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবার মেয়ে সে নয়, কিছু একটা করবেই। কি করবে, কি করা সম্ভব? কল্পনা নানা রকম ছবি আঁকছিল। মশগুল হয়ে এক-একটা ছবির দিকে চেয়ে দেখছিলেন তিনি। ডানা কি রূপচাঁদের শরণাপন্ন হবে? অমরেশবাবুকে টেলিগ্রাম করবে? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা হওয়াতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মন্দাকিনীকে খবর দিয়ে দেবে না তো? তা হ'লে কিন্তু হুলুস্থুল বেধে যাবে। মন্দাকিনীর ঠিকানা অবশ্য ডানার জানা নেই। রূপচাঁদ জানে। চিন্তিত হয়ে হাঁটু দোলালেন খানিকক্ষণ। চিন্তার অন্তরালেও কিন্তু একটা পুলকের স্রোত ফল্গুর মত বইছিল। ডানা যা-ই

করুক, তাঁকে নিয়েই যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—উঠেছে নিশ্চয়ই—এই ধারণাটা পুলকিত ক'রে তুলেছিল তাঁকে।

যে ঘরটায় ছিলেন তিনি, সে ঘরে জানলা ছিল একটা। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নীল আকাশ। নীল আকাশের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল একটা গাছের কঙ্কাল। পাতা সব ঝ'রে গেছে। যে শাখা-প্রশাখাগুলি অসংখ্য সবুজ পত্রকে আঁকড়ে ধরেছিল তারা আজ রিক্ত। একটি পাতাও নেই। গাছের শীর্ষদেশে ব'সে আছে এক গোদাচিল। খানিকক্ষণ চিলটার দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে ভাব জাগল। একটা ছোট খাতা আর পেন্সিল তাঁর পকেটে সর্বদা থাকত। বার ক'রে লিখতে লাগলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

যে নিগূঢ় মিল আছে ছবি আর পটভূমিকায়
ফুটিবে তা কোন্ বর্ণে কার তুলিকায়?
পিছনে আকাশ গাঢ় নীল,
এই পটভূমিকায় গাছের কঙ্কাল আঁকা
শিরে তার ব'সে আছে চিল।
তীক্ষ্ণ নখ-চঞ্চুবান ব'সে আছে অশঙ্কিত হিয়া
তাম্রবর্ণ পক্ষ দুটি সূর্যালোকে উঠে ঝলসিয়া,
শক্তি-দৃপ্ত অকুণ্ঠিত মহিমার প্রতীক যেন সে,
দৃষ্টি তার প্রশ্ন করে এখনও কেন সে
পায় নি শিকার ;
গাছের কঙ্কাল কিম্বা আকাশের নীল বর্ণ
চিত্তে তার তোলে নি বিকার
আমি কবি, আমি শুধু মুগ্ধ নেত্রে হেরি এই ছবি
মনে মনে খুঁজি সেই মিল
রিক্ত-বৃক্ষ, ক্ষুব্ধ-চিল, নির্বিকার আকাশের নীল
যে মিলে মিলিত হ'লে খুলে যাবে সমস্যার খিল।
স্বপ্নে দেখি যেন এক নতুন ধরণী,
নূতন নদীর স্রোতে ভেসে চলে নূতন তরণী ;
আরোহী ওরাই
আকাশের নীল আর গাছের কঙ্কাল আর ওই চিলটাই ;
সে তরীতে আমিই নাবিক
কোন ঘাটে ভিড়িব যে তাও যেন জানি আমি ঠিক।

কবিতাটা লেখা শেষ ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। নতুন ধরণীর নতুন নদীস্রোতে ভাসতে ভাসতে চ'লে গেলেন কোথায় যেন। হঠাৎ চমক ভাঙল, জানলার ঠিক নীচেই খুব চেনা পাখি ডেকে উঠল একটা। ছোটছেলেরা 'টু' শব্দ ক'রে যেমন লুকোয়, অনেকটা তেমনি মনে হ'ল তাঁর। মনে হ'ল তাঁকে ডেকে যেন বলছে—কি যা-তা ভাবছ তুমি! আমি এত কাছে রয়েছি দেখতে পাচ্ছ না! কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঠিক নীচেই কুন্দফুলের ঝাড় রয়েছে একটা। আর কিছু দেখতে পেলেন না প্রথমে। একটু পরেই পেলেন। দরজিপাখি একটি, কুন্দ-ঝাড়ের নিচের ডালটিতে ব'সে আছে, ডালটি দুলছে, একফালি রোদ এসে পড়েছে তার ওপর। দরজিপাখিকে একাধিক

বার দেখেছেন তিনি ইতিপূর্বে, তার নানারকম ডাক শুনেছেন, তার পাতায় পাতায় সেলাই-করা বাসাও দেখেছেন—সংগ্রহ করা আছে একটি অমরেশবাবুর মিউজিয়মে ; কিন্তু এত কাছে, এমন ঘনিষ্ঠভাবে দরজিপাখিকে দেখবার সুযোগ তিনি পান নি। বইয়ে যেন বর্ণনা পড়েছিলেন তা মনে করবার চেষ্টা করলেন। বইয়ে লেখা আছে 'অলিভ গ্রীন' রঙ, লালচে পা, ছোট্ট মুখ, ছোট ঠোঁট, গলায় কালো কণ্ঠি। সবই মিলে যাচ্ছে। হঠাৎ ল্যাজটা সোজা খাড়া হয়ে উঠল পিঠে ওপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'টোয়িট্' 'টোয়িট্'! 'টোয়িট্' শব্দ ক'রে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল দরজি পাখি। বোঝা গেল, কবিকে দেখতে পেয়েছে এবং চটেছে। 'স্পাই'কে পাখিরাও ঘৃণা করে। কবির মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি, ছোট নাতির কাণ্ড-কারখানা দেখে দাদামশায়ের মুখে যেমন ফোটে। খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে, এঁকেবেঁকে নানারকমে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাখিটিকে আর দেখতে পেলেন না। একুট দূরে ডাক শোনা গেল—পীপ্ পীপ্ পীপ্। ঠিক এর পরই কবি বুঝতে পারলেন, বন্দীত্বের দুঃখটা কোথায়! তার ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে গিয়ে পাখিটার খোঁজ করেন ; কিন্তু তার উপায় নেই এখন। অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালনে ঘরের মধ্যেই। তারপর চেয়ারে এসে বসলেন। একটু পরে খাতা পেন্সিল বেরুল পকেট থেকে, ভাব ছন্দ আর মিলের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে পড়ল মন, ভেসে চলল কল্পনা-তরণী নতুন নদীর নতুন স্রোতে। অনেকক্ষণ লাগল কবিতাটা লিখতে, অনেক কাটাকুটি হ'ল, তবু মন খুঁত খুঁত করতে লাগল, মনে হ'ল ঠিক যেন বলা হ'ল না।

দরজিপাখি শিল্পী মানুষ মরজি মতন চলেন
'পীপ্' 'পীপ্' 'পীপ্' দু-চার কথা খেয়াল মাফিক বলেন।
তোমার আমার দৃষ্টিটিকে পারতপক্ষে এড়ান,
পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান।
চ'টে গেলেই ধমকে ওঠেন 'টোইট্' 'টোইট্' 'টোইট্'
যার অর্থ সরল ভাষায়—চটছি আমি, 'নো ইট'।
মনটা যখন তলিয়ে ছিল বিষণ্ণতার তলায়
হঠাৎ গানের উঠল গমক দরজিপাখির গলায়।
চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দেখি, সবুজ কুন্দ-শাখায়
দোল খাচ্ছেন দরজিপাখি রোদ পড়েছে শাখায়।
বুকটি সাদা পিঠটি রঙিন গলায় আভাস কালোর,
হচ্ছে মনে দুলছে যেন রঙিন সুরের ঝালর।
জলপাই রঙ সাধছে সারং শুনছে স্বয়ং তপন
বইছে হাওয়া মন্দ-মৃদু আকাশ দেখছে স্বপন।
দেখছে যেন বসুন্ধরাই দরজিপাখির মতন
রূপের হট্টলোকের মাঝে খুঁজছে অরূপ রতন।
আকাশ-ভরা সূর্য তারা লক্ষ পাতা শাখীর
সব ছাড়িয়া সুর উঠেছে বসুন্ধরা-পাখির।
পাতায় পাতায় সেলাই ক'রে সেও তো বাসা বানায়
কিন্তু সে যে নয়কো ছোট্ট গান গেয়ে তা জানায়।

কবিতাটি বার দুই মনে মনে পড়লেন তিনি। তারপর জোরে জোরে পড়লেন একবার।

'ছোট্ট' কথাটাকে কেটে 'ছোট' করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন কবিতাটার দিকে। ভাবতে লাগলেন, আরও গোটা দুই লাইন জুড়ে দেবেন কি না। এমন সময় জেলার বাবু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

"আপনার 'বেল' হয়ে গেছে। আসুন।"

কবি দাঁড়িয়ে উঠলেন হঠাৎ। খাতাটা প'ড়ে গেল তাঁর কোল থেকে। সেটাকে তুলে আবার পকেটে পুরলেন। খবরটা শুনে তিনি মনে মনে একটু হতাশই হয়ে গেলেন যেন। এত সহজে সব শেষ হয়ে গেল? তিনি আশা করেছিলেন, অনেক হৈ-চৈ হবে এ নিয়ে।

"বেল' হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। একজন ভদ্রমহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে। উনিই সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর এস. পি.-র সঙ্গে দেখা ক'রে 'বেলে'র ব্যবস্থা করেছেন। আসুন।"

কবি বেরিয়ে দেখলেন, ডানা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। তারপর হঠাৎ গদগদ হয়ে বললেন, "চমৎকার। এইটেই আশা করেছিলাম।"

"চলুন, ট্রেনের বেশি দেরি নেই আর।"

"এ ঘোড়ার গাড়ি কি আমাদের জন্যে?"

"হ্যাঁ। ওইটে ক'রেই তো ঘুরছি সকাল থেকে।"

"ও। খুব ঘুরতে হয়েছে বুঝি?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে ডানা কেবল বললে, "চলুন।"

গাড়িতে উঠে কিছুই কথা হ'ল না খানিকক্ষণ। ডানা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কবি উসখুস করতে লাগলেন। ডানাই কথা কইলে প্রথম।

"মনে হচ্ছে, এরা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে।"

"ষড়যন্ত্র? মানে? কারা ষড়যন্ত্র করছে?"

"মল্লিক মশাইরা।"

"আগে যে মল্লিক ম্যানেজার ছিল, সেই?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটা তো খারাপ নয়। তুমি জানলে কি ক'রে?"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন। মল্লিক মশাই নাকি গোপনে পুলিস সাহেবকে খবর দিয়েছিলেন যে, এ খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত।"

"কি রকম?"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সব কথা খুলে বললেন না। ইঙ্গিতে শুধু বললেন যে, আপনাদের নিজের লোকই তো পুলিশকে এ খবর দিয়েছে। নিজের লোকটি কে তা জিজ্ঞেস করাতে একটু ইতস্তত ক'রে তিনি মল্লিক মশাইয়ের নামটা বললেন। তাঁর ধারণা, মল্লিক মশায় আগে এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং অমরেশবাবুর স্ত্রী তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আপনাকে বসিয়েছেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হ'ল, মল্লিকের এই অদ্ভুত আচরণের হেতুটা যেন তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'ল। তারপর যখন শুনলেন আপনি প্রফেসার ছিলেন, তখন তাঁর ভুরু আরও কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কলেজের প্রফেসার ছিলেন? আমি জানতাম না। বলতে পারলাম না। তিনি বললেন, আমি

এক আনন্দবাবুর ছাত্র ছিলাম ইনি তিনি নন তো? প্রশ্ন করলেন, কবিতা লেখেন কি খুব? এ খবরটা জানা ছিল। বললাম, লেখেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ইনি তা হ'লে সেই আনন্দবাবু। আমাকে একটা দরকারে এখুনি এক জায়গায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, তা না হ'লে আমি নিজেই যেতাম তাঁর কাছে। যাই হোক, তাঁর 'বেলে'র ব্যবস্থা আমি এখুনি ক'রে দিচ্ছি।"

কবি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন।

"নাম কি বল তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের?"

"তা তো ঠিক জানি না।"

"আমার এক ছাত্র—নিখিল বোধ হয় তার নাম—কোথায় যেন এস. ডি. ও. হয়েছিল শুনেছিলাম, এ হয়তো সেই।"

ডানা বললে, "উনি একদিন আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

কবি হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর কল্পনা-তরণী তখন বিশাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—অকূলে কূল খোঁজবার আশায় নয়, আনন্দের আবেগে।

ডানা বললে, "মিছিমিছি কি কাণ্ড দেখুন তো! খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয় আপনার?"

"কিছুমাত্র না। আমি কবিতা লিখছিলাম। শুনবে?"

"এখন থাক্। বাড়ি গিয়ে শুনব।"

"না, অত তর সইবে না আমার। এখনিই শোন।"

ছ্যাকড়া গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বর পাল্লা দিতে লাগল।

ডানা ইন্টার ক্লাস টিকিট করতে চেয়েছিল, কবি কিন্তু শুনলেন না।

ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করতে হ'ল।

কবি বললেন, "তোমাকে ভিড়ের মধ্যে দেখলে ঠিকমত দেখা হয় না। মনের সঙ্গে চোখের ঝগড়া চলতে থাকে খালি।"

ডানা মৃদু হেসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল। হাওয়ার বেগে বিস্রস্ত হতে লাগল তার চুলগুলো।

কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন তার দিকে।

হঠাৎ বললেন, "তুমি যদি আমার মেয়ে হতে, বেশ হ'ত তা হ'লে—ভারি খুশী হতাম।"

"কেন?"

"অসঙ্কোচে আদর করতে পারতাম। আদর ক'রে যা বলতাম তা বেমানান হ'ত না। এখন কিছু বললেই তুমি চ'টে যাবে, লোকে শুনলেও ছি-ছি করবে।"

"কেন, কি বলতে চান?"

ডানা মুখ টেনে নিলে ভিতরে।

"বলতে চাই—।" ব'লেই কবি পকেট থেকে খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

তুমি সুন্দরী, মন্দার মালা,
তুমি কর্পূরলতা,
দিবসের আলো, রাতের আঁধার
যাচে তব সখ্যতা।

জ্যোৎস্না-সাগরে তোমার তরণী
পাড়ি দেয় যবে রাতে
বেরসিক যারা ঘুমাইয়া থাকে
কবি জেগে থাকে ছাতে।
তাহাই কাব্য-তীর্থে, ক্ষণিকা,
ক্ষণতরে অবতরি,
মর্ত-মলিন কল্পনা তার
দাও যে সুধায় ভরি।

তুমি দেহ নও, তুমি কেহ নও,
অথচ তুমি যে সব,
তোমারে ঘিরিয়া হয় যে মূর্ত
নিখিলের উৎসব।

তোমারই নয়নে, তোমারই অধরে,
তোমারই ডাহিনে বামে
সত্য শিবের চির-সহচর
সুন্দর এসে নামে।

জানি না তাহারে, চিনি না তাহারে,
নাম নাই তার জানা,
তবু তারি লাগি কাব্যে ও গানে
সাজাই ছন্দ নানা।

ডানা স্মিতমুখে শুনছিল।

কবি থামতেই হেসে বললে, "আমি তা হ'লে আপনার মতে, স্টেজ মাত্র!"

"স্টেজের মহত্ত্ব কম নাকি! স্বয়ং শেক্‌সপীয়র ব'লে গেছেন—সমস্ত পৃথিবীটাই স্টেজ।"

ডানা হাসিমুখে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। তারপর জানলা দিয়ে আবার মুখ বাড়াল। কোন কথা কইল না। যে আমগুলো স্টেশন থেকে কেনা হয়েছিল, কবি তারই একটা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন—হাত বেয়ে রস পাঞ্জাবীতে লাগল।

হঠাৎ ডানা মুখ ফিরিয়ে বললে, "ও কি করছেন? দিন, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ক্ষিধে পেয়েছে আপনার? বলেন নি কেন?" কবির হাত থেকে আমটা নিয়ে ডানা নিপুণভাবে কাটতে লাগল। কবি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন।

"কি দেখছেন অমন একদৃষ্টে?"

"মেয়েকে, মাকে।"

ডানা চোখ তুলে চাইল। কবি দেখলেন, চোখে যে হাসি চিকমিক করছে তাতে আর শঙ্কার ছায়া নেই। তা প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ।

৭

ফিরে এসেই ডানা আবার বেরিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর খোঁজে। তাঁ-তাঁ করছে দুপুরের রোদ। এই রোদে কেন যে সে বেরিয়ে পড়ল তা নিজেও সে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করল না। আমাদের সব কাজের আসল কারণ কেউ আমরা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি না। অজুহাত অবশ্য সকলেরই একটা থাকে, ডানারও ছিল। যে আমগুলো কাল স্টেশনে কিনেছিল, তাই সে দিতে যাচ্ছিল সন্ন্যাসীকে। পরে দিলেও চলত, চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলত। কিন্তু পিপাসার্ত পশু যেমন সহজ বুদ্ধিবলে টের পায়—জল কোথায় আছে এবং সে জলের সমীপবর্তী কি ক'রে হতে হয়, ডানাও ঠিক তেমনই অনুভব করছিল, সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য তাকে এমন কিছু একটা দেবে যার জন্যে সে মনে মনে আকুল। কিন্তু সেটা যে কি, সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার। ধারণা করবার প্রয়োজনও অনুভব করে নি সে। সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, এই হেতুটুকুই যথেষ্ট ছিল তার কাছে।...বেরিয়েই চোখে পড়ল ছাই-রঙের একটা পাখি জিওলগাছের ডালে বসে আছে। অনেকটা বাজের মত। বুকের কাছটা বাদামী, তাতে ডোরাও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। চোখ দুটো লালচে। ডানার মনে হ'ল, বাজ নয়, বাজ হ'লে ঠোঁটটা বাঁকা হ'ত। কি পাখি ওটা? এর আগে দেখে নি তো এ পাখি! পাখিটা যেই দেখলে ডানা তাকে লক্ষ্য করছে, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। উড়তেই ডানার নজরে পড়ল, পাখিটার ল্যাজের নীচে কালো রঙের ডোরা রয়েছে। পাখিটা উড়ে গিয়ে দূরে একটা আমগাছে বসল। ডানা চলতে শুরু করল আবার। চলতে চলতে ভাবতে লাগল, কি পাখি ওটা! মনে পড়ছে, অথচ পড়ছে না। ঘুরতেই আবার পাখি। এক ঝাঁক ছাতারে একটা ঝোপের ধারে কচকচ করছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দূরে টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর ব'সে আছে ফিঙে। আর একটু দূরে মন্দিরের চূড়ার উপর নীলকণ্ঠ—ট্যাক ট্যাক শব্দ করছে আর ল্যাজ নাড়ছে। শালিকের বাসা চোখে পড়ল একটা। পক্ষীজগতের সঙ্গে আগে তার কোনও পরিচয় ছিল না, কোন ঔৎসুক্যও ছিল না। বাড়ির বাইরে বেরুলে পাখিদের সম্বন্ধে চোখ কান আগে সজাগ হয়ে উঠত না। এখন হয়। পাখিদের সামান্য সাড়াও মনে সাড়া জাগায়। অমরেশবাবু তাকে নতুন একটা রহস্য-লোকের সন্ধান দিয়ে গেছেন। অমরেশবাবুর মুখটা মনে পড়ল। কত বড় বিদ্বান অথচ কত সরল। এ দেশের এত রকম পাখি দেখেও তৃপ্তি হয় না। ভদ্রলোকের। আরও টাকা থাকলে বিদেশে গিয়ে আরও পাখি দেখতেন। ছোট শিশু যেন। ডানার মনের নিভৃত কন্দর থেকে মাতৃস্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, কত টাকা লাগে বিদেশে যেতে? আমার যদি থাকত আমি নিশ্চয় দিয়ে দিতাম। কবির কথায়ও মনে হ'ল, উনিও একটি শিশু, কিন্তু অন্যরকম। ছিটগ্রস্ত। ভাবের ঘোরে কখন যে কি বলেন, কি করেন—কিন্তু ঠিক নেই। অনুকম্পা হ'ল। চিন্তাধারায় বাধা পড়ল হঠাৎ। রাস্তার ধারে একটা কাক কি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তাকে দেখেই উড়ে গেল। ডানা দেখলে, মরা ইঁদুর একটা। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, নীচের দাঁত দুটোও দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ ক'রে ব্যঙ্গ করছে যেন। কাকে? বিধাতাকে? মৃত্যুর সম্মুখীন হ'লে সকলেরই যেমন ক্ষণকালের জন্য জীবনের নশ্বরতার কথা মনে জাগে, ডানারও জাগল। বর্মা থেকে পালাবার সময় একবার মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিল সে। মনে পড়ল সে কথা। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বাবার মুখটা স্পষ্ট ফুটে উঠল মনে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? হারিয়ে যায় কি চিরকালের মত? নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যাওয়াই ভাল বোধ হয়। এই জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ বোধ সমস্ত স্মৃতিসম্ভার বহন করার

সার্থকতা কি থাকতে পারে, জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রই যদি চিরকালের মত ছিন্ন হয়ে যায়? যায় কি? তার এ চিন্তাস্রোতও ব্যাহত হ'ল। দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল আর একটা পাখি—বউ কথা কও! চমৎকার মিষ্টি ডাকটি। 'থাটি'র উপর একটু সামান্য জোর দিয়ে, সামান্য একটু টান দিয়ে কি অপরূপ ক'রে বললে—বউ কথা কও। একবার ডেকেই কিন্তু চুপ ক'রে গেল। ডানা এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগল, কোন্ গাছের ফাঁকে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে! যে ছাই-রঙের পাখিটাকে একটু আগে দেখতে পেয়েছিল, সেটা বউ-কথা-কও নয়। যদিও সে চোখে দেখে নি এখনও, কিন্তু বইয়ে পড়েছে বউ-কথা-কও পাখির রঙ কালো, ঠোঁটের দিকটা সাদা। ওর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo......ছাই রঙের পাখিটা কি তা হ'লে? পরমুহূর্তেই পাখিটা তারস্বরে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল। সুরের উৎস পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে উৎসারিত হ'ল, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতপ্ত নির্মেঘ আকাশ সে উচ্ছ্বাসে বিব্রত হয়ে পড়ল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দিগ্‌দিগন্তকে আকুল ক'রে তুলল যেন। ডানার তখন মনে পড়ল, অনেক কষ্টে এই চোখ-গেলকে একবার মাত্র দেখতে পেয়েছে সে। আরও মনে পড়ল, এর সঙ্গে বাজের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে ব'লে এর ইংরেজী নাম Hawk Cuckoo......ডানা চেয়ে দেখলে, কিছুদূরে একটা আমগাছের শাখা ফলভারে অবনত হয়ে পড়েছে। আরও কিছুদরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া শাখায় শাখায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে, তার পাশেই কর্ণিকার, মনে হচ্ছে অসংখ্য হলুদ রঙের প্রজাপতি যেন কোনও মন্ত্রবলে অচঞ্চল হয়ে গেছে ওর পত্রপল্লবে। সমুজ্জ্বল উত্তপ্ত রৌদ্রকিরণেও উৎসবের আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে। সরবে-নীরবে, আভাসে-ইঙ্গিতে, স্পষ্টতা-অস্পষ্টতায় সে উৎসব আত্মপ্রকাশ করছে নানা সুরে নানা ছন্দে। বউ-কথা-কও আবার ডেকে উঠল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডানার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু। সন্ন্যাসীর কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছিল, রাস্তার মাঝখানে ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে পাখির ডাক শুনে আর ফুলের গাছ দেখে। আবার চলতে শুরু করল। অনেক দিন আগে কবি একটা কবিতা লিখে শুনিয়েছিলেন তাকে। তার লাইনগুলো মনে পড়ল ঃ

নকল কাজেতে মত্ত থাকিয়া আসল কাজটি হয় নি করা,
মিলন-সভায় যাইতে পারি নি, সে যে হবে ওগো স্বয়ম্বরা।
সে বারতা লেখা তারায় তারায় ফুলে ফুলে তাহা উঠেছে ফুটি।
অকাজের পাকে রয়েছি জড়ায়ে কিছুতেই যেন পাই না ছুটি।

কবিতার লাইনগুলো গুঞ্জন করত লাগল মনের ভিতর। এর যে অর্থ সে আগে বোঝে নি, সেই অর্থটা ক্রমশ যেন প্রতিভাত হ'ল তার মনে। মনে হ'ল, আনন্দের একটা উৎসব অহরহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে চোখের সামনে, কিন্তু তাতে যোগ দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার।

সন্ন্যাসীর বাসার কাছাকাছি গিয়ে ডানা যখন পৌঁছল, তখন আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। দূর থেকে সে যা দেখতে পেল তা অপ্রত্যশিত। দেখলে, একটা শাবল নিয়ে সন্ন্যাসী একটা নারকেলের ছোবড়া ছাড়াবার চেষ্টা করছেন প্রখর রৌদ্রে ব'সে। ডানার মনে পড়ল কাকের ইঁদুর খাওয়ার দৃশ্যটা।

"কি করছেন আপনি?"

সন্ন্যাসী একটু অপ্রতিভ হলেন।

'ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছি। তুমি এই রোদে বেরিয়েছ যে?"

"এই আমগুলো দিতে এসেছি আপনাকে।"

"দেখ, কি অদ্ভুত যোগাযোগ!"

শাবল ও নারকেল সরিয়ে রেখে হাসিমুখে সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ।

"যোগাযোগ মানে?"

ডানা আমগুলি রেখে জিজ্ঞেস করল।

আর একটু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, "যোগাযোগ বলছি এইজন্যে যে, ভগবানই আমার নিতান্ত দৈহিক ক্ষুধায় বিচলিত হয়ে প্রথমে নারকেল পাঠিয়ে দিলেন, তারপর যখন দেখলেন নারকেলটা আমি ছাড়াতে পারছি না তখন তোমাকে দিয়ে আম পাঠালেন—এ কথা ভাবতে পারছি না। যাঁকে নির্বিকার পরমব্রহ্ম ব'লে ভাববার চেষ্টা করছি, তিনি এভাবে বিচলিত হচ্ছেন—একথা আমার পক্ষে ভাবা শক্ত। তাই যোগাযোগ বলছি।"

"নারকেলটা কে দিলে?"

"কেউ দেয় নি। নদীর ধারে ব'সে ছিলাম, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আমার সামনে ঠেকল, ঠেকেই রইল অনেকক্ষণ, তাই তুলে নিয়ে এলাম। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব।"

"আপনি তো রোজ ভিক্ষা করতেন! ভিক্ষেয় কিছু পান নি বুঝি?"

'ভিক্ষা আজকাল আর করি না। আজকাল উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেছি।"

"উঞ্ছবৃত্তিটা আবার কি?"

"তুমি মহাভারত পড়েছ?"

"না। কেন?"

"মহাভারতে শান্তিপর্বে এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কাহিনী আছে। পদ্মনাভ সে কাহিনী ধর্মারণ্য নামক এক ব্রাহ্মণকে বলছেন।"

"কি, বলুন না শুনি!"

"এখানে বড্ড রোদ, ঘরে চল।"

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল, সেখানেও খুব ছায়া নেই। ভাঙা চালের ভিতর দিয়ে সেখানেও রোদ ঢুকেছে।

ডানা বললে, "এই ঘরে কি ক'রে যে আপনি আছেন! আনন্দবাবু আজকাল অমরেশবাবুর ম্যানেজার হয়েছেন, তাঁকে বলব আপনার ঘরটা সারিয়ে দিতে।"

"না থাক। কদিনই বা আর আছি!"

ভাঙা ঘরটার আসল মালিক যে তিনিই, অমরেশবাবু নন—এ কথা তিনি ডানাকে বললেন না। অমরেশবাবু নিজেও সে কথা জানতেন না বোধ হয়।

"চ'লে যাবেন না কি এখান থেকে?"

"সবাইকেই যেতে হবে, তোমাকেও। এক জায়গায় বেশিদিন থাকবার জো আছে কি! স্রোতের মুখে ভাসছি যে সব।"

"স্রোতের মুখে থেকেও তো মনে হয়, নড়ছি না।"

ডানা হেসে জবাব দিলে।

"বাইরের জগৎটা কার চোখে যে কেমন ঠেকে, কার মনে যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয় তা বলা শক্ত। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, সেইজন্য কারও মাপের সঙ্গে কারও মেলে না।"

"ওসব আধ্যাত্মিক কথা থাক্ এখন। আপনি আমগুলো খান আগে।"

"এনেছ যখন খাবই তো। তুমি ওই কোণের দিকটায় ব'স, যদি বসতে চাও অবশ্য। দাঁড়াও, আমগুলো নিয়ে আসি বাইরে থেকে।"

সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন আবার। ঘরের কোণে ছেঁড়া মাদুর গোটানো ছিল একটা। সেইটে পেতেই ডানা বসল। সন্ন্যাসী আমগুলি নিয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, "তুমি ওই মাদুরটা পেতে বসলে! আচ্ছা থাক্, বসেছ যখন—"

"কেন, কি হয়েছে মাদুরে?"

'হবে আবার কি! নদীর চরে শ্মশানে প'ড়ে ছিল, কুড়িয়ে এনেছিলাম একদিন। ওতেই শুই রাত্তিরে। তোমার ওতে যদি বসতে আপত্তি থাকে আমার ওই আসনটায় ব'স। আমি আমগুলো কাটি ততক্ষণ।"

মাদুরের ইতিহাস শুনে ডানার উঠে পড়তেই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সেটা অশোভন হবে ভেবে উঠল না। মনে হ'ল, সন্ন্যাসী এতে শুতে পারেন আর আমি ব'সে থাকতে পারব না?

সন্ন্যাসী ঝুলি থেকে ছুরি বার ক'রে আমগুলি ধুয়ে কাটতে লাগলেন। ঝুলি থেকেই বার করলেন কয়েকটি শালপাতা। একটি আম কেটে শালপাতায় রেখে এগিয়ে দিলেন ডানার দিকে।

"তুমি খাও।"

"আমি এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।"

"তবু খাও। তুমি সামনে ব'সে থাকবে, আর আমি একা খাব—সেটা কি ভাল দেখায়।"

"তা হ'লে আমি উঠি। আপনি খান।"

"তুমি না খেলে আমি খাবই না। তাছাড়া একটা আমই যথেষ্ট আমার পক্ষে। অতগুলো আম নিয়ে কি করব আমি? তুমি একটা খাও, আমি একটা খাই। বাকিগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"রেখে দিন, কাল খাবেন।"

"আমি সঞ্চয় করি না। কালকের আহার কাল জুটেই যাবে কোথাও থেকে।"

ডানার মনে একটু খটকা লাগল। সন্দেহ হ'ল, লোকটা তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য বাজে ভাওঁতা দিচ্ছে না তো! মুখে কিন্তু কিছু বললে না। শালপাতা থেকে আমের একটা চোকলা তুলে নিয়ে খেতে লাগল হাসিমুখে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সন্ন্যাসী নিজের এবং ডানার শালপাতাটা তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এলেন, ডানাকে কিছুতেই ফেলতে দিলেন না। ডানা হাত মুখ ধুয়ে নিজের আঁচলেই হাত মুখ মুছতে মুছতে বললে, "আপনি এত একগুঁয়ে কেন বলুন তো?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"কিছু বলছেন না যে?"

"যা বলতে ইচ্ছে করছে তা বললে তুমি আমাকে হয়তো ভণ্ড মনে করবে। এ সব জিনিস বললেই খেলো শোনায়। চুপ ক'রে থাকাই ভাল।"

এবার ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো, একটু আগে ওঁকে ভণ্ডই মনে হচ্ছিল। তার মনের কথা টের পেয়ে গেলেন নাকি! শক্তিশালী সন্ন্যাসীরা অন্তর্যামী। এ কথা সে শুনেছিল যেন কার কাছে! সরলভাবে সত্য কথাই বললে সে, "আমরা সাধারণ লোক অনেক সময় আপনাদের বুঝতে পারি না, তাই ভণ্ড ব'লে মনে হয়। ভণ্ড সাধুরও অভাব তো নেই দেশে।"

সন্ন্যাসী খুশী হলেন।

বললেন, "সত্যি কথা বললে বলতে হয়—আমিও ভণ্ড। আমার বাইরেটা দেখে বা

আমার কথাবার্তা শুনে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা লোকের হওয়া স্বাভাবিক, আমি ঠিক তা নই। অথচ মুশকিল, আমি আমার বাইরের প্রকাশটা ঠিক আমার স্বরূপের অন্তরের অনুরূপ করতেও পারি না। তাই চেষ্টা করি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে।"

এই স্বীকারোক্তির পর কি বলা উচিত, ডানার মাথায় এল না। কিন্তু আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, লোকটা ভণ্ড নয়।

"উঞ্ছবৃত্তির সম্বন্ধে আপনি কি একটা গল্প বলবেন বললেন' বলুন না শুনি।"

"এ সব আজগুবি গল্প কি ভাল লাগবে তোমার? মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে গল্পটা। ধর্মারণ্য ব'লে একজন ব্রাহ্মণ কোন্ ধর্ম আচরণীয় তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁকে একজন পরামর্শ দিলেন—তুমি পদ্মনাভের কাছে যাও, তিনি তোমাকে নির্দেশ দেবেন। ধর্মারণ্য পদ্মানাভ্বে বাড়ি গিয়ে শুনলেন, পদ্মনাভ সকালে উঠে সূর্যের রথচক্র বহন করতে গেছেন। রোজই যান। সূর্য অস্ত গেলে তিনি বাড়ি ফিরবেন। ধর্মারণ্য শুনে অবাক হয়ে গেলেন। নদীর ধারে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে এলেন তিনি। ধর্মারণ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সূর্যলোকে কি কি আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন আপনি? পদ্মনাভ নানা রকম আশ্চর্য জিনিসের বর্ণনা ক'রে শেষে বললেন—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম একটি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে। তিনি সূর্যের মতই জ্যোতিষ্মান। তিনি যেন দ্বিতীয় সূর্য। দেখলাম; তিনি এসে সূর্যের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেলেন। আমি সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠিক আপনার মত দীপ্তিশালী এই মহাপুরুষ কে? সূর্য বললেন—ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিধারী তপস্বী। এই গল্পটি শুনেই ধর্মারণ্য উঠে পড়লেন। পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছিলেন তা তো বললেন না? ধর্মারণ্য উত্তর দিলেন—আমি যা জানতে এসেছিলাম তা জেনেছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, তাই আমি চ'লে যাচ্ছি।—এই বলে প্রণাম ক'রে তিনি চ'লে গেলেন।"

গল্পটি ব'লে সন্ন্যাসী চুপ করে রইলেন। ডানাও চুপ ক'রে রইল। তার কানে এল অনেক দূরে বউ-কথা-কও পাখিটা আর একবার ডেকে উঠল। মনে হ'ল, পাখিটাই যেন তাকে বললে—চুপ ক'রে আছ কেন? কথা কও, যা জানতে চাইছ জেনে নাও। একটু ইতস্তত ক'রে ডানা বললে, "উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলে তা আমি জানি না। আমার মূর্খতায় আপনি হাসবেন হয়তো।"

"কুড়িয়ে খাওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি। ফল ফুল শস্য কন্দ কত রকম খাবার ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে চতুর্দিকে। কুড়িয়ে খেলে একজনের অনায়াসে চ'লে যায়। বিষয়ী মানুষরাই কেবল খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে, পৃথিবীর বাকি সমস্ত প্রাণীই তো কুড়িয়ে খায়। পৃথিবীই অন্নপূর্ণা, তিনিই সকলের জন্য অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে রাখছেন অহরহ। আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?"

ডানা হেসে বললে, "পশুত্বের স্তরে নেমে আসাই তা হ'লে সাধুত্বের লক্ষণ বলুন!"

"পশুরা অসহায়। উঞ্ছবৃত্তি না ক'রে ওদের উপায় নেই। মানুষ কিন্তু স্বাধীন, সে ইচ্ছে করলে রাজরাজেশ্বর হতে পারে আবার উঞ্ছবৃত্তিধারীও হতে পারে। সাধুরা রাজরাজেশ্বর হতে চান না, কারণ রাজরাজেশ্বর হ'লে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। সাধুরা চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে চান।"

"সেই চিরানন্দলোক কোথায়? ঠিকানা পেলে যাবার চেষ্টা করতাম।"

"ঠিকানা কেউ ব'লে দিতে পারবে না। তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।"

"আমি কোথায় খুঁজব?"

'ঠিকানা তোমার মনের মধ্যেই আছে। যদি খোঁজ, পাবেই নিশ্চয়।"

"কই, কোনদিন আভাস মাত্র তো পাই নি!"

"চেষ্টা করলেই পাবে। শুধু আভাস কেন, তোমার তেমন আগ্রহ যদি থাকে সাক্ষাৎদর্শন পর্যন্ত পাবে।"

"কার সাক্ষাৎদর্শন পাব?"

"সত্যের।"

"কিন্তু আপনি চিরানন্দলোকের কথা বলছিলেন যে!"

"সত্যই চিরানন্দময়। সত্যই আনন্দ, সত্যই শিব, সত্যই সুন্দর। যে মুহূর্তে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবে, সেই মুহূর্তে এমন আনন্দ তোমার সমস্ত সত্তায় ওতপ্রোত হয়ে যাবে, যার শেষ নেই, যা অবর্ণনীয়।"

"কি রকম সে ব্যাপারটা—কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সেটা কেউ কাউকে বোঝাতে,পারে না। প্রভাতের সূর্যোদয় যে দেখে নি, তাকে বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো অসম্ভব। তোমার রাত্রি শেষ হ'লে নিজেই তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে তা বুঝতে পারবে একদিন। সে উপলব্ধি এ জন্মে হতে পারে, জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করতে হতে পারে তার জন্য। কারও বক্তৃতা শুনে তাড়াহুড়ো ক'রে তা হবে না। কাছে বা দূরে সে প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য। তোমাকে যেতে হবে সেখানে।"

"কিন্তু আপনি এখনই তো বললেন, তা আমার মনের মধ্যেই আছে! তবে আবার দূরে আছে বলছেন কেন?"

"মনের মধ্যেই আছে। কিন্তু তোমার মন কি ছোট? সে যে বৃহৎ—অতি বৃহৎ। তারও সীমা নেই, শেষ নেই, তাও দূর থেকে দূরান্তে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিস্তৃত। তা তোমার ওই দেহটুকুর মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। তার স্বরূপ-আবিষ্কারই তো আত্ম আবিষ্কার। সে আবিষ্কার সকলকেই করতে হবে একদিন, আর সেই আবিষ্কারের পথেই সত্য-দর্শনও হবে। তখনই বুঝতে পারবে, চিরানন্দলোক কোথায়।"

...ডানা আনত-দৃষ্টিতে শুনছিল। শুনতে শুনতে তার মনে হ'ল, সে যেন খর-স্রোতে ভেসে চলেছে। ছোট একটা নৌকার উপর ব'সে আছে সে। কোথাও কূলকিনারা নেই। মনে হচ্ছে, স্রোতের ধারা দূরদিগন্তে আকাশে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। দিগন্ত রেখা স'রে স'রে যাচ্ছে কেবল। সে যে কঠিন মাটির উপর সন্ন্যাসীর সামনে ব'সে আছে, তা ভুলে গেল সহসা। কয়েক মুহূর্তের জন্য অসীম যাত্রাপথের যাত্রী হয়ে পড়ল সে যেন, স্থান কাল অবরুদ্ধ হয়ে গেল তার চেতনা থেকে। একটা সুনিশ্চিত অবলম্বনের আশায় আকুল হয়ে উঠল সে...ভয়-ভয় করতে লাগল... মনে হ'ল, নৌকাটা এই স্রোতের ধাক্কা কতক্ষণ সইতে পারবে—টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এখনই...আশ্রয় চাই, অবলম্বন চাই একটা। আশ্রয় মিলল। বাইরে একটা দোয়েল পাখি তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠে আশ্বাস দিলে। কি বললে, ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না ; কিন্তু মনে হ'ল, যেন আশ্রয় মিলল।

ডানা চেয়ে দেখলে, সন্ন্যাসী চোখ বুজে ব'সে আছেন।

৮

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ডানা যখন চ'লে এল, তখনও বাইরে রোদের তেজ একটুও কমে নি। তখনও 'লু' বইছে। বাইরের এই রুদ্র রূপ কিন্তু ডানার মনকে একটুও স্পর্শ করল না। সে সন্ন্যাসীর কথাই ভাবছিল কেবল। ভাবছিল, উনি নিশ্চয়ই এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, যার তুলনায় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ওঁর কাছে। নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধনের ভেতর দিয়ে কি পেতে চাইছেন উনি? ভগবানকে? উঞ্ছবৃত্তিধারী না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না? প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না, চুপ ক'রে থাকেন, মাঝে মাঝে একটু হাসেন। কখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, কখনও আবার সোৎসাহে এমন সব কথা বলেন যার মানে বোঝা যায় না। অথচ ওঁকে পাগলও ঠিক বলা চলে কি! এই সব ভাবতে ভাবতে ডানা পথ চলছিল।

"মাসীমা, মাসীমা শুনুন।"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, চণ্ডী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কয়েক দিন আগে রূপচাঁদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ছেলেটি এসেছিল—ডানার মনে পড়ল।

"কি?" ডানা দাঁড়িয়ে পড়ল।

চণ্ডী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "চৌধুরীদের বাগানে একটা গাছে হলদে পাখির বাসা দেখে এসেছে গণেশ।"

"ও, আচ্ছা। গণেশকে নিয়ে এস। একটা চাকরকে নিয়ে যাব আমি। বাসাটা দেখব।"

"আপনি নিজে যাবেন?"

"যাব।"

"কখন আসব?"

"তোমাদের যখন সুবিধে। এখনও যেতে পারি।"

"গণেশকে নিয়ে আসছি তা হ'লে।"—চণ্ডী একছুটে চ'লে গেল আবার।

সন্ন্যাসীর কথাটা ডানার মনের প্রত্যক্ষলোক থেকে স'রে গেল, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসে দেখলে, কবি ব'সে আছেন। ডানাকে দেখেই বললেন, "ছিলে কোথা? অমেরশবাবুর একখানা চিঠি এসেছে। আমি ভাবছিলাম, কাজে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখ। উনি সিমলায় গিয়ে পাখি দেখে বেড়াচ্ছেন।। কাশ্মীর ঘোরবারও ইচ্ছে আছে অথচ চিঠিতে কোনও ঠিকানা নেই যে, চিঠি লিখি।"

ডানা চিঠিখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি এই দুপুর রোদে?"

"সন্ন্যাসীটিকে কয়েকটা আম দিতে গিয়েছিলাম।"

"ও! সেই সন্ন্যাসী এখনও আছেন নাকি?"

"আছেন।"

"চিঠিটা আর একবার পড় দেখি চেঁচিয়ে।"

ডানা পড়তে লাগল।—

প্রীতিভাজনেষু,

আনন্দবাবু,গতবার 'প্যারাডাইস ফ্ল্যাইক্যাচার'-এর (Paradise Flycatcher) যুগ্মমূর্তির একটা রঙিন ক্রিশমাস্ কার্ডে আপনি একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন আমাকে। নকল ক'রে

রেখেছিলেন কি না জানি না। তাই প্রতিলিপি আপনাকে আবার পাঠালাম। প্যারাডাইস ফ্ল্যাইক্যাচারের দেশী নাম—দুধরাজ। কেউ কেউ শাহবুলবুল বলে। কিন্তু ওটা সম্ভবত ঠিক নয়। আপনার কবিতাটি এই—

১

সমাজ মানে আঁধার গলি
বাধার কাদা মানার পলি
পরদানসীন আনারকলি
ছদ্মবেশে তাই বুঝি।
চুলগুলো তাই বব্ করেছে
নাই বুঝি তাই বোরখাটা
পরদা-ভাঙা সুর ধরেছে—
জরদা-রঙের ওড়ানাটা।

২

তেপান্তরি মাঠের শেষে
রূপান্তরি স্বপনদেশে
শঙ্খধবল পাখির বেশে
রাজপুত্র ওই বুঝি
নতুন ধরন নতুন বরণ
নতুন রকম ছন্দ রে
সাদায় কালোয় মেলায় চরণ
কষ্টি এবং মর্মরে।

কবিতাটি টুকে রাখবেন। আমার খুব ভাল লেগেছে। মেয়ে-পাখিটির মধ্যে আপনি যে আনারকলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এতে আপনার কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এখন সিমলায় আছি। কাশ্মীরের নানা জায়গায় বেড়াবার ইচ্ছে আছে। আপনাকে কাশ্মীরের পাখি বিষয়ে একটি বই পাঠালাম। ছবি দেখে যদি কবিতার প্রেরণা পান খুশী হব। যদি কবিতা লেখেন আমাকে পাঠাবেন।

এখানে অনেক নতুন পাখি দেখলাম।

আমাদের শালিকের মত অনেকটা দেখতে একরকম পাখি আছে, গায়ে সাদা সাদা দাগ, নাম Straited Laughing Thrush (স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ্)—এদের দেশী নাম কি জানি না। তবে থ্রাশ্ পাখির কাস্তুরা, পাণ্ডু, শামা এসব নাম শুনেছি, পড়েওছি। এদের হুইশলিং ডাকটা খুব অদ্ভুত—'ও সি হোয়াইটি—ও হোয়াইট্'। এ অঞ্চলে এ পাখি অনেক। হিমালয়ের বসন্ত-বউরি পাখিও দেখলাম। বেশ বড় পাখি। প্রায় পায়রার মত। সালিম আলির 'ইণ্ডিয়ান হিল বার্ড্স্' বইটাতে ছবি আছে দেখবেন। পাখিটার সর্বাঙ্গে চমৎকার রঙ! নানা রকম রঙ। তাছাড়া গ্রেহেডেড ফ্লাইক্যাচার, ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারও (Verditer Fly catcher) অনেক দেখলাম এখানে। এই শেষোক্ত পাখিটি চমৎকার দেখতে! নীল রঙের

ওপর সবুজের আভা। আপনি দেখলে নীল-পরী বা ওই ধরনের কিছু একটা নামকরণ ক'রে ফেলতেন। আসামের দিকে ফেয়ারি ব্লু বার্ড (Fairy Blue Bird) নামে নাকি এক রকম পাখি আছে, দেখি নি এখনও। এখানে হিমালয়ান হুইশলিং থ্রাশের একটানা শিস ঝরনার কলধ্বনি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বেশ। কোকিলের কুহু কুহু ডাকেই অভ্যস্ত আমরা। এখানে কুলু উপত্যকায় কুক্কুর 'কুক্-উ' ডাক শুনলাম। কিন্তু সালিম আলির বইয়ে একথা লেখা নেই। আর একটি নতুন পাখি দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। ব্রাউন ডিপার। ব্যাল নদীর স্রোতে খেলতে দেখলাম পাখিটিকে। এর কথা প'ড়ে দেখবেন। অদ্ভুত লাগবে। এরা খুব উঁচুতে তুষারচ্ছন্ন অঞ্চলে থাকে। আর খেলা করে স্বচ্ছ বরফ-গলা নদী স্রোতে। কথাটা যত সহজ শোনাল,আসলে ততটা সহজ নয়। পাহাড়ের বরফ-গলা নদী তোড়ে নেবে আসে—ফেনায় আবর্তে কলকলধ্বনিতে চতুর্দিক মাতিয়ে। এই দুর্দম দূরন্ত নদীর জলে ওই ছোট্ট বাদামী রঙের পাখিটি (আমাদের দোয়েলের চেয়ে বড় নয়) ঝাঁপাই ঝুঁড়তে ভালবাসে। জলের তলায় ডুব-সাঁতার কেটে খাদ্য অন্বেষণ করে। ব্যাপারটা কল্পনা করুন। একে যদি জলপরি বলেন ঠিক মানাবে না। জলদস্যু বললে খানিকটা ঠিক হবে হয়তো। দু রকম ডিপার আছে, এক রকম পুরোপুরি বাদামী, আর এক রকমের বুকটা সাদা (এর ছবি সালেম আলিতে পাবেন)। ব্লু ম্যাগপাইও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। আপনারা ওখানে যে ল্যাজঝোলা পাখি দেখেন (যার ইংরেজী নাম ট্রিপাই, বাংলায় কেউ কেউ হাঁড়িচাঁচাও বলে) তারই জ্ঞাতি এই ব্লু ম্যাগপাই। বেশ বড় পাখি। প্রায় বাইশ-তেইশ ইঞ্চি লম্বা হবে। ল্যাজটা খুবই লম্বা। নীল (প্রায় কালো) রঙের সঙ্গে সাদা ও ধূসরের অপূর্ব সমন্বয়। ঠোঁটটি লাল। হলদে ঠোঁটওলা আর একটা জাতও আছে, কিন্তু এখানে লাল-ঠোঁটই বেশি। কালীজ ফেজান্ট (Kaleej Pheasant), মোনাল ফেজান্টও (Monal Pheasant) দেখেছি। চমৎকার বর্ণসজ্জা ! একটা 'স্কিন' জোগাড় করেছি। এখানে বার্কিং ডিয়ারও (Barking Deer) পাওয়া যায়। শিকার করতে দেখেছি।

আরও নানা রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সব চিঠিতে লেখা যাবে না। আপনারা আশা করি ভাল আছেন। আমি দিন সাতেক পরে এখান থেকে চ'লে যাব আরও উঁচুতে। সম্ভব হ'লে নতুন ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখব। শ্রীমতী ডানা আশাকরি ভাল আছেন। আমার পাখিগুলি কেমন আছে?

আমরা ভাল আছি। আপনারা আমাদের ভালবাসা নিন। রত্না ডানাকে একটা চিঠি দেবে বলেছিল, কিন্তু আর ডাকের সময় নেই। ইতি

আপনাদের অমরেশ

চিঠিপড়া শেষ হতেই কবি বললেন, "কাণ্ড দেখ! এ এক আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি! এই খুনের মোকদ্দমা এখন কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। এখুনি আমার কাজে ইস্তফা দিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

ডানা একটু মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু আমি যা শুনলাম তাতে কাজে ইস্তফা দিলেও আপনি মোকদ্দমার হাত থেকে উদ্ধার পাবেন না।"

"কেন?"

"যে মেয়েটি খুন হয়েছে, তার ঘর খানাতল্লাসি ক'রে পুলিস আপনার লেখা এক টুকরো চিঠি নাকি বার করেছে। বাকি খাজনার নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে আপনি কিছু লিখেছিলেন নাকি?"

'লিখেছিলাম হয়তো। শুধু তার নয়, অনেকেরই নোটিশের পিছনে লিখেছি। দেখলাম, অনেক খাজনা বাকি প'ড়ে রয়েছে, যদি কিছু মাপ ক'রে দিলে আদায় হয় তাই সে কথা লিখে দিয়েছিলাম অনেক নোটিশের পেছনে। কেন, তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে?"

"অন্যায় কিছু হয় নি। তবে পুলিশ নাকি ওই সূত্র ধ'রেই আপনাকে জড়িয়েছে এতে?"

"কে বললে?"

রূপচাঁদবাবু।"

"রূপচাঁদ কবে এসেছিল তোমার কাছে?"

"আপনি যেদিন সদর এস. ডি. ও.র কাছে যান, সেই দিনই। ও নিয়ে মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার কোনও ভয় নেই। আমাদের এস্টেটের ভাল উকিল আছেন, তিনি যা করবার করবেন। আমি ফিরে এসেই অমর বাবুর স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছি। কিন্তু তিনি সে চিঠি পাবেন না বোধ হয়।"

"কি লিখেছ?"

"এখানকার সব ঘটনা। আপনি অমরবাবুকে কিছু লেখেন নি? ওঁদের সব জানানোই তো ভাল।"

"আমি ভাবছিলাম, কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু মন স্থির করতে পারি নি, তাই দেরি হচ্ছে। তোমার মতে তা হ'লে কাজ ছাড়া ঠিক নয়?"

ডানা হেসে বললে, "সেটা আপনি ঠিক করুন। আমি কি বলব!"

"না, তুমিই ঠিক কর। তুমি যা বলবে তাই করব। আমার নিজের উপর আর আস্থা নেই।"

কবির কণ্ঠে যে অসহায় সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল তা শিশুর কণ্ঠেই মানায়।

ডানা হাসিমুখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বললে, "তাড়াতাড়ি এখন কাজ ছাড়বার দরকার কি! যেমন চলছে চলুক না। এ মোকদ্দমার কিছু হবে না।"

"বেশ।"

গণশাকে সঙ্গে ক'রে চণ্ডী এসে হাজির হ'ল। গণশা চণ্ডীরই সমবয়সী, কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। মাথার চুল দশ-আনা ছ-আনা, পরিধানে হাফপ্যান্ট হাফশার্ট, হাতে একটি গুলতি। ডানার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, "আপনি ডেকেছেন আমাকে?"

ডানা একবার চণ্ডীর দিকে একবার গণশার দিকে চেয়ে দেখলে।

"তুমি হলদে পাখির বাসা কোথায় দেখেছ?"

"অমরবাবুর বাগানে।"

"আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে?"

"পারব। অনেক উঁচুতে আছে। গাছে না উঠলে দেখা যাবে না। কিন্তু।"

"আমার দূরবীন আছে, আমি নীচে থেকেই দেখতে পাব।"

"বেশ, চলুন তা হ'লে।"

ডানা কবির দিকে ফিরে বললে, "আপন বসুন। আমি হলদে পাখির বাসাটা দেখে আসি চট ক'রে।"

কবি বললেন, "এরা কে?"

"চণ্ডী আর গণেশ। এদের হলদে পাখির বাসার সন্ধান করতে বলেছিলাম।

"আপনি বসুন। আমার বেশি দেরি হবে না।"

"চল না, আমিও যাই।"

"না, এই রোদে আপনার কষ্ট হবে। আপনি বরং বসুন এখানে। এই বইগুলো ওলটান কিংবা লিখুন কিছু।"

"বেশ। বেশী দেরি ক'রো না কিন্তু।"

"না দেরি হবে না।"

চণ্ডী ও গণশাকে নিয়ে ডানা বেরিয়ে পড়ল।

অমরবাবুর বাগানে ডানা ইতিপর্বে আসে নি কখনও। দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল, এ একটা আলাদা জগৎ যার পরিচয় সে জানত না। নানা রকম পাখি ডাকছে—কোকিল, বসন্ত-বউরি, চোখ-গেল, দোয়েল, ফিঙে, নীলকণ্ঠ। ভগীরথের অবিশ্রান্ত টুক্-টুক্-টুক্ ও ধ্বনিত হচ্ছে কোথায় যেন। প্রজাপতি উড়ছে নানা রঙের। পতঙ্গের বিচিত্র ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দূরে একটা তালগাছের ওপর শকুনি ব'সে আছে একটা। আর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে আমগাছেরা—কেউ ফলভারনত, কেউ মুকুল-ভূষিত, কেউ রিক্ত, কারও বা শাখায় কিশলয়ের শোভা। তারা নীরব ভাষায় যা বলছে তা অবর্ণনীয়। ডানা বাগানের মাঝখানে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার মনে হ'ল সন্ন্যাসীর কথা। মনে পড়ল, তিনি একদিন বলেছিলেন—পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে যিনি আছেন, তিনিই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানলে মানুষের কোন ভয় থাকে না, তিনি অভয়। এমন ভাবে বলেছিলেন যেন তিনি চেনেন তাঁকে। অথচ স্বীকার করেন না সে কথা। বলেন—পাই নি এখনও, খুঁজছি। ডানা ভাবতে চেষ্টা করল, ওই মুকুল-ভরা আমগাছ, ওই দোয়েলের গিটকিরি, ওই পতঙ্গের কর্কশ চীৎকার আর ওই শকুনির বীভৎস চেহারা—এ সবই ব্রহ্মের প্রকাশ? এদের মধ্যে মিল কোথায়? কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে একদিন।

চণ্ডী আর গণেশ এসেই চ'লে গিয়েছিল খুব বড় একটা আমগাছের তলায়। গণেশ গাছটায় উঠেছিল। ডানা দেখতে পেলে, গণেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ডানা এগিয়ে গেল। গণেশ গাছের ওপর থেকেই ফিসফিস ক'রে বললে, "আমি যেদিকে আঙুল দেখাব, সেইদিকে দূরবীন দিয়ে দেখুন। ওই যে ডালটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই ডগায় দেখুন বাটির মত ঝুলছে, তার ওপরে হলদে পাখিটা ব'সেও আছে। ওই দেখুন, উড়ে গেল।"

ডানা দূরবীন দিয়ে বাসাটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু পাখিটাকে দেখতে পায় নি।

বললে, "দেখেছি। নেবে এস। রোজ এসে খবর নিতে হবে। ওটা হলদে পাখিরই বাসা।"

গণেশ তরতর ক'রে নেবে পড়ল।

"রোজ খবর নেওয়া তো মুশকিল। ইস্কুল পালিয়ে আসা যাবে না। মাসী জানতে পারলে খাওয়াই বন্ধ ক'রে দেবে।"

"ও! মাসীমা বুঝি খুব কড়া গার্জেন?"

"আর বলবেন না। সমস্ত সকালটি তাঁর সামনে ব'সে পড়া করতে হয়। দুপুরে ইস্কুল, সেখানে আছেন রামবাবু। আসলে তিনি রাবণবাবু। একটি ভুল হ'লে আর রক্ষে নেই। বিকেলে ফিরে জলখাবার খেয়ে মাসীমার সামনে ব'সে দুখানি বাংলা, ইংরিজী হাতের লেখা লিখে তবে ছুটি। তখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন এই বাগানে এসে কি পাখির খবর নেওয়া যায়। রবিবারে কিংবা ছুটির দিনে নিতে পারি।"

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মা-বাবা কোথা?"

"তাঁরা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। মাসীই আমাকে মানুষ করেছেন।"

"তোমার মেশোমশাই কি করেন?"

"তিনিও মারা গেছেন। অমরবাবুর এস্টেটে চাকরি করতেন আগে।"

"এখন তোমাদের চলে কি ক'রে তা হ'লে?"

'অমরবাবুর এস্টেট থেকেই মাসী মাসোহারা পান। কিছু জমিও দিয়েছেন অমরবাবু।"

"তোমার মাসীমার ছেলেপিলে কটি?"

"মাসীর কোনও ছেলে হয় নি।"

চলতে চলতে কথাবার্তা হচ্ছিল। চণ্ডী চুপ ক'রে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সে বললে "গণশা প্রতিবার ফার্স্ট হয়।"

গণেশ ধমক দিয়ে উঠল, "চুপ কর, ফাজিল কোথাকার!"

চণ্ডী যেন চুপসে গেল।

এই দুটি কিশোরের সঙ্গ খুব ভাল লাগছিল ডানার। একটা গোপন মাধুর্য ধীরে ধীরে তার মনকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলছিল। তার এও মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর চারিদিকে—দূরে নিকটে এই যে এত মাধুর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে তার যেন ঘনিষ্ঠ কোন যোগ নেই। সকলের কাছেই সে যেন পর। কারোরই আপন লোক নয় সে। সবাই তাকে খাতির করে, অনেকেই তার সঙ্গে আত্মীয়ের মত কথাও কয়, খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেতেও চায় দু-একজন (যেমন আনন্দবাবু, রূপচাঁদ); কিন্তু দূরত্বটা যেন ঘুচতে চায় না। মনে হয়, সে যেন এদের মাঝখানে আগন্তুক একজন। এসেছে, আবার চ'লে যাবে। সন্ন্যাসীর কথা মনে হ'ল হঠাৎ। মনে হ'ল, আজই আবার দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে।

চণ্ডী বললে, "আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব রোজ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি গাছে উঠতে পারি না ভাল।"

"তোমাদের কাউকে আসতে হবে না। আমিই আসব এখন বিকেলের দিকে।"

"আমিও থাকব আপনার সঙ্গে। আমাকে দূরবীন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তো?"

"দেব"।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর চণ্ডী সসঙ্কোচে বললে, "রূপচাঁদবাবুর বাড়ি যাবেন?" কাছেই খুব।"

"রূপচাঁদবাবু আপিস থেকে ফিরেছেন এখন। বকুলদি ব্যস্ত আছেন। পরে যাব কোনদিন দুপুরে।"

"কবে যাবেন?"

চণ্ডীর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল। ডানা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সে আবার বললে, "দুপুরে যাওয়াই ভাল। আপনি যেদিন বলবেন এসে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল যাবেন?"

"ঠিক বলতে পারছি না।"

"কাল সকালে এসে তা হ'লে জেনে যাব। কেমন?"

"আচ্ছা।"

চণ্ডীর কেন যেন মনে হচ্ছিল, ডানার সঙ্গে বকুলবালার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারলে তার এয়ার্-গান্ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে।

গণেশ হঠাৎ বললে, "ফিঙে পাখির বাসাও দেখেছি আমি একটা। অনেকটা হলদে পাখির বাসার মত দেখতে। একবার দেখেছিলাম, একই গাছে প্রায় পাশাপাশি ফিঙে পাখি আর হলদে পাখির বাসা ছিল।"

গণেশের কথাবার্তায় ডানা বুঝতে পেরেছিল যে, ছেলেটি সত্যিই বুদ্ধিমান। তার মনে

হ'ল, অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তিনি হয়তো ছেলেটিকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে সাহায্য করবেন।

"পাখির বাসা দেখবার খুব ঝোঁক বুঝি তোমার?"

গণেশ বললে "ঝোঁক আগে ছিল না। কিন্তু অমরেশবাবু বলেছেন যে, পাখি সম্বন্ধে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখবে তাকে তিনি একশো টাকার প্রাইজ দেবেন। প্রাইজটা আমাকে নিতে হবে। অমরেশবাবু বলেছেন—বই দেখে লিখলে চলবে না, নিজের চোখে পাখিদের লক্ষ্য ক'রে লিখতে হবে। তাই সময় পেলেই পাখি দেখে বেড়াই।"

"তুমি লক্ষ্য করেছ কিছু?"

"কিছু কিছু করেছি।"

"খাতায় লিখে রেখেছ?"

"রেখেছি।"

"দেখিও তো আমাকে একদিন।"

"আচ্ছা। আমি এবার যাই। আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। ওই যে আমার বাড়ি।"

গণেশ আঙুল দিয়ে ছোট একটি মাটির বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

"ও, আচ্ছা। তোমার মাসীমার সঙ্গে এসে আলাপ করব একদিন।"

"আসবেন।"

গণেশ চ'লে গেল।

গণেশ সব দিক দিয়েই চণ্ডীর চেয়ে ভাল ছেলে। উঁচু ক্লাসে পড়ে, ফার্স্ট হয়, পাখির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে—এসবই সত্য ; কিন্তু এ সত্য ডানার কাছে এমন ভাবে প্রকটিত হওয়াতে চণ্ডী একটু মন-মরা হয়ে পড়ল। সে স্কুল-পালানো খারাপ ছেলে। এক বকুলবালা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার আশা হয়েছিল, ডানাও হয়তো দেবে। কিন্তু গণেশের মত একটা জ্যোতিষ্ক এসে পড়াতে সে একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "গণশা মাথায় মাথায় আমার মত দেখতে। কিন্তু ওর বয়স হয়েছে বেশ। ষোল পেরিয়ে গেছে—ওর মাসী বলছিল।"

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, কোনও উত্তর দিলে না। চণ্ডী আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে ডানার দিকে, আর কিছু বলা সমীচীন মনে হ'ল না তার। নীরবেই বাকি পথটুকু হেঁটে ডানার বাসার কাছাকাছি যখন এল, তখন বললে, "মাসীমা, আমি তা হ'লে এবার যাই। কাল আসব সকালে।"

"এসো। কিছু খাবে নাকি?"

"না, আমার খিদে পায় নি।"

"তবু দুখানা বিস্কুট নিয়ে যাও।"

ডানা ঘরে ঢুকে চারখানা বিস্কুট এনে দিলে তাকে। মহানন্দে চ'লে গেল চণ্ডী। ডানা ঘরে ঢুকে দেখলে, কবি টেবিলের উপর কবিতা লিখে গেছেন একটা।

"অমরবাবুর নির্দেশ অনুসারে একটি পাখির ছবি দেখে কবিতা লেখবার চেষ্টা করলাম। এই দাঁড়াল—

১

খাঁচার টিয়ার সাথে বুনোটার মিল নেই
এটা পড়ে, ওটা পড়ে না,

আসল পাখির সাথে ছবিটার মিল নেই
এটা নড়ে, ওটা নড়ে না।
কার সাথে কার কত মিল বা অমিল আছে
খুঁজি খালি দিবা-রাতি রে
হিসাবের গোলমালে বেসামাল হয়ে পাছে
ছুঁচো ব'লে ফেলি হাতীরে
এই ভয়ে ক্রমাগত কষিতেছি অঙ্ক
ওদিকে কমল ফোটে ভেদ করি পঙ্ক।

২

জীবনের পথে যেতে দেখা হ'ল যার সাথে
সে যেন রাগিণী ললিতা
কিংবা পাহাড়ি-পথে ঝরনার ধারা যেন
উচ্ছলা কল-কলিতা!
তারে ল'য়ে কি করিব ভাবিতে ভাবিতে মোর
বেলা ব'য়ে গেল হায় রে
কি লেবেল গায়ে তার জানি না মানাবে ঠিক
বিবেক যে ধমকায় রে
'ঠিক ক'রে যুক্তির তুলোটাকে ধোন্ না
ওটা তোর মাসী, পিসী, প্রেয়সী না কন্যা!'

৩

কবি কয়—দুত্তোর
দেব নাকো উত্তর!"

কবিতাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ডানা। আবার পড়ল কবিতাটা। তার অজ্ঞাতসারেই সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে, অন্তর্লীন একটা গর্ব যেন অভিব্যক্ত হতে চাইল সে হাসির রেখায়। হঠাৎ কিন্তু ভয় হ'ল তার, মনে হ'ল, সে যেন অতলস্পর্শ একটা গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বেসামাল হলেই প'ড়ে যাবে। আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। মনে হ'ল। ঘরের ভিতরেই বুঝি বিপদ্‌টা লুকিয়ে আছে। ঘর থেকে বেরিয়েই মুখে লাগল রোদের তাত, চোখে পড়ল কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় উদ্দাম বর্ণসমারোহ, কানে এল দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্ষণকালের জন্য। মনে হ'ল, সমস্ত প্রকৃতি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে; যেন বলছে—পালাচ্ছ কোথায়, পালাচ্ছ কেন, চারিদিকেই যে ফাঁদ! কৃষ্ণচূড়ার ফুলে, দোয়েলের গানে, স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে যে নাটক জ'মে উঠছে তাতে যোগ না দিয়ে পালাবার প্রবৃত্তি কেন তোমার! এই স্পষ্ট অথচ অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। মনে হতে লাগল, তার বুকের ভিতর কাঁটার মত কি যেন একটা বিঁধে আছে, যা আনন্দজনক অথচ কষ্টকর। আবার চলতে শুরু করল। সন্ন্যাসী কি আছেন এখন বাসায়? না থাকলেও খুঁজে বার করবে সে। একমাত্র ওই লোকটির কাছে গেলেই শান্তি পাওয়া যায়, মনে হয় অনেকক্ষণ রোদে হেঁটে যেন গাছের ছায়া পাওয়া গেল। বেশ দ্রুতপদে চলতে লাগল সে। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল, কি বলবে তাঁকে গিয়ে! এই তো কিছুক্ষণ আগে আম দেওয়ার ছুতোয় গিয়েছিল তাঁর কাছে,

এখন কোন্ ছুতোয় যাচ্ছে? যাওয়ার একটা সঙ্গত কারণ দিতে হবে তো। কি বলবে গিয়ে? নারীর সান্নিধ্য যিনি পছন্দ করেন না, তাঁর কাছে এমনভাবে যাওয়ার অর্থই বা কি! নিজের উপর রাগ হ'ল, মনে মনে নিজেকেই সে বলতে লাগল—নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান ক'রে নাও না, পরের কাছে সাহায্য চাইতে যাচ্ছ কেন? উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, ওঁকে বিব্রত করার মানে হয় না। তবু কিন্তু সে থামল না, চলতে লাগল। সন্ন্যাসীর বাসার কাছে এসেই চোখে পড়ল, উনি সেই শাবলটা একটা পাথরে ঘ'ষে ঘ'ষে শান দিচ্ছেন। ডানার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন, তারপর একটু মুচকি হেসে শাবলটা সরিয়ে রেখে দিলেন।

"আবার কি মনে ক'রে?"

ডানার মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধরনের উত্তর বেরিয়ে পড়ল একটা।

"একটা কথা জানতে এলাম। প্রকৃতি বলতে কি বোঝায়? ইংরেজীতে যাকে নেচার বলে, তাই কি প্রকৃতি?"

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর আবার হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

বললেন, "হঠাৎ এ আগ্রহ হ'ল কেন?"

"আগ্রহ ঠিখ নয়, কৌতূহল হয়েছে। নানারকম পাখি গান করছে, সঙ্গীনীকে ডাকছে, ফুল ফুটছে, ভ্রমর আসছে, আলোর পর অন্ধকাব, অন্ধকারের মধ্যেও অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ। একা একা ব'সে প্রকৃতির কত লীলা দেখি রোজ। নিজের মধ্যেও প্রকৃতির নিগুঢ় ষড়যন্ত্র টের পাই। তাই মনে হ'ল, প্রকৃতির রহস্যটা কি জেনে আসি একটু আপনার কাছে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি যা বর্ণনা করলে তা প্রকৃতির প্রকাশ। প্রকৃতি অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়। সতঃ, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। এই সাম্যভাব বিচলিত হ'লেই সক্রিয় হয়, তখনই সৃষ্টি-লীলা আমাদের ইন্দ্রিয়লোকে ফুটে ওঠে: অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ও আমাদের নেই।"

"তাহ'লে তার অস্তিত্ব আছে তা বোঝেন কি ক'রে?"

"অনুমান ক'রে, ধ্যান ক'রে।"

ডানা চুপ ক'রে রইল। সন্ন্যাসী একটু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ বেরুলেন না। ডানা ব'সেই রইল চুপ ক'রে। সন্ন্যাসীর কাছে এসে সে যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সাংখ্যের প্রকৃতির স্বরূপ জানতে সে সন্নাসীর কাছে আসে নি। সে এসেছিল তার মনের মধ্যে যে অস্বস্তি জাগছে, বৈশাখের উন্মত্ত প্রকৃতি যে অস্বস্তিকে নানাভাবে বাড়িয়ে তুলছে, সেই অস্বস্তির প্রতিকার-কামনায়। সে ভেবেছিল, সন্ন্যাসী তার মনের কথা বুঝবেন, কিন্তু তিনি একেবারে দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করলেন। আনন্দবাবু কবিতার ইঙ্গিতে ক্রমাগত যা বলতে চাইছেন তা ভাল লাগছে, কিন্তু তার তাৎপর্য কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না। আনন্দবাবু নিজেও সেটা বলতে চাইছেন না। একটু আগে যে কবিতাটি লিখেছেন তাতে স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—"কবি বলে দুত্তোর, দেব নাকো উত্তর।" ওঁর মনের ভিতরেও সে কথাটা স্পষ্ট নেই কি? কে জানে!

সন্ন্যাসী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হঠাৎ। এসে বললেন, "দেখ, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অশান্তি আছে। ওতে ভয় পেয়ো না। ওটা জীবনের লক্ষণ। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকলেই হ'ল,

বাকি সব তুচ্ছ। কিসের অভাবে তোমার জীবন অশান্তিময় হয়েছে, তা জানলে চেষ্টা করতাম সে অভাব পুরণ করবার। বেশ তো আছ, কিসের অভাব তোমার?"

ডানা হেসে বললে, "আপনার কাছে বলতে লজ্জা করছে।"

"কিসের লজ্জা?"

"আমার অভাব টাকার। যদি অনেক টাকা পেতাম তা হ'লে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশী থাকতে পারতাম। টাকা নেই, তাই চাকরির গ্লানি বহন করতে হচ্ছে—আপনার মত লোকের কাছে এই তুচ্ছ কথাটা বলা লজ্জাকর বইকি।"

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর হেসে বললেন, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভাবনাই সিদ্ধির রূপ ধ'রে আসে। হয়তো তোমার কামনা নিষ্ফল হবে না। আমি এখন একটু বেরুচ্ছি। তুমি বসবে নাকি?"

"না, চলুন, আমিও যাই। কোন্ দিকে যাবেন আপনি?"

"চরের দিকে। স্নান করব।"

"আপনার সেই পাখির দল আছে এখনও?"

"আছে। তবে অনেক পাখি চ'লে গেছে।"

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। অমরবাবুর পাখিগুলোর খবর নিতে হবে।"

"অমরবাবুর পাখি পোষার শখ আছে নাকি?"

"আছে। উনি পাখি পুষেছেন পক্ষীবিজ্ঞান চর্চা করবার জন্যে।"

"ও"।

সন্ন্যাসী চরের দিকে চ'লে গেলেন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দিকে চেয়ে, তারপর চ'লে গেল নিজের বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরে দেখলে, আনন্দবাবু ব'সে আছেন।

"কোথা গিয়েছিলে তুমি?"

"একটু বেরিয়েছিলাম।"

সত্য কথাটা ডানা চেপে গেল। আনন্দবাবুও আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন না, যে সংবাদটি এনেছিলেন তারই উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে ছিলেন তিনি।

"জান, নিখিল এসেছিল একটু আগে?"

"নিখিল কে?"

"ম্যাজিস্ট্রেট এখানকার। সত্যিই সে আমার ছাত্র। চমৎকার ছেলে।"

"মোকদ্দমার কথা কি বললেন?"

"ও মোকদ্দমা ডিসমিস হয়ে যাবে। কেসটা যে সাজানো তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ও। কিন্তু আমি আর এক মুশকিলে পড়েছি যে!"

"আবার কি?"

"অমরবাবু আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।"

"তিনি কাশ্মীর যাবেন লিখেছিলেন যে?"

"কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আপনি এখন যাবেন কি ক'রে? আপনি জামিনে খালাস আছেন, মোকদ্দমার দিন আপনাকে তো হাজির থাকতে হবে।"

"দেখি, নিখিলের সঙ্গে দেখা করি। নিখিল চ'লে যাবার ঠিক পরেই টেলিগ্রামটা এল। নিখিলের সঙ্গে দেখা করি, কি বল?"

"তাই করুন। তা হ'লে তো এখনই বেরুতে হয় আপনাকে। আর একঘণ্টা পরেই ট্রেন।"

"তাই নাকি? আমি উঠি তা হ'লে।"

আনন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে চ'লে গেলেন। কিছুদুর গিয়ে ফিরে এলেন আবার।

"আমি তোমাকে আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম, বলতে ভুলে গেলাম। আমি কবিতায় আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে ফেলি—না লিখে পারি না, তাতে তুমি রাগ ক'রো না বা ভয় পেয়ো না। আমার কবি-সত্তা কল্পনালোকে তোমাকে নিয়ে যে উৎসব করে, আমার সামাজিক সত্তার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। এ কথা আগেও তোমাকে বলেছি বোধহয়। আবার বলছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমার কবিতা তোমার মনে ঠিক—মানে—"

ইতস্তত ক'রে কবি থেমে গেলেন।

ডানা স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়িয়ে ছিল। কবি থামতেই চোখ তুলে বললে, "আপনার কবিতা খুব ভাল লাগে আমার। আর সেই জন্যেই বোধহয় ভয় করে।"

"জ্যোৎস্না, সন্ধ্যার মেঘ, ফুল, পাখি—এদের দেখেও ভয় করে নাকি?"

"তার মানে?"

"কথাটা ভাব। পরে আলোচনা হবে। চললুম।"

কবি চ'লে গেলেন।

ডানা স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। পাখিগুলোর তদারক করতে এখুনি তাকে বেরুতে হবে। জ্বলন্ত স্টোভের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। আনন্দবাবু যা ব'লে গেলেন তার অর্থ কি! জ্যোৎস্না, ফুল,পাখি—এরাও তো এক-একটা সৃষ্টি, কবিতাও সৃষ্টি, আনন্দবাবুর কবিতা প'ড়ে কিন্তু ভয় হয়। যেমন ব্যাঘ্র নামক পশুটি সৃষ্টি হিসাবে চমৎকার হ'লেও তাকে দেখলে ভয় হয়। আনন্দবাবুর কবিতার সঙ্গে বাঘের উপমা দিয়ে নিজেই মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু এ কথাও সে অস্বীকার করতে পারলে না যে, আনন্দবাবুর কবিতার মধ্যে এমন একটা কি যেন আছে যা ভীতিজনক, অস্বস্তিকর। ভাবতে ভাবতে নতুন কথা মনে হ'ল একটা। মনে হ'ল, তার এই চিন্তার মধ্যে অহঙ্কার কি প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই! সে নিজেকে এমন মোহিনী রূপসী ব'লে কেন ভাবছে? আনন্দবাবুর মত বিজ্ঞ লোক তাকে দেখে বেসামাল হয়ে পড়বেন—এই কুৎসিত চিন্তা তার মনে আসছেই বা কেন? আনন্দবাবু কবিতায় যা-ই লিখুন, তাঁর ব্যবহারে কোন অশোভনতা তো সে লক্ষ্য করে নি। ....কবিতায় কবিরা একটু বাড়াবাড়ি ক'রেই থাকেন। সে বাড়াবাড়িকে সত্য মনে করা হাস্যকর নয় কি? সে কি কর্পূরলতা, না, মন্দারমালা! উচ্ছলা কলকলিতা পাহাড়ী ঝরণার সঙ্গেই বা তার মিল কোথায়! এই অসম্ভব উদ্ভট ধারণা কেন তার মনে আসছে! কেন সে ওই কবিতাগুলোকে নিজের সঙ্গে জড়াচ্ছে! কেন? হঠাৎ রূপচাঁদবাবুর কথা মনে পড়ল। ওই লোকটির আচরণে কিন্তু প্রচ্ছন্ন কিছু নেই। ধূর্ত শিকারী। একটা কথা মনে হওয়াতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। রূপচাঁদবাবুর অভব্যতাকে সে যদিও প্রশ্রয় দেয় নি, কিন্তু তার বর্বরতাটা মনের নিভৃতে উপভোগ করেছে সে। আশ্চর্য।

চায়ের জলটা ফুটে উঠল।

৯

ট্রেন খুব ভোরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। তখনও সূর্য ওঠে নি। কবি প্রত্যাশা করেন নি যে, এত ভোরে অমরবাবু স্টেশনে আসবেন তাঁকে নিতে। তিনি গ্র্যান্ড হোটেলের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেই ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে ধরতে হবে—এই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন কবি। ধরতে যদি না পারেন, তা হ'লে কি অকুল পাথারে যে পড়বেন তা ভেবেও চিন্তিত ছিলেন একটু। যে লোক সিমলা থেকে হঠাৎ কলকাতা চ'লে আসতে পারে,তার পক্ষে কলকাতার হোটেল ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাওয়া অসম্ভব নয়। অমরবাবুকে সশরীরে স্টেশনে দেখে আনন্দবাবু শুধু আনন্দিত হলেন তা নয় একটু অবাকও হলেন।

"জিনিসপত্র খুব বেশী আছে নাকি সঙ্গে?"

"না, স্যুটকেস আর বিছানাটা।"

"কবিতার খাতাখানা এনেছেন তো?"

"এনেছি।"

"এইখানেই হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে তা হ'লে সোজা এখান থেকেই যাওয়া যাক।"

"কোথা যেতে হবে?"

"সল্টলেক।"

কবির চোখে বিস্মিত দৃষ্টি দেখে হেসে ফেললেন অমরবাবু।

"আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে, না?"

"সিমলা থেকে হঠাৎ এখানে এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন, তারপর দুজনে মিলে সল্টলেকে যাচ্ছি, একটু দুর্বোধ্য বইকি!"

অমরবাবু ব্যাপারটা যেন উপভোগ করলেন মনে মনে, ছোট ছেলেরা নিজেদের জানা হেঁয়ালী অপরকে সমাধান করতে ব'লে যেমন মজা উপভোগ করে অনেকটা তেমনি। কবির দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, "হোরেস অ্যালেকজাণ্ডারের নাম শুনেছেন?"

"না। কে তিনি?"

"একজন বড় পক্ষীবিজ্ঞানী। খঞ্জন-স্পেশালিস্ট। তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে। হঠাৎ সিমলায় চিঠি পেলাম, তিনি কলকাতায় আসছেন দুদিনের জন্যে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সৌভাগ্য। তাই কালবিলম্ব না ক'রে চ'লে এলাম। কাল আর পরশু—দুদিন তাঁর সঙ্গে সল্ট লেকে ঘুরেছি, নানারকম পাখি দেখলাম, অনেক পাখি এর আগে দেখিই নি। অ্যালেকজাণ্ডার কাল চ'লে গেছেন। আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম দুটো কারণে। প্রথম, আপনাকেও পাখিগুলো দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়, আপনার আর ডানার চিঠিতে খবর পেয়েছিলাম যে, আপনি কোন এক খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। আমার ভয় ছিল, আপনি হয়তো আসতেই পারবেন না। আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘামাবার মত যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা রত্না ঘামাবে। সে এতক্ষণ ডানার কাছে পৌঁছে গেছে সম্ভবত। এবার আশাকরি আর কিছু দুর্বোধ্য ঠেকছে না? চলুন, সোজা বেরিয়ে পড়া যাক এখান থেকে। আগে কিছু খেয়ে নিন।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "সল্টলেকটা কোথায়?"

"বেঙ্গল কেমিক্যালের পিছনে। সল্টলেকের বাংলা নাম হচ্ছে ভাঙড়, প্রচুর পাখি আছে মশাই, স্বদেশী বিদেশী দুই-ই। আপনি গেছেন কখনও?"

"না। কখনও দরকার পড়ে নি।"

"চমৎকার জায়গা। জলের মধ্যে আল-বাঁধা জমি, তা ছাড়া জলা, ডোবা, ঝিল, হ্রদ সব একসঙ্গে পাবেন। আবার ওর ভিতর বাবলা গাছও আছে, ছোট বড় ঝোপঝাড়ও আছে, নল বন, নানাজাতের শর, হোগলা, শ্যাওলা, দেশী পানা, কচুরিপানা—হরেক রকম জিনিস দেখবেন সেখানে। আজ বিশেষ ক'রে গ্রেট মার্শ ওয়ার্বলার (Great Marsh Warbler) দেখাতে চাই আপনাকে। দেখতে বোধহয় পাবেন না, ডাক শুনেই ফিরে আসতে হবে। নল বনের ভিতর ঢুকে থাকে ওরা। চলুন, যাওয়া যাক।"

স্টেশনের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে সল্টলেকের উদ্দেশ্যে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। খাল পেরিয়ে তবে সল্টলেকে পৌঁছতে হবে। পারাপার করবার জন্য খেয়া আছে। কবি আর বিজ্ঞানী খেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"দেখুন, দেখুন—"

"কই, কি?"

"উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক।"

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলেন।

কবি বললেন, "শালিক অনেক দেখেছি।"

"কিন্তু এমন দল বেঁধে এত উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন? সাধারণত সকাল বেলায় ওরা এমন ক'রে উড়ে বেড়ায়। এক্সারসাইজ করে সম্ভবত। আগেও লক্ষ্য করেছি।"

কবি চুপ ক'রে রইলেন।

অমরবাবু বলতে লাগলেন, "পাখিদের নানাভাবে লক্ষ্য করলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ধরুন, এই শালিকরাই সমস্ত দিন কখন কি ভাবে চলাফেরা করে তার একটা রেকর্ড যদি রাখা যায়, অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। সেদিন আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। একটা বাগানে রোজ যেতাম। যখনই ভোরে গেছি তখই দেখেছি, 'ফটিক জল' পাখিরা এ-গাছ ও-গাছে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একদিন যেতে একটু বেলা হ'ল, দেখি, ফটিক-জল একটিও নেই, ঘুঘুর দল এসেছে। মনে হ'ল, প্রত্যেক পাখির বোধহয় খেলা করবার নির্দিষ্ট সময় আছে এক-একটা। কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য না করলে অবশ্য ঠিক বলা যায় না। আপনাকে আইডিয়াটা দিয়ে দিলাম, ফিরে গিয়ে লক্ষ্য করবেন তো যদি সময় পান। জমিদারির ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিব্রত হতে হচ্ছে না তো! ও নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না, আমলা-গোমস্তারা যা পারে করুক, আপনি শুধু একটু নজর রাখবেন। বাস্। বেশী গোলমাল দেখেন তো রত্নাকে খবর দিয়ে দেবেন। ও এসব ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ভাল বোঝে। চলুন এবার।"

খেয়াটা এসে ভিড়ল। যাত্রীর দল নেমে গেল। ঝুড়ি-মাথায় স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি। গ্রাম থেকে তরি-তরকারি মাছ নিয়ে যাচ্ছে শহরের বাজারে। একজনের সঙ্গে একটি ছাগ-শিশুও ছিল। কবি আর বিজ্ঞানীর সঙ্গে একজন মৎস্য শিকারীও উঠলেন। ওপারে পৌঁছে বেশ কিছুদূর হাঁটতে হ'ল আল ধ'রে।

"দেখুন, দেখুন, কি বলুন তো ওগুলো? বাইনাকুলারটা নিয়ে ভাল ক'রে দেখুন।"

বাইনাকুলারটা নিয়ে কবি দেখতে লাগলেন।

"বক মনে হচ্ছে।"

"গ্রে হেরন (Grey Heron)। ওরা খেয়ে ফিরছে সম্ভবত। ওরা খুব ভোরে একবার খায়, আর একবার খায় সন্ধ্যার দিকে। সমস্ত দিন কোনও গাছে নিঝ্‌ঝুম হয়ে ব'সে থাকে।"

কবি যতক্ষণ দেখা গেল হেরনগুলিকে দেখলেন।

তারপর বললেন, "এখানে কোথাও যদি বসবার জায়গা পাওয়া যেত একটু, বেশ হ'ত।"

"হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না কি? অনেক হাঁটতে হবে এখন।"

"হাঁটতে পারব, বসবার জায়গা খুঁজছি কবিতা লিখব ব'লে।"

"গুড। আছে জায়গা,—ওই দেখুন।"

দূরে একটি কুটির ছিল। অমরবাবু সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

"ও তো বেশ ভাল জায়গা। চেনা-শোনা আছে নাকি আপনার সঙ্গে? "

"না, তবে চেনা শোনা ক'রে নিতে কতক্ষণ। এটা ভারতবর্ষ—সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন মশাই? তা ছাড়া কবি-গুরুর সেই কবিতাটাই বা ভুলে যাচ্ছেন কেন—কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই? আসুন।"

অমরবাবু হনহন ক'রে, প্রায় ছুটে চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে ঘুরে বললেন, "বাইনাকুলারটা গলায় ঝুলিয়ে রাখুন।"

কবির মনে যে কবিতার ভাব জেগেছিল, সেইটেতে তা দিতে দিতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন তিনি। আলের উপর দিয়ে বেশি জোরে চলা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। কুটিরের কাছাকাছি এসে কবি দেখলেন, কুটিরের মালিক অমরবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ গদগদ হয়ে পড়েছেন। মনে হ'ল, লোকটি দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে সের পাঁচেক দুধ ছিল,অমরবাবু সমস্তটা কিনে নিয়েছেন। কবি শুনলেন, অমরবাবু বলছে—"দুধটা একটু গরম ক'রে দিতে হবে কিন্তু। আর গোটা দুই গেলাস, আর একটু জল চাই।"

ঝোলা-গোঁফ দুগ্ধ-ব্যবসায়ী সবিনয়ে বললেন, "সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে বাবু। আপনারা ততক্ষণ পাখি দেখুন, আমি পীতুকে ডেনে আনি। সে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে আপনাদের। এক শিকারী বাবু বন্দুক নিয়ে এসেছেন, তার পিছু পিছু ঘুরছে শালা।"

"পীতু তোমার চাকর বুঝি?"

"আমার ছেলে বাবু। চাকর রাখবার মত পয়সা আছে কি বাবু? নিজেদের কাজ নিজেরাই ক'রে নিই। দুধ কেনা-বেচা ক'রে কায়ক্লেশে সংসার চালাই কোন রকমে। আপনারা এই চৌকিটাতে বসুন। আমি যাব আর আসব।"

"তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

অমরবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

"আমার নাম নীলাম্বর ; 'নীলু' ব'লেই ডাকবেন আমাকে। আমার ছেলের নাম পীতাম্বর, ডাকনাম পীতু।"

"ও—"

"পীতুকে ডেকে নিয়ে আসছি এক্ষুনি। আপনারা বসুন।"

নীলাম্বর চ'লে যেতেই অমরবাবুর চোখে শিশুসুলভ দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল।

"আপনি ওই চৌকিটাতে ব'সে ততক্ষণ যা মনে এসেছে লিখে ফেলুন। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ওই যে ওই গাছের ডগায় ব'সে আছে ওটা কি? ঠিক চিল ব'লে মনে হচ্ছে

না। আর একটু এগিয়ে না গেলে ফোকাস করতে পারব না। আপনি কি বিষয়ে লিখবেন এখন? খুব গ্র্যান্ড ভাব এসে গেছে নিশ্চয়?"

"ওই বকগুলোর কথা শুনে দু-চার লাইন মনে এসেছে, তাই লিখে রাখব।"

"হেরনদের সম্বন্ধে লিখবেন? তা হ'লে হেরনদের কোর্টশিপের ব্যাপারটা শুনে নিন। আর্মস্ট্রং সাহেবের লেখা একটা বইয়ে পড়েছিলাম। হেরন-যুবা প্রিয়ার সন্ধান করবার আগে ঠিক করে, কোথায় বাসা বাঁধবে। সেটা ঠিক হয়ে গেলে হেরন যুবা সেই নির্বাচিত বৃক্ষের একটি শাখায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শব্দ করে 'উ উ উ উ'। যতক্ষণ না প্রিয়ার দেখা পায়, ততক্ষণ ক্রমাগত এই রকম শব্দ ক'রে যায় সে।... আমি চললুম, এক্ষুনি আসছি।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, হেরনের বাংলা কি হবে? বক?"

"হেরন—বড় বক। কঙ্ক বা বলাকা বলতে পারেন। আমি চললুম। দেখে আসি, ওটা কি! আপনি চটপট লিখে ফেলুন, অনেক ঘুরতে হবে।"

অমরবাবু বাইনাকুলারটা গলায় দুলিয়ে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন।

কবি চারিদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা প্রণিধান করলেন। কবিতা লেখবার উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই। কিন্তু চৌকিতে ব'সে হাঁটুর উপর খাতা রেখে লেখা যাবে না। পাশেই একটা চট প'ড়ে ছিল। সেইটে মাটিতে পেতে বসলেন, আর চৌকিটাকে করলেন টেবিল। ব্যবস্থাটা বেশ মনোমত হ'ল। বাগিয়ে বসলেন। পকেট থেকে খাতা আর কলম বেরুল। মুখ ছুঁচোল ক'রে হাঁটু দুলিয়ে ভাবলেন খানিক্ষণ, তারপর লিখতে শুরু করলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

বিজ্ঞানী কষে শুধু তথ্যের অঙ্ক
কবি বলে—পাখি নয়, মহর্ষি কঙ্ক!
কবি খোঁজে কবিতা, বিজ্ঞানী তথ্য,
কঙ্কই জানে শুধু কোথা সার সত্য।
সকালেই খাওয়া সেরে চ'লে যায় বাসাতে
সন্ধ্যায় খাবে ব'লে ব'সে থাকে আশাতে।
চিত্তে তোলে না সুর কবিতার মাধুরী
তার ধ্যান চুনোপুঁটি মৎস্য বা দাদুরী।
'হু' 'উ' ডাকে উড়ে আসে প্রিয়া নভোচারিণী
সু-অণ্ড-প্রসবিনী অতি মনোহারিণী।
বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বেড়ে যায় বংশ
ছানা নয়, আহা, যেন কুল-অবতংস!
এই সত্যের নীড়ে বাস করে কঙ্ক
এই কাব্যের তালে বাজে তার ডঙ্ক।
বাজিতেছে চিরকাল যুগে ও যুগান্তে
হারাইয়া গেল কত ডারবিন্ দান্তে।

কবিতাটা লিখে কবি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর খাতার পাতা ওলটালেন। উলটেই আর একটা কবিতা চোখে পড়ল। নিজেরই ছেলের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল যেন। অদ্ভুত লাগল। ভাবটাও অদ্ভুত।

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুরগী
চড়াই শকুনি আর কাকেরা
বিহঙ্গ-সমাজের এই নব-শাকেরা,
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ ঝাণ্ডা
অভিজাত পাখিদের ক'রে দেবে ঠাণ্ডা!
ময়ূর, ফটিক-জল, দোয়েল হলদে পাখি
আমেরিকা যাবে ব'লে খুঁজিতেছে 'ভিসা' নাকি'!
দুধরাজ-দম্পতি
কম্পিত চিত অতি,
নীলকণ্ঠের নীল হইতেছে গাঢ়তর
তিতির বটের হুপো ভয়ে কাঁপে থরথর,
খঞ্জন, টিট্টিভ
ভয়ে বুক টিপটিপ!
থিরথিরা ছোটপাখি
কাঁপিতেছে থাকি থাকি।
কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া
চোখ গেল চোখ গেল—ফুকারিছে পাপিয়া।
টুনটুনি বুলবুল
ঘামিতেছে কুলকুল।
শুধু কাঠঠোক্‌রার শোনা যায় ঝঙ্কার—
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও,
চুপি চুপি ডাকে—বউ কথা কও।
দরজি বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসে শুনিয়া।

কবিতাটা নিজেরই ভাল লাগে নি ব'লে ডানাকে শোনানো হয় নি আর। আর একটা অদ্ভুত কবিতাও চোখে পড়ল। লাল কালিতে লেখা। পড়তে পড়তে মুচকি হাসি ফুটল—কেন লিখেছিলেন এসব! রাবিস যত!

বল দেখি ভাই—ডাব,
বলত যদি সে,
অমনি হেসে জবাব দিতাম
তোমার সঙ্গে ভাব।
ছেলেবেলায় সহজ ছিল সব
এখন সবাই 'স্নব'।
শিকড়সুদ্ধ নারকেল গাছটাও এখন যদি আসে
ফিরবে হতাশ্বাসে,
জমবে না ঘটকালি
ঘটবে না তা 'ডাব' বললেই ঘটত যাহা খালি।

কাটাকুটির ভিতর আর একটা কবিতা চোখে প'ড়েও মজা লাগল খুব।

কবি। [উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যের প্রতি] ওরে ভুতো—
পাখিগুলো তাড়া তাড়া, মার, জুতো।
[চড়ুই পাখির প্রতি, ভদ্রতা সহকারে]
চড়ুই পাখি, চড়ুই পাখি,
তোমার না হয় নাই শরম।
কিন্তু তোমার বোঝা উচিত
আমি একটা ভদ্রলোক
আমার দুটো আছেও চোখ
আমার সামনে না-ই করলে
এমনধারা কান্ড চরম।
[ঈষৎ ভাবিয়া এবং ইতস্তত করিয়া]
একটা কথা হচ্ছে মনে, বলছি সেটা,
আমার ঘরের আল্‌সে জুড়ে করছ যেটা
সেটাই হবে শিল্প-সৃষ্টি
সংস্কৃতি কিংবা কৃষ্টি
সভ্য ভাষা যদি একটা শিখতে পার
করছ যা তা গল্পে যদি লিখতে পার
করতে পার বাজার গরম
পটাৎ ক'রে পক্ষী-কবি হতেও পার
কেউ তোমাকে বলবে—লবেঙ্গ,
কেউ বা হয়তো বলবে—মম্‌।

কবি তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা উলটে চলেছিলেন। অমরবাবু যে 'এক্ষুনি আসছি' ব'লে অনেকক্ষণ দেরি করছেন—এ খেয়ালই ছিল না তাঁর। তিনি পুরনো কবিতাগুলোই আবার কাটাকুটি করছিলেন। হঠাৎ অমরবাবু এসে হাজির হলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত কলেবর, সঙ্গে চার-পাঁচটা ছোঁড়া।

"লেখা হ'ল আপনার?"

"হয়েছে।"

"উঠুন তা হ'লে। অনেক জিনিস দেখাব আপনাকে আজ। গাছের ওপর ওটা কি ব'সে আছে জানেন? চিল নয়, কোড়াল—হোয়াইট টেল্‌ড্‌ ফিশিং ঈগল্‌ (White Tailed Fishing Eagle), সংস্কৃত ভাষায় বললে বলতে হয়—মৎস-গরুড়। ভাঙড়ের জলচারী পাখিদের রাজা। প্রায় তেত্রিশ ইঞ্চি লম্বা। চলুন, আর দেরি করবেন না।"

কবি প্রশ্ন করলেন, "এ ছেলেগুলি কে?"

"এদের ডেকে নিয়ে এলাম ওদিকের গাঁ থেকে। দুধ খাওয়াব এদের। পাঁচসের দুধ না হ'লে হবে কি? এদের সাহায্যেও দরকার আমাদের। নল বনের ভেতরে যে সব ওয়ার্বলার ঢুকে আছে তাদের তাড়া না দিলে বেরুবে না, তাড়া দিলেও বেরুবে কিনা সন্দেহ। এরা ঢিল মারবে। চলুন বেরুনো যাক। চড়চড় ক'রে রোদ উঠছে।"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। পিছনে পিছনে ছোঁড়ার দল চলল। আলের ওপর দিয়ে কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে অমরবাবু বললেন, "কি কি দেখাব আপনাকে তার মোটামুটি

একটা ফর্দ ক'রে ফেলেছি—এই দেখুন। মানে, এই পাখিগুলো এখনও এখানে আছে। খঞ্জন কয়েক রকমই আছে। বিদেশ থেকে এ দেশে যারা শীতকালে এসেছিল, তাদের এবার নিজের দেশে ফেরবার সময় হয়েছে। সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে এবার ওরা ডিম পাড়বে। সেই জন্যে ওরা সবাই এবার ব্রিডিং প্লুমেজে (Breeding Plumage) অর্থাৎ বর-বেশে সেজেছে। এদের মধ্যে এক রকম হচ্ছে হলদে খঞ্জন। এদের মধ্যে আবার তিনটি উপজাতি আছে। নীল মাথা, ফিকে ধূসর মাথা, গাঢ় ধূসর মাথা। এছাড়া আর এক রকম হলদে খঞ্জন আছে যাদের মাথাটাও হলদে। এরা ভিন্ন জাত। পঞ্চম হচ্ছে গ্রে ওয়াগ্‌টেল (Grey Wagtail)—এও ভিন্ন জাত। সব দেখতে পাবেন আজ। খঞ্জন ছাড়া আর এক রকম নতুন পাখি দেখাব, যা আপনি দেখেন নি কখনও—ওয়ার্বলার (Warbler)। এদের বাংলা নাম দিয়েছি কলকলানি। ক্রমাগত কলকল করে। পাঁচ রকম আছে দেখলাম—স্ট্রায়েটেড মার্শ ওয়ার্বলার (Striated Marsh Warbler), গ্রেট্‌ রীড্‌ ওয়ার্বলার (Great Reed Warbler), জাংগল্‌ রেন্‌ ওয়ার্বলার (Jungle Wren Warbler), ইণ্ডিয়ান রেন ওয়ার্বলার (Indian Wren Warbler) প্যাডি ফিল্‌ড্‌ ওয়ার্বলার (Paddy Field Warbler)—"

অমরবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

"আমার নোট-বুকের কয়েকটা পাতা খুলে প'ড়ে গেছে দেখছি।"

"এই যে আমি কুড়িয়ে রেখেছি।"—একটি ছেলে খান কয়েক পাতা ছেঁড়া কামিজের পকেট থেকে বার করলে।

"বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে! চল, খাওয়াব তোমাদের।"

অমরবাবু তার হাত থেকে পাতাগুলি নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বলতে লাগলেন, "এ সব ছাড়া আর যা আছে তা আপনি দেখেছেন সম্ভবত। টিট্টিভ, গাংচিল, বাজ, জলপিপি, ফেজান্ট টেল্‌ড্‌ জ্যাকানা আছে দেখলাম একটা, ওর দিশী নাম পিউয়া। পিউয়া এখন বর-বেশে সেজেছে, একটা তুতীও দেখেছি, চলুন, অনেকক্ষণ ঘুরতে হবে।"

গতিরোধ করতে হ'ল আবার। দেখা গেল, নীলাম্বর পীতাম্বরকে নিয়ে ফিরছে। নীলাম্বর অবাক হয়ে গেল, একটু অপ্রস্তুতও হ'ল যেন।

"আপনারা সব চ'লে যাচ্ছেন যে?"

"আসছি এখুনি, তুমি ততক্ষণ দুধটা গরম কর না।"

"কতক্ষণে ফিরবেন? দুধ জুড়িয়ে যাবে যে!"

'আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। একটু পরে না হয় গরম ক'রো।"

অমরবাবু নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন একবার।

"চলুন, যাওয়া যাক।"

আবার তিনি তাঁর নোট-বুক থেকে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। বাইনাকুলারটা তুলে ফোকাস করলেন আকাশের দিকে, ক'রেই নাবালেন সেটা চোখ থেকে. চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল উত্তেজনায়।

"ওই দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না?"

কবি বাইনাকুলার লাগালেন চোখে. তারপর বললেন, "চিলের মত মনে হচ্ছে।"

"চিলের মত, কিন্তু চিল নয়। ওর পেটের তলাটা দেখুন ভাল ক'রে, আর গলার পাশটা দেখুন। পেটের তলাটা দেখেছেন?"

"দেখেছি, সাদা। গলার পাশে কালো মত একটা দাগ রয়েছে।"

"দ্যাট'স ইট। চিলের ও-রকম থাকে কি? বরং হোয়াইট আইড বাজার্ড ঈগলের (White Eyed Buzzard Eagle) সঙ্গে কিছু মিল আছে। কিন্তু বাজার্ড অনেক ছোট ওর চেয়ে। অস্প্রে (Osprey) মশাই। উৎক্রোশ, কবি কালিদাস যাকে কুররী ব'লে বর্ণনা করেছেন। সেবার শীতকালে আপনাকে দেখিয়েছিলাম, মনে নেই? এরা সব শীতের অতিথি। গ্রীষ্মকালে ওরা ইউরোপে চ'লে যায়। ইউরোপে গিয়ে এতদিন ওর বাসা বাঁধা উচিত ছিল। ভাঙড়ের মাছের লোভ ছাড়তে পারছে না বোধ হয়।"

অমরবাবু আরও বোধ হয় কিছু বলতেন, কিন্তু নীলাম্বর-পুত্র পীতাম্বর ছুটে এসে বাধা দিলে।

"দুধটা আপনারা খেয়েই যান। বাবা বললেন, তা না হ'লে দুধ হয়তো খারাপ হয়ে যেতে পারে। রাত্রের বাসি দুধ তো।"

"চলুন, ঝামেলা মিটিয়েই ফেলা যাক।"

অমরবাবু আবার সদলবলে ফিরলেন কুটিরের দিকে। ঘুঁটে আর কাঠ জ্বালিয়ে দুধটা গরম ক'রে ফেললে নীলাম্বর। অমরবাবু প্রত্যেকটি ছেলেকে দু-তিন গ্লাস ক'রে দুধ খাওয়ালেন।

কবি বললেন, "আমার মশাই খিদে নেই এখন।"

"যা পারেন খেয়ে নিন। সমস্ত দিন ঘুরতে হবে তো। মিল্ক্ ইজ এ গুড ফুড। একটু খান।"

এক গ্লাশ খেতে হ'ল কবিকে। অমরবাবু উবু হয়ে ব'সে ঢকঢক ক'রে প্রায় এক ঘটি দুধ খেলেন।

নীলাম্বর বললে, "আরও খানিকটা দুধ প'ড়ে রইল যে?"

রুমালে মুখ মুছে অমরবাবু হেসে বললেন, "ওটুকু তোমরা দুজনে শেষ ক'রে ফেল। চলুন এবার। আহার-সমস্যার সমাধান হ'ল, নিশ্চিন্ত চিত্তে এবার পাখি দেখা যাক।"

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পরিশ্রান্ত কবি একটা গাছের ছায়ায় এসে বসেছেন। অমরবাবু তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘন নলখাগড়া ঝোপের পাশে। ছেলেগুলো তখনও ঝোপের ভিতর ইট ফেলছে মাঝে মাঝে। একটিও কলকলানি পাখি দেখা যায় নি তখনও। নলখাগড়ার ভিতর থেকে কিন্তু অবিরাম শব্দ হচ্ছে, গোড়া থেকেই হচ্ছিল। চক্ চক্ চক্ চক্—কেরে কেরে ক্রেৎ ক্রেৎ—চক্ চক্—পৃৎ পৃৎ পৃতিক—ক্রেৎ ক্রেৎ ক্রেৎ। হঠাৎ মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে। সারা দুপুর এই শব্দ শুনে কবি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে একটা কবিতার কয়েকটা ছত্র ঘুরে-ফিরে আসা-যাওয়া করছিল অনেকক্ষণ থেকে। পকেট থেকে খাতা কলম বার ক'রে হাঁটুর উপর খাতাটা রেখে কবিতাটা লিখে রাখলেন। এখুনি না লিখে ফেললে ভুলে যাবেন পরে—

জয় জয় জীবনের জয় জয়
নলখাগড়ার বন বাঙ্ময়।
বাঙ্ময় আকাশের শূন্য
ক্ষিতি অপ্ মরুৎ যে পূর্ণ
রোদে জ্ব'লে বাণী কার পুণ্য
    নলখাগড়ার বন কিবা কয়!
জয় জয় জীবনের জয় জয়!

"দেখুন, দেখুন, দেখুন—একটা বেরিয়েছে।"

অমরব্বাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন হঠাৎ।

ফুডুৎ করে একটা পাখি বেরিয়েই আবার ঝোপে ঢুকে পড়ল। অমরবাবু সাগ্রহে ছুটে এলেন।

"দেখেছেন পাখিটা? অলিভ ব্রাউন রঙ, ঠোঁটটা কালচে বাদামী?"

কবি দেখতে পান নি। কিন্তু বিজ্ঞানীকে সে কথা বললে তিনি বড়ই মর্মাহত হবেন, তাই বললেন, "দেখেছি, তবে ভাল ক'রে দেখিনি।"

"ওর চেয়ে ভাল ক'রে দেখা শক্ত। মার্শ ওয়ার্বলারটা দেখেছেন ভাল ক'রে আশাকরি। অনেকটা ভরত পাখির মত উড়ল, না? গানটিও সুন্দর, হুইট্—হুইট্—টু—টু—হুইট্—হুইট্—"।

ছেলেগুলো নলখাগড়ার ঝোপে আবার ঢিল ছুঁড়ছিল। দুধ খাইয়ে অমরবাবু তাদের কেনা গোলাম ক'রে ফেলেছিলেন একেবারে। অমরবাবু বললেন, "ওই ঝোপটার ওপর আসুন আমরা বাইনাকুলার ফোকাস ক'রে ব'সে থাকি। কখন ফট ক'রে বেরুবে বলা যায় না তো!"

দুজনে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ব'সে রইলেন। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, গ্রীষ্মের এই দুপুরে কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে আমরা কি খুঁজছি? পাখি, না, আর কিছু?

১০

ডানা আবার সন্ন্যাসীর কাছেই গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না, কারণ আনন্দমোহনবাবুর চ'লে যাওয়ার ঠিক পরেই রূপচাঁদ এসে হাজির হয়েছিলেন আবার। রূপচাঁদের ব্যবহারে কোনরকম অশোভনতা ছিল না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে শাণিত ছুরিকার ঝলক চকমক ক'রে উঠছিল যেন মাঝে মাঝে। যাওয়ার আগে তিনি ব'লে গিয়েছিলেন, "এখন আমি চললুম। কিন্তু আবার আসব। একবার নয়, বার বার। ওই নীলকণ্ঠ পাখিটা তার সঙ্গিনীকে ঘিরে যে উৎসব করছে, একবার উড়ে চ'লে যাচ্ছে দূরে আবার ফিরে আসছে দ্বিগুণিত উৎসাহে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত ক'রে, তা কি দেখতে পাও না তুমি? বাইনাকুলার চোখে দিয়ে কি দেখ তা হ'লে? ওইটেই তো দেখবার মত একমাত্র সত্য। শুধু পক্ষী জগতে নয়—সর্বত্র। আর একটা জিনিসও এতদিন তোমার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত ছিল, চোখে পড়া উচিত ছিল অন্তত। পাখিদের মধ্যে এটা কি তুমি লক্ষ্য কর নি যে, যে পুরুষপাখিটা বেশি শক্তিমান, সে-ই অবশেষে প্রণয়-দ্বন্দ্বে জয়ী হয়? শক্তিরই জয় সর্বত্র। বিদেশের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক—সবাই এই কথাই বলছেন। ডারউইন 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' আর নীট্‌শের 'সুপারম্যান' একই তথ্যের দুটো দিক। আমাকে তুমি কি অক্ষম মনে কর? শক্তির পরিচয় যেদিন চাইবে, যেমন ভাবে চাইবে, পাবে। এমনও হতে পারে যে, না চাইলেও পাবে। এখন চললুম, কিন্তু আবার আসব। হয়তো অসময়ে অতর্কিতে আসব।"

ডানার দিকে চেয়ে একটু হেসে চ'লে গিয়েছিলেন তিনি। ডানা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ব'সে ছিল খানিকক্ষণ, তারপর সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল।

সমস্ত শুনে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "ইতিহাস পড়েছ তুমি?"

"পড়েছি কিছু কিছু।"

"তা হ'লে তোমার জানা উচিত, ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা অসভ্যতার লক্ষণ। মানুষ যখন

খুব অসভ্য ছিল, তখন তার পশু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। কিন্তু চারদিকে যে অদৃশ্য শক্তির প্রতাপ সে অনুভব করত, যার প্রভাব সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারত না, যার প্রকাশ সে দেখত ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, বজ্রে-বিদ্যুতে. দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, হিংস্র জন্তুতে, তার রূপ ভয়ঙ্কর ছিল তার কাছে। সেই ভয়ঙ্কর কল্পনা যখন দেবতারূপে মূর্ত হ'ল তাদের সমাজ-জীবনে, তখন সে দেবতাও হ'ল ভয়ঙ্কর। তার রূপ হ'ল রক্তপায়ী পিশাচের রূপ। যে সব সভ্যতা অতি প্রাচীন, যেমন ধর—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, উর, তাতে তুমি কোনও সুন্দর দেবতার সাক্ষাৎ পাবে না। সবই বীভৎস। পশু আর মানুষে মিলিয়ে, দুরকম পশুর সংমিশ্রণ ক'রে যে সব দেবতার মূর্তি তারা নির্মাণ করেছিল, তা ছিল তাদের ভয়েরই প্রতীক। মানুষ আরও যখন সভ্য হ'ল, তখন ভয় কমতে লাগল। ও-দেশে বোধ হয় গ্রীসেই প্রথম মানুষের রূপে ভগবানকে কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে বোধ হয় তারও আগে। আমাদের দেশে চিন্তাধারা আরও নানাভাবে এগিয়েছে। ভগবানকে আমরা নিজেদের মধ্যেই পেয়েছি, আমরাই বলেছি—সোহং, আমরাই জেনেছি—প্রেমই ভগবান, আমরাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি। যদিও নানাভাবে নানা সাধক নানা পথে এগিয়েছেন, প্রত্যেকের পথ আলাদা আলাদা হয়েছে, হয়তো বিপরীতমুখী হয়েছে, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই একমত—ভয়কে কেউ আমল দেন নি, ভয়ের স্থান কোথাও নেই। আমাদের দেশে আত্মার অপব নামই অভয়। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? রূপচাঁদবাবু কি করবেন তোমার?"

"যদি অপমান করেন?"

"সম্মান মানেই আত্মসম্মান। তুমি ছাড়া তোমার সম্মান আর কেউ তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।"

"যদি জোর ক'রে গায়ে হাত দেন?"

"দিলেই বা। তোমার যদি খারাপ লাগে, বাধা দেবে। তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই প্রতিবাদ করবে।"

"তা তো করবই। কিন্তু আমার শক্তি আর কতটুকু বলুন?"

"যতটুকু আছে প্রতিবাদ করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তোমার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ও-লোকটা যদি তোমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে, তা হ'লে তোমার আত্মসম্মান নষ্ট হবে না। তা ছাড়া, তোমার যে আসল 'তুমি' তার গায়ে কেউ হাত দিতেই পারে না। তোমার দেহটা তুমি নও। তুমি ভয় ত্যাগ কর। তা ছাড়া, তোমার কাছে চাকর থাকে তো একজন?"

"তা থাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ, চাকরটাও ওঁর দলে। উনিই যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন লোকটাকে। সেদিন দেখলাম, একটা রঙিন জামা আর জুতো কিনে দিয়েছেন। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না।"

সন্ন্যাসী আবার কিছুক্ষণ হাসিমুখে থেকে বললেন, "আত্মবিশ্বাস ছাড়া আর কোনও বিশ্বাসই টেকে না শেষ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে আস্থাবান হও, ভয় পেয়ো না। ভয়টা মিথ্যা, একমাত্র সত্যই অভয়।"

"আপনি আমার কাছে গিয়ে থাকবেন চলুন। আমি বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি।"

"পরিষ্কার আমি নিজের হাতেই ক'রে নিতে পারি। কিন্তু তোমার ওখানে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বাধা আছে।"

"কিসের বাধা?"

"তা ঠিক তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না।"

ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। লজ্জায় নয়, রাগে। রাগটা হ'ল তার নিজেরই ওপর। ঠিক এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর একবার আলোচনা হয়েছিল, ঠিক এই একই অনুরোধ করেছিল সে সন্ন্যাসীকে—তখনও তিনি ঠিক এমনই ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আরও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নারীসঙ্গ বিষবৎ আমার পক্ষে। তবু সে কোন্ লজ্জায় ওই একই প্রসঙ্গ তুলছে আবার! কিন্তু এ অবস্থায় সে করবেই বা কি? হঠাৎ কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

"চিনতে পারছ?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং রত্নপ্রভা দাঁড়িয়ে। গোলগাল কালো মুখটি হাসির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। হাতে একটি বেঁটে ছাতা, বগলে ফাইল। ডানা কি যে বলবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল শুধু। তার পর বললে, "আপনি আসবেন কোন খবর পাই নি তো?"

"খবর দেওয়ার সময় ছিল না। একাই এসেছি। আনন্দবাবুর বিপদের খবর পেয়ে মনে হ'ল, নিজে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসি। আমি এসেছি সকালে। এসেই সদরে গিয়েছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে।"

তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে তিনি নমস্কার করলেন। হাসিমুখে বললেন, "আপনি এখনও আছেন এখানে?"

"এইবার যাব।"—সন্ন্যাসীও হাসিমুখে উত্তর দিলেন।

ডানা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে এসেছেন কতক্ষণ আগে?"

"এখুনি। সোজা স্টেশন থেকেই তো আসছি। তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। চাকরটার কাছে শুনলাম—তুমি এখানে আছ, তাই এখানেই চ'লে এলাম।"

স্মিতমুখে ডানার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অকারণে ডানার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, সে যেন একটা দুষ্কার্য করছিল, হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, "চলুন, আপনার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করি তা হ'লে।"

"সে সব সেরে এসেছি আমি সদরে। চা খাব একটু।"

"চলুন।"

কিছুদূরে এসে রত্নপ্রভা প্রশ্ন করলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ভাব হ'ল কি সূত্রে?"

"সূত্র কিছু নেই, এমনি আলাপ করেছিলাম একদিন নিজেই গিয়ে। অদ্ভুত চরিত্রের লোক, নিজেকে নিয়েই থাকেন ওই ভাঙা ঘরে। নদীর চরে একা একা ঘুরে বেড়ান। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গল্প করি।"

"আমাদের পাখিগুলোর খবর কি?"

"মাঝে মাঝে ম'রে যাচ্ছে দু-একটা।"

"তা তো যাবেই। চা খেয়ে যাব একবার দেখতে। তার পর হেসে বললেন, "দেখবার মত বিদ্যে নেই অবশ্য আমার। আমার দৌড় লাহা মশায়ের 'পেট বার্ডস অফ বেঙ্গল' (Pet Birds of Bengal) পর্যন্ত। ওঁর সঙ্গে এতদিন থেকেও বিদ্যে বিশেষ বাড়ে নি। তোমার কেমন লাগছে?"

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না, অর্থাৎ ঠিক কি বুঝছে [illegible]

সত্য কথা বলা হবে তা মাথায় এল না। অমরবাবু তাকে যে নতুন জগতের সন্ধান দিয়ে গেছেন তা যে খারাপ লাগছিল—এ কথা সত্য নয় ; কিন্তু যে অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে থেকে তাকে সে জগতের পরিচয় নিতে হচ্ছিল, সেই পবিবেশটাই ক্রমশ এমন নিদারুণ হয়ে উঠছিল যে কিছুই তার ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, দাঁতের ব্যথা নিয়ে তাকে যেন বাধ্য হয়ে ব'সে কোনও ভাল ওস্তাদের গান শুনতে হচ্ছে। গানের কিছুটা সে বুঝতে পারছে, কিছুটা তাকে মুগ্ধও করছে, কিন্তু দাঁতের ব্যথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিন্তু এত কথা সে রত্নপ্রভাকে বুঝিয়ে বলবে কি ক'রে? তাই চুপ ক'রেই রইল। রত্নপ্রভা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন।

বললেন, "তোমার ভাল লাগছে না বোধহয়। কিন্তু পাখির পালক নিয়ে যে প্রবন্ধটা তুমি ওঁকে লিখে পাঠিয়েছিলে, তা প'ড়ে মনে হয়েছিল যে, পাখিদের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি।"

"ও-প্রবন্ধে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। পাঁচটা বই দেখে লিখেছিলাম। পাখিদেব কথা আগে তো কিছুই জানতাম না, এখন যত দেখছি তত ভাল লাগছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—"

"মুশকিল আবার কি?"

"চলুন, সব বলছি।"

ডানা অবশ্য অকপটে সব কথা রত্নপ্রভাকে বলতে পারে নি। বলা সম্ভবই ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু যতটুকু সে বলেছিল, তাতেই রত্নপ্রভা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁব নিটোল ভারী মুখখানা যদিও গম্ভীর হয়েই ছিল, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়ছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, "ওতে ভয় পেয়ো না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়। ও কিছু নয়। আমাকে তো রূপসী বলা চলে না, সাঁওতালনীর মত চেহারা আমার, আমাকেও ও-ভোগ ভুগতে হয়েছে। ও কিছু নয়। দু'দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে সব। আমাদের দেউড়ির সিপাহী সুখন পাঁড়েকে ব'লে যাব, সে তোমার কাছে না হয় থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। আর এক কাজ করলেও তো হয়। এখানে থাকবার দরকার কি? আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটা কি দুটো ঘর নিয়ে থাকলেই তো পার।"

"নদীর ধারে এই জায়গাটা কিন্তু ভারি চমৎকার। গোড়া থেকেই এখানে আছি, মন ব'সে গেছে এখানে। তবে আপনি যদি বলেন—"

শেষের কথাগুলো উচ্চারণ ক'রেই সে থেমে গেল। নিজের কানেই অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। তার যে নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সে যে একজন বেতনভোগিনী দাসী মাত্র, কর্ত্রীর আদেশ অনুসারেই তাকে চলতে হবে, গত্যন্তর নেই—এই ভাবটা যেন কদর্য মূর্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষের কটা কথায়।

রত্নপ্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। তাঁর গাম্ভীর্য অটুট রইল।

বললেন, "বেশ, এখানেই থাক তা হ'লে। সুখন থাকবে তোমার কাছে—তাকে ব'লে যাব।"

"না, তাকে কিছু বলবার দরকার নেই এখন। ও যেমন দেউড়িতে আছে থাকুক। যদি তেমন দরকার বুঝি আনিয়ে নেব ওকে।"

"বেশ। চল, এবার পাখিগুলো দেখে আসা যাক।"

"চলুন"।

আনন্দবাবুর ব্যাপারটা কি হ'ল তা রত্নপ্রভা কিছু বলেন নি এতক্ষণ। রাস্তায় যেতে যেতে

বললেন, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। আনন্দমোহনবাবুর ছাত্র উনি, আমার সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন।"

'আনন্দমোহনবাবুর মকদ্দমার আবার দিন পড়েছে?"

"পড়েছে বোধ হয়। কিন্তু আনন্দমোহনবাবুকে ওঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। আসল খুনী ধরা পড়েছে, দোষও স্বীকার করেছে।"

"ও! তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আনন্দমোহনবাবুকে এর জন্যে আর ঝামেলা পোয়াতে হবে না, তবে—। আচ্ছা, এখানকার এস. পি. মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?"

"না, তেমন আলাপ হয় নি।"

"আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় উনি। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। কোথায় বেরিয়েছেন শুনলাম। আজই ফেরার কথা। আমি চিঠি লিখে এসেছি একটা। হয়তো দেখা হয়েও যেতে পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর জাল-ঘেরা পক্ষী-নিবাসে এসে হাজির হলেন তাঁরা। একজন চাকর পাখিদের জন্যে নানারকম খাবার নিয়ে আগে থাকতেই ব'সে ছিল। রত্নপ্রভাই সদরে যাবার আগে এ ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন।

দানা আর ফল ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের মধ্যে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল যেন, বিশেষ ক'রে টিয়া, শালিক আর ছাতারেদের মধ্যে। আলাদা আলাদা খাঁচায় শামা, হরবোলা, দামা, দোয়েল, পাহাড়ী ময়না, হলদে পাখি প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাখা ছিল। তারা বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না কিন্তু। খাবারের দিকে চেয়েও দেখলে না।

"হুতোম প্যাঁচাটা ম'রে গেছে?"

"হ্যাঁ। ফিঙে দুটোও বাঁচল না। ওই পাহাড়ী ময়নাটাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। গায়ে পোকা হয়েছে বোধহয়। হলুদ-জলে একদিন স্নান করিয়েছিলাম। কি করা যায় বলুন তো?"

"বেশি অসুস্থ হ'লে ছেড়ে দিও। হরবোলাটা কেমন আছে? ছেলেবেলায় আমি একটা হরবোলা পুষেছিলাম, কতরকম ডাকই যে ডাকত!"

হরবোলার খাঁচার কাছে গিয়ে রত্নপ্রভা অপ্রত্যাশিতভাবে শিস দিলেন একটি। ডানা অবাক হয়ে গেল ; হরবোলা পাখিটাও। খাঁচার ভিতরই সে তুড়ুক ক'রে এগিয়ে এল, ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে দেখলে একবার রত্নপ্রভার মুখের দিকে, তারপর সেও মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে জবাব দিলে। মনে হ'ল, রত্নপ্রভাকে যেন বললে—তুমি যে আমার আত্মীয় তা তোমার শিস শুনেই বুঝেছি। তারপর খাঁচার দাঁড়ে পা দুটো আটকে ডিগবাজি খেয়ে নিজের আর একটা কৃতিত্ব দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ওর প্রতি আর বেশি মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাওয়া গেল না, আর একজনের ডাক শোনা গেল। ফটি—ক জল, ফটি—ক জল।

"ফটিক-জলগুলো বেঁচে আছে না কি?"

"না তিনটে ম'রে যাবার পর বাকিগুলোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বন্দী অবস্থায় কেমন যেন মন-মরা হয়ে থাকে।"

"বেশ করেছ। কিন্তু ডাকটা এল কোথা থেকে?"

"ওই বড় গাছটায় ওরা বাসা বাঁধছে বোধ হয়। প্রায়ই ডাক শুনি। বাইনাকুলার দিয়ে দেখতেও পেয়েছি দু-একবার।"

"চমৎকার দেখতে, নয়?"

"সুন্দর।"

পক্ষী-প্রসঙ্গ কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পেল না। মোটরের হর্ন শোনা গেল একটা। চাকরটা এসে খবর দিলে—পুলিস সাহেব এসেছেন, মালকাইনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

পক্ষী-নিবাসের গেটেই দেখা হ'ল মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে। রত্নপ্রভাকে দেখেই মিস্টার গুপ্ত স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে এলেন এবং পরিধানে সাহেবী পোশাক থাকা সত্ত্বেও হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে।

"মাসীমা, আপনি যে এখানে আসতে পারেন তা কল্পনাই করি নি আমি। এখানে হঠাৎ কি সূত্রে এসেছেন?"

"এখানে আমার একটা বাড়ি আছে, কিছু সম্পত্তিও আছে। তাই মাঝে মাঝে আসি। তুমি কতদিন হ'ল এসেছ এখানে?"

"বেশিদিন নয়। মাস দুয়েক।"

"এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শ্রীমতী ডানা, আমাদেব পক্ষীনিবাসের কর্ত্রী। এখানেই থাকেন উনি। রিটায়ার্ড প্রোফেসার আনন্দমোহনবাবু আমাদের জমিদারির ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গেও আলাপ ক'রো, চমৎকার লোক, চমৎকাব কবিতা লেখেন। এখন এখানে নেই, কলকাতা গেছেন, দু-একদিনেই ফিরবেন।"

"আচ্ছা, ইনিই কি খুনের মোকদ্দমায় পড়েছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ। কোনও দুষ্টু লোক ফাঁসিয়ে দিয়েছিল বেচারীকে, তোমাদের আইনের জালে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ওঁকে রেহাই দিয়ে দিয়েছ তোমরা।"

মিস্টার গুপ্ত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নিজের বাটার-ফ্লাই গোঁফে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করতে করতে রত্নপ্রভার কথা শুনছিলেন। রত্নপ্রভা থামতেই বললেন, "সে দুষ্টু লোকটিকে চিনি আমি। এ যে আপনাদের জমিদারি, আপনাদের ব্যাপার—কিছুই জানতাম না আমি। আই সি। আপনি যাবেন কখন?"

"আজই রাত দশটার ট্রেনে আমি ফিরতে চাই। তোমার মা কোথায় আজকাল?"

"ডেরাডুনেই আছেন। মেসোমশায়ের পাখি-বাতিক এখনও আছে?"

"বেড়েছে। পক্ষী-নিবাস দেখে বুঝছ না? তুমি সন্ধ্যেবেলা আজ খাও না আমার কাছে! সুনীরা এখানেই আছে?"

"না, সে বাপের বাড়ি গেছে, তার বোনের বিয়ে। আসবে দিন সাতেক পরে। আচ্ছা, আমি আসব আজ সন্ধ্যের পর। সাড়ে সাতটা নাগাদ।"

"ডানা, তুমিও এস, আমার ওখানেই খাবে আজ।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। খাকি-পোশাক-পরা গোঁফ-ছাঁটা ঘাড়-কামানো এই বলিষ্ঠ লোকটার সামনে ব'সে খেতে হবে! কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। চুপ ক'রে রইল!

মিস্টার গুপ্ত বললেন, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, আসুন না, পৌঁছে দি।"

"আমরা বেশিদূর যাব না। এই কাছে-পিঠেই ঘোরা-ফেরা করব। তুমি যাও।"

"আচ্ছা, সাড়ে সাতটা নাগাদ আপনাদের কাছারিতে পৌঁছব, কাছারিটা চিনি। পাশেই দোতলা বাড়িটাই নিশ্চয়ই আপনার?"

"হ্যাঁ।"

মিস্টার গুপ্ত চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা পক্ষী-নিবাসটাই ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলেন নীরবে। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে জিজ্ঞেস করলেন, "এ পাখিটা কি—বেশ সুন্দর দেখতে তো! এটাকে আগে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না!"

"আপনারা চ'লে যাওয়ার পর একটা পাখিওলা দিয়ে গিয়েছিল।"

"নাম কি?"

"বলেছিল, দামা। দামাই লিখে রেখেছি, ইংরেজী নাম খুঁজে পাই নি।"

"লাহা মশায়ের বইয়ে দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব অরেঞ্জ-হেডেড গ্রাউন্ড থ্রাশ (Orange-headed Ground Thrush)।"

আরও কিছুক্ষণ নীরবে পাখি দেখে বেড়ালেন। তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখ, আমাদের ছেলেমেয়ে হয় নি। এরাই আমাদের ছেলেমেয়ে। এদের একটু যত্ন ক'রো। তুমি যত্ন করছ নিশ্চয়ই, তবু বললাম কথাটা। এদের নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। আচ্ছা, কটা পাখি ম'রে গেছে? লিস্ট ক'রে রেখেছ কি?"

"রেখেছি। বাসায় আছে।"

"মরতে দিও না কাউকে। যদি দেখ খাচ্ছে না বা বিমর্ষ হয়ে আছে, ছেড়ে দিও।"

"আচ্ছা।"

ডানার বাসার দিকেই ফিরছিলেন রত্নপ্রভা। হঠাৎ রত্নপ্রভার কানের কাছ দিয়ে সোঁ ক'রে একটা তীর বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

"এ কি ব্যাপার, তীর ছুঁড়ছে কে?"

পর-মুহূর্তেই তীরন্দাজদের দেখা গেল। বকুলবালা গাছ-কোমর বেঁধে হাঁটু গেড়ে ব'সে তৃতীয়বার শর-সন্ধান করছিলেন, পাশে এক গোছা শর নিয়ে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল, তারও আর এক হাতে ধনুক।

ডানা হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললে, "বকুলদি, কখন এলেন আপনি?"

"এখুনি এসেছি। এসেই দেখি একটা বাজ না চিল তোমার ওই পাখির বাসার উপর ব'সে আছে। আর একটু হ'লে বাচ্চাগুলোকে শেষ ক'রে ফেলত। ভাগ্যে আমি আর চণ্ডী এসে পড়েছিলাম।"

উৎসাহভরে তিনি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রত্নপ্রভাকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গায়ে দিয়ে মাথায় আধঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

ডানা পরিচয় করিয়ে দিলে, "ইনি অমরেশবাবুর স্ত্রী। আসুন, আলাপ করুন।"

বকুলবালার কিন্তু আলাপ করবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ লজ্জিত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, আর বার বার আঁচল দিয়ে নিজের স্থূল বপুটি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে এলেন তিনি।

ডানা বললে, "ইনি রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী। এঁরও পাখি পোষার খুব শখ। তালগাছে ওই যে বাক্সটা আমরা বেঁধে দিয়েছি, তাতে শালিক বাসা বেঁধেছে। বাচ্চাও হয়েছে তাদের। উনি কিছুদিন আগে এসে ডিমগুলো দেখে গিয়েছিলেন।"

"নমস্কার।" হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন রত্নপ্রভা।

বকুলবালা আর একটু ঘাড় হেঁট ক'রে আঁচলটা গায়ে আর একটু টেনে দিলেন।

"আসুন। আপনার যখন পাখি পোষার এত শখ, তখন আপনি তো আমাদের ঘরের লোক। এতদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া উচিত ছিল। আসুন।"

একটু দূরে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। শুধু দেখছিল নয়, উপভোগ করছিল। তার চোখ-মুখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, এই অপূর্ব মিলনের কৃতিত্বটা যেন তারই।

বকুলবালা নিম্নকণ্ঠে তাকে বললেন, "আমার ধনুকটা তুলে রাখ্ ভাল ক'রে। এখনি বাড়ি ফিরব আমরা। তুই পালাস নি যেন।"

"না।"

এই আদেশ দিয়ে গায়ের কাপড়-চোপড় আবার সামলে-সুমলে বকুলবালা রত্নপ্রভাকে অনুসরণ ক'রে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন।

রত্নপ্রভা চণ্ডীকে দেখিয়ে বললেন, "ওটি কে? ছেলে বুঝি?"

"না। আমার ছেলে হয় নি।"

হঠাৎ একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল। তিনটি নিঃসন্তান রমণীকে কেন্দ্র ক'রে একটা বিরাট শূন্যতা মূর্ত হয়ে উঠল যেন।

রত্নপ্রভাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

বললেন, "কি পাখি ভালবাসেন আপনি?"

"অনেক রকম ভাল পাখি পুষেছি আমি। টিয়া, চন্দনা, ময়না, মুনিয়া। একটা হলদে পাখি পোষবার শখ, কিন্তু পাচ্ছি না যোগাড় করতে। একবার একটা পেয়েছিলাম, না খেয়ে ম'রে গেল। ইনি একটা যোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন, তাই এসেছিলাম খোঁজ করতে।"

"চেষ্টা করছি। বাচ্চা পেলেই আপনাকে খবর পাঠাব। আপনার চণ্ডী-গণশাও তো খোঁজে আছে।"—ডানা হেসে উত্তর দিলে।

গণশার নাম শোনামাত্র কিন্তু বকুলবালা ক্ষেপে গেলেন। রত্নপ্রভার খাতিরে যে ভব্যতাটুকু এতক্ষণ তিনি বজায় রেখেছিলেন তা আর টিকল না, চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল। ঘাড়ের ঝাঁকানিতে আঁচল স'রে গেল মাথা থেকে।

"গণশা মুখপোড়ার কাণ্ড শুনবেন? বলে কিনা—আমাকে একটা ভাল ডিশ্‌কনারি না কিনে দিলে হলদে পাখির বাচ্চা পেলেও উড়িয়ে দেব আমি। মুখপোড়া আমাকে আবার মাসীমা ব'লে সোহাগ জানাতে আসে। অমন বোনপোকে ঝাঁটা মারি আমি।"

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল আবার। এক নজরেই তিনি বকুলবালারস্বরূপ অনেকটা টের পেয়েছিলেন। গণশাকে তিনি চেনেন। গণশার মেশোমশাই এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন, কিছুদিন আগে মারা গেছেন, রত্নপ্রভাই পেনশন বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন তাঁর বিধবার জন্যে, জমিও দিয়েছেন কিছু। গণশা যে পড়াশোনায় ভাল তাও তিনি জানেন। বকুলবালার কাছে গণেশের নতুন পরিচয় পেয়ে খুব মজা লাগল তাঁর।

ছদ্ম বিস্ময়ে বললেন, "এই কথা বলেছে গণশা?"

"আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চন্ডীকে জিজ্ঞেস করুন। এই চণ্ডে, এদিকে আয়। গণশা তোকে কি বলেছিল বল্ তো এঁদের।

চণ্ডী থেমে থেমে ঢোক গিলে গিলে বকুলবালার কথা সমর্থন করলেন, না ক'রে উপায়ও ছিল না। কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর নাম এ ভাবে কালিমালিপ্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল সে। তার ভয়ও করছিল। কথাটা গণশার কানে গেলে সে যে কি করবে, তা কল্পনা ক'রে হৃৎকম্প হচ্ছিল তার। হয়তো আচমকা নাকে একটা ঘুষিই বসিয়ে দেবে কোন্‌দিন!

বকুলবালা বললেন, "এরা দুটোতে কম জ্বালায় আমাকে! ইনি জেদ ধ'রে ব'সে আছেন একটা এয়ার-গান্ কিনে দিতে হবে, উনি বলেছেন ভাল ডিশ্‌কনারি চাই। আমি অত টাকা পাব কোথা? বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরিয়ে কতই বা জমানো যায়! ডিশ্‌কনারি জিনিসটা কি? কুডুল-টুডুল না কি—সাতজন্মে ও-কথা শুনি নি কখনও।"

ডানা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল। রত্নপ্রভা কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, "আপনাকে এমন ভাবে জ্বালাতন করা খুব অন্যায় হয়েছে ওদের। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি, আপনি হলদে পাখি ঠিক পাবেন এবার।"

"ধাড়ি পাখি চাই না কিন্তু, বাচ্চা দিতে হবে।"

"বেশ, তাই পাবেন।"

বকুলবালার চোখের দৃষ্টি ঝলমল ক'রে উঠল আনন্দে।

চণ্ডীর দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলি তো! আর তোদের তোয়াক্কা করব না আমি।"

কথাবার্তা আরও হয়তো কিছুদূর অগ্রসর হ'ত, কিন্তু সনাতন মল্লিকের আকস্মিক আবির্ভাবে তা চাপা প'ড়ে গেল। বকুলবালা তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে দ্রুতপদে স'রে পড়লেন চণ্ডীকে নিয়ে। সনাতন মল্লিক যা করলেন, তা আরও নাটকীয়। তিনি রত্নপ্রভার পদপ্রান্তে দড়াম্ ক'রে শুয়ে প'ড়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন রত্নপ্রভা। উঠে স'রে দাঁড়ালেন। মাথার কাপড়টা টেনে দিলেন একটু। মল্লিক সাশ্রুনেত্রে করজোড়ে বলতে লাগলেন, "আপনি আমার মা, বাঁচান আমাকে, ছাপোষা মানুষ আমি, দয়া করুন আমার ওপর।"

"কি হয়েছে?"

মল্লিক তখন জামার পকেট থেকে একটি ছোট চিঠি বার ক'রে রত্নপ্রভার হাতে দিলেন। পেন্সিলে ছোট চিঠি। এস. পি. লিখেছেন—

"মাসীমা, এই লোকটিই সেই দুষ্ট লোক, যার কথা আপনি আন্দাজ করেছিলেন একটু আগে। ইনিই আনন্দমোহনবাবুর নামে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন পুলিসকে। এঁর লেখা একখানা চিঠি আছে আমাদের কাছে। আনন্দমোহনবাবুর মত নিরীহ ভদ্রলোককে বিব্রত করার জন্যে এঁর শাস্তি হওয়া উচিত। আপনারা যদি এঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন, আমরা সাহায্য করতে পারি। তবে যদি ক্ষমা করেন, সে কথা স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার পর যাব। ইতি—

—অনিল"

রত্নপ্রভা চিঠিখানা প'ড়ে ডানাকে দিলেন সেটা। মল্লিক মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, "আনন্দমোহনবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না ক'রে কিছুই বলতে পারছি না আপনাকে এখন। তিনি যদি মামলা করতে চান মামলা হবে, যদি না করতে চান হবে না।"

"আপনি দয়া করলে—"

রত্নপ্রভা আর কোনও জবাব দিলেন না, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। ডানা তাঁর পিছু পিছু গেল।

১১

কবি দিনের গাড়িতে ফিরছিলেন কলকাতা থেকে। অমরবাবু ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন পাখিদের মাইগ্রেশন (Migration) সম্বন্ধে একটা নতুন বই। কবি অভিভূত হয়ে ব'সে ছিলেন। তাঁর অভিভূত ভাবটা একরঙা ছিল না অবশ্য, রঙ

বদলাচ্ছিল। প্রথমে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন অমরবাবুর ব্যবহারে। কিছুতেই ছাড়লেন না ভদ্রলোক, জোর ক'রে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে দিলেন। বললেন, "কিছু বলা যায় না, একটু আরামে গেলে হয়তো আরও দু-চারটে ভাল ভাল কবিতা পাব আমরা। তার দাম এই টাকা কটার চেয়ে অনেক বেশি। একটু শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, একটু নির্জনতা না থাকলে ভাল ভাব আসতে পারে না। ভাল ভাবও পাখির মত, গোলমাল দেখলেই স'রে পড়ে।"

কবি সত্যিই খুব আরাম বোধ করছিলেন। গাড়িতে নির্জনতাও ছিল, কিন্তু কোনও কবিতার ভাব মনে আসছিল না। তিনি তন্ময় হয়ে জানলা দিয়ে দেখছিলেন কেবল—দৃশ্যের পর দৃশ্য আসছে আর চ'লে যাচ্ছে, থামছে না কেউ। এ সব দৃশ্য আগে অনেকবার দেখেছেন, নতুন কিছু নয়, সবই চেনা ; তবু মনে হচ্ছে ঠিক যেন চেনা নয়, ওঁদের মধ্যেই অচেনার রহস্য যেন মাখানো রয়েছে। টেলিগ্রাফের তারে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ফিঙেকে, নীলকণ্ঠকে, বাঁশপাতিকে, কাজলা পাখিকে (যার ইংরেজী নাম শ্রাইক—Shrike). বুলবুলিও দু-একটা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—সবই চেনা ; কিন্তু তবু মনে হচ্ছে একটু যেন অচেনার আমেজ আছে প্রত্যেকটির মধ্যে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তাঁর। মনে হ'ল, যা চেনা তা ফুরিয়ে যায়, তা ক্ষণভঙ্গুর, নিজের পরিচয়ের পসরা সে যখন উজাড় ক'রে দেয়, যখন নতুন-কিছু দেবার আর থাকে না, তখনই সে ম'রে যায়, অনেক সময় সে বুঝতেও পারে না যে তার মৃত্যু হয়েছে। অচেনার মধ্যে কিন্তু অসীম সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তা আমাদের প্রত্যাশার নব নব দাবি মিটিয়ে চলেছে চিরকাল, মেটাবার পরই আবার মৃত্যু হচ্ছে তারও, আসছে নতুন অচেনা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে, শুধু তাই নয়, আসছে ওই চেনাকে অবলম্বন ক'রেই। ভাবটা কবির মনে নানাভাবে প্রসারিত হতে লাগল মেঘের মত। তার পর ক্রমশ কবিতায় রূপান্তরিত হ'ল তা। খাতা কলম বার ক'রে অনেক ভেবে ভেবে তিনি লিখলেন—

হে অচেনা, কতবার চেনা তুমি হ'লে
কত রূপে এ জীবনে ; কত প্রসাধনে
দেখা দিলে রঙ্গমঞ্চে—শূন্যে জলে স্থলে,
জীবে-জড়ে, অন্ধকার অরণ্যে-গহনে,
জনাকীর্ণ সমাজের হাসি-অশ্রু-জলে,
নিত্য-নবায়িত করি জীর্ণ পুরাতনে
চিরকাল এ কি লীলা তব পলে পলে।
অচেনার অনন্যতা অবলুপ্ত হয়
পরিচয়-ঘর্ষণেতে, অপূর্ব পরশে
তারই মাঝে সঞ্চারিয়া নবীন বিস্ময়
সঞ্জীবিত কর তারে নব প্রাণ-রসে,
মৃত্যুর মুখেতে শুনি জীবনের জয়
ভীত প্রাণ উল্লসিয়া ওঠে যে হরষে,
মৃত্যু যেন এসে বলে—আমি মৃত্যুঞ্জয়।

কবিতাটা বার দুই পড়লেন, কেমন যেন তৃপ্তি হ'ল না। মনে হ'ল, যে ভাবটি মনে এসেছিল ঠিক সেটি ফোটাতে পারেন নি তিনি। ভাষা আর ছন্দকে বাঁচাতে গিয়ে ভাব মারা পড়েছে। বচনের ভিড়ে হারিয়ে গেছে অনির্বচনীয়। নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় ক্ষুণ্ণ হলেন। চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। একটা পুলের উপর গাড়ি উঠেছিল, শুভ্র

সৈকতের মাঝখান দিয়ে শীর্ণস্রোতা নদীটি বইছে। এখন গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে শুকিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ম'রে যায় নি। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে রেখেছে, দু-কূল প্লাবিত ক'রে একদিন তা আত্মপ্রকাশ করবে। পুকুর হ'লে ম'রে যেত। এই চিন্তার সূত্র অনুসরণ ক'রে একটা দার্শনিক-লোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য। মনে হ'ল, নদীর উৎস উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে, তাই সে বেঁচে থাকে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপও তার জীবনধারাকে সম্পূর্ণ শুষ্ক করতে পারে না। মানুষের জীবনও একটা অদৃশ্য স্রোতের মত, তারও কি কোনও উৎস আছে কোনও উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে? ভগবানের কথা মনে হ'ল, অনেকদিন আগে পড়া উপনিষদের কথা মনে পড়ল, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কোল থেকে বার্ড মাইগ্রেশনের বইটা প'ড়ে গেল, মর্ত্যলোকে নেবে এলেন আবার। বইটারই পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তার পর পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে নতুন ভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন আবার। গ্রন্থকার লিখছেন* যে, কেবল যে পাখিরাই এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায় তা নয়। অনেক প্রাণীও যায়। জলচর, স্থলচর, উভচর, মাছ, কীটপতঙ্গ, প্রজাপতি এমন কি কাঁকড়ারা পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে স্থান পরিবর্তন করে। আদিম মানবজাতিদের মধ্যে যারা নিজেদের আদিম স্বভাব এখনও রক্ষা করতে পেরেছে তারাও স্থাণু নয়, পরিভ্রমণশীল। এক স্থানে বেশিদিন থাকে না তারা, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে খাদ্যের সন্ধানে, শিকারের সন্ধানে, পালিত পশুদের জন্য মাছের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা। কালাহারি মরুভূমির বুশ্‌ম্যানরা, সাইবেরিয়ার বল্গাহরিণ-শিকারীরা, মধ্য এশিয়ার পশুপালকেরা নিয়মিত ভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। আরব দেশে ভ্রাম্যমাণ রুওয়ালা (Ruwala) জাতির অস্তিত্ব এখনও আছে। সভ্য মানুষেরাও মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাতে না পারলে হাঁপিয়ে ওঠে। ...পড়তে পড়তে কবির মনে হ'ল, মুক্তি ব'লে যে অবস্থাটা আমরা কল্পনা করি, যার স্বপ্ন সাধুরা দেখেন, প্রতি জীবনের মধ্যে এই স্থান পরিবর্তনের আকাঙক্ষা কি সেই মুক্তি-আকাঙক্ষারই আদিম রূপ না কি? যে কোনও পরিবেশেই আমরা বাস করি না কেন, কিছুদিন পরে সেই পরিবেশ যেন কারাগার মনে হয়। একঘেয়েমির কারাগার। তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণ ছটফট করে। তাই উত্তরমেরুর পাখি চ'লে আসে ভারতবর্ষের নদী তীরে, আফ্রিকার হাতী গভীর অরণ্য ত্যাগ ক'রে অগভীর বনে বেড়াতে আসে, উরাল পর্বত বা কামস্কাট্‌কা থেকে চ'লে আসে হলদে খঞ্জনের দল ভারতবর্ষের মাঠে। কলকাতার সল্টলেকে যে খঞ্জনগুলোকে দেখে এসেছেন, তাদের দোদুল্যমান পুচ্ছভঙ্গির ছবিটা ফুটে উঠল চোখের সামনে, নতুন দেশে এসে তারা যেন আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। এই আনন্দই কি মুক্তির আনন্দের আভাস? সত্যিই কি এমন কোন পরিবেশ আছে যা কিছুদিন পরে কারাগার হয়ে ওঠে না, যেখানে নিত্য-নতুনের আবির্ভাব মনকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচাতে পারে? চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লম্বা হয়ে শুলেন। শুয়ে শুয়ে আবার পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে ঘুম এসে গেল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন এল। অদ্ভুত স্বপ্ন! ছেলেবেলার একটা দুপুর হঠাৎ যেন ফিরে এল স্বপ্নে। অতীতের একটা টুকরো সহসা মূর্ত হ'ল চৈতন্যলোকে। স্কুলের সঙ্গী ভুতোকে দেখতে পেলেন। হরিবাবুর বাগানের বেড়ার ধারে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা পেয়ারা। আনন্দবাবু, তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ভুতো, তুই বেঁচে আছিস? আমি খবর পেয়েছিলাম তুই মারা গেছিস কলেরায়।—ভুতো কোনও উত্তর দিলে না। মুচকি হেসে

* *Bird Migrants* by ERIC SIMMS

পেয়ারাটা দেখালে শুধু। বালক আনন্দমোহন যেন তাকে ধরতে গেলেন। সে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখিয়ে পেয়ারাটায় কামড় দিলে একটা। এই দেখে আনন্দমোহন ছোটার বেগ বাড়িয়ে দিলেন এবং হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলেন। ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, ঘেমে গেছেন, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। সত্যিই যেন ছুটছিলেন। উঠে বসে ভাবতে লাগলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে হঠাৎ ভুতোকে স্বপ্ন-দেখার মানে কি? ভুতোর কথা তিনি তো ভাবছিলেন না, তাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। ছেলেবেলার কথাও ভাবছিলেন না, তা হ'লে এ রকম স্বপ্ন দেখলেন কেন? হঠাৎ মনে হ'ল, এও এক রকম ভ্রমণ না কি? আমাদের মনও বোধ হয় ভ্রমণ করে, একস্থান থেকে আর এক স্থানে—কখনও স্বপ্নে, কখনও কল্পনায়। পাখিরা নতুন দেশে কিছুদিন থেকে যেমন পুরাতন জায়গায় ফিরে আসে, তাঁর মনও বোধ হয় বর্তমানের নতুন পরিবেশ থেকে ফিরে গিয়েছিল অতীতের পরিবেশে, হরিবাবুর বাগানের ধারে ভুতোর কাছে। বিজ্ঞান এ স্বপ্নের বাখ্যা হয়তো অন্য রকম করবে, কিন্তু কবি নিজের ব্যাঘ্যাতে নিজেই তুষ্ট হলেন। অন্যমনস্ক হয়ে ভুতোর কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। ভুতো সত্যিই ইহলোকে নেই, কিন্তু সে বেঁচে আছে। অতীত নিগূঢ়ভাবে বেঁচে থাকে। সহসা আব একটা কথাও তাঁর মনে হ'ল, বর্তমানটা প্রবাস, অতীতই যেন স্বদেশ। এ চিন্তা কিন্তু আর বেশিদূর প্রসারিত হ'ল না তাঁর মনে, ট্রেন এসে একটা বড় জংশনে ঢুকল। কলকাতার পর এইটেই প্রথম বড জংশন, অর্থাৎ বর্ধমান। ভিড় চীৎকার কোলাহল কলরব। একটা নতুন জগতে এসে হাজির হলেন যেন, একটা এঞ্জিন খুব জোরে হুইস্‌ল্ দিয়ে উঠল, মনে হ'ল যেন স্পর্ধিত হুঙ্কার ছাড়ছে কোনও অদৃশ্য আততায়ীকে উদ্দেশ্য ক'রে। কবি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন একবার, মনে হতে লাগল, সহসা যেন কোন অপরিচিত বিদেশে এসে পড়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অপ্রত্যাশিত আর একটা ঘটনাও ঘটল একটু পরে। স্টেশনের হোটেলের এক পোশাকপরা চাপরাসী এসে জিজ্ঞাসা করলে, তিনিই আনন্দমোহন তরফদার কি না, কারণ হাওড়া থেকে তারে খবর এসেছে যে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী মিঃ তরফদারকে যেন খাবার দেওয়া হয়। অমরবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক এ জন্য হাওডায় টাকা জমা ক'রে দিয়েছেন। কবি অবাক হলেন, তাঁর খাওয়ার দরকার ছিল না তত। কিন্তু দাম যখন দেওয়া হয়ে গেছে, তখন না খেলে লোকসান। কথাটা অমরবাবুর কানে গেলে হয়তো...

...সাড়ম্বরে খাচ্ছিলেন তিনি। মাংসের ঝোলটা বেশ ভালই লাগছিল। ট্রেনে চ'ড়ে ঝড়ের বেগে যেন নতুন পরিবেশে হঠাৎ তিনি হাজির হয়েছিলেন, সে পরিবেশের সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিছু আর বিসদৃশ লাগছিল না, মাংসের ঝোলটা খুব ভাল লাগছিল। আপন মনে নিবিষ্ট চিত্তে তিনি খেয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা ঘটনা ঘটল।

"এ কি, তুমি এখানে?"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, মন্দাকিনী প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে তাঁর মামাতো শালা যজ্ঞেশ্বর। কবি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সহসা তাঁর মনে পড়ল, এই বর্ধমানের কাছেই তো তাঁর শ্বশুরবাড়ি। এই স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি ক'রে যেতে হয়। মন্দাকিনী এবং তাঁর মামাতো ভাই উঠে প্রণাম করলেন কবিকে।

কবি বললেন, "একটু দরকারে কলকাতা যেতে হয়েছিল। ফিরছি।" তারপর একটু থেমে একবার ঢোঁক গিলে বললেন, "তুমি আসছ তা তো জানাও নি, জানলে আমি—"

"আমি যে আসব তা কি নিজেই জানতাম? রূপচাঁদবাবুর চিঠি পেয়ে আসতে হ'ল।"

মন্দাকিনীর চোখের দৃষ্টিতে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। কবি ভয় পেয়ে গেলেন একটু।

"ব্যাপার কি? কি লিখেছে রূপচাঁদ?"

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা শোনা গেল। মন্দাকিনী তাঁর মামাতো ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "তোর তা হ'লে আর কষ্ট ক'রে যাওয়ার দরকার কি? টিকিট কিন্তু কাটা হয়ে গেছে নয়?"

"টিকিট ফেরত নেবে।"

"তা হ'লে তোকে আর কষ্ট ক'রে যেতে হবে না। আমার টিকিট দিয়ে তুই না হয় ফিরে যা। আমার জিনিসপত্তরগুলো কোথা?"

"এনে দিচ্ছি।"

যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি নেমে গেল এবং পুঁটুলি, ঝোলা, ঝুড়ি, তোরঙ্গ, বিছানার বাণ্ডিল প্রভৃতি নিয়ে এল। গুছিয়ে রেখে দিলে সব নিপুণভাবে। জামাইবাবু যে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন, এতে যেন সে বিশেষ একটা গৌরব বোধ করছিল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল তা।

গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল।

যজ্ঞেশ্বর একখানি ইণ্টার ক্লাস টিকিটি সসম্ভ্রমে কবির হাতে দিয়ে বললে, "এই দিদির টিকিট। আমি 'ক্রু'কে ব'লে দিচ্ছি, চেঞ্জ ক'রে দেবে।"

হোটেলের খানসামা এসে প্লেট প্রভৃতি নিয়ে নেমে গেল। যজেশ্বরও প্রণাম ক'রে নেমে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

কবি ও মন্দাকিনী পরস্পরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন।

বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে যা অহরহ ঘটছে কিন্তু যার সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই—ক্ষুদ্র পরিবেশে সেই ঘটনাটা কবির মনে কৌতুক সঞ্চার করলে একটু। পৃথিবী যে সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটে চলেছে এবং যে কোনও মুহূর্তে যে সেটা চুরমার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনা জেনেও আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরনা করছি—ঠিক এ কথাটা কবির মনে হ'ল না, কিন্তু দ্রুতবেগে ধাবমান ট্রেনের কামরায় সহসা জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়াতে এ কথাটা তাঁর মনে হ'ল যে, আমাদের প্রত্যাশাটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব'লে অপ্রত্যাশিতকে আমরা ভাল ক'রে সম্বর্ধনা করি না, মনে মনে তার জন্যে প্রস্তুত থাকি না। সে যখন আসে আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পায়। মন্দাকিনী না এসে যদি একটা শ্যাওলা ধরা কলসী জানলার ভিতর দিয়ে এসে হাজির হ'ত আর সেই কলসীর ভিতর থেকে দৈত্য না বেরিয়ে যদি মন্দাকিনী বেরিয়ে আসতেন এবং এসে বলতেন যে যাদুকর পি. সি. সরকারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি আমার গাড়িভাড়াটা বাঁচিয়ে দিলেন—তা হ'লে কি এর চেয়ে বেশি বিস্ময়কর হ'ত কিছু? কবি লক্ষ্য করলেন, মন্দাকিনীর গালে কপালে কালো কালো দাগ হয়েছে কিসের। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন মনে করলেন না। চুপ ক'রে চেয়েই রইলেন তাঁর মুখের দিকে। মন্দাকিনী কোনও কথা বললেন না কয়েক মুহূর্ত। তিনি স্বামীর মুখের দিকে এক নজর চেয়েই সত্যই হৃদয়ঙ্গম করছিলেন, ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। রূপচাঁদবাবু চিঠিতে যে সব ইঙ্গিত করেছিলেন তা যে মিথ্যা তা কবির মুখভাবের সূক্ষ্ম শুচিতা দেখেই বুঝেছিলেন তিনি। এই সূক্ষ্ম শুচিতার স্বরূপ আর কারও চোখে হয়তো ধরা পড়ত না, কিন্তু মন্দাকিনীর চোখে পড়ল, কারণ এই

শুচিতাটুকুর ভিত্তির উপরই তাঁর সমগ্র দাম্পত্য জীবন গ'ড়ে উঠেছিল, সে ভিত্তির স্বরূপ তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না, তাতে এতটুকু চিড় খেলে আর কেউ না জানুক তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারতেন তা কোনও প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা না রেখেই। তবে একটা কাণ্ড যে কিছু ঘটেছে তাতে সন্দেহ ছিল না, আর খুব সম্ভবত ঘটেছে কবিরই নির্বুদ্ধিতার-জন্য বা কোনও কিছু নিয়ে বাহাদুরি করতে গিয়ে—এ রকম ধরনের কাণ্ড তো একবার নয়, অনেকবার উনি করেছেন। একবার তো চাকরিটাই যেত আর একটু হ'লে। ছেলেরা করেছে স্ট্রাইক, ওঁর সর্দারি ক'রে তাদের দলে ভিড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু উনি ভিড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে থাকাটা ক্রমশ যেন একটা সেতুর মত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সেতুর উপর দিয়ে মন্দাকিনী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে, কবির মনে হ'ল।

মন্দাকিনী এর পর যা বললেন, তা কিন্তু কবি প্রত্যাশা করেন নি।

"বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হয়েছে নিশ্চয়। ঠাকুরটা রাঁধে কেমন?"

কবি তবু চুপ ক'রে রইলেন। অভিভূত হয়ে কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগলেন।

"রূপচাঁদের চিঠি পেয়ে আসছ তুমি! কি লিখেছে রূপচাঁদ? আমাকে কিছু না জানিয়ে তোমাকে চিঠি লেখার মানে কি তা তো বুঝতে পারছি না।"

মন্দাকিনী যে প্রশ্ন করেছিলেন এটা ঠিক তার জবাব নয়। নিজেও তিনি বুঝতে পারছিলেন তা, কিন্তু যত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই হোক সবচেয়ে দরকারি কথাটা তিনি যে ব্যক্ত করেছেন, করতে পেরেছেন, এইতেই তিনি যেন আরাম পেলেন একটু, সাহসও পেলেন।

মন্দাকিনীর উত্তর কিন্তু একটুও অপ্রাসঙ্গিক হ'ল না।

তিনি বললেন, "তিনি তোমার বন্ধু ব'লেই লিখেছিলেন। এসব কথা তোমারই উচিত ছিল আমাকে জানানো। তুমি দিনরাত ব'সে ব'সে কবিতা লিখতে পার, কিন্তু আমাকে দু লাইন চিঠি লিখতে পার না। শঙ্করীকে চিঠি লিখেছিলে? না তাও লেখ নি?"

মন্দাকিনীর কথার ধাঁচে সেই সাবেক সুর বেজে ওঠাতে আনন্দমোহন আর একটু সাহস পেলেন। সাহস পাবার আর একটা কারণও ছিল। যে সব অস্ত্র চালনা ক'রে মন্দাকিনী তাঁকে কাবু করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর মনে হ'ল, সে সব অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবার মত একটা অস্ত্র অন্তত তাঁর তূণে আছে। ব্যবহার করলেন সেটি।

"অতবড় জমিদারির ম্যানেজারি করতে করতে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাই না, চিঠি লিখব কখন? তার ওপর খুনের মামলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম একটা।"

এইবার মন্দাকিনী আকাশ থেকে পড়লেন এবং প'ড়েই নির্বাক হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। জমিদারির ম্যানেজারি? খুনের মামলা? এসব কি আবার! এসবের বিন্দুবিসর্গ তো তিনি জানেন না! রূপচাঁদবাবুও তো লেখেন নি কিছু! তিনি কেবল লিখেছেন—'আপনি চ'লে আসুন, আনন্দমোহন কাছাখোলা লোক, আপনি না থাকাতে নানা ভাবে ও নানা রকম কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াচ্ছে, ওকে একদিন থানায় পর্যন্ত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, অনেক তদ্বির ক'রে জেল থেকে উদ্ধার করেছি আমরা ; একটা মেয়েমানুষের নামের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে যা তা রটাচ্ছে লোকে।' জমিদারির কথা তো লেখেন নি কিছু!

তাঁর বাক্‌শক্তি যখন ফিরে পেলেন তখন প্রশ্ন করলেন, "কার জমিদারির ম্যানেজারি করছ তুমি?"

"অমরেশবাবু। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি গেছে। আমিই এখন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার।"

"কি রকম?"

মন্দাকিনীর মুখভাব দেখে কবি খুশী হলেন। এই সংবাদ-বোমাটি যে মন্দাকিনীর সমস্ত বিরুদ্ধতাকে বিধ্বস্ত ক'রে দেবে এ তিনি জানতেন। কিছুদিন পূর্বে মল্লিক-গৃহিণী মন্দাকিনীকে তাচ্ছিল্যভরে কি একটা বলেছিলেন যার থেকে মন্দাকিনীর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, উনি ম্যানেজারের বউ ব'লেই এ ধরনের কথা বলতে সাহস করেছেন। কিন্তু এ ধারণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, চাকা ঘুরে যেতে পারে এবং তিনিই একদিন ম্যানেজারের বউ হয়ে যেতে পারেন। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—এ কথা স্বকর্ণে শুনেও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কবিকে নানা রকম প্রশ্ন ক'রে নানা ভাবে কুরে কুরে সম্পূর্ণ খবরটি তিনি যখন জানলেন বিশেষত যখন টের পেলেন যে এর জন্যে মোটা মাইনেও পাওয়া যাবে, ইতিমধ্যে হাজার টাকা পাওয়াও গেছে, তখন তিনি উথলে উঠলেন। তাঁর এই উথলে-ওঠা অবস্থা দেখেও কবি কিন্তু আর একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন মনে মনে। শঙ্করীকে, মানে তাঁব মেয়েকে সত্যিই এখনও চিঠি লেখা হয় নি। সেই প্রসঙ্গটা যদি হঠাৎ উঠে প'ড়ে তা হ'লে কি জবাব দেবেন তিনি! মরীয়া হয়ে ঠিক করলেন, নিজেই প্রসঙ্গটা তুলবেন। বললেন, "ফিরে গিয়েই তোমাকে খবরটা দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতা ছুটতে হয়েছিল। শঙ্করীকে পর্যন্ত চিঠি লিখতে পারি নি এখনও। ওই খুনের মকদ্দমাটায় এমন জড়িয়ে ফেলেছিল আমাকে—আমার বিশ্বাস মল্লিক আছে এর ভিতরে।"

দেখা গেল মন্দাকিনীর প্রত্যয় আরও দৃঢ়।

তিনি বললেন, "নিশ্চয় আছে।"

একটা বড় স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল।

মন্দাকিনী একটা ফেরিওলাকে দেখে বললেন, "আমার জন্যে কিছু ফল কেনো তো, আজ আমার ষষ্ঠীর উপোস।"

কবি তাড়াতাড়ি ফল কিনতে লাগলেন।

১২

কবি যথাসময়ে এসে পৌঁছেছিলেন ঠিক, কিন্তু ডানার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। কবি ব্যস্ত ছিলেন মন্দাকিনীকে নিয়ে—ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ডানাকেও ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রথমত, চিড়িয়াখানার পাখিগুলোকে নিয়ে, আবার দু-চারটে পাখি ম'রে গিয়েছিল, সে জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। দ্বিতীয়ত, রূপচাঁদবাবু আবার বিব্রত করছিলেন তাকে। আগ্নেয়গিরিশিখর থেকে আবার ধূমোদ্‌গিরণ শুরু হয়েছিল। কবি টেলিগ্রাম পেয়ে যেদিন কলকাতা চ'লে গেলেন সেই দিন রাত্রে রূপচাঁদবাবু এসেছিলেন। অনেক রাত্রে। ডানা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোয় নি, বই পড়ছিল। রূপচাঁদবাবুর ডাকাডাকিতে উঠে আসতে হ'ল। তাকে দেখেই রূপচাঁদবাবু হাত দুটি জোড় ক'রে বললেন, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তুমি না ডাকলে আর আসব না। কিন্তু আসতে হ'ল, তোমার জন্যেই আসতে হ'ল। একটু আগে তোমার চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসছিলাম—মনে হ'ল, তোমার চিড়িয়াখানায় সাপ ঢুকেছে। পাখিগুলো খুব চেঁচামেচি করছে। ফোঁস

ফোঁস শব্দও পেলাম দু-একবার। মালীটার কি রাত্রে ওখানে শোবার কথা? ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পেলাম না কারও, তাই ভাবলাম তোমাকে অন্তত খবরটা দিয়ে যাই।"

ডানা একটু বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর সপ্রতিভভাবে বললে, "ও। কি করা যায় তা হ'লে বলুন তো? মুন্সীর ওখানে শোবার কথা। ঘর রয়েছে তার।"

"আমি তো ডেকে সাড়া পেলাম না কারও। তুমি যদি যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি—ও, বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে না তা মনে ছিল না।"

"আমি গিয়েই বা কি করব? সাপ মারা তো আমার সাধ্যে কুলবে না। আচ্ছা আমি দেউড়িতে খবর পাঠাচ্ছি, সুখন পাঁড়ে যা পারে করুক।"

"বেশ, আমি চললাম তা হ'লে।"

রূপচাঁদ চ'লে গেলেন কিছুদূর তার পর ফিরে এলেন আবার। এসে যা বললেন, তা অপ্রত্যাশিত নয়, ওই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করেছিল ডানা।

"সেদিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যে কাজটা ক'রে ফেলেছি, তার জন্যে এখনও কি ক্ষমা কর নি আমাকে? ভগবানও শুনেছি পাপীকে ক্ষমা করেন, তুমি কি তাঁর চেয়েও নিষ্ঠুর?"

প্রত্যুত্তরে অনেক কিছু বলা চলত, কিন্তু ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তার পর তিনিও ভিতরে উঠে গেলেন।

বললেন, "ডানা, এমন অবুঝের মত ব্যবহার তোমার কাছে আশা করি নি। তুমি সত্যিই যদি আমার নিতান্ত স্বাভাবিক আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাক, স্পষ্ট ভাষায় সেটা জানিয়ে দিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। তোমার এই সঙ্কোচ দেখে আমার আশা হচ্ছে যে, আমার সেদিনকার ব্যবহারে সত্যিই হয়তো তুমি তত রাগ কর নি।"

এর উত্তরে ডানা যে কথা যে সুরে বললে, তা তার নিজের কানেই অত্যন্ত নরম শোনাল। সে বলতে চাইছিল, "এই মুহূর্তে আপনি বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে' বা ওই ধরনের একটা রূঢ় কিছু। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনুনয়ের সুর—"কেন আপনি আমাকে এ ভাবে জ্বালাতন করছেন রূপচাঁদবাবু?"

"এটাকে জ্বালাতন মনে করছ কেন তুমি? অভিনন্দন এটা, পুরুষের অকৃত্রিম অভিনন্দন প্রকৃতির উদ্দেশে। আচ্ছা, সত্যিই তুমি বিরক্ত হয়েছ?"

"আমার সেদিনের আচরণ থেকে তা কি স্পষ্ট হয় নি?"

"না। সেদিন তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়াটা অনেক সময় আমন্ত্রণেরই নামান্তর। পুরুষের শক্তি বা আগ্রহকে মাপবার মাপকাঠি ওটা অনেক সময়ে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তোমরা অনেক সময় ব্যবহার কর ওটা—বড় বড় প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেন।"

"আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের বিচার প্রাণীদের নিয়ম নিয়ে হয় না। প্রাণীরা প্রকৃতির কারাগারে বদ্ধ জীব। মানুষ সে কারাগার ভেঙেই মনুষ্যত্ব অর্জন করেছে। কামনার দাসত্ব করা প্রাণীদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, মানুষের পক্ষে নয়। অন্তত আমার পক্ষে নয়।"

"আমাকে কি তা হ'লে তুমি অমানুষ ব'লে মনে কর?"

"আপনার স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা আমি কোনদিন করি নি। করবার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। এইটুকু শুধু বুঝেছি, আপনি যে পথে চলতে চান সে পথে আমি চলতে চাই না। সম্ভবত আপনার স্ত্রীও চান না।"

কথাটা ব'লেই ডানার মনে পড়ল, বকুলবালা মানা ক'রে দিয়েছিল রূপচাঁদবাবুকে তার কথা বলতে।

"আমার স্ত্রীর কথা জানলে কি ক'রে তুমি?'

"শুনেছি।"

"কি শুনেছ?"

"শুনেছি তিনি সতী।"

"কে বললে তোমাকে?"

"ঠিক মনে নেই। আশাকরি সংবাদটা মিথ্যে নয়।"

"কিন্তু তিনি আমার পথে চলতে চান না—এ খবরটা তো তাঁর কাছ থেকে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এ খবরটা পেলে কোথা?"

"ওটা আমার অনুমান। আর খুব সম্ভবত সত্য অনুমান। তিনি সত্যই যদি সতী হন, তা হ'লে আপনার পথে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।"

রূপচাঁদ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"এ দেশের সতী স্ত্রীরা স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্যে সব কিছু করতে পরে। সতী স্ত্রী পঙ্গু স্বামীর লালসা চরিতার্থ করবার জন্য তাকে কাঁধে ক'রে বেশ্যাবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে—এ গল্পও প্রচলিত আছে এ দেশে।"

"হয়তো আছে। কিন্তু ও গল্পের মূলে আর একটা জিনিস আছে, সেটাকে উপেক্ষা করবেন না। ওতে স্বামীর অকপটতাও প্রকাশ পেয়েছে। স্বামী অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর লালসার কথা স্ত্রীর কাছে, শিশু যেমন মায়ের কাছে অকপটে ব্যক্ত করে তার সন্দেশলোলুপতা। লুব্ধ অসহায় পঙ্গু স্বামীর তুচ্ছ সাধ মেটাবার জন্যে হয়তো করুণাময়ী সতী স্ত্রী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বেশ্যালয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার আচরণের মিল কোথায়? আপনি কি আপনার স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন আপনার স্ত্রীর কাছে? আমার বিশ্বাস, করেন নি। আপনি যা করছেন, তা চোরের মত করছেন। আপনার লোলুপতায় শিশুর সারল্য নেই, আছে অতি জঘন্য ভণ্ডামি। যান, বাড়ি যান। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

রূপচাঁদ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো শ্বাপদের চোখের মত জ্বলতে লাগল। নাসারন্ধ্রযুগল বিস্ফারিত হ'ল একটু। কিন্তু যে কথাগুলি তিনি বললেন, তাতে উষ্মার আভাস পাওয়া গেল না।

"তুমি আমার নিখুঁত ছবি এঁকেছ ; তোমার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করছি। কিন্তু একটু খটকা লাগছে। তুমি আমাকে এতটাই যদি বুঝেছ তা হ'লে আমাকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছ কেন, আর প্রশ্রয়ই যদি দিয়েছ তা হ'লে মাঝ পথে থামছই বা কেন?"

"আমি আপনার কথার উত্তর দেব না। আপনি বাড়ি যান।"

ঠিক এই সময়ে চাকরটা না এসে পড়লে কি হ'ত বলা শক্ত। চাকরটার আগমনে রূপচাঁদ বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু, সে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

"মাইজি, মুন্সী এসেছে।"

"এতক্ষণ তা হ'লে ঘুম ভেঙেছে যাদুর। আচ্ছা, আমি চললাম। আবার আসব পরে।"

রূপচাঁদ বেরিয়ে গেলেন।

মুন্সী এগিয়ে এসে সেলাম ক'রে প্রশ্ন করলে, মাইজি কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

"আমি তো ডেকে পাঠাই নি।"

"রূপচাঁদবাবুই তো একটু আগে ডাকছিলেন আমাকে। আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম তিনি এই দিকেই আসছেন, তাই মনে হ'ল আপনিই বোধ হয় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"না, আমি ডাকি নি। রূপচাঁদবাবু চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে আসতে আসতে শুনেছিলেন যে, পাখিগুলো চীৎকার করছে, সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজও পেয়েছিলেন তিনি, তাই তোমাকে ডাকছিলেন। চিড়িয়াখানার সব ঠিক আছে তো?"

"ঠিক আছে। অনেক পাখি তো রাত বারোটার সময রোজ ডেকে ওঠে। সাপের আওয়াজ তো পাই নি। অমন ঘন জালের বেড়ার মধ্যে সাপ ঢুকবেই বা কি ক'রে?"

"তুমি চিড়িয়াখানার চাবিদিকে ফিনাইল ব্লিচিং পাউডার দাও তো?"

"রোজ দু বেলা দি মাইজি।"

"নতুন যে প্যাঁচাটাকে আজ এনেছ, সেটা খেয়েছে কিছু?"

"একটা ইঁদুর খেয়েছে।"

"আচ্ছা, যাও তুমি। আমি কাল সকালে যাব।"

মুন্সী চ'লে গেল, চাকরটাও শুতে গেল নিজের ঘরে।

ডানা বিছানায় শুয়ে আবার আগের মতন পড়তে শুরু করল।

ভাবতে চেষ্টা করল, যেন কিছু হয় নি। রত্নপ্রভার কথাগুলো মনে পড়ল—ও কিছু নয়, সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয, ওতে ভয পেয়ো না। ডানা ভয় পায় নি। কিন্তু এটা সে ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছিল যে, রূপচাঁদ সমস্যাব একটা ভদ্র সমাধান করতে না পারলে তাকে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ক'রে যাবে কোথায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে? খুঁজলে হয়তো আশ্রয় কোথাও মিলবে, কিন্তু তার জন্যে যে প্রাথমিক প্রয়াস প্রয়োজন তা করবার শক্তি তার আছে কি? খবরের কাগজেব বিজ্ঞাপন দেখে অনেকগুলো দরখাস্ত সে করেছিল। সন্তোষজনক কোনও জবাব আসে নি। দু-এক জায়গা থেকে ইণ্টারভিউ করবার জন্যে ডেকেছিল, কিন্তু ডানা যায় নি। তার মনে হয়েছিল, চাকরিই যদি করতে হয় তা হ'লে এর চেয়ে ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না আপাতত। অমরেশবাবু বা রত্নপ্রভাকে মনিব ব'লে মনে হয় না কখনও, তাঁরা যেন আত্মীয়। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গেল ডানা একটু। নিজের ভবিষ্যতের কথা এমন ভাবে কেন ভাবছে সে? এ ভাবনার কোনও কূলকিনারা তো নেই! সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন—"কাজ কর, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ক'রো না। নির্বিকার হয়ে যদি কাজ করতে পার, তা হ'লে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাবে। আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি, এ কাজটা ভাল, ও কাজটা মন্দ, কাজ করবার বদলে আমি এ চাই ও চাই—এই সব অহংচিন্তাকে যদি প্রশ্রয় দাও, তা হ'লে দুঃখের শেষ থাকবে না। এ কথা নতুন নয়, চির পুরাতন। কিন্তু পুরাতন ব'লেই পরিত্যাজ্য নয়, দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার ওটা একটা পরীক্ষিত পথ।" ...ডানা ভাবতে লাগল, নির্বিকার হয়ে কাজ করা কি সম্ভব? আমি কাজ করব অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা করব না—এই বা কেমন ধারা কথা? ভাল কাজ, মন্দ কাজ—দুই-ই সমান ব'লে মনে করা যায় কি! তা হ'লে ওই কামুক রূপচাঁদের বাহুপাশে ধরা দেওয়া আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করায় কোন তফাত নেই? ডানার মনে হ'ল, সন্ন্যাসীর যুক্তি হয়তো ঠিক অনুসরণ করতে পারে নি সে। কাল গিয়ে পুরাতন প্রসঙ্গটা আবার একবার তুলতে হবে। সন্ন্যাসীকে ধরাই কিন্তু শক্ত। প্রায়ই তো বাসায় থাকেন না। ডানা বইটাতে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলে আবার বিলেতের এক স্কুলের হেডমাস্টার মিস্টার প্যাট্রিজ (E. H. Patridge) লিখেছেন বইখানা। এ বইটাতে তিনি যা

বলতে চেয়েছেন, ভারতবাসীর পক্ষে তা খুব নতুন কথা নয়। বর্তমান যুগের যন্ত্রসভ্যতার ভাব ও-দেশের মানুষকে প্রকৃতির কাছ থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন করেছে, আমাদের দেশে এখনও ততটা করে নি, কারণ আমাদের দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব এখনও তেমন প্রবল হয় নি, যদিও আমরা কামনা করছি—প্রবল হোক। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর। প্যাট্রিজ সাহেব বলছেন যে, যদিও বর্তমান যুগের টেকনিক্যাল শিক্ষাকে উপহাস করা বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তা করতে যাওয়া যুক্তিযুক্তও নয় ; কিন্তু তবু এ কথা ভুললে চলবে না, টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে অতি-প্রবণতা আমাদের ক্রমশ অমানুষ ক'রে ফেলেছে—আমাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল করছে, আমরা আদর্শ পিতা-মাতা হতে পারছি না, আদর্শ ভাই-বোন হতে পারছি না, আদর্শ বন্ধু-আত্মীয় হতে পারছি না, আদর্শ দেশসেবকও হতে পারছি না। ওসব হতে হ'লে বুদ্ধিবলের চেয়ে চরিত্রবল থাকা বেশি দরকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা আমাদের স্বার্থ-বুদ্ধিতেই শান দিচ্ছে কেবল, স্বার্থপর ক'রে তুলছে আমাদের। আমরা এর ফলে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছি, জীবনটাকে ভাল ক'রে ভোগও করতে পারছি না। টাকা রোজগার করছি কিন্তু সুখী হচ্ছি না, জীবনটাই ক্রমশ যেন বিস্বাদ হয়ে আসছে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের পরিপূর্ণ রূপ-রস থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমরা। এমন অবস্থা হয়েছে, যাঁরা বয়স্ক তাঁরা জীবনের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে চান না, ভয় পান। যারা শিশু বা কিশোর-কিশোরী তারা এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। সুতরাং প্যাট্রিজ সাহেবের অভিমত, নানা ছুতোয় প্রকৃতির সংস্পর্শ লাভ কর। আমরা এই যে একপেশে জীবনযাপন করছি, এ জীবন অসম্পূর্ণ, তাই আমরা অসুখী। ডানার মনে হ'ল, প্যাট্রিজ সাহেবের প্রকৃতি-সম্পূর্ণ জীবনের যে শিক্ষা আমাদের দেবে, তাও কি আমাদের কাম্য? প্রকৃতিলালিত বর্বর মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে, তারা প্রকৃতিকে চেনে, প্রকৃতির ভাষা বোঝে, তার প্রতিটি ইঙ্গিতের অর্থ তাদের নখদর্পণে, আমরা কি তাই হতে চাই? প্যাট্রিজ সাহেব তা চান না, কিন্তু তিনি প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চান। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ডানা। ভারতবর্ষের দর্শনেও প্রকৃতির উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসী সেদিন বলেছিলেন, প্রকৃতি অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়, সত্তঃ রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। ঠিক বুঝতে পারে নি কথাটা। আর একদিন গিয়ে বুঝে নিতে হবে। বইটা আবার পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু আর ভাল লাগল না। আলো নিবিয়ে পাশ ফিরে শুল। সন্ন্যাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল কেবল। স্বপ্নেও দেখা দিলেন সন্ন্যাসী।

খুব ভোরেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল ডানার। তখনও অন্ধকার কাটে নি। উঠে বসল সে বিছানার উপর। ব'সেই মনে হ'ল, শরীরের ক্লান্তি একটুও দূর হয় নি। সমস্ত রাত সে কেবল চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে ছিল, সত্যিকার ঘুম আসে নি। একটা অস্বস্তি সারা মন জুড়ে রয়েছে। ঘরের ভিতর সাপ ঢুকেছে খবর পেলে যে ধরনের অস্বস্তি হয়, অনেকটা তেমনি। রূপচাঁদইকি এর একমাত্র কারণ? না, অন্য কিছু? চিড়িয়াখানার বন্দী পাখিগুলো? তাদের অসহায় অবস্থা গোড়া থেকেই পীড়া দিচ্ছে তাকে। পাখিগুলোকে দেখে মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের কথা মনে পড়ে, যাদের বিরুদ্ধে কোনও দোষ প্রমাণ করা যায় নি, এমন কি যাদের বিচারালয়ে বিচার পর্যন্ত হয় নি, তাদের চেয়েও নিরপরাধ এই পাখিগুলো। একটা বড়লোকের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে আর তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার পাহারাদার। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাকে এই নিষ্ঠুর কর্ম বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে ব'লেই কি এই অস্বস্তি? আবার তার মনে হ'ল, তার নিজের টাকা যদি থাকত কিছু,

তা হ'লে সে বোধ হয় এমন অশান্তি ভোগ করত না। নির্ভরযোগ্য কোন নিজের লোকও যদি থাকত কেউ! ...হঠাৎ একযোগে সমস্ত পাখিগুলো ডেকে উঠল। ফরসা হয়ে এল বোধ হয়। ঘোর গ্রীষ্মেও সে সাহস ক'রে জানলা খুলে শুতে পারত না। দু-একদিন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি, শুধু রূপচাঁদের ভয় নয়, সে ভয়ও অবশ্য ছিল খুব, কিন্তু অন্য ভয়ও ছিল—বিশেষ ক'রে সাপের ভয়। গঙ্গার ধারে প্রায়ই বড় বড় সাপ বের হয়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল সে। চাকরটাকে উঠিয়ে দিলে চা করবার জন্য। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখলে যে, অত ভোরেও একটা দোয়েল এসে নদীর ধারে পোঁতা উঁচু বাঁশের ডগাটার উপর ব'সে পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে গান শুরু ক'রে দিয়েছে। পূর্বাকাশ উষারাগরঞ্জিত। মনে হ'ল, ও যেন পাখি নয়, বৈদিক যুগের কোনও ঋষি, উষাদেবীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছে স্বতঃ-উৎসারিত সঙ্গীতের মন্ত্র দিয়ে। বহু উষাকে অনুসরণ ক'রে যে নতুন উষা আজ এসেছে, অনন্তের যাত্রাপথে চলতে চলতে কিছুক্ষণের জন্য যে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর পূর্বতোরণে, তার সম্বন্ধে আর সবাই উদাসীন, কিন্তু ওই দোয়েল নয়। অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। সমস্ত পৃথিবীর হয়ে ওই ক্ষুদ্র পাখিটি যে কর্তব্য পালন করছে তার জন্য তার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু একটু পরেই তাকে চমকে উঠতে হ'ল আর একটা পাখির ডাকে, যেন সুরের ছোট্ট তুবড়ি ছুটিয়ে উড়ে চ'লে গেল একটা টুনটুনি পাখি। তার পরেই পাশের পুটুস ফুলেব ঝোপটাতে টিক-টিক-টিক শব্দ করে খুব ছোট একটা পাখি তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। দরজি পা . কি? বেশিক্ষণ ভাববার অবসর পেলে না, এক জোড়া ঘুঘু তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে। পাশপাশি এসে বসল তারা অশ্বত্থগাছেব কাঠের বাক্সটার উপর। এই বাক্সটা অমরেশবাবু টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যদি কোনও পাখি ওতে বাসা বাঁধে এই আশায়? কোনও পাখি এখনও পর্যন্ত বাঁধে নি। ঘুঘু পাখি দুটোকে বসতে দেখে ডানার একটু আশা হ'ল, বাসা বাঁধবে কি ওরা? পর-মুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল পাখি দুটো। উড়ে অনেক দূর চ'লে গেল। অনেক গাছে অনেক বাক্স টাঙিয়ে দিয়ে গেছেন অমরেশবাবু—অনেক রকম আকারের বাক্স, কিন্তু এক ওই তালগাছে টাঙানো বাক্সটায় ছাড়া অন্য কোনও বাক্সে কোনও পাখি বাসা বাঁধে নি। মানুষকে পাখিরা এখনও তত বিশ্বাস করে না। ওই বাক্সগুলোকে তারা ফাঁদ ভাবছে। বাক্সগুলোর অভিনবত্ব যখন লোপ পাবে, পুরনো হয়ে যাবে ওগুলো যখন, প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যাবে, তখন হয়তো ওগুলোতে বাসা বাঁধবে পাখিরা। অভিনবত্বকে ওরা ভয় করে, অভিজ্ঞতার ধোপে না টিকলে ওরা কোনও জিনিসকে গ্রহণ করে না। মানুষের মত দ্রুত আধুনিক হওয়ার িকে ওদেরও প্রবণতা কম। অনেক বিদেশী বিজ্ঞানী পাখিদের আধুনিক ক'রে তোলবার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য বৈঠকখানা, বাসা প্রভৃতি বানিয়ে দিচ্ছেন, এই ভদ্রমহিলার টাইপ-রাইটারের উপর ছোট্ট একটি পাখির ছবিও সে একবার দেখেছিল অমরেশবাবুর একখানা বইয়ে ; কিন্তু ওই বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করেছেন যে, পাখিদের বিশ্বাস উৎপাদন করানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ডানার এ চিন্তাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পেল না একদল শালিকের চিৎকারে। একটু এগিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে হ'ল, শালিকগুলো চেঁচাচ্ছে কেন! দেখল, একটা নেউল বেরিয়েছে। তাকে দেখেই নেউলটা ঢুকে পড়ল একটা ঝোপে। তারপরই চোখে পড়ল, সন্ন্যাসী চর থেকে ফিরছেন। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপরই মনটা অস্বস্তিত্বে ভ'রে উঠল আবার। যতক্ষণ পাখিদের নিয়ে মন নিযুক্ত ছিল ততক্ষণ নিজেকে সে ভুলে ছিল, সন্ন্যাসীকে দেখেই নিজের কথা মনে হ'ল। হঠাৎ সে

আবিষ্কার করল সন্ন্যাসীর উপর একটু অভিমান তার মনের প্রত্যন্তলোকে সঞ্চিত হয়েছে। আবিষ্কার ক'রে সে একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল নিজের কাছেই। সন্ন্যাসী তো তার সঙ্গে কোনদিন কোনও অভদ্র ব্যবহার করেন নি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু, কোনও দাবিই তো নেই, তবে অভিমান কেন? অভিমানকে প্রশ্রয় দেবার জন্য সামান্য একটু প্রেমের সম্পর্ক থাকা দরকার—তা সে সম্পর্ক যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেটুকু সম্পর্কও তো তার হয় নি। সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে হয়তো হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী সে ইচ্ছা করেন নি। বরং বিপরীত ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন তিনি, নারীসঙ্গ তিনি পরিহার করতে চান। ডানার মনে হ'ল, এই জন্যই অভিমান হয়েছে তার। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মনে মনে সে কি যেন একটা প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক যে কি সে সম্বন্ধে যদিও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার, কিন্তু প্রত্যাশা একটা ছিল মনে মনে, এখনও আছে। সে যেন মনে মনে নির্ভর ক'রে আছে ওই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটির উপর, তার নিভৃত অন্তরবাসী সত্তাটির দৃঢ় প্রত্যয়—ওই লোকটির সত্য পথের সন্ধান পেয়েছেন, ইচ্ছে করলে তারও সমস্যার সমাধান করতে পারেন, কিন্তু করছেন না। এই জন্যই অভিমান হয়েছে বোধহয়। আর একটা কারণও সম্ভবত আছে, যদিও সেটা নিজের কাছে এতদিন স্বীকার করতে বেধেছে তার। কিন্তু প্রশান্ত প্রভাত-আলোকে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। সে বুঝতে পারল যে, তার অহঙ্কার ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লেই রাগ হয়েছে ; এও সে বুঝতে পারল সন্ন্যাসীর দুর্নমনীয় সংযমকেও তার নারী-প্রকৃতি সুচক্ষে দেখছে না, মনে হচ্ছে ওটা একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বা পরিখা যা তাকে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। মনে পড়ল আর একটা ভোরের কথা। সে দিন সে রূপচাঁদের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সন্ন্যাসীর ওই ভাঙা ঘরটাতে। সন্ন্যাসী ঘরে ছিলেন না, একটু পরে ফিরে এসে যা যা বলেছিলেন তা এখনও মনে আছে তার। একটা কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে—"পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হ'ল।" সে তো সবার কাছ থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এমন কি ওই সন্ন্যাসীর কাছ থেকেও। কে কি বলবে, পাছে সন্ন্যাসী কিছু মনে করেন, এই সব ভেবে সে সন্নাসীর সঙ্গ এড়িয়ে এসেছে, ইচ্ছে থাকলেও যায় নি তাঁর কাছে। ইচ্ছে করলে সে কি ঘনিষ্ঠ হতে পারত না? তার ঘনিষ্ঠতা কি উপেক্ষা করতে পারতেন উনি? তার যে আকর্ষণী শক্তি আছে এর অনেক প্রমাণ পেয়েছে সে জীবনে। অমরেশবাবু, আনন্দবাবুর মত লোকও আকৃষ্ট হয়েছেন তার প্রতি। রূপচাঁদতো হয়েইছেন।...হঠাৎ অনেক দিন পরে আবার মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরী আর ভাস্কর বসুর কথা। এরা দুজনেও আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। রিসার্চস্কলার ভাস্কর বসুকে তার নিজেরও ভাল লেগেছিল। জাপানীরা বোমা ফেলে যদি রেঙ্গুন বিধ্বস্ত ক'রে না দিত, তা হ'লে হয়তো ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত। কথাবার্তা তো প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নের মতই মিলিয়েগেছে। সৌম্যদর্শন ভাস্কর বসুর মুখটা মনের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। কোথায় আছে এখন সে? বেঁচে আছে কি? তার মন কিন্তু ভাস্কর বসুকে নিয়ে, অতীতকে নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে চাইল না, সন্ন্যাসীই এসে মনটা জুড়ে বসলেন আবার। সন্ন্যাসী ক্রমশ এগিয়ে আসছিলেন তার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল ভূমিতে। তাঁর ভূমি নিবদ্ধ দৃষ্টি ডানার অহঙ্কারকে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল যেন। ডানা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিল, উনি চোখ তুলে চাইবেন এবং তাকে দেখে মৃদু হেসে বলবেন কিছু। কিন্তু উনি সে সব কিছুই করলেন না। ওঁর বাইরে যে একটা জগৎ আছে সে জগতের সম্বন্ধে উনি যেন সচেতনই নন মনে হ'ল। নিজের ভাঙা ঘরের মধ্যে যখন তিনি

ঢুকে পড়লেন, তখনও ডানা দাঁড়িয়ে রইল। তারও চোখে বাইরের পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহর্তের জন্য, সমস্ত অন্তর সন্ন্যাসীময় হয়ে গিয়েছিল। চাকরটার ডাকে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল।

"চা ভিজিয়ে দিয়েছি মা, আপনি আসুন।"

"ভিজিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি ভেজাতে গেলে কেন? আমাকে ডাকলেই পারতে। ভেজাবার আগে টী-পট্‌টা গরম জলে ধুয়ে নিয়েছিলে তো?"

"নিয়েছিলাম। ভরতি ভরতি দু চামচ চা দিয়েছি।"

"দুধটা গরম করেছ?"

"করেছি।"

নিরর্থক জেনেও চাকরের সঙ্গে উপরোক্ত আলাপ সে করল নিজেকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকবার বাসনায়। কিছুতেই সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না, কি করলে সে আর পাঁচজনের মত বেশ সহজ হতে পারবে। ত্রিশঙ্কুর মত কতদিন আর সে কাটাবে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে? চা খেতে খেতে সে ঠিক করলে, ওই সন্ন্যাসীর কাছেই সে পরামর্শ চাইবে আর একবার গিয়ে। তাঁকে গিয়ে বলবে, আপনি দয়া ক'রে আমাকে একটা সহজ পথ ব'লে দিন। আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশ অত্যন্ত ধোঁয়াটে মনে হয়, ঠিক বুঝতে পারি না। যতটুকু পারি ততটুকুও অনুসরণ করতে পারি না। কখনও মনে হয় হাস্যকর, কখনও মনে হয় অসম্ভব। সেদিন উঞ্ছবৃত্তির কথা বলছিলেন, এ যুগে ব্যাপারটা কি বেমানান নয়? মনে মনে সন্ন্যাসীকে সামনে বসিয়ে মনেমনেই কথাগুলো বললে সে। কিন্তু সঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার মনে। কি ছুতোয় সে যাবে তাঁর কাছে? তাঁর দিক থেকে আমন্ত্রণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও তো সে পায় নি কোনদিন। এমনভাবে যাওয়াটা কি শোভন? কথাটা আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে না গিয়ে পারে নি। এর কারণ সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, তাঁর সান্নিধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা অনির্বচনীয়, যার অপরূপত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সন্ন্যাসীর কাছে নিজের সমস্যার কথা সে তো পেড়েছিল কয়েক দিন আগে, সন্ন্যাসী বিরক্ত হন নি। বলেছিলেন, যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে ভাবনাকে একটা বিশেষ পথ অনুসরণ করতে হবে। সেই পথের কথাই জিজ্ঞাসা করবে এবার গিয়ে। একটা নির্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হয়ে তার মন যেন একটু শান্ত হ'ল।

পর-মুহূর্তেই চাকরটা এসে বললে, "কাল দুপুরে যখন আপনি বাইরে গিয়েছিলেন, তখন পিয়ন এসে ওই পার্শেলটা দিয়ে গেছে। আপনি রসিদ সই ক'রে দিন, পিওন এসে আজ নিয়ে যাবে।"

খুব ছোট একটা পার্সেল রত্নপ্রভা পাঠিয়েছেন। ডানা খুলে দেখলে, তার মধ্যে একটা চাবি রয়েছে আর একটা চিঠি।—

ডানা,

আমাদের লাইব্রেরি-ঘরের চাবিটা তোমাকে পাঠালাম। মাঝে মাঝে গিয়ে বইয়ের শেল্‌ফ্‌গুলোর একটা তদারক ক'রো। অনেক সময় উই লাগে। কোনও বই যদি পড়তে ইচ্ছে করে, প'ড়ো। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকাই স্থির কর, সুখন পাঁড়েকে বললেই

সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। তাকে ব'লে এসেছি। তুমি যে সব ভয় করছ তা অলীক। আমি যতটা করবার ক'রে এসেছি। কোনও ভয় নেই। পাখিগুলোর খবর দিও মাঝে মাঝে। কাল আমরা সিমলা যাচ্ছি। সেখানকার ঠিকানা গিয়ে পাঠাব। বকুলবালার জন্যে একটা এ-বছরের হলদে পাখি কিনেছি টেরেটি বাজার থেকে। কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। আগে থাকতে তাকে ব'লো না যেন কিছু। পৌঁছলে তারপর খবর দিও। আশাকরি, ভাল আছ। ভালবাসা নিও। ইতি—

রত্নপ্রভা।

মুক্তোর মত গোটা গোটা অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর উঠে পড়ল। নতুন ধরনের একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেল যেন সে। ঠিক করলে, আগে লাইব্রেরিতে যাবে, তারপর চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানা যাবার পথে খোঁজ নিয়ে যাবে সন্ন্যাসীর। একটা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার মনের অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল।

লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন একটা জগৎ আবিষ্কার করলে সে। তাদের বাড়িতেও বেশ বড় লাইব্রেরি ছিল, কিন্তু তাতে ছিল প্রধানত আইনের বই। যখন কলেজে পড়ত, তখন কলেজ-লাইব্রেরির বই সে নিত মাঝে মাঝে। প্রায়ই কাজের বই নিত, পড়ার বই বা যে সব বই পড়লে পরীক্ষা পাস করবার সুবিধা হয় সেই সব বই। তার সঙ্গে আনন্দের বিশেষ কোন যোগ ছিল না, কলেজ-লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে তা নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামায় নি সে। অমরেশবাবুর ছোট্ট-লাইব্রেরিটি কিন্তু তাকে অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দের সন্ধান দিলে। তার অবলম্বনহীন ক্ষুধিত মন যেন একসঙ্গে অবলম্বন এবং খাবার পেয়ে গেল নানারকম। কত রকম বই। পাখির বই-ই যদিও বেশি ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরেজী বাংলা নানা রকম মাসিক পত্র, গ্রীক নাটকের একটা পুরো সেট, ইংরেজী নভেল, বাংলা নভেল, নক্ষত্রের বই, পাকপ্রণালী, ইতিহাসের বইদু-চারখানা, কয়েকটা অভিধান—নানা রকম বই রয়েছে। ডানা একটা চাকরকে দিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে ফেললে। পরিষ্কার করাবার সময় একটা খাতা বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। সাধারণ একসারসাইজ বুক। উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'পক্ষীপর্যবেক্ষণ বাই গণেশ'। খাতা খুলে আরও অবাক হয়ে গেল ডানা। চণ্ডীর বন্ধু গণশার খাতা, গত বছরের ডায়েরির মত, সম্ভবত অমরেশবাবুর উৎসাহে পাখি দেখতে উৎসাহিত হয়েছিল গণেশ। যা যেমন দেখেছিল, লিখে রেখেছে।

১লা কার্তিক, ১৩৫৬ ঃ বেনেবউ পাখির ডাক শোনা গেল, সকাল প্রায় আটটা নটার সময়। প্রাই দেখতে পাচ্ছি পাখিগুলোকে। একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছিল। একটা ফিঙে ডাকছিল, চমৎকার মিষ্টি ডাক, প্রায় নটা দশটার সময়।

২রা কার্তিক ঃ আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শনতে পেলাম কোকিলেরা ডেকে উঠল। তার একটু পরে—প্রায় ছটার সময়—একটা দোয়েলের শিস শুনতে পেলাম। বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেলাম কয়েকটা গোশালিককে। দোয়েলটাকেদেখা গেল না। আর একটা ছোট্ট পাখি দেখলাম—টৌইট্ টৌইট্ টৌইট্, একরকম ডাকছে। ওই কি—দরজি পাখি! অনেক রকমপাখি দেখলাম আজ। টিয়া এক ঝাঁক, একটা বেনেবউ, কয়েকটা গেছোভরত—অমরেশবাবু এদের ইংরেজী নাম বলেছিলেন ট্রি-পিপিট, হলদে খঞ্জন একটা, চিল, বুক-সাদা মাছরাঙা ; বসন্ত-বউরির ডাকও শুনলাম ; স্যাকরা পাখিও (ছোট বসন্তবউরি) ডাকছিল—টংক, টংক, টংক।

৩রা কার্তিক ঃ একটা ঘুঘু ঠিক আমাদের চালের উপর ব'সে ডাকছিল আজ ভোরে।

৪ঠা কার্তিক ঃ কোকিল, ঘুঘু।

৫ই কার্তিক ঃ তেমন কিছু দেখি নি। ঘুঘুর ডাক শোনা গেছে।

৬ই কার্তিক ঃ অমরেশবাবু যে নতুন পাখিটা চিনিয়ে দিয়েছেন, সেটাকে আবার দেখলাম—রেডস্টার্ট। দেশী নাম থিরথিরা। আতাগাছে ব'সে ছিল।

পাতার পর পাতা লিখে গেছে গণেশ। খাতাটার শেষ পাতায় অমরেশবাবু লিখেছেন—"খুব খুশী হলাম ; ছেলেটির পড়ার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। রত্নাকে দেখাতে হবে খাতাখানা।" অমরেশবাবুর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। খাতাখানা রেখে দিয়ে আর একটা শেলফের দিকে এগিয়ে গেল ডানা। চোখে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী রয়েছে। একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, হঠাই বেরিয়ে পড়ল 'কর্মযোগ'। তাতেই মগ্ন হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতটা পড়া সম্ভব ততটা প'ড়ে শেষকালে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়তে লাগল সে। মনে হ'ল, তার প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন বহুকাল আগে। উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহের আর একটা হেতুও ছিল। এই প্রবন্ধটা পড়বার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করাটা সহজ হবে মনে হ'ল। উনিও আলাপের সূত্র পাবেন কিছু। 'কর্মযোগ' পডতে পড়তে সন্ন্যাসীর কথাটাই ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল। উনি নিশ্চয় পড়েছেন এসব, ওঁর নাম কি, বাড়ি কোথা? বাধা পড়ল একটু পরে। আনন্দবাবুর চাকর একট চিঠি নিয়ে হাজির হ'ল। চিঠির গোড়াতেই কবিতা একটা—

'আমি আছি', 'আমি নেই' এ দুটোই সত্য,
ছিলাম', 'ছিলাম না' তা-ও নয় মিথ্যে,
'থাকব না','থাকব' দুই-ই খাঁটি তথ্য—
সব জানি তবু হায় সুখ নেই চিত্তে।
কোথায় যে আছে সুখ কিসে যে ভরিবে বুক
তারই লাগি অহরহ হয়ে আছি উন্মুখ,
চিরে তর্কের চুল গাছে কি ফুটেছে ফুল,
প্ল্যান ক'রে হয়েছে কি মহাসাগরের কূল,
মোদের জীবন তবে অপূর্ণ কেন রবে
দর্শন-মন্থনে সুখ কে পেয়েছে কবে!
যাহাতে ভরিবে বুক কোথায় সে চিরসুখ
যেখানেই থাক্ না সে নিত্যে অনিত্যে
তাহারই ঠিকানা চাই সুখ নেই চিত্তে।

উল্লিখিত কবিতাটি প'ড়ে তোমার যদি মনে হয়, আমি দর্শন-শাস্ত্রকে বিদ্রূপ করেছি, তা হ'লে মারাত্মক ভুল হবে তোমার। দর্শন নয়, অদর্শনই আমার ক্ষোভের কারণ। যিনি আমার আসল মনিব তিনি এসেছেন, সুতরাং আপিস কামাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাবছি, ছুটির ক্ষেত্রটাকে কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়? অর্থাৎ গৃহিণীর সঙ্গে তোমার যদি আলাপ করিয়ে দিই ; তা হ'লে সমস্যার সমাধান হবে কি? এ বিষয়ে তোমার যদি অমত না থাকে, তা হ'লে আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যেয়ো। যদি অমত থাকে, জানিয়ে দিও সেটা। অমরেশবাবুর কাছারির অনেক পুরনো দলিলের পঙ্কোদ্ধার করেছি। অর্থাৎ বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র করছি একটা। তুমি যদি একটু সাহায্য কর, প্রয়োজনীয় কর্তব্যটা মনোরমও হয়ে

উঠবে। সন্ধ্যার সময় আসবে কি না এক লাইন লিখে জানিও।

আনন্দমোহন

ডানা ভুরু কুঁচকে ভাবলে স্মিতমুখে, তারপর এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে—"যাব নিশ্চয়ই ; আমি নিরামিষ খাই সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।"

বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' পড়তে পড়তে ডানা নতুন জগতে নীত হ'ল। সন্ন্যাসী তাকে যে জগতের আভাস দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দও তাকে সেই জগতেই নিয়ে গেলেন। সে জগতে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। সকলেই সেখানে স্ব-স্ব মর্যাদায় সমান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সে জগতে রাজায় মেথরে, সন্ন্যাসী গৃহস্থে সম্মানের কোন তারতম্য নেই। সকলেই সেখানে ভগবানের কাজ করছেন, নিজের নয়। কর্মই সে জগতের একমাত্র অবলম্বন—কর্মফল নয়, আকাঙ্খা নয়, অহঙ্কারও নয়। সে জগতের সামান্য পক্ষী-পরিবারও তাই অতিথি-সেবার জন্য আত্মবিসর্জন করতে ইতস্তত করে না, সন্ন্যাসী হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে রাজ্যেশ্বরী রূপসী রাজকন্যাকে। সে জগতে কর্তব্যই সব চেয়ে বড়—আত্মসুখ নয়, পরার্থপরতাই সেখানকার মন্ত্র—স্বার্থপরতা নয়। এই নতুন জগতে নীত হয়ে ডানা খানিকক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হ'ল, সে কি আদর্শ গৃহস্থজীবন যাপন করতে পারবে? এমন পুরুষ কি এ দেশে আছে, পরের মঙ্গলের জন্য যে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবে? সে রকম পুরুষ না পেলে তো আদর্শ গৃহস্থালী স্থাপনই করা যাবে না। সে নিজেও কি পারবে? বইটা বন্ধ ক'রে উঠে পড়ল সে। কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করলে নিজেকে। শেল্‌ফ্ গোছাতে গোছাতেও কিন্তু ওই একই কথা ভাবতে লাগল—আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনযাপন করবার উপায় আছে কি এ যুগে? সকলেই যে যুগে স্বার্থপর, সে যুগে পরার্থপরতার অর্থ বোকামি বা পাগলামি, সে যুগে এ সব কথা ভাবাও কি সঙ্গত? কোথায় আছে সে রকম পুরুষ, যে সংসার পাতবে নিজের জন্য নয়—পরের জন্য? যদি সে রকম পুরুষ দুর্লভ হয়—হবেই—তা হ'লেই বা তার কর্তব্য কি? সন্ন্যাসীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুললে তিনি এর কি উত্তর দেবেন, শোনবার জন্য তার মন আগে থাকতেই উৎসুক হয়ে উঠল। একটু পুলকিতও হ'ল সে। কল্পনায় সে সন্ন্যাসীর বিব্রত ভাবটা উপভোগ করতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। 'কর্মযোগ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে সন্ন্যাসীর কথা বর্ণনা করেছেন, যিনি সুন্দরী রাজকন্যাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান ক'রে বনের মধ্যে পালিয়ে গেলেন, এ সন্ন্যাসীরও কি তেমনি মনের জোর আছে? বেগতিক দেখলে ইনিও কি অমনি অন্তর্ধান করবেন? করতে পারবেন? হঠাৎ তার কল্পনা বিঘ্নিত হ'ল। চিড়িয়াখানার চাকর মুন্সী এসে দ্বার প্রান্তে দাঁড়াল।

"মাইজি, পাখিদের দানা ফুরিয়েছে। গোটা দশেক টাকা দিন, কিনে আনি। হরেওয়াদের জন্যে কিছু ঝাড়-জঙ্গলও আনাতে হবে। মিহিপুরার একটা বাগানে আছে খবর পেয়েছি। আমাকে যদি এক বেলা ছুটি দেন, আমিই গিয়ে কেটে আনতে পারি, তা না হ'লে একটা মজুর পাঠাতে হবে—তার আবার মজুরি লাগবে।"

ডানা সহসা যেন আর এক জগতে এসে হাজির হ'ল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে নীরবে চেয়ে রইল সে মুন্সীর দিকে। তারপর তার মনে পড়ল, হরবোলা পাখিরা লোরেনথাস্ (Loranthus) ফুল খেতে ভালবাসে। এগুলো একরকম পরগাছার ফুল, সাধারণত আমগাছের উঁচু ডালে হয়। অমরবাবু একবার তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন মনে পড়ল। তারপর তার মনে হ'ল, মুন্সী যে প্রস্তাবটি এনেছে তার অন্তরালে মুন্সীর চতুর একটা মতলবও যেন লুকিয়ে

আছে। যে টাকাটা সে দানা কেনবার জন্যে চাইছে তার সবটা হয়তো সে দানা কেনবার জন্যে খরচ করবে না। কিছু বাঁচাবে নিশ্চয়ই। আর যে মিহিপুরার বাগানে সে লোরেনথাস্ ফুল আনতে যাচ্ছে, সেই মিহিপুরা গ্রামেই তার শ্বশুরবাড়ি, তার যুবতী বধূ সেখানে আছে। ডানা ইচ্ছে করলে একজন গোমস্তাকে দিয়ে পাখির দানা আনিয়ে নিতে পারে, একবার হুকুম করলেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। এ বাড়ির কোনও চাকরকে ফরমাশ করলে লোরেনথাস্ ফুলও অনায়াসে এসে যাবে। অমরেশবাবুর আস্তাবলে ঘোড়া নেই কিন্তু সহিস আছে, তাকে রত্নপ্রভা বরখাস্ত করেন নি, পেন্‌শন দিয়েছেন। সে ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে উৎসুকও, তাকে বললেই সে সানন্দে লোরেনথাস্ ফুলগুলি এনে দেবে। ডানা আর একবার মুন্সীর মুখের দিকে চাইল, দেখল তার চোখ দুটো মিটমিট করছে। মায়া হ'ল, মনে হ'ল, বেচারার আশা ভঙ্গ করে তার কোন লাভ হবে না, হয়তো তার অনুচ্চারিত অভিশাপ তাঁর অনিশ্চিত জীবনকে আরও অনিশ্চিত ক'রে তুলবে। অদেখা বধূটির প্রত্যাশা-ভরা পথ চাওয়াটাও সে যেন দেখতে পেল কল্পনায়। তার নিজের মনের ভিতরই কে একজন যেন বধূটির হয়ে সুপারিশ করতে লাগল। ডানা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে দশ টাকার নোট বার করলে একটি।

"পাখির দানা কিনে আন। ভাল জিনিস কিনো, আর ওজনও ঠিক ঠিক দেখে নিও। দানা কিনে নিয়ে চল তুমি চিড়িয়াখানায়। সেখানে পাখিদের খাইয়ে তার পর মিহিপুরা যেয়ো। আমিও যাচ্ছি এখুনি।

মুন্সী সানন্দে চ'লে গেল।

চিড়িয়াখানায় অনেক রকম পাখি ছিল। একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরকে প্রথমে দেওয়াল দিয়ে এবং পরে তার দিয়ে ঘিরে অমরেশবাবু নিজের যে পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন—এখনও যদিও তা সম্পূর্ণ হতে অনেক দেরি, কিন্তু যতটুকু হয়েছে ততটুকুই ডানাকে হিমসিম খাওয়াবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশির ভাগ পাখি পাখিওয়ালারাই দিয়েছে। মুনিয়া, তিতির, বটের, দামা, দোয়েল, হরবোলা, বুলবুলি, চাতক, শ্যামা, বেনেবউ, নীলকণ্ঠ, বুনোচড়াই, গাংশালিক, পাহাড়ী ময়না, রেডস্টার্ট (কবি যার নামকরণ করেছিলেন ফুলকি), ভিংরাজ, টিয়া, চন্দনা, ফিঙে প্রভৃতি পাখিকে বড় বড় খাঁচায় রাখা হয়েছে, একটা পকুরে কিছু পানকৌড়ি এবং একজোড়া ডাহুককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হুতোম প্যাঁচাও রাখা হয়েছে খাঁচার ভিতরে, কতকগুলো ভরদ্বাজ পাখিও ছাড়া আছে ঘাসের জঙ্গলে, দরজিপাখি, টুনটুনি, সাধারণ চড়াই, ছাতারে, এ সব তো আছেই। কিছুদিন আগে রেডস্টার্টগুলোকে ডানা ছেড়ে দিয়েছিল। একটা প্যাঁচা মারা গেছে, আর একটাও মরমর। এইটের জন্যেই ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছে, ভাবছে এটাকেও ছেড়ে দেবে কি না।

মুন্সী দানা নিয়ে আসতেই ডানা জিজ্ঞেস করলে, "প্যাঁচাটা কিছু খেয়েছে?"

"একটা গোটা মাছ খেয়েছে হুজুর।"

"ভালই আছে তা হ'লে।"

"চোখ খোলেনি কিন্তু হুজুর। পিছু ফিরে ব'সে মাছটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল, তারপর থেকে চোখ বুজে ব'সে আছে।"

ডানা প্যাঁচাটার খাঁচার সামনে এগিয়ে গেল। সত্যিই রোগা হয়ে গেছে বেচারা।

"কত বড় মাছ দিয়েছিলি?"

"বেশ বড় পুঁটি একটা। আধপোয়াটাক হবে।"

ডানা কেটুপা প্যাঁচার প্রধান বৈশিষ্ট্যটা আবার ভাল ক'রে লক্ষ্য করছিল, পায়ে মোটে পালক নেই। হঠাৎ প্যাঁচাটা চোখ খুলে একবার চাইলে, বড় বড় গোল গোল চোখ দুটোর দৃষ্টি ডানাব মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল, তারপর পিঠ ঘুরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, তোমাদের মত পাষণ্ডদের মুখদর্শন করাও পাপ। ডানা মুচকি হেসে এগিয়ে গেল মুন্সীর দিকে। মুন্সী শ্যামা পাখিটার খাঁচায় কিছু মাংসের কিমা আর কিছু মরা ফড়িং দিচ্ছিল। ডানা আছে আসতেই সে বললে, "এগুলো আরশোলা খুব ভালবাসে। পুরনো গুদোম ঘরটায় অনেক আছে, কিন্তু নায়েব মশাই সেখানে ঢুকতেই দেন না আমাকে। আপনি যদি একটু ব'লে দেন।"

"আচ্ছা, বলব। গুদোম ঘরে অনেক জিনিসপত্তর আছে কি না, তাই সে ঘরের চাবি কাউকে দিতে চান না তিনি। আমি কা'ল চাবি চেয়ে রাখব, তুমি আমার সামনে কিছু আরশোলা ধ'রে এনো।"

প্রস্তাবটা মুন্সীর খুব মনঃপূত হ'ল না। সে গম্ভীর মুখে নীলকণ্ঠ, ভিংরাজ, দোয়েল প্রভৃতি মাংসাশী পাখিদের কিমা আর ফড়িং দিতে লাগল। হঠাৎ শ্যামা পাখিটা খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল আর লাফালাফি করতে লাগল খাঁচার ভিতরে।

"ওর পেট ভরে নি বোধ হয়। ওকে আর একটু কিমা দাও মুন্সী।"

মুন্সী আদেশ পালন করলে, কিন্তু মন্তব্য করলে, "ওর পেট কি ভরাতে পারবেন আপনি মা, রাক্ষস একটা! দশটা ফড়িং ওকে দিয়েছি।"

নীলকণ্ঠটাও চীৎকার শুরু করল। ভিংরাজ দোয়েলেরও আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। ডানার মনে হ'ল, কোন বড়লোকের বাড়িতে যেন কাঙালীবিদায় হচ্ছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বটের পাখিটা ব'লে উঠল—ঠিক, ঠিক তো।

"আমি চললুম! তুই এদের খাইয়ে মিহিপুরায় চ'লে যাস। আজই ফিরবি তো?"

"নিশ্চয়। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব।"

ডানা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বন্দী পাখিগুলোর দুর্দশা অতিষ্ঠ ক'রে তুলল তাকে।

সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ডানা একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস দেখলে। সন্ন্যাসী পান খাচ্ছেন। কাছেই খান দুই শালপাতা দেখে সন্দেহ হ'ল, হয়তো বাজার থেকে খাবার কিনেও খেয়েছেন। ডানাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন একটু, কোন কথা বললেন না। কিন্তু ওই মৃদু হাসির মধ্যেই এমন একটি সূক্ষ্ম অভ্যর্থনা ছিল যা ডানার মর্ম স্পর্শ করল।

"রোজই ভাবি আপনার কাছে আসব, কিন্তু সাহস পাই না। আজ জোর ক'রে চ'লে এলাম। যদি এটাকে অন্যায় মনে করেন বকুন আমাকে, আমি তৈরি হয়েই এসেছি।"

"বকতে যাব কেন শুধু শুধু। তুমি এলে তো ভালই লাগে।"

"আপনি যে পথের পথিক সে পথে তো আমরা বাধা, নিজেই তো বলেছেন এ কথা।"

"কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু পথের বাধাকে অতিক্রম করবার শৌর্য যে আমার আছে তা যাচাই করব কি ক'রে যদি বাধা না থাকে? তাই বাধাটা অনাবশ্যক নয়, ওরও প্রয়োজন আছে। তাছাড়া যা অনিবার্য তাকে কি নিবারণ করা যায়। বাধা হিসাবে তুমি দুস্তরও নও, ভয়ঙ্করও নও।"

কথাগুলি ব'লে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ডানার দিকে।

"পান পেলেন কোথা? উঞ্ছবৃত্তিধারীরা পান কুড়িয়ে খায় না কি!"

'না। কিনেছি। শুধু পান নয়, কচুরি এবং রসগোল্লাও।"

"পয়সা পেলেন কোথা?"

"আমি তো নিঃস্ব নই। পোস্টাফিসে আমার টাকা আছে কিছু।"

"এখানকার পোস্টাফিসে?"

"হ্যাঁ।"

ডানা যুগপৎ বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে উকিলের মেয়ে, তার বাবা নামজাদা উকিল ছিলেন বর্মায়, জেরা করবার সহজ শক্তি তার অন্তরের মধ্যেই ছিল সম্ভবত। সে জেরা করতে লাগল।

"এখানে এসে পোস্টাফিসে টাকা জমা করেছিলেন?"

"না। টাকা অনেক আগে থাকতেই ছিল।"

"আগে তা হ'লে আপনি আর একবার এসেছিলেন এখানে?"

সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন হাসিমুখে। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "আমার সম্বন্ধে এ কৌতূহল কেন তোমার?"

"বাঃ, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জানতে চাইব না!"

'আমার পরিচয় তো জেনেছ, আমি সন্ন্যাসী। সংসারী লোকের কাছে এর বেশি পরিচয় দেওয়া নিরর্থক।"

"আমি কিন্তু ঠিক সংসারী লোক নই। আপনাকে তো সব কথা বলেছিলুম একদিন! আমার নিজের লোক বলতে কেউ নেই। ঘটনাচক্রে আমিও সংসার থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। তাই বোধহয় আপনার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা অনুভব করি। আপনি আমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের লোক, নারীর সান্নিধ্য আপনি পছন্দ করেন না। এসব জেনেও তবু আপনার কাছে আসি। আপনার পরিচয়ও জানতে তাই আগ্রহ হয়।"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটা মাটির সরা আর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে ক'রে বেরিয়ে এলেন আবার। ডানার সামনে সেগুলো নামিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও তা হ'লে।"

"কি?"

"আমার পরিচয়। এককালে খুব খাইয়ে ছিলাম। কদিন থেকে রসগোল্লা, গরম কচুরি আর মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিছুতেই একাগ্র হতে পারি না ভগবৎ চিন্তার ফাঁকে ফাঁকেও লোভটা এসে উঁকি মারে দুষ্টু ছেলের মত। আজ সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাই ওটাকে শান্ত করলুম আগে। কিছুদিন বিরক্ত করবে না আর।"

অকৃত্রিম সরল হাস্যে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর। ডানাকে বললেন, "নাও, তুমিও খাও।"

"এখন তো আমি গিয়ে ভাত খাব। এখন খেলে দুপুরের খাওয়াটা নষ্ট হবে।"

"সঙ্গে নিয়ে যাও তা হ'লে।"

"আপনিই রেখে দিন না, বিকেলে খাবেন।"

"আমি আর খাব না। লোভকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়াও ভাল নয়। ওগুলো নিয়ে যাও তুমি।"

"আমি না এলে কি করতেন?"

"কাককে কুকুরকে খাইয়ে দিতাম। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমার নেই।"

"পোস্টাফিসে টাকা তো সঞ্চয় করেছেন!"

"আমি করি নি। আমার পূর্বপুরুষরা করেছেন।"

কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না সন্ন্যাসীর, কথার পিঠে বেরিয়ে পড়ল। জেরার মুখে আরও অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল।

"আপনার পূর্বপুরুষরা? তাঁরা এখানকার পোস্টাফিসে টাকা জমালেন কি ক'রে?"

"তারা এই অঞ্চলেই ছিলেন এককালে। আমারও ছেলেবেলাটা এখানেই কেটেছে।"

এইবার ডানা আকাশ থেকে পড়ল!

"অমরবাবু আনন্দবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল আপনার?"

"এঁরা অনেক পরে এসেছেন। আমরা এখানে ত্রিশ বছরেরও আগে ছিলাম। আমি যখন এখান থেকে চ'লে যাই, তখন আমার বয়স পাঁচ বছরেরও কম।"

"আর আসেন নি?"

"এসেছিলাম একবার পোস্টাফিসের খাতাটা ঠিক করিয়ে নেবার জন্যে। চার-পাঁচদিন ছিলাম মাত্র।"

"পোস্টাফিসের খাতা আপনার নামেই ছিল?"

"আমার নামেই ছিল। এখনও আছে।"

"এখানে আপনার পূর্ব পরিচিত লোক আছেন নিশ্চয় তা হ'লে?"

"বেশি নেই। দু-একজন আছেন। না থাকলে টাকা বার করা যেত না। কারণ এখন যিনি পোস্টমাস্টার, তিনি আমাকে চেনেন না। তাঁদের একজনকে ডেকে আনলাম গিয়ে, তারপর টাকা পেলাম।"

ডানার ভারি মজা লাগল—রসগোল্লা, লুচি আর মিঠে পান খাওয়ার জন্য ভদ্রলোক এত কাণ্ড করেছেন! লোকটির চরিত্রের আর একটা দিক দেখতে পাওয়ার পর লোকটাই যেন বদলে গেল তার চোখে। এতদিন সে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, এই অপ্রত্যাশিত নতুন আলোতে একটা পথের রেখা সে যেন দেখতে পেল। যদিও অস্পষ্ট আভাস মাত্র, তবু আশাপ্রদ।

অনুযোগভরা কণ্ঠে ডানা বললে, "এতক্ষণে বুঝতে পারছি, সত্যিই আপনি আমাকে পর মনে করেন। আমাকে একটু যদি খবর দিতেন তা হ'লে আপনাকে কচুরি আর রসগোল্লার জন্যে এত কাণ্ড করতে হ'ত না, আমি অনায়াসে সব ব্যবস্থা ক'রে দিতাম।"

"তা দিতে, জানি। কিন্তু তোমার যুক্তিটা ঠিক হ'ল না। পরের কাছেই অসঙ্কোচে ভিক্ষা চাওয়া যায়, কিন্তু নিজের লোকের কাছে সঙ্কোচ হয়। তাছাড়া তোমার কথা মনেও হয় নি। জীবন্ত কারো কাছে ভিক্ষা না ক'রে মৃতের দ্বারস্থ হচ্ছি এর অভিনবত্বেই মশগুল হয়ে ছিলাম আমি।"

"মৃতের মানে?"

"পূর্বপুরুষদের।"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল ডানার মুখের দিকে সহাস্যদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রেখে আবার বললেন, "পূর্বপুরুষদের কাছে যে আমরা সর্বদাই ঋণী সে কথা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। স্মৃতিশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন ক'রে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। আমি স্মৃতিশাস্ত্রের এ বিধান মানি নি, কথাটা মনেও লাগে নি খুব। পিতৃঋণ অপরিশোধ্য এই আমার বিশ্বাস। পূর্ব পুরুষদের দাক্ষিণ্যর দ্বারে হাত পেতে তাই ভারি আনন্দ পেয়েছি আজ।"

ডানা মুচকি হেসে বললে, "আমি আপনার মত পণ্ডিত নই। অত চুলচেরা বিশ্লেষণ

করতে পারব না। তবে রামায়ণে পড়েছিলাম যে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে কয়েকটি শহুরে মেয়ে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে শহরে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সন্দেশ দেখে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শেষকালে তিনি রাজা লোমপাদের জামাইও হয়ে গেলেন। আপনার কথা শুনে গল্পটা মনে প'ড়ে গেল।"

সন্ন্যাসী হেসে জবাব দিলেন, "অতটা বেকুবি আমি করব না! যাক, আমার কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ওটা এখন বন্ধ থাক্। কোনও দরকারে এদিকে এসেছিলে, না, এমনি বেড়াতে এসেছ?"

"দরকার আমার একটা আছে। আগেও দু-একবার বলেছি আপনাকে, কিন্তু আপনি ব্যাপারটাকে আমল দেন নি। অথচ আমার ধারণা, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন!"

সন্ন্যাসী একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখে একটা শঙ্কার ছায়াপাতও হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মনে করবার চেষ্টা করলেন, মেয়েটি কবে কোন্ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর কাছে এসে বিফলমনোরথ হয়েছে। কিন্তু মনে পড়ল না। তখন বললেন, "তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার দ্বারা তোমাব যদি কোনও উপকার হয়, নিশ্চয় করব যথাসাধ্য। ব্যাপারটা কি?"

"আপনাকে আগেই বলেছি, পৃথিবীতে এখন আমার আপন বলতে কেউ নেই। এখন যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি অতি সদাশয় লোক সন্দেহ নেই। আমার অনেক উপকার করেছেন, আরও হয়তো করবেন ; কিন্তু যে কাজ তিনি আমাকে দিয়েছেন তা একেবারেই ভাল লাগছে না আমার। কতকগুলো নিরীহ পাখিকে তিনি বন্দী ক'রে রেখেছেন আর আমার ওপর ভার দিয়েছেন তাদের তদারক করবার। ওদের আর্ত-চীৎকার রোজ রোজ আর শুনতে পারি না। মাঝে মাঝে ম'রেও যাচ্ছে। ছেড়ে দিয়েছি কয়েকটাকে। ইচ্ছে করে, সবগুলোকেই ছেড়ে দিই। কিন্তু ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই যখন আমার চাকরি তখন সব ছেড়ে দিলে হয়তো আমার চাকরিই থাকবে না। নিজের স্বার্থের জন্য অতগুলো প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছি—একথা ভাবতেও খুব খারাপ লাগে। তার ওপর আছেন ওই রূপচাঁদবাবু, লোকটার ধরন ধারণ মোটেই ভদ্র নয়। মোটের ওপর আমি বড় অস্বস্তিতে আছি। মনে হচ্ছে, এ পরিবেশ থেকে স'রে না গেলে স্বস্তি পাব না। অথচ স'রে যাবই বা কি ক'রে, হাতে টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই। এ অবস্থায় কি করি বলুন তো? আমাকে একটা পরামর্শ দিন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "সাংসারিক ব্যাপারে আমি তোমার চেয়েও আনাড়ী। অনেকদিন হ'ল সংসার থেকে চ'লে এসেছি। তোমাকে সাংসারিক পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তো আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, এ পরিবেশ তোমার যদি খারাপ লাগে এখান থেকে চ'লে যাওয়াই উচিত। স্বাধীনতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সত্যের সন্ধানে যে শক্তি আমাদের একমাত্র সম্বল, স্বাধীনতা না থাকলে সে শক্তিও আমাদের থাকে না। সংসারে অনেকেই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, আমি পারি নি, তাই আমাকে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে। সকলের পথ অবশ্য এক নয়, কোন্ পথে গেলে তুমি সুখী হবে, তা তোমাকে ঠিক করতে হবে।"

"কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি কই?"

"তোমাকেই ঠিক করতে হবে। কোন্ খাবারের স্বাদ কি রকম, তা ভাল লাগছে, না মন্দ লাগছে—এ যেমন নিজেকেই ঠিক করতে হয়, আনন্দের পথও তেমনি নিজেকে বার করতে হয়, কেউ সংসারের ভিতরে থেকেই তা পারে, কাউকে সংসার ছাড়তে হয়। আমাকে

হয়েছে। তুমি কি করবে সেটা তুমিই ঠিক কর। অনিশ্চয়তার মধ্যেই ধ্রুবকে পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তার পটভূমিকাতেই তো চেনা যায় তাকে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ পরিবেশ যদি ভাল না লাগে অন্য কোথাও চ'লে যাও।"

"আমার কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম। মুশকিল হয়েছে আমি নিঃস্ব।"

"কষ্ট ক'রে থেকে কিছু টাকা জমাও তা হ'লে মাইনে থেকে। তারপর কোথাও একটা চাকরি যোগাড় ক'রে চলে যেয়ো। এই লক্ষ্যটা ঠিক রেখে চলা ছাড়া আর অন্য কি-ই বা উপায় আছে তা তো মাথায় আসছে না আমার। অলক্ষ্য থেকে হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যরকম হয়ে যাবে কিছু একটা, তখন আবার তদনুসারে চলতে হবে। এই তো জীবন।"

সন্ন্যাসী ডানার দিকে চেয়ে হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। মনে হতে লাগল, সে যা বলতে এসেছিল তা বলেছে, কিন্তু তবু যেন বাকি আছে কিছু। অনেক কিছু।

১৩

ডানা কবির বাড়িতে যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে এসে সে পৌঁছেছিল—যদিও তাতে নতুনত্ব কিছু ছিল না, নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে—এ কথায় চমক-লাগানো অভিনবত্ব কি-ই বা থাকতে পারে, কিন্তু তবু এই আলোচনার ঘোরটা কিছুতেই যেন কাটতে চাইছিল না তার মন থেকে। ক্ষিধে পেলে খাবারটা পছন্দসই কি না তা ভাববার অবসর থাকে না অনেক সময়, যা পাওয়া যায় তাই খেতে হয়, ক্ষিধের মুখে অখাদ্যও ভাল লাগে, তাই সন্ন্যাসী বলছিলেন—যে-পথ সামনে পেয়েছ সেই পথেই চল। চলতে চলতে নিজেই বুঝতে পারবে পথটা তোমার মনোমত কি না! পথই তোমাকে নতুন পথের সন্ধান দেবে, নতুন বিচারের প্রেরণা জোগাবে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কবির বাড়িতে এসে হাজির হ'ল সে। হাজির হয়েই অর্থাৎ কড়া নাড়ার আগেই মন্দাকিনীর কথা মনে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। মনের রঙটা বদলে গেল একেবারে, কল্পনা-বীণায় বেজে উঠল নতুন সুর। বকুলবালার মত মন্দাকিনীও অপ্রত্যাশিত কিছু হবেন নাকি! হঠাৎ মনে হ'ল, মন্দাকিনী লেখাপড়া জানেন কি? আনন্দবাবুর কবিতা পড়েন কি? সহসা লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। আনন্দবাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে যে-সব কবিতা লিখেছেন তা যদি ওঁর নজরে পড়ে থাকে...। কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সে কড়া নাড়ল। কপাট কিন্তু খুলল না। কবি দোতলায় নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে ছিলেন, কড়া নাড়ার শব্দ তাঁর কানে গেল না। মন্দাকিনী রান্নাঘরে মৈথিল ঠাকুরটার সঙ্গে বাগযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তিনিও কিছু শুনতে পেলেন না। চাকরটা ছিল না, তাকে মন্দাকিনী বাজারে পাঠিয়েছিলেন সা-জিরে আনবার জন্যে। ডানা নিরামিষ খায় শুনে তিনি নানারকম নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে সোৎসাহে লেগে পড়েছিলেন এবং ঠিক এই কারণেই ডানার সম্বন্ধে একটু সশ্রদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। লেখাপড়া-জানা বর্মী মেয়ে মাছ-মাংস খায় না—এটা যেন বাঘের গায়ে কালো-ডোরা-নেই জাতীয় আশ্চর্য খবর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। তা ছাড়া আর একটা বড় কথা, আনন্দবাবুও প্রশংসা করেছেন মেয়েটির। উনি যার-তার প্রশংসা বড় করেন না। মোষের মত মোটা একটা

মেয়ে কিছুদিন আগে ওঁর পিছু নিয়েছিল, যখন উনি প্রফেসারি করতেন। এক গাদা পদ্য নিয়ে এসে প'ড়ে প'ড়ে রোজ শোনাত ওঁকে। মুখখানা কাছিমের পিঠের মত, তার উপর বড় বড় হলদে হলদে ফাঁক ফাঁক দাঁত, মুখে সর্বদা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। চুল ফাঁপিয়ে, হাত-কাটা জামা প'রে, কত ঢঙ ক'রেই যে আসত! আসতে যেতে পেন্নাম। কিন্তু তবু উনি আমোল দেন নি তাকে। এলে বিরক্তই হতেন। তাঁর দূরসম্পর্কের ছোট বোন জবাও ফষ্টি-নষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল তাঁর সঙ্গে শালী হিসেবে, কিন্তু ওঁর গাম্ভীর্যও টলাতে পারে নি, প্রশংসাও কুড়োতে পারে নি। আড়ালে বলতেন, মেয়েটা ডেঁপো। জবা সুন্দরী ছিল, কিন্তু উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। তাঁর মত লোক যখন বলেছেন যে—মেয়েটির রূপও আছে, গুণও আছে, তখন সে কথা মূল্যবানই মনে হয়েছিল মন্দাকিনীর। তিনি বাইরে স্বামীর যত রূঢ় সমালোচনাই করুন, মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন খুবই। এত বয়েস হয়েছে কিন্তু শিশুর মত সরল, নিজের কাপড়জামাটা পর্যন্ত সামলাতে পারেন না, কখন কোথায় কোন্ কথা বললে মানাবে জানেন না, ফট ক'রে বেমানান হয়তো ব'লে বসলেন একটা কিছু, এসবের জন্যে অনেক বকাঝকা, অনেক অশান্তি সৃষ্টি তিনি করেছেন, কিন্তু ওই সরলতার জন্যেই ওঁকে শ্রদ্ধাও করেন। আসল কথা, মন্দাকিনীর মনটা এসে থেকেই খুশী হয়ে আছে, সেই জন্যেই সব কিছু ভাল লাগছে তাঁর। তিনি এখন সামান্য মাস্টারের স্ত্রী নন, এত বড় জমিদাবির সর্বেসর্বা ম্যানেজারের স্ত্রী, এই ব্যাপারটা তাঁকে খুশির সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছে। মল্লিক মশায়ের বউয়ের গুমরটা যে ভেঙেছে, এতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করেছেন। জগু মোক্তারের স্ত্রীও পরশু ঘটা ক'রে বেড়াতে এসেছিলেন—আগে কখনও আসতেন না, দেখা হলে কথাও কইতেন না। এখন মুখে কথার খই ফুটছে! রূপচাঁদবাবুও এসেছিলেন দুবার। আগে এত ঘন ঘন আসতেন না। স্বামীর আয় বাড়তেই শুধু নয়, পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়াতে মন্দাকিনীর যেন নবজন্ম হয়েছে। স্বামীকে তিনি পাখি দেখতেও উৎসাহ দিচ্ছেন আজকাল। জমিদারের যখন পাখি দেখার বাতিক আছে, তখন পাখিদের খবরাখবর রাখলে তিনি খুশী হবেন নিশ্চয়, আর তিনি খুশী হ'লে চাকরির বনিয়াদ ক্রমশ পাকা হবে—এই তাঁর যুক্তি। ডানা মেয়েটিও এই পাখি-তদারকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে শুনে ডানার প্রতি একটা আত্মীয়সুলভ মনোভাব হয়েছিল তাঁর। মহা উৎসাহে তার জন্যে রান্না করছিলেন তিনি।

তৃতীয় বার একটু জোরে কড়া নাড়ার পর ফল হ'ল। মৈথিল ঠাকুরটি এসে কপাট খুলে দিয়ে আধা-বাংলা হিন্দীতে অভ্যর্থনা করলে, "আসেন মাইজি, ভিতরে আসেন।"

ব্যাপারটা কবিরও কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি নেবে এলেন। মন্দাকিনীও কড়াটা নাবিয়ে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। লণ্ঠনটা তুলে ধ'রে ডানার মুখখানি ভাল ক'রে দেখে একমুখ হেসে বললেন, "ইনিই ডানা নাকি! একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। এ যে আমার শঙ্করী গো।"

ডানার মধ্যে নিজের মেয়ে শঙ্করীকে দেখে মন্দাকিনী বিগলিত হয়ে পড়লেন একেবারে। কবি কোনও কথা বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু। মন্দাকিনীর আড়ময়লা কাপড়ে হলুদের দাগ লেগেছিল একটু, মাথায় টাক পড়েছিল সামনের দিকটা, কপালে গালে কালো কালো দাগ পড়েছিল, দেহ শীর্ণ, গায়ে সেমিজ পর্যন্ত নেই ; কিন্তু তবু মন্দাকিনীকে খুব ভাল

লাগল ডানার। তাঁর স্নেহমাখা মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয় হ'ল যেন সে। ঝুঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে তাঁকে। প্রণাম করতে গেলে অনেকে যেমন মৌখিক লৌকিকতা ক'রে 'হাঁ-হাঁ' ক'রে ওঠেন, মন্দাকিনী সে সব কিছু করলেন না। তাঁর প্রাপ্য প্রণামটা নিয়ে তার চিবুকে হাত দিয়ে নিজের আঙুলগুলি ঠোঁটে ঠেকিয়ে আলগোছে চুম্বন করলেন। তারপর আশীর্বাদ করলেন, সতীলক্ষ্মী হয়ে দীর্ঘজীবী হও। ডানার মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা সম্পদ পেয়ে গেল সে অপ্রত্যাশিতভাবে। তাকে এমন ক'রে আশীর্বাদ কেউ কখনও করেনি। তার দেহমন স্নিগ্ধ হয়ে গেল যেন।

"রান্নার এখনও একটু দেরি আছে। তোমরা ওপরে ব'সে ততক্ষণ লেখাপড়া কর। ঠাকুর, তুমি বেরিয়ে দেখ একটু, হরিয়া মুখপোড়া দু-আনার সা-জিরে আনতে গিয়ে যুগ কাবার ক'রে দিলে। ঠিক মোড়ে বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে মুখপোড়া।"

ডানাকে নিয়ে কবি উপরে উঠে গেলেন।

"আমার কাজ প্রায় হয়ে এসেছে। তুমি ততক্ষণ আমার কবিতার খাতাটা ওলটাও। শেষের দিকে দেখ, কয়েকটা নতুন কবিতা লিখেছি।"

ডানা খাতা ওলটাতে লাগল। কয়েকটি নতুন কবিতা চোখে পড়ল।

টিয়া

ওরে টিয়া তোকে যদি বলি কলাগাছ
ঠোঁটটি তা হ'লে তোর মোচা,
কিন্তু যে কবি তোকে কলাগাছ বলবে
সে কবি নিতান্তই ওঁছা!

তুই কিরে সবুজের জয়-গান
তাই কি কোরাস্ ধরে যত বন-ময়দান
যোগ দিয়ে পান্নার সঙ্গে
এসে কি মিশল তোর অঙ্গে!

সবুজ হতে না পেরে চুনীটা
হ'ল বাঁকা টুকটুকে ঠোঁট কি
চুনীতে তৈরি ওটা আবীরের মটকি ;
সে'আবীর কারো কারো কণ্ঠেও লেগেছে
কারো কারো ডানাতে
এ কথা রটেছে-রূপখানাতে।

সেখানের রূপসীরা তাই নাকি ঠোঁটে গালে চরণে
আলতা মাখায় নানা ধরনে!
রসিকেরা হেসে হন্ন-সারা
টিয়ার নকল করা—এ কেমন ধারা!

ছাতারে

দিন, গেল, মাস গেল, কাটিল বছর
তবু তোর থামিল না কচর-বচর
রে ছাতারে পাখি,
বল্ তোর ভাষণের আর কত বাকি!
কান প্রাণ গেল যে ছাপিয়ে
আর কত বকবি রে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ফুৎকি

ওরে ওরে ফুৎকি, মাটিতে নামবি না?
একটু থামবি না?
ডালে ডালে চিরকাল ছটফট করবি
সারাদিন ক্রমাগত কত পোকা ধরবি?
একটু নাম্ না ভাই
একটু থাম্ না ভাই!
দূরবীনে দে না ধরা ক্ষণিকের জন্য,
চট্ ক'রে দেখে নি'
কবিতায় এঁকে নি,
কোন্ গুণে হয়েছিস এতটা অনন্য!

ফটিক জল

ফটিক জল পাখিটির দেখা পেলাম সকালে
দেখা দিয়েই ঠকালে,
ফুড়ুৎ ক'রে পালিয়ে গিয়ে লুকোল
অমনি আমার কাব্য-মুকুল শুকোল,
কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ উঠল ফুটে হর্ষিত
'ফটি—ক জল' গহন- থেকে হ'ল যখন বর্ষিত।

ফিঙ্গক-শারিকা-কাব্য

আমড়াগাছের শুকনো ডালে একটি ফিঙে এবং একটি শালিক পাশাপাশি ব'সে ছিল। কেন জানি না, মনে হ'ল শালিকটি স্ত্রী-শালিক এবং ফিঙেটি পুরুষ-ফিঙে। এ অবস্থায় মানব-কবির মনে যে ভাব আসা স্বাভাবিক তাই এসেছিল। কিন্তু শেষে অপ্রস্তুত হতে হ'ল।

ওহে ফিঙে চৌধুরী
করেছ কার বউ চুরি?
শালিকপ্রিয়া তোমার পাশে
আছেন ব'সে কিসের আশে!
মিল হবে কি শালিক-ফিঙে কূজনে?
করছ নাকি কেলেঙ্কারি
বাঙালী আর তেলেঙ্গারি
গাঁথছ নাকি মিলন-মালা দুজনে!
খাসা কাব্য ফেঁদেছিলাম
ছন্দটি বেশ গেঁথেছিলাম
এমন সময় ফিঙা গেল উড়িয়া
শালিক পাখি নির্বিকার
দেখলে নাকো ফিরেও আর
রইল একা আমড়া-শাখা জুড়িয়া।
তার পরেতে একটু পরে
উড়ল সেও 'পিড়িং' ক'রে
দিব্যজ্ঞান হইল পরকীয়ার কি।
বসল শিরীষ গাছে গিয়ে
তার পরেতে ঘাড় ফুলিয়ে
ঝাঁকিয়ে মাথা বললে এ কি ইয়ার্কি!
মনে রেখো শালিক মোরা
এবং মোরা সেকেলে,
মানুষ নই, মানুষ নই
এবং নই একেলে।

শিকারী পাখি

অলঙ্কৃত কর তুমি আকাশের নীল
বহু নামে। কভু তিস্‌সা, কভু চিল,
কখনও কোড়ল ; ঈগলের রূপ ধরি
কভু দৃপ্ত পক্ষীরাজ। শিক্‌রে কুররী
কভু ; কখনও আবার সাপমার হয়ে
ধ্বংস করি সর্পকুল বেড়াও নির্ভয়ে।
পানডোবা-মাঠচিল-রূপে পুন দেখি
ক্ষিপ্র বেগে শত্রুমাঝে ঝম্প দিয়া, একি

অসঙ্কোচে অনুসরি বেদুঈন-রীতি
সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রান্তে ঝুলায়ে ঝটিতি
রক্তাক্ত শিকারটিরে, হও নিরুদ্দেশ।
কভু দেখি ধরিয়াছ অপরূপ বেশ
পাংশু মাথা লাল ডানা ; কভু লাল শির
ডানায় নীলাভ পাংশু তন্বী তুরম্‌তীর।
মাঝে মাঝে মনে হয় ঋষি দুর্বাসার
তুমিই কি পক্ষীরূপ? অথবা দুর্বার
চেঙ্গিস নাদির কোন ধর পক্ষীসাজ।
পক্ষীজগতের বজ্র, হে বিহঙ্গ বাজ,
কহ, কহ, সমুদ্যত-নখ-চঞ্চুবান,
রুদ্রবীণে তুমিই কি সারঙের তান?

কাজল গৌরী

ও রূপসী বণিক বধূ
মাথা তোমার করছে ধূ-ধূ
হঠাৎ কেন করলে এমন ক্ষৌরী,
হলদে পাখি বললে হেসে
দিলাম দেখা নূতন বেশে
নামটি আমার এখন কাজল গৌরী।
বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম
কালার দেখা পেয়েছিলাম
মাথার কালো হারিয়ে গেল সেই কালোয়,
তাহার ধটির পীতবরণ
হলদে রঙও করবে হরণ
থাকব কি আর তখন আমি এই আলোয়?
শুনি এই নিদারুণ বাণী
আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িলাম জীর্ণ গীতাখানি।

ডানা

পাখির ডানা আছে, তুমিও ডানা
আকাশে উড়িবার নাই তো মানা
কিন্তু জানি তুমি উড়িবে না গো,
মনে মনে তারই দরশ মাগো
যাহার বাজারেতে অনেক দাম
স্বর্ণ-পিঞ্জর যাহার নাম
হারেম বলে কেউ, কেউ বা ঘর,

সবাই চেনা-শোনা নাইক পর,
তাহারই নিরাপদ কোমল কোলে
জানি গো জানি তব হৃদয় দোলে,
অজানা আকাশেতে দেবে না হানা
যদিও নাম তব শ্রীমতী ডানা।

কবিতাটি প'ড়ে ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। কবির দিকে চেয়ে দেখলে একবার। কবি নিবিষ্টচিত্তে কি লিখে যাচ্ছিলেন, ফিরে চাইলেন না। ডানা তবু চেয়েই রইল, তার মনে যে প্রতিবাদটা জেগে উঠেছিল, সে ভাবছিল, সত্যিই কি সেটা অন্তরের কথা তার? অজানা আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাহস তার আছে কি? সহসা মনে হ'ল, আছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে অজানা পথেই তো চলছে। শুধু সে কেন, সকলেই। মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, অজানা জগতেই এসে অবতীর্ণ হয় সে। তার পব থেকে প্রতিমুহূর্তে তার অভিযান চলে অজানাকে জানবার, অনায়ত্তকে আয়ত্তে আনবার। এই চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে ডানা কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারল না। পৌঁছবার আগেই কবি বাধা দিলেন।

"একটা খবর তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। নিখিল বদলি হয়ে গেল এখান থেকে। তার জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিস্টার বোস। তিনি নাকি চেনে তোমাকে। আসবেন তোমার কাছে একদিন।"

"মিস্টার বোস?"

"হ্যাঁ, ভাস্কর বোসু।"

ডানা স্তম্ভিত হয়ে রইল।

১৪

যে ভাস্কর বসুর সঙ্গে রেঙ্গুনে আলাপ ছিল, যার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে-ই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে! কথাটা বিশ্বাস করতে সাহস হ'ল না ডানার। কিন্তু আর কোনও ভাস্কর বসুর সঙ্গে তার তো আলাপ নেই! তা হ'লে...। আশা-আশঙ্কায় বুকটা দুলে উঠল তার। বিয়ে করেছে কি ভাস্কর? যদি ক'রে থাকে, যদি না ক'রে থাকে—উভয়বিধ সম্ভাবনার জন্যেই সে নিমেষে প্রস্তুত ক'রে নিলে নিজেকে। যেন পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে। বাইরে কিন্তু কোনও বিচলিত ভাব দেখা গেল না তার। কবি ঝুঁকে কি একটা কাগজ দেখছিলেন, ডানা তাঁর দিকে শান্তমুখেই চেয়ে রইল। তার পর প্রশ্ন করল, "ভাস্কর বসুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে নাকি?"

কবি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, "না। শুনছি লোকটা ট্যাঁসমার্কা। আলাপ হবেই একদিন। ব্যস্ত কি! যেচে আলাপ করতে যাব কেন?"

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চেয়েই রইলেন খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে। তার পর বললেন, "একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করেছি পুরনো কাগজপত্র থেকে। অমরবাবুও বোধ হয় জানেন না ব্যাপারটা।"

"কি?"

"তুমি যে বাড়িটাতে আছ আর ওই সন্ন্যাসী যে পোড়ো বাড়িটাতে আছেন—ওই বাড়ি

দুটো আর ওর সংলগ্ন বিশ বিঘে জমি অমরবাবুর নয়। ওটা সহায়রাম ভট্টাচার্য নামে এক ভদ্রলোকের। সমস্ত জমিদারিটাই এককালে তাঁর ছিল। রত্না দেবীর বাবা তাঁর কাছ থেকে জমিদারিটা কেনেন। গঙ্গার ধারেব ওই বাড়ি দুটো আর ওই বিশ বিঘে জমি তিনি বিক্রি করেন নি, আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল বোধ হয়, এসে বাস করবেন। কিন্তু আর আসেন নি। ওটা ক্রমশ অমরবাবুর সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয়ে গেছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো।"

ডানার মনে পড়ল, সন্ন্যাসী বলছিলেন যে ছেলেবেলায় তিনি এখানে ছিলেন। সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই তো? তাঁর বাবা এখানকার পোস্ট-অফিসে টাকা জমিয়ে গেছেন। চকিতের মধ্যে অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলে গেল তার মনে। কিন্তু কোন কথা বললে না সে। শান্তমুখে ব'সে রইল চুপ করে। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললে, পোস্ট-অফিসে যখন পাসবুক আছে তখন সন্ন্যাসীর সব খবর সে বার করতে পারবে। যদি পারে, তখন...চিন্তা আর এগোল না। তখন কি করবে সে? বিশেষ কিছুই তো করবার নেই! বিশেষ কিছু করবার নেই, এই কথাটা মনে হওয়াতে বিমর্ষ হয়ে পড়ল সে। ওই উদাসীন লোকটা আজ এখানে আছে, কাল আবার অন্যত্র চ'লে যাবে, কোন ঘটনাই তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না কোথাও।

কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন।

"আমার সব রান্না হয়ে গেছে। এইবার রূপচাঁদবাবু এলেই তোমরা খেতে বসতে পার। আমি তোমার জন্যে নিরামিষ রান্না করেছি, রূপচাঁদবাবু নিজেই নিজের জন্যে মাংস রান্না ক'রে আনবেন। আমি আর আঁশের হাঙ্গামাই করি নি এ বেলা। উনি এখানে কাজ করছেন, চল তুমি ও-ঘরে, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। এখানে বক বক করলে উনি রাগ করবেন এখুনি আবার। রাগটি তো কথায় কথায় কিনা! লেখাপড়ার সময় টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।"

কবি কোন কথা না ব'লে গৃহিণীর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু ক্ষণকাল। তারপর আবার কাগজপত্রে মন দিলেন। রূপচাঁদবাবু আসবেন শুনে ডানা মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু তার বাইরের শান্তভাব ব্যাহত হ'ল না তাতে। মন্দাকিনীর কথা শুনে হাসিমুখে সে উঠে দাঁড়াল।

কবি তার দিকে চেয়ে বললেন, "আমি একটা নতুন কবিতা লিখেছি আজ সকালে। সেটা ও-খাতায় নেই। অন্য আর একটা খাতায় আছে। পরে দেখাব। খাওয়া-দাওয়ার পর।"

মন্দাকিনী ঠোঁট উলটে বললেন, "আমি মুখ্যু মানুষ। ও-সবের কিছু বুঝি না। তোমার ভাল লাগে বুঝি?"

ডানা হেসে বললে, "লাগে একটু একটু।"

"তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, কত পরীক্ষা পাস করেছ, তোমার তো লাগবেই। চল ও-ঘরে।"

পাশের ঘরে গিয়ে ডানা বললে, "পরীক্ষা পাস করলেই বা, আপনার সংসারের বিষয়ে যত জ্ঞান যত বুদ্ধি আছে তার সিকির সিকিও আমার নেই। আমি কতকগলো বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাস করেছি মাত্র।"

মন্দাকিনী মনে মনে খুশী হলেন। তাই একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, "তাই বা ক'টা মেয়ে পারে! ক'টা ছেলেই বা পারে। আমার খোকা তো এবার প্রমোশনই পেল না। কেবল ঘুড়ি, ঘুড়ি আর ঘুড়ি।"

বিছানায় দুজনে পাশাপাশি বসলেন।

মন্দাকিনী বললেন, "তোমাকে দেখে আমার শঙ্করীকে মনে পড়ছে। তোমার চিবুকের দিকের গড়নটা ঠিক শঙ্করীরই মত। তার চোখ অবশ্য তোমার চোখের মত ভাসা ভাসা নয়, ধরন-ধারণ কিন্তু তোমারই মত। মুচকি মুচকি হাসে, বেশি কথা বলে না। অনেক দিন চিঠি পাই নি মেয়েটার। তার কোলের মেয়েটা কেমন আছে কে জানে!"

এইভাবে আলাপ শুরু ক'রে মন্দাকিনী নিজের জগতে নিয়ে গেলেন ডানাকে, যে জগতে মলোটভ বা নেহরুর চেয়ে সুন্দরী গাই বড়, বেকার-সমস্যার চেয়ে বড়ি-সমস্যার প্রাধান্য বেশি। কথায় কথায় তাঁর ভাইয়ের বিয়ের কথাও উঠে পড়ল ; বিয়েতে কতরকম বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, কত জিনিস নষ্ট হয়েছিল (আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত গামলা গামলা সন্দেশ রসগোল্লা চুরি করেছিল—নীচু গলায় বললেন খবরটা), পাত্রীপক্ষ অলঙ্কারে, বরাভরণে কি রকম কৃপণতার পরিচয় দিয়েছিল, এমন খেলো চেলী দিয়েছিল যে রঙ উঠে যাচ্ছিল, আংটিটা পেতলানি, দানের বাসন কংকঙে, নগদ টাকা তো দেয়ই নি—যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে তারা। তবে মেয়েটি সুন্দরী। তা ছাড়া ঘরের কাজকর্মও ভাল জানে। চমৎকার মোরব্বা তৈরি করেছিল। আচারও নাকি চমৎকার করে শুনলাম। আচার-প্রসঙ্গ এসে পড়াতে মন্দাকিনীর ক্ষোভ উথলে উঠল। ঠিক সময় কুল কেনা হয় নি ব'লে তিনি কুলের আচার করতে পারেন নি। উনি (আনন্দবাবু) যদি একটু হুঁশ ক'রে কিনে রাখতেন তা হ'লে হ'ত, কিন্তু ওঁকে বিধি যে কি দিয়ে নির্মাণ করেছেন তা তিনিই জানেন। এ অঞ্চলে কুল একটু দেরিতে পাকে, কুল পাকবার আগেই তাঁকে ভায়ের বিয়ের জন্যে চ'লে যেতে হ'ল, কুল কেনা হ'ল না। এবার আমের কাসুন্দি করবার ইচ্ছে আছে। হঠাৎ মন্দাকিনী ডানার ব্লাউসের হাতাটায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ছুঁচের কাজ তুমি নিজে করেছ?"

ডানা লজ্জিত হয়ে বলল, "আমিই করেছি। কিন্তু ভাল হয় নি, আমি ভাল জানি না।"

"কেন, বেশ চমৎকার হয়েছে তো। আমি এসব কিছুই পারি না। কাঁথা সেলাই করতে দাও, পারব। পাড় জুড়ে জুড়ে পরদা বা বিছানার চাদর করতে দাও, পারব। কিন্তু ছুঁচ দিয়ে ফুল পাখি লতাপাতা আঁকা—এ আমার দ্বারা হয় না। কেউ-তো শেখায় নি ছেলেবেলায়। শঙ্করীটা পারে। এক মাস্টারনী শিখিয়েছিল ওকে।"

ডানা চিত্রার্পিতবৎ ব'সে ব'সে শুনে যাচ্ছিল। যে জগতে সে মানুষ হয়েছে সে জগতেও গৃহকর্ম-নিপুণা গৃহলক্ষ্মীরা ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন আলাদা জাতের। বিদেশী সংস্কৃতির ছোঁয়াচ লেগে তাঁদের স্বভাবটা একটু যেন দোআঁশলাগোছের হয়ে গিয়েছিল। চাকরকে 'বোয়' ব'লে ডাকতেন, বাইরের কেউ এলে চট ক'রে তার সামনে বেরুতে পারতেন না। দু সেকেণ্ডের জন্যেও অন্তত আয়নার সামনে না দাঁড়িয়ে অচেনা লোকের সামনে বার হওয়া অসম্ভব ছিল তাঁদের পক্ষে। যখন বার হতেন তখন মুখে ঝুলত একটা মেকি হাসি। মন্দাকিনীর মত এ রকম বেশে বাইরের কারো সামনে ব'সে গল্প করার কল্পনাও করতে পারতেন না তাঁরা। তাঁদের গল্পও পোশাকী গল্প, খবরের কাগজের খবর, আবহাওয়া, বড়

জোর মার্কেট-সংক্রান্ত দু-চারটে কথা। অন্তরের কথা নয়। তাঁরা যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তাঁদেরও অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের, মন্দাকিনীর মত নয়। শুধু যে তাঁরা টেবিলে খেতেন বা ইংরেজী বকুনি দিয়ে কথা বলতেন ব'লেই স্বতন্ত্র জাতের তা নয়, তাঁদের মন এবং চরিত্রের গড়নই ছিল অন্য রকম। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়াতে মজা লাগল একটু। মনে পড়ল, বিপদে পড়লে এই স্বতন্ত্র সংস্কারে গঠিত চরিত্র বা মন এক নিমেষে বদলে যেতেও সে দেখেছে। জাপানীরা যখন বর্মায় বোমা ফেলল তখন তাদের এক সাহেবী-মেজাজের প্রতিবেশী মিস্টার বিশওয়াস্ বদলে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন দলবদ্ধ হয়ে পালাচ্ছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে দাড়িওলা গলায়-রুদ্রাক্ষের মালা এক বেঁটে কালো-গোছের লোক ছিলেন। তিনি বিশওয়াস্-পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন কয়েক দিনের মধ্যে। বহু লোক একসঙ্গে পালাচ্ছিল। কয়েক দিন মিস্টার বিশওয়াস্দের খবর পাওয়া যায় নি ভিড়ের মধ্যে। সবাই তখন নিজের নিজের সামলাতে ব্যস্ত। দিন দশেক পরে হঠাৎ তাঁদের দেখা গেল একেবারে ভিন্ন চেহারায়। মিস্টার বিশওয়াস্ হঠাৎ ভোল বদলে একেবারে বিশ্বেস মশাই হয়ে গেছেন। মাথা কামিয়ে টিকি রেখেছেন, গায়ে নামাবলী। মিসেস বিশ্বাসের ঠোঁটে রুজ নেই, কপালে তিলক। তিনি নিষ্ঠাভারে নিজেকে বিপত্তারিণী-ব্রতে নিযুক্ত করেছেন।

মন্দাকিনী বক্ বক্ ক'রে ব'কেই চলেছিলেন। ডানা যে তাঁর কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না, সে খেয়ালই তাঁর ছিল না। তিনি যেন তাঁর শঙ্করীকে পেয়ে তার কাছেই বহুদিনকার সঞ্চিত সংবাদ সব ব'লে যাচ্ছিলেন অসঙ্কোচে। পাশের ঘরে রূপচাঁদের গলা পেয়ে তাঁর একটু হুঁশ হ'ল, মাথার কাপড়টা টেনে উঠে দাঁড়ালেন।

"রূপচাঁদবাবু এসে গেছেন। এবার খাবার ঠিক করি তোমাদের। রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে তো?"

"আছে।"

"তা হ'লে পাশের ঘরেই বসবে চল।"

বলা বাহুল্য, রূপচাঁদবাবুর সামনে ডানার যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তবু বেশ সপ্রতিভভাবেই পাশের ঘরে গেল।

ডানাকে দেখে রূপচাঁদবাবু একটু অবাক হয়ে গেলেন।

"এ কি, তুমি এখানে? আমি তোমার বাড়ি হয়ে ঘুরে এলাম।"

"কেন, কোনও দরকার ছিল?"

"একটা খবর দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে হঠাৎ এখান থেকে বদলি ক'রে দিয়েছে। খবর পেলাম, মিসেস সেনগুপ্তের ইঙ্গিতেই এটা নাকি হয়েছে। পুলিস সায়েব তাঁর নাকি চেনা লোক। মল্লিককেও তিনি বিপন্ন করেছিলেন। আনন্দমোহনের দয়াতে সে বেচারা ছাড়া পেয়েছে। মল্লিকের না হয় কিছু দোষ ছিল, কিন্তু আমাকে কি অপরাধে বদলি করা হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না। তাই তোমার কাছে জানতে গিয়েছিলাম, তুমি কিছু জান কি না। তুমি রত্নপ্রভা দেবীর পেয়ারের লোক—হয়তো জানতেও পার।"

"আমি কিছুই জানি না। আপনার বদলির খবর আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ডানার মনে হ'ল, তার দু গালে কে যেন দুটো ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে। তার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। আনতচক্ষে ব'সে

রইল সে।

"যাক, এ ব্যাপারটা শেষ হ'ল মোটামুটি এখন।"

কবি সশব্দে মোটা খাতাখানা বন্ধ ক'রে দিলেন।

"কি ব্যাপারে লিপ্ত ছিলে তুমি? কবিতা লিখছিলে, না, আর কিছু?"—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন।

"কিছুক্ষণ আগে কবিতা লিখেছি একটা। কিন্তু এই খাতাটায় সমস্ত প্রজাদের একটা বর্ণানুক্রমিক সূচী ও তাদের পরিচয় লিখে ফেললাম। আচ্ছা, সহায়রাম ভট্টাচার্যকে চেন তুমি, নাম শুনেছ কখনও তাঁর?"

"না। কোথাকার লোক?"

"এককালে তিনিই এই জমিদারির মালিক ছিলেন। রত্নপ্রভা দেবীর বাবা, মানে—অমরবাবুর শ্বশুর তাঁর কাছ থেকেই জমিদারিটা কেনেন। কিন্তু নদীর ধারের বিশ বিঘে জমি আর দুখানা বাড়ি তিনি বিক্রি করেন নি। একটা বাড়িতে ডানা থাকে, আর একটাতে ওই সন্ন্যাসী থাকেন।"

এ নিয়ে আরও আলোচনা চলত, কিন্তু মন্দাকিনী এসে বললেন, "লুচি ভাজছি, তোমরা বসবে চল।"

রূপচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাত নেই? মাংসে একটু বেশি ঝোল থেকে গেছে। চারটি গরম ভাত পেলে ভাল হ'ত।"

"ভাত আছে বইকি।"

"তবে চলুন।"

ডানা খেতে ব'সে অবাক হয়ে গেল। মন্দাকিনী এক হাতে দশ রকম নিরামিষ তরকারি, দু রকম ডাল, পায়েস, এমন কি পিঠে পর্যন্ত করেছেন। এত রকম এবং এমন সুস্বাদু নিরামিষ তরকারি সে জীবনে আর কখনও খায় নি। খেতে খেতে রূপচাঁদের বদলি নিয়েই আলোচনা হতে লাগল। পূর্ণিয়ায় বদলি করেছে তাঁকে। জায়গাটা বড় অস্বাস্থ্যকর, গেলেই নাকি ম্যালেরিয়া হয়! ডানা এ আলাপে যোগ দিল না। খাওয়া শেষ হবার পর রূপচাঁদ ডানার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? যাও তো পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।"

"আমি একটু পরে যাব। আপনি যান।"

রূপচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর চ'লে গেলেন।

সকলের খাওয়ার পর মন্দাকিনী খেতে বসলেন। ডানা তার কাছে বসল গিয়ে।

"এ কি. আপনি আর কিছু খাবেন না?"

মন্দাকিনী দুখানি রুটি, একটু তরকারি আর গুড় নিয়েছিলেন।

"রাত্রে বেশি খেলে হজম হয় না। ভাত লুচি কিচ্ছু না। দুখানি শুকনো রুটি খাই, তাও রাত্রে দুবার উঠে জল খেতে হয়।"

মন্দাকিনী রান্নাঘরের এক ধারেই খেতে বসেছিলেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ডানা ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্যেই একটা আসন নিয়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ব'সে আছে। বসবার ধরন দেখেই তিনি বুঝতে পারছিলেন, বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ব'সে নেই সে। অসুবিধা হচ্ছে।

"তুমি ওপরে ওঁর কাছে গিয়ে ব'স না। আমার কাছে আর বসতে হবে না। আমার খাওয়া

হয়েও গেল।"

একটি ছোট ঘটি বাঁ হাতে তুলে আলগোছে জল খেয়ে আহার শেষ করলেন তিনি।

"তুমি ওপরে যাও। আমার সারতে-সুরতে এখনও ঢের দেরি।"

"আমি তবে চ'লেই যাই। আর একদিন আসব।"

ডানা কবির সঙ্গে যখন ওপরে দেখা করতে গেল, তখন তিনি লিখছিলেন। ডানাকে দেখে বললেন, "এ কবিতাটা নিয়ে যাও, বাড়ি গিয়ে প'ড়ো। এখানে পড়বার নয় ওটা।"—ব'লে তিনি মুচকি হাসলেন।

"এখনই লিখলেন নাকি?"

"না। আগেই লিখেছি। টুকে দিলাম এখন। অনেকদিন পরে এ ধরনের কবিতা লিখলাম। লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল, শুনলে হয়তো তোমার ভালই লাগবে।"

"কি কথা?"

"এ ধরনের কবিতা আর লিখব না।"

"কেন?"

"লিখতে পারব না। যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে।"

কবি স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তার পর বললেন. "কিন্তু সেই জোয়ারের মুখে নৌকো ভাসিয়ে যে অমরাবতীতে আমি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। যদি হাতে কোনদিন পয়সা হয়, কবিতাগুলো ছাপাব, আর তুমি যদি আপত্তি না কর, তোমাকে উৎসর্গ করব সেগুলো।"

এর উত্তরে ডানা কিছু না ব'লে একটু মুচকি হেসে চ'লে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে একটা কথা তার মনে হ'ল। যে রকম যোগাযোগ ঘটছে, তাতে তার জীবনে নবপর্বের সূচনা হবে বোধ হয়। এখানে যে লোকটি দুষ্টগ্রহের মত তার জীবনের আকাশে উদিত হয়েছিলেন, তিনি অস্ত যাচ্ছেন। রূপচাঁদের বদলির খবরটা পেয়ে তার মনের একটা অংশ খুশীই হয়েছিল ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'লেও এ কথা সে না মেনে পারছিল না যে, ওই লোকটিই তার নারীসত্তাকে এমন একটি মূল্য দিয়েছিল যা আর কারও দেবার সাহস হয় নি, এবং যে মূল্য পেয়ে সে গর্বই অনুভব করেছিল মনে মনে। তার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি সে নানা কারণে, কিন্তু তার বলিষ্ঠ পুরুষোচিত আকুলতাকে সে সত্যি সত্যি ঘৃণা করে নি কখনও। ভয় পেয়েছে, ঘৃণা করে নি। রূপচাঁদবাবু আর তার জীবনে ছায়াপাত করবেন না—এই সম্ভাবনাতে তাই সে একটু বেদনাও বোধ করল যেন। বেদনাটা আরও বাড়ল কবির কথা ভেবে। তাকে দেখে তাঁর মনে যেন জোয়ার এসেছিল তা নেবে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে আর তিনি কবিতা লিখবেন না—এ সংবাদটাও স্বস্তিকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হ'ল না। মনে হতে লাগল, তার জীবন থেকে কি যে একটা হারিয়ে গেল চিরকালের মত। পর-মুহূর্তেই মনে হ'ল, ভাস্কর এসেছে। মনে পড়ল তার কথা—'তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব, আর কাউকে বিয়ে করব না।' অপেক্ষা ক'রে আছে কি? হঠাৎ তার সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠল খবরটা জানবার জন্যে।

"মাসীমা—"

"কে?"

"আমি চণ্ডী। কলকাতা থেকে একটা লোক চমৎকার একটা হলদে পাখি নিয়ে এসেছে। অমরবাবুর স্ত্রী পাঠিয়েছেন। বকুল-মাসীমাকে তিনি একটা পাখি পাঠাবেন ব'লে গিয়েছিলেন। হয়তো এইটে সেই পাখি! তাই আমি আপনাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

"ও! আচ্ছা, চল দেখি।"

সত্যিই রত্নপ্রভা বকুলবালার জন্যে চমৎকার একটা হলদে পাখি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিও একটা লিখেছিলেন—

ডানা,

শ্রীমতী বকুলের জন্যে হলদে পাখি পাঠালাম একটা। এই বছরেরই বাচ্চা। তাঁকে পাখিটা পাঠিয়ে দিও। তোমার সমস্যার, আশাকরি, সমাধান হয়ে গেছে। অনিলের (মিস্টার গুপ্ত) চিঠি পেয়েছি। আমরা এবার কাশ্মীর পাড়ি দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে ঠিকানা জানাব। কালই আমাদের রওনা হওয়ার কথা। আশাকরি, তোমরা সব কুশলে আছ। পাখিগুলোর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপরেই রইল। ওদের সম্বন্ধে যা ভাল মনে কর ক'রো। যদি ইচ্ছে কর, ছেড়ে দিতেও পার। ওঁর এখন চিড়িয়াখানা করার দিকে তত ঝোঁক নেই। ঝোঁক হয়েছে বিদেশে গিয়ে (ইয়োরোপে, আমেরিকায়, ও-দেশের সমুদ্রের ধারে ধারে) বিদেশী পাখিদের পরিচয় লাভ করা। টাকার যোগাড় যদি হয় চ'লে যেতে পারি। সুতরাং তুমিই ওই পক্ষীনিবাসের সর্বেশ্বরী হয়ে থাক। ওখানকার জমিদারির আয় থেকেই তোমাদের খরচ চ'লে যাবে। আমরা ওখান থেকে আপাতত কিছু নেব না ঠিক করেছি। আনন্দমোহনবাবুকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি স্নেহ-আশীর্বাদ নিও।

ইতি

রত্নপ্রভা সেনগুপ্ত.

ডানা যতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিল চণ্ডী সোৎসুকে চেয়ে ছিল তার মুখের দিকে। পড়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করলে, "আমাদেরই পাখি, নয়?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাও। আমার চাকরটাই গিয়ে দিয়ে আসুক। আমি চিঠিও লিখে দিচ্ছি একটা। দাঁড়াও একটু।"

চিঠিটা রূপচাঁদবাবুরও হাতে পড়বে এই সম্ভাবনাটা মনে হ'ল তার। তাই অতি সংযত ভাষায় ছোট চিঠি লিখলে একটা—

শ্রীমতী বকুলবালা,

আপনার জন্যে রত্নপ্রভা দেবী কলকাতা থেকে একটা হলদে পাখি উপহার পাঠিয়েছেন। পাঠালাম এই সঙ্গে। শুনলাম, আপনারা বদলি হয়ে গেছেন। যাব একদিন আপনাদের বাড়িতে। নমস্কার জানবেন। ইতি

ডানা

পাখি নিয়ে ওরা যখন চ'লে গেল, তখন চুপ ক'রে ব'সে রইল সে বারান্দায় একা। মনে হ'ল, সে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে। চোখে পড়ল, কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ উঠেছে বটগাছের মাথার উপরে। একটা উপমা মনে এল, সংস্কৃত কাব্যের উপমা, বটগাছটা যেন ধূর্জটির জটাজাল, সেই জটাজালে সুশোভিত হয়েছে বঙ্কিম চন্দ্র। চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—পাপিয়াটা ডেকে উঠল দূরের একটা গাছ থেকে। তার আকুল স্বরে ডানার মনের আকুলতাই ফুটে উঠল যেন। আরও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। তারপর ঘরে ঢুকে

শোবার আয়োজন করতে লাগল, ব্লাউসটা খুলতে গিয়েই কবিতাটা বেরিয়ে পড়ল। সে কবিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল। আলোটা কমানো ছিল টেবিলের উপর। সেটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু জুৎ ক'রে ব'সে কবিতাটা পড়তে লাগল—

ঝাঁ-ঝাঁ রোদে রুক্ষ মাঠের মাঝ দিয়ে
একা চলেছিলে তুমি।
কাছাকাছি আর কেউ ছিল না, আমিও না,
তুমি নিজেও ছিলে না নিজের কাছে!
আমি যে সুদূর লোক থেকে দেখেছিলাম তোমাকে
হয়তো তারই উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়েছিলে,
কিন্তু নিজেই তা জানতে না ॥
মনে হচ্ছিল তৃষ্ণার্ত মাঠের আর্ত কামনা মূর্ত হয়েছে,
তোমার চলাটা মনে হচ্ছিল প্রবাহ ॥
স্বচ্ছতোয়া তন্বী তটিনীর উপর নেমেছে নব জলধর,
এক জোড়া খঞ্জন উড়ছে,
নীল শাড়িতে ফুটেছে আকাশের মহিমা,
চলার বেগে অকুণ্ঠিত ঔদাসীন্য ॥
রুক্ষ মাঠের তৃষ্ণার্ত কামনা যে ছবি সেদিন এঁকেছিল,
জানি তুমি তা নও,
কখনও হবে না তা-ও-জানি।
কিন্তু সত্যি তুমি যা
তা নিয়ে স্বপ্নের ছবি আঁকা যায় না।
তোমার ভঙ্গুরতা তোমার ক্ষণিকের সত্যকে,
যে রূপে তুমি সকলের কাছে পরিচিত হয়েছ তাকে,
চুরমার ক'রে দেবে একদিন।
বেঁচে থাকবে শুধু এই স্বপ্নটুকু।
অলীক রঙে আঁকা এই ছবিটি, যা তুমি নও,
যা তুমি হবে না ॥

ডানা কবিতাটা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বার দুই পড়ল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অধরে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল একটি। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সে থেকে সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখলে কবিকে নয়, ভাস্কর বসুকে।

১৫

পরদিনই ভাস্কর বসুর সঙ্গে দেখা হ'ল ডানার। ভাস্কর বসু নিজেই এসেছিলেন দেখা করতে। তিনি যখন আসছিলেন তখন ডানা তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু চিনতে পারে নি। যে লোক সিগারেটটি পর্যন্ত খেত না, তার মুখে যে অত বড় পাইপ ঝুলবে তা

প্রত্যাশা করতে পারে নি সে। পরনে খাকী রঙের হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট, হাতে ছোট একটা বেত, চোখে গাঢ় কালো রঙের গগল্‌স্‌। ডানা বারান্দায় ব'সে চিঠি লিখছিল, লিখতে লিখতে একবার চোখ তুলে দেখতে পেয়েছিল তাকে। দেখে বিরক্তই হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, কোনও বেকার ছোকরা বোধ হয় আসছে তাকে বিরক্ত করতে। অনেকে আজকাল আসে অমরবাবুর 'পক্ষী-নিবাস'টা দেখতে। অসংলগ্ন অবান্তর প্রশ্ন করে নানারকম। প্রশ্ন শুনলেই মনে হয় পাখির সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই, কেবল খানিকটা সময় কাটাতে এসেছে।

"চিনতে পারছ আমাকে?"

গগল্‌স্‌ খুলে বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালেন ভাস্কর বসু। বজ্র প'ড়ে ডানার স্বপ্নসৌধ যেন চুরমার হয়ে গেল। এই সেই ভাস্কর? এত পরিবর্তন হয়েছে! চোখের কোলে কালি, রঙও ময়লা হয়ে গেছে, কেবল চোখের দৃষ্টিটাই উজ্জ্বল আছে তেমনি। আরও উজ্জ্বল হয়েছে বোধ হয়। ডানা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠল।

"ভাস্কর! এস, এস! তুমি এমন ভাবে আসবে তা প্রত্যাশা করি নি। কাল আনন্দবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে, ভাস্কর বসু নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন এখানে, তখন—"

"আমি এসেই তোমার খবর পেলাম এস. পি. মিস্টার গুপ্তের কাছে। 'মিস্‌ ডানা' শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। তার পর তিনি যখন বার্মা রেফিউজি বললেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। শুনলাম, এখানে তুমি কোন পক্ষী-নিবাসের কর্ত্রী হয়েছ? ব্যাপারটা কি? পোল্‌ট্রি?"

"না। চাকরি। এখানকার জমিদার অমরেশবাবু একজন পক্ষীতত্ত্ববিদ। তিনি অনেক রকম পাখি ধ'রে রেখেছেন এখানে। তারই তত্ত্বাবধান করি আমি।"

"আই সি। কতদিন আছ?"

"ছ মাস হয়ে গেল। নভেম্বর মাসের শেষে এসেছিলাম।"

"একাই আছ? মিস্টার গুপ্ত তাই বললেন যেন।"

ভাস্কর বসু উঠে এসে আরাম-কেদারাটায় ব'সে পাইপে টান দিয়েই বুঝলেন, পাইপ নিবে গেছে। নিবিষ্ট মনে সেইটেই ধরাতে লাগলেন।

"একাই আছি।"

"আর সবাই কোথা?"

"মারা গেছে। আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। তুমি শোন নি?"

"বাই জোভ, বল কি! না, কিচ্ছু শুনি নি তো! আমি অনেক দিন এ দেশে ছিলাম না।"

ভাস্কর বসু সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারের উপর। ডানা চুপ ক'রে রইল।

তারপর সব বলতে লাগল। তার নূতন জীবনের মাঝখানে পুরাতন জীবনটা হঠাৎ এসে হাজির হ'ল যেন খানিকক্ষণের জন্য।

১৬

দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদে সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চরের উপর। জ্যোৎস্নার মত রোদটাকেও তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। দৈহিক কষ্টটাকে আমলই দিচ্ছিলেন না ; যে বোধশক্তি আরাম বা কষ্টের কারণ, সেই শক্তিটাকেই তিনি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছিলেন, যাতে সে কষ্টটাকেও সুখ ব'লে গণ্য করে। তাঁর মনে হচ্ছিল, যে মুহূর্তে তিনি সুখ-দুঃখের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারবেন সেই মুহূর্তে সত্যকেও উপলব্ধি করবেন।

সুদূর আকাশে চক্রকারে ঘুরে ঘুরে একটা শকুনি উড়ছিল। তারই দিকে নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ হাত তুলে তাকে নমস্কার করলেন। মনে মনে বললেন, সুদূর আকাশে উঠেছ তুমি। অনেক জিনিসই তোমার চোখে পড়ছে। শুভ্রমেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়েছে দিগ্বলয়ের কাছে। কিন্তু আমি জানি, তুমি ওসব কিছুই দেখছ না। তুমি ব্যাকুল হয়ে সন্ধান করছ, মড়া কোথায় আছে! ও ব্যাকুল একাগ্রতা যদি আমারও থাকত! কিছুতেই একাগ্র হতে পারছি না, কিছুতেই নিস্পৃহ হতে পারছি না। মায়া কেটেও যেন কাটছে না। এই স্থানটার মোহ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। আবার পদচারণ শুরু করলেন। গম যব ছোলা মটর সব কাটা হয়ে গেছে। চরের যে সব জায়গায় ফসল ফলেছিল সে সব জায়গা আবার প্রস্তুত হচ্ছে নতুন ফসলের জন্যে। সন্ন্যাসী চেয়ে দেখলেন সদ্য-কর্ষিত জমিগুলোর দিকে। যে গম যব ছোলা মটর তাদের অলঙ্কৃত করেছিল একদিন, বুকে ক'রে ধ'রে রেখেছিল যাদের, তাদের সম্বন্ধে সামান্যতম শোক বা মোহের চিহ্ন তো নেই। ভূমি নির্বিকার। তার কাছে ভাল গাছ খারাপ গাছ দুই-ই সমান ; ফুল, শস্য, খাদ্য, বিষ সমস্তই সে উৎপাদন করে, কিন্তু কাউকে আঁকড়ে থাকতে চায় না। তারা দলে দলে আসে আর চ'লে যায়। সে নির্বিকার। নির্বিকার ব'লেই এত অসংখ্য সম্ভাবনাব জননী সে। সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুয়ে পড়লেন ভূমির উপর। উত্তপ্ত চরের নিদারুণ উষ্ণতা প্রবেশ করতে লাগল তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাঁর মনে হতে লাগল, বীর্যবতী জননীর আশ্বাসবাণী যেন সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গে। তিনি যেন বলছেন—ভয় নেই, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে ; থেমো না, এগিয়ে চল। সন্ন্যাসী আবার উঠে বসলেন। স্থির হয়ে ব'সে রইলেন চোখ বুজে। তাঁর খুব কাছে একটি বকও ধ্যানমগ্ন হয়ে ব'সে ছিল অনেক আগে থেকেই। সন্ন্যাসীকে দেখে সে স'রে গেল না। সন্ন্যাসীকে চিনত সে। নিঃসংশয়ে জানত, এঁর দ্বারা কোনও অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই তার। অনেক দিন এসেছেন, বসেছেন, বেড়িয়েছেন, স্নান করেছেন, কোনদিন তাকে মারতে বা ধরতে যান নি। অনড় হয়ে ব'সে রইল বক। সন্ন্যাসীও অনড় হয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে নদীর জলে নামলেন। স্নান করলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। তার পর উঠে ভিজে কাপড় প'রেই নিজের সেই ভাঙা ঘরটির উদ্দেশ্যে চলতে লাগলেন। স্নান করবার পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আসছিলেন, খাওয়ার মত যদি কিছু জুটে যায় পথে। বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। আশা করতে লাগলেন, নদীর ধারে যে বেলগাছটা আছে তাতে একটা বেলও অন্তত পেয়ে যাবেন। ঘরে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, ডানার চাকর এক ঝুড়ি ফল নিয়ে ব'সে আছে। ঠিক এই রকম ব্যাপার আর একদিনও হয়েছিল।

চাকর বললে, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাইজীকে অনেক ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি আপনাকে কিছু পাঠিয়ে দিলেন।"

সন্ন্যাসী একটি মাত্র ল্যাংড়া আম তুলে নিয়ে বললেন, "আর আমার লাগবে না। ওগুলো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"আরও কিছু রাখুন।"

"না। আর দরকার নেই।"

সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকে গেলেন। চাকরটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তার পর চ'লে গেল।

১৭

প্রথম কয়েকদিন ডানার সঙ্গে ভাস্কর বসুর যে পরিচয়টা হ'ল তা ঠিক পুরনো পরিচয় ঝালানো নয়, তা সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়। ভাস্কর বসু যে-ডানাকে দেখলেন, সে-ডানা ঠিক তাঁর পূর্ব পরিচিত তন্বী রূপসীটি মাত্র নয়। বর্মায় জাপানী বোমা না পড়লে যাকে তিনি বিয়ে ক'রে এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশ থেকে আর এক ড্রয়িং-রুমের পরিবেশে অনায়াসে স্থানান্তরিত করতে পারতেন, এ ডানা সে ডানা নয়। এর দেহ মন আরও পরিপুষ্ট হয়ে অনেক বদলে গেছে। এখন মুখের দিকে চাইলে ও আগেকার মত চোখ নীচু করে না, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে না, বেশ সপ্রতিভ ভাবে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে যায় না, বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়, অনেক সময় পালটা প্রশ্নও করে। অবশ্য সেজন্য আগের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর, ঢের বেশি লোভনীয়ও হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিত্ব ওকে আরও মোহিনী করেছে, মনে হ'ল, সেই ব্যক্তিত্বের বেড়াটা পেরিয়ে তার কাছে যাওয়া শক্ত, ঘনিষ্ঠ হওয়া আরও শক্ত।

ডানাও দেখলে, যে ভাস্কর বসুকে সে চিনত, যাকে নিয়ে তার মন স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল একদিন, এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি ঠিক সে লোক নন। তরুণ তেজস্বী রিসার্চ-স্কলার ভাস্কর বসুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার দীপ্তি নিবে গেছে। তার সঙ্গে এ লোকটির কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্য নেই। একটা বহুমূল্য আসবাব অযত্নে বাইরে প'ড়ে থাকলে যেমন হয়, অনেকটা যেন তেমনি। রঙ চ'টে গেছে, জৌলুস নেই। ডানা একে দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু দু-চার দিন দেখবার পর সে ভাবটাও কেটে গেল। কৌতূহল হ'ল বরং। বাইরেটা বদলেছে। ভিতরটাও বদলেছে কি? দুজনেই পরস্পরের অন্তরের খবর নেবার চেষ্টা করছিল। সোজাসুজি কোন প্রশ্ন না ক'রে। কথায় কথায় যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুই বেরুচ্ছিল না। দুজনেই সাবধানী। এই ভাবেই চলছিল।

...অসহ্য গরম ছিল সেদিন। গাছের পাতাটি নড়ছিল না। ডানা নিজের ঘরের জানলা কপাট বন্ধ ক'রে ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুয়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ভাস্কর বসুর কথাই ভাবছিল। রোজই প্রায় ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কিন্তু ও বিয়ে করেছে কি না তা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। সে নিজেও বলে নি, ডানা লজ্জায় ও-প্রসঙ্গ তোলেই নি। কিন্তু কথাটা জানবার জন্যে তার মন ছটফট করছে। মনে হচ্ছে যদি...কিন্তু না, কথাটা মনে করতেও লজ্জা হচ্ছে। সে নিজের মুখে কিছুতেই বলতে পারবে না। নিজের মনের এই হ্যাংলাপনাতেই সে মরমে ম'রে যাচ্ছে। কিন্তু একটা সত্য সে কিছুতেই এড়াতে পাচ্ছে না, বরং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সেটা। ভাস্করের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়ে যায়, তা হ'লে অচিরাৎ তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আপাতত। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধটা করবে কে? যে সমাজে সে মানুষ হয়েছে, তা যদিও ঠিক গোঁড়া বাঙালী সমাজ নয় ; কিন্তু সে সমাজেও পিতামাতারাই বিবাহ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী। তারা তো কেউ নেই, তা হ'লে কি নিজেই তাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে? মৎস্যশিকারীরা টোপের লোভ দেখিয়ে মাছ ধরে যেমন ক'রে? কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল তার। কিন্তু...চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বন্ধ দ্বারে টোকা পড়ল। মনে হ'ল, টোকা নয়, ঘুষি। কপাট খুলে দেখলে, বকুলবালা দাঁড়িয়ে আছেন। রোদের ঝাঁজে লাল হয়ে উঠেছে মুখটা। পিছনে চণ্ডীও রয়েছে।

"আসুন, আসুন।"

বকুলবালা বললেন, "একটু ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন?"

ডানা কুঁজোতে হাত দিতেই বললেন, "খাব না, পা ধোব। পা দুটো ঝলসে গেছে আমার। রাস্তার ধুলো যেন তপ্ত খোলার বালি।"

"তা হ'লে চানের ঘরে চলুন।"

চানের ঘরে ঢুকে উপর্যুপরি কয়েক ঘটি জল ঢেলে বকুলবালা পা ধুলেন। তারপর নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়েই মুছলেন পা দুটি। ডানা একটা তোয়ালে এগিয়ে দিচ্ছিল, তিনি নিলেন না।

বললেন, "কি হবে তোমার ফরসা তোয়ালেটা ময়লা ক'রে? আমাকে তো একটু পরে কাপড় ছাড়তেই হবে। তখন ভাল ক'রে থুপে কেচে নেব। এখন যে জন্য এসেছি তা বলি। চমৎকার পাখিটি পাঠিয়েছ ভাই। আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু ফাঁকই পাই নি। উনি কদিন ছুটি নিয়েছিলেন, বাড়িতে ব'সেই আপিসের কাজকর্ম করছিলেন। আমরা এখান থেকে বদলি হয়ে গেছি, মাসখানেক পরেই বোধ হয় চ'লে যেতে হবে। আজ উনি আপিসে গেছেন, তাই চ'লে এসেছি আমি। পাখি নিয়ে কিন্তু অনেক কাণ্ড হয়েছে ভাই। উনি পাখি দেখে ভয়ানক চ'টে গেছেন। বলছেন, অমরবাবুর স্ত্রীই মিথ্যে ক'রে ওঁর নামে লাগিয়ে ওঁকে এখান থেকে বদলি করিয়েছেন, তাঁর উপহার ফেরত দাও। আমি কিছুতেই রাজি হই নি। বাড়িতে সে কি ধুম কাণ্ড ওই পাখি নিয়ে, চণ্ডীকে জিগ্যেস কর না। বল না রে—"

চণ্ডী কিছু বলল না, মুচকি হাসতে লাগল শুধু।

বকুলবালা বলতে লাগলেন, "আমি শেষে বলেছি, আমি নিজে কিছুতেই পাখি ফেরাতে পারব না। একজন ভদ্দরলোকের মেয়ে একটা উপহার পাঠিয়েছেন, তা আমি কোন্ মুখে ফিরিয়ে দিতে যাব! তোমার যদি চোখের চামড়া না থাকে তা হ'লে তুমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

এই ব'লে বকুলবালা এমন ভাবে ডানার দিকে চাইলেন যেন ডানাই রূপচাঁদবাবু। ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল, কি আর বলবে?

বকুলবালা তখন আসল প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"উনি যে রকম জেদী লোক, ঠিক পাখিটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে আসবেন। তখন তুমি যেন ঘুণাক্ষরেও ব'লো না যে, আমি অমরবাবুর স্ত্রীর কাছে পাখি চেয়েছিলাম ; তা হ'লে কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন বাড়ি গিয়ে। উনি পাখি যদি ফেরাতে আসেন, তা হ'লে তুমি টুঁ শব্দটি না ক'রে পাখিটি নিয়ে নিও। চণ্ডী তার পরদিন এসে পাখিটি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়ে আসবে, বলবে—ও আর একটা পাখি, ও এক পাখিওলার কাছ থেকে জোগাড় করেছে। কি রে চণ্ডী, যা বলছি তা করবি তো? নিজে যেন গাপ ক'রো না পাখিটি। তোমার এয়ার গান্ আমি দেব—যখন বলছি ঠিক দেব। সেই পাখিওয়ালাটার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে ব'লে রাখিস, উনি যদি জিজ্ঞেস করেন তা হ'লে যেন বলে সে-ই পাখি দিয়েছে। কিছু পয়সা দেব বললেই রাজী হয়ে যাবে। ভাল বুদ্ধি করি নি ভাই, পাখির গায়ে তো আর নাম লেখা নেই। চমৎকার পাখিটি। এর মধ্যেই এমন মায়া ব'সে গেছে! কি সুন্দর ক'রে আজ সকালে ডাকল—ইষ্টিকুটুম! না রে চণ্ডে?"

চণ্ডী বললে, "একবার 'খোকা হোক' ও বলেছিল। তুমি তখন চানের ঘরে ছিলে।"

"মিথ্যুক কোথাকার! চানের ঘরে থাকলে আমি শুনতে পাব না? কানের মাথা খেয়েছি না কি?"

"আমার কিন্তু মনে হ'ল।"

"ভুল শুনেছ তুমি। ইষ্টিকুটুম ছাড়া আর কিছু বলে নি। বলবে অবশ্য ক্রমশ। আর একটু পোষ মানুক।"

একটা গাড়ি হর্ন দিয়ে এসে থামল বাড়ির সামনে।

"কেউ এল বোধ হয় ভাই। আমি পালাই, লুকিয়ে এসেছি তো। উনি হয়তো আজ সকাল সকালেই আপিস থেকে এসে পড়বেন। যাবার আগে আর একদিন আসবার চেষ্টা করব ভাই। যা যা বললুম সব মনে থাকবে তো?"

ডানা মৃদু হেসে বললে, "থাকবে।"

"পালাই তা হ'লে। পিছনের দরজা আছে? তা হ'লে ওই দিক দিয়েই যাই।"

চণ্ডীকে নিয়ে বকুলবালা খিড়কি-দরজা দিয়ে চ'লে গেলেন।

পর-মুহূর্তেই ভাস্কর বসু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

"আমার গাড়িটা আজ কলকাতা থেকে এল! বাইরে বেরুচ্ছি একটু। তোমার হাতে যদি তেমন বিশেষ কাজ না থাকে, চল না, ঘুরে আসবে আমার সঙ্গে।"

"কতদূর যাবে?"

"বেশি নয়, মাইল ষোল। ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"এই গরমে বেরুবে?"

"মোটর চললে বেশি গরম লাগে না। হাওয়া লেগে আরামই লাগে বরং। আমাকে যেতেই হবে—একটা এনকোয়ারি আছে। তুমি যদি না যেতে চাও, থাক্ তা হ'লে।"

ডানা দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তকাল। এই সফরের সম্ভাব্য ফলাফলের ভাল-মন্দ দুটো দিকই মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল তার মনে। তার পরে যেন মরীয়া হয়ে বলল, "বেশ, চল।"

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

ভাস্কর নিজেই ড্রাইভ করছিল। পিছনে ব'সে ছিল চাপরাসী। পোস্ট-অফিসের কাছে এসেই ডানার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। সন্ন্যাসীর কথা। তিনি বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে তাঁর নামে খাতা আছে। সেই খাতা থেকে ভদ্রলোকের আসল পরিচয়টা জেনে নেবে ভেবেছিল সে।

"পোস্ট-অফিসের কাছে একটু থামো তো। একটু দরকার আছে।"

ব্রেক ক'ষে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলেন, "কি দরকার?"

"নদীর ধারে এক প'ড়ো বাড়িতে একটি সন্ন্যাসী থাকেন। শুনেছি এই পোস্ট-অফিসে তাঁর সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে। ভদ্রলোকের আসল নামটা সম্ভবত সেই খাতা থেকে পাওয়া যাবে। আমাকে বলবে কি?"

"তোমাকে না বলতে পারে, আমাকে বলবে।"

ভাস্কর চাপরাসীকে আদেশ দিলেন পোস্টমাস্টারবাবুকে সেলাম দিতে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি।

"এখানে নদীর ধারে অমরবাবুদের একটা প'ড়ো বাড়িতে এক সন্ন্যাসী আছেন শুনলাম। তাঁর এখানে নাকি একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে। সেই অ্যাকাউণ্টে তাঁর কি নাম আছে একটু দেখে বলুন তো।"

পোস্টমাস্টার বললেন, "কয়েক দিন আগেই তিনি টাকা বার করেছেন। তাঁর নাম হচ্ছে—বিশ্বপতি ভট্টাচার্য। আমিও তাঁকে চিনতাম না, তাঁকে আইডেন্টিফাই করলেন আপনারই আপিসের একজন ক্লার্ক বিনয়বাবু। তিনি ওঁর খবর বলতে পারবেন।"

"কত টাকা আছে ওঁর অ্যাকাউণ্টে?"

"সাত হাজার টাকা। অনেকদিন ধ'রে প'ড়ে আছে।"

"ও। আচ্ছা।"

আবার মোটর চলতে শুরু করল।

ডানার বিস্ময় সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে যার সাত হাজার টাকা, সে উঞ্ছবৃত্তিধারী! কেন?...অন্যমনস্ক হয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল সে।

ভাস্কর বসু উঠলেন এসে একটা ডাক-বাংলোয়। নদীর ধারে বেশ মনোরম বাংলোটি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জন্য দারোগা-জাতীয় কয়েক জন লোক অপেক্ষা করছিলেন। ভাস্কর ডানাকে বললেন, "আমি যত শিগ্‌গির পারি কাজটা সেরে নিচ্ছি। তুমি যদি গাড়িতে বসতে চাও—"

ডানা বললে, "তুমি কাজ সার। আমি নদীর ধাবে ধারে ঘুরে বেড়াই একটু। দু-চারটে পাখির দেখা নিশ্চয়ই পাব।"

নদীর উপর গোটা দুই কালো-পেট গাংচিল উড়েছিল। তাদের সহজ সুন্দর স্বচ্ছন্দ ওড়ার দিকে চেয়ে ডানা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পর দেখতে পেলে, দুটো বাঁশপাতি উঁচু পাড়ের গর্ত থেকে মুখ বাড়াচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখল দুটো নয়, অনেক। গর্তও অনেক। বাঁশপাতিরা পাড়া বসিয়ে ফেলেছে একটা। দূরবীনটা আনে নি ব'লে দুঃখ হতে লাগল। গাংশালিকও আছে মনে হ'ল।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের পর ঝিরঝির ক'রে সুন্দর হাওয়া উঠেছিল। ঝিল্লীর ঝঙ্কারে স্পন্দিত হচ্ছিল অন্ধকার। ডানা চুপ ক'রে ব'সে ছিল একটা ক্যাম্প-চেয়ারে হেলান দিয়ে। ভাস্কর বসুও পাশেই ব'সে ছিলেন। কেউ কোনও কথা বলছিল না। না-বলা কথার ভারে পরিবেশটা যেন আরও নিবিড় আরও ঘন হয়ে উঠেছিল। ভাস্কর হঠাৎ দেশলাই জ্বেলে পাইপটা ধরালেন, নিবিড় ভাবটা কেটে গেল।

"চা দিতে তো বড্ড দেরি করছে। দুধ যোগাড় করতে পারে নি বোধ হয়। আমি টাটকা দুধ দিয়ে চা তৈরি করতে বলেছি। দেখি।"

ভাস্কর বসু উঠে ডাক-বাংলোর সামনের দিকে গেলেন।

ডানা চুপ ক'রে ব'সে রইল। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক দূর চ'লে গিয়েছিল। কয়েকটা কাদাখোঁচা আকৃষ্ট করেছিল তাকে। গ্রীষ্মকাল প্রায় শেষ হতে চলল,

এদের এতদিন এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়া উচিত ছিল। এরা বোধ হয় এখনও এ দেশের মায়া কাটাতে পারে নি। এরা কোন্ জাতের, গ্রীন স্যাণ্ডপাইপার (Green Sandpiper), না কমন স্যাণ্ডপাইপার (Common Sandpiper) তা বোঝা যাচ্ছিল না। উড়লে গ্রীন স্যাণ্ডপাইপারের সাদা পিছন দিকটা থেকে বোঝা যায়—অমরবাবুর দেওয়া একটা বইয়ে পড়েছিল সে। তাই দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাখিগুলো এমন ভাবে উড়ছিল যে, পিছন দিকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই করতে করতে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল সে নদীর ধার দিয়ে। নদীর তীরে একজায়গায় ঝোপের মত ছিল একটু, তারই পাশে গিয়ে বসল সে অবশেষে! ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে তার সমস্ত ক্লান্তি চ'লে গেল। ছোট কবিতাও মনে পড়ল একটা। আনন্দবাবু তার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। কবিতাটা মনে গেঁথে গিয়েছিল তার।

দূরের আকাশে অনেক সূর্য উঠেছে এবং অস্ত গেছে
কাছের আকাশে এখনও ওঠে নি কেউ
দূরের বাগানে অনেক ফুলেরা ফুটেছে ঝরেছে অতীত কালে
কাছের বাগানে এখনও ফোটে নি কেউ।

কাছের আকাশে উঠবে সূর্য কাছের বাগানে ফুটবে ফুলেরা জানি
মনের ভিতরে তবুও কিন্তু কাহারা বসিয়া করে যেন কানাকানি
বিরাট সূর্য খুব কাছে এলে সহ্য করতে পারবে কি তাকে হায়
খুব কাছাকাছি ফুটলে ফুলেরা লাগবে কি তব রসবোধ চেতনায়
তাদের সূক্ষ্ম গন্ধ বর্ণ ঢেউ?

কবি অজ্ঞাতসারেই তার মনের কথাটা লিখেছিলেন ওই কবিতাটাতে। তাই মনে থেকে গেছে। হঠাৎ সেই কাদাখোঁচা পাখির দল খুব কাছে এসে বসল এবং উড়ল তখনই। এবার সাদা পিছন দিকটা স্পষ্ট দেখা গেল। ডানা বুঝতে পারল, ওরা গ্রীন স্যাণ্ডপাইপারই। ভারি আনন্দ হ'ল বুঝতে পেরে। তার পরই মনে হ'ল, কেন এই আনন্দ? সত্য নির্ণয় ক'রে? না, নিজের অহঙ্কার তৃপ্ত হ'ল ব'লে? আবার পাখিগুলো এসে বসল, আবার উড়ল। এবার উড়ে অনেক দূরে চ'লে গেল। আকাশের ভিতর মিলিয়ে গেল যেন। ডানার মনে পড়ল ওরা দূরের যাত্রী। তার পরই সে সচেতন হ'ল যে, তাকেও ফিরতে হবে। ভাস্করের কাজ হয়তো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। এসে দেখলে, ভাস্কর সত্যিই তার অপেক্ষায় ব'সে ছিল।

"ওদিকের ঘরটায় চা দিয়েছে, চল।"

"চল।"

ডাক-বাংলোয় খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য যে ঘরটা নির্দিষ্ট থাকে, তাতে বেশ কেতাদুরস্তভাবে চা-পানের আয়োজন করা হয়েছিল। পেট্রোম্যাক্স্ জ্বলছিল একটা ঘরের কোণে। চাপরাসী চা ঢেলে দিতে যাচ্ছিল, ডানা তাকে মানা করলে। নিজেই চা ঢালতে লাগল

সে। চাপরাসী বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কর বসু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ডানার আনত মুখের দিকে। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল। একটা সঙ্কটই যেন ঘনিয়ে এসেছে ডানার মনে হচ্ছিল। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা। অনেক ফুল নিয়ে দ্বারপ্রান্তে একটি লোক এসে দাঁড়াল। ভাস্কর ঘাড় ফেরাতেই ঝুঁকে সেলাম করল লোকটি। তার পর ঘরে ঢুকে একটি চিঠি দিল। ভাস্কর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিঠিটার দিকে চেয়ে দেখল একবার। তার পর লোকটিকে বললে, "আচ্ছা, দিয়ে যাও ওগুলো। বাবুজীকে আমার সেলাম দিও।" লোকটি ফুলগুলো চাপরাসীর হাতে দিয়ে চ'লে গেল।

ভাস্কর মৃদু হেসে চিঠিটা এগিয়ে দিল ডানার দিকে। ডানা দেখলে, লেখা রয়েছে—"মিসেস বসুর জন্যে কিছু ফুল পাঠালাম। আপনারা আমার নমস্কার জানবেন। ইতি কৃষ্ণলাল।"

"বেচারা জানেই না যে, আমি বিয়ে করি নি।"

"ও! খবরটা আমিও তো জানতুম না।"

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

ভাস্কর বসু এ সুযোগ ছাড়লেন না।

বললেন, "তোমার জানা উচিত ছিল। সব ভুলে গেছ নাকি? তোমার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার আস্থা ছিল, এখনও আছে।"

ডানা মনে মনে যা প্রত্যাশা করেছিল, যা চাইছিল, তাই হ'ল। কিন্তু সে সহসা উত্তর দিতে পারল না কিছু। চোখ নীচু ক'রে চামচেটা চায়ের পেয়ালার ভিতর নাড়াতে লাগল আস্তে আস্তে। কি বলবে মাথাতেই এল না।

"ভুলে গেছ সব?"

"না। কিছুই ভুলি নি, তবে—"

আবার থেমে গেল সে।

"তবে কি?"

"কিছুই নয় তেমন। চল, এবার ফেরা যাক।"

ডানা উঠে দাঁড়াল। ভাস্কর বসু কিন্তু ব'সেই রইলেন।

"কথাটা শেষ ক'রেই দাও না যাবার আগে।"

"শেষ করবার তো কিছুই নেই। ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে। এখন চল।"

"আলোচনা করবার মত কিছু আছে না কি?"

"আছে কি না সেইটেই আলোচ্য।"

"হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে।"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ভাস্করের চোখের নীচেটা ফোলা ফোলা। আগে তো এমন ছিল না। এর আগে তার চোখেও পড়ে নি।

"কি দেখছ অমন ক'রে?"

"কিছু নয়, চল। আমার কাজ আছে।"

দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

১৮

কল্পনার নতুন খোরাক পেয়ে কবি মেতে উঠেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল কাব্য-চর্চায়। বিশেষ ক'রে সংস্কৃত কাব্য তাঁকে পেয়ে বসেছিল যেন। তার পর যখন কলেজে তিনি চাকরি পেলেন, তখন মেতে উঠলেন ছাত্রদের নিয়ে। তাঁর সৃজনী-প্রতিভা লেগে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের সুরুচি-সৃষ্টি করবার কাজে। কলেজের যা পাঠ্য তা তো তাঁদের পড়াতেনই নানা রকম ক'রে, যা পাঠ্য নয় তাও পড়াতেন। কালিদাস যাঁদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, তাঁরা ভবভূতি, ভারবী ও মাঘেরও আস্বাদ পেতেন কিছু কিছু। ছাত্রদের নিয়েই মেতে ছিলেন তিনি তাঁর চাকরি-জীবনে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখন একটু মুশকিলে পড়েছিলেন। বাল্যবন্ধু রূপচাঁদ ছিলেন অবশ্য, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা মাতিয়ে দিতে পারে। তাঁর চতুর বৈষয়িকতায় কোনও প্রেরণা পেতেন না তিনি। তবু তাঁকে নিয়েই দিন কাটছিল। তাঁর পাল্লায় প'ড়েই নীট্শের দু-একখানা বইও পড়েছিলেন। খুব ভাল লাগে নি তাঁর। মনে হয়েছিল, তখনকার হেঁইও-মার্কা বীরপুরুষদের মন রাখবার জন্যই ভদ্রলোক বুদ্ধির কসরৎ করেছেন নানারকম। যারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শকে উপলব্ধি করেছে, তাদের কাছে নীট্শের্ 'সুপারম্যান' খুব ফিকে। এ দেশে চার্বাক কল্‌কে পায় নি, নীট্শেও পাবে না। এ নিয়ে রূপচাঁদের সঙ্গে তর্ক হ'ত মাঝে মাঝে। অর্থাৎ নীট্শেকে নিয়েই মেতে থাকবার চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু জমত না। এমন সময় অমরবাবু এলেন তাঁর চোখের সামনে, তা শুধু পাখির জগৎ নয়, তা এক অদ্ভুত রহস্যময় অমরাবতী। তার পর এল ডানা! অপরিচিতা, রূপসী, যুবতী। মানবী নয়, যেন স্বপ্ন। নতুন রঙে, নতুন রসে মেতে উঠল তাঁর কল্পনা। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়ে উঠল, যা পাষাণ মনে হচ্ছিল তা ফেটে গেল হঠাৎ, কুলকুল ক'রে বেরিয়ে পড়ল কাব্যনির্ঝরিণী। চলল কিছুদিন। এখন সে ভাবটাও কেটে গেছে। এখন নতুন সুর লেগেছে মনে। অমরবাবুর জমিদারির ম্যানেজার হওয়ার পর থেকে প্রজাদের দিকে তাঁর নজর পড়েছে। কি করলে তারা ভালভাবে থাকতে পারে—এই হয়েছে এখন তাঁর প্রধান চিন্তা। ওই নিয়েই মেতে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। ডানার কাছ থেকে মন স'রে গেছে অনেক দূরে। জোর ক'রে যে সরিয়ে দিয়েছেন তা নয়। নদীর মত আপনিই স'রে গেছে।

...দুপুরের রোদ অগ্রাহ্য ক'রে সেদিন বেরিয়েছিলেন তিনি ইছাপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে। হেঁটে নয়, গরুর্ গাড়ি ক'রে। ইছাপুরের প্রজারা জানিয়েছেন, যে, এবার তাদের ফসল ভাল হয় নি। তার ওপর গ্রামে কলেরার মড়ক লেগেছে। পুকুরে জল নেই, কাদা উঠছে। যে কটি কূপ আছে তাও শুষ্ক হয়ে আসছে। আনন্দবাবু ডাক্তার পাঠিয়ে কলেরার প্রকোপটা আগেই কমিয়েছিলেন। নবাগত মাজিস্ট্রেট ভাস্কর বসুর সহায়তায় কয়েকটা কূপের জীর্ণসংস্কারও হয়েছে। দু একটা টিউবওয়েল করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। কবি যাচ্ছিলেন স্বচক্ষে সব দেখবার জন্যে। একটা বাগানের কাছাকাছি এসে গাড়োয়ানটা বললে, হুজুর গরু দুটোকে একটু জল খাইয়ে আনি। বড্ড হাঁপাচ্ছে। কাছেই নদী, আমি যাব আর আসব। চান করিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। যা রোদ!"

কবি বললেন, "বেশ, যাও। খুব বেশি দেরি ক'রো না। আমার বিছানাটা একটা গাছের তলায় বিছিয়ে দাও তা হ'লে। গাড়িতে ব'সে থাকার চেয়ে ওখানে ব'সে থাকা ভাল।"

ছায়াসুশীতল একটি বড় গাছের নীচে বিছানাটি পেতে দিয়ে গাড়োয়ান চ'লে গেল। কবি উপবেশন করলেন। উপবেশন ক'রেই অনুভব করলেন, এক অদ্ভুত স্বর্গরাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। চতুর্দিক যখন রোদে পুড়ে যাচ্ছে, তখন এই শ্যামাঙ্গিনী কানন-লক্ষ্মী আশ্চর্য কৌশলে অদৃশ্য এক স্নেহ-অঞ্চলের আড়ালে এই স্থানটুকুকে রোদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে ফেলেছেন। অদ্ভুত পরিবেশ। তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগলেন পরিবেশটা। তারপর গান শুরু করলে একটা দোয়েল পাখি। গ্রাম-সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। কবিতার খাতা বেরুল পকেট থেকে। দেখলেন, পুরনো খাতাটা এনেছেন। মাত্র চার-পাঁচ পাতা সাদা আছে। মাঝে মাঝে যে সব পাখি নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাই পরিষ্কার ক'রে টোকা আছে এতে। বহুবার-পড়া কবিতাগুলোতেই চোখ আটকে গেল আবার। আবার পড়তে লাগলেন।

বক

গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক
কেউ সাদা, কারো গায়ে নানা ছক।
নদী-নালা-পুকুরেতে চুপচাপ
ব'সে ব'সে মাছ খায় কুপকাপ।
এক মনে ব'সে থাকে নড়ে না।
চোখে তার আর কিছু পড়ে না।
আকাশেতে ওঠে রবি, তারা, চাঁদ,
বাগানে রূপের বান ভাঙে বাঁধ।
বাতাসেতে কত লীলা সুরভির
কত সাহানার কত পূরবীর।
বকদের প্রাণে নেই কোন শখ
গাই-বক, কোঁচ-বক, রাত-বক,
দেখে শুধু চুনো-পুঁটি মারে ঘাই
তার চোখে আর কিছু পড়ে নাই।
বক কয়, কবি, মোরা সত্যিই নাজেহাল
তোমাদের মত বল কোথা পাব বেড়াজাল।

ময়ূর

নীল-সবুজের সাথে ইন্দ্রধনু করেছে মিতালি
ছন্দ সাথে মহানন্দে মিলিয়াছে মনের আবেগ
উচ্ছসিত পেখমেতে জ্বলিতেছে বর্ণের দীপালি
প্রেয়সী এসেছে, কাছে, আকাশেতে উঠিয়াছে মেঘ।

* * *

ভঙ্গী-ভরা দৃপ্ত গ্রীবা অপাঙ্গে কি বহ্নি-বিভা
প্রতি পর্ণে বর্ণময় সুর,
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।
নাচিছে কবির চিত্ত বনভূমি হ'ল তীর্থ
স্থূল রূপ হ'ল সূক্ষ্ম, দুঃখ হ'ল দূর
তালে তালে নাচিছে ময়ূর।

* * *

নাচে পক্ষী-নটরাজ পরিয়া অপূর্ব সাজ
গ্রীষ্মও যে হ'ল স্বপ্নাতুর,
শাল তাল কর্ণিকার ভাষা নাহি বর্ণিবার
সর্ব অঙ্গে তাহাদের রোমাঞ্চ মধুর
প্রিয়া-পাশে নাচিছে ময়ূর।

শকুনি

কলির জটায়ু তুমি জয়, জয়, জয়
ক্ষুধারূপী রাবণের করেছ দমন
জীবন্ত কোন সেনা নাহি করি ক্ষয়।
মরিয়া পড়িয়া থাকে ভাগাড়ে যারা
অভিনব তব রণে যোদ্ধা তারা
শবের বাহিনী ল'য়ে হে শিব-দোসর,
ক্ষুধাসুরে কর পরাজয়।

নহ তুমি মনোহর, বিলাসী নহ,
দুঃখের রুক্ষতা অঙ্গে বহ
মৃত্যুর সাথে তব কি দুঃসহ
ঘনিষ্ঠ ঘোর পরিচয়।
জয়, জয়, জয়।

বাবুই

চোখ দিয়ে যা দেখছ তুমি
আসল সেটা দেখাই নয়,
আসল দেখা হয় যে অনেক পুণ্যে।
বাবুইটাকে ভাবছ পাখি?
কিন্তু ওরা পাখিই নয়
ব্যাবিলনের শিল্পী ওরা
শহর বানায় শূন্যে।

* * *

খড়ের বোতল বানিয়ে ওরা
দুলিয়ে দিল তালগাছে,
না, না ভায়া, তাড়ির নেশায় নয় গো!
ঘোজঘাজ আর কোটর ছেড়ে
নতুন কিছু করল ওরা
শিল্পী মনের সেই তো পরিচয় গো!

নাইক তাঁত, নাইক হাত
নাইকো কোন যন্তর
তালগাছেতে বুনল শহর
এ কোন্ যাদু মন্তর!
* * *
আছে কেবল ছোট্ট মুখ
হলদে মাথা, হলদে বুক,
এবং আছে কল্পনা
নেহাত সেটা অল্প না!

তাই কি বুড়ো তালগাছটা সসম্ভ্রমে যেন
পাতার ছাতা ধরছে মাথায় ওদের?
কিন্তু ওরা মশগুল যে, তোয়াক্কা নেই রোদের।
শূন্যে শহর দুলছে
এই আমোদেই রোদ বৃষ্টি ভুলছে!

আরও অনেক পাখির বিষয়ে অনেক কবিতা লেখা আছে। কিন্তু দোয়েল পাখিটার অশ্রান্ত গানের তাগিদে পড়া বন্ধ করতে হ'ল তাঁকে। দোয়েল যেন ভর্ৎসনার সুরে তাঁকে বলতে লাগল—কি কাণ্ড তোমার! আমি এসেছি দেখছ না? এখন অন্য কিছু করা সম্ভব কি! মনে পড়ল, অমরবাবু অনেকদিন আগে একটা চিঠিতে একটা দোয়েলের গানকে আমাদের অক্ষরে লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। কবিতায় সে চেষ্টা করলে কেমন হয়? কান পেতে শুনতে লাগলেন মন দিয়ে। তারপর ভেবে ভেবে লিখলেন—ওরই গানের যথাসম্ভব অনুসরণ ক'রে লিখলেন—

চিচাকি—চিচাকি—চিচির্র্র্
কিনি কিনি কিনি কিনি কুংকিনি কোনিয়া
টুকচি কুটর কিম কোনিয়া
কুরুরু কিচির চং
কুরুরু কিচির চং
জুচকি জুচ্কি কি রে কিচ্কিচ্ কোনিয়া।

মানুষের কাছে এর কোন অর্থ নেই। কিন্তু দোয়েলের কাছে আছে। দোয়েলটা উড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে বসল একটা ল্যাজ-ঝোলা পাখি। এ পাখিটি তাঁর প্রিয় পাখি। লম্বাটে ধরনের বাদামী রঙের পাখি, ল্যাজটি লম্বা, মাথাটি কালো ; কিন্তু ওর রূপের জন্য নয়, ওর সাবলীল বেপরোয়া ভাব-ভঙ্গীর জন্য ওকে কবির ভারি ভাল লাগে। বুলিও ছাড়ে নানারকম। চ্যা—চ্যা—চ্যা ডাকের জন্য বেরসিক লোকেরা ওর নাম দিয়েছে হাঁড়িচাঁচা। কিন্তু তারা বোধ হয় ওর ক-অক্‌রিং ডাকটা শোনে নি। ওই ডাকটাই মাঝে মাঝে শোনায় 'খুকু নেই', 'খুকু নেই'। এ ছাড়াও কখনও কখনও গঁয়-গঁয়-গঁয়-গঁয় ধরনের শব্দ করে পাখিটা। অদ্ভুত শোনায়। মনে হয় কোনও ছোট ছেলে যেন গন্ গন্ ক'রে বায়না করছে। ল্যাজ ঝোলা যেন কবির মনের কথা টের পেয়ে তারা সেরা বুলিটা শুনিয়ে দিল।

"ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং—ক-অক্‌রিং।"

বেশ দুলে দুলে ডাকতে লাগল। যাকে উদ্দেশ্য ক'রে এই সুরেলা সম্ভাষণ সেই পক্ষী-প্রিয়াকেও দেখতে পেলেন কবি। আর একটা গাছে বেশ সপ্রতিভভাবে সে ব'সে আছে, যেন কেউ তাকে ডাকছে না। কবি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। শুরু করলেন কবিতা আবার। এবার পাখির ভাষায় নয়, বাংলা ভাষায়।

যদিও পুরুষ পাখি তবু যেন কিশোরী
বাদামী গায়ের রঙ, কালো মাথাটি
পুচ্ছের পাখিটি জাপানী, না মিশরী
(তোমরা তা ঠিক কর আমি জানি না)
আমি জানি চুর ক'রে খাবে আতাটি।

চুরি ক'রে ফল খায়, চুরি ক'রে ডিম খায়,
প্রেয়সীর কাছেতেই শুধু হিমসিম খায়,
খোশামোদী সুর জাগে গলাতে
মনে হয় যেন আমতলাতে
বৃন্দাবনের সুর বাজল
বাঁশরীর সুরে বুঝি শ্রীরাধিকা সাজল।
ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং ক-অক্‌রিং—
ল্যাজ-ঝোলা পাখিটাই দুলে দুলে ডাকছে
মাঝে মাঝে চুপ ক'রে থাকছে।
ভাবছে, প্রিয়ার কথা ভোল্ না
আবার দুলিয়ে দেহ দোল্ না
পুনরায় ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং,
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং. ক-অক্‌রিং।

উঁচু ডাল থেকে পাখি নিচু ডালে নামছে
মাঝে মাঝে ডাকছে ও থামছে।
গাছের সবুজে রোদ জ্বলছে
মদন-দহনে পাখি বলছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

সহসা বেসুরা ডাক—চ্যা চ্যা চ্যা—
বিবেকই বলছে বুঝি ছ্যা ছ্যা ছ্যা
আর কত খোশামোদ করবি
আর কত ডেকে ডেকে মরবি
বাড়িয়ে সুরের হাত আর কত পায়ে তার ধরবি।

একটুও নেই তোর লাজ হায়!
ল্যাজের বাহার দিয়ে উড়ে গিয়ে বসল
ফল-ভরে নত আমগাছটায়।
ক্ষণ পরে দেখি পুন ডাকছে
ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং, ক-অক্‌রিং।

কবিতাটা শেষ ক'রে কবি অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। মানুষ ছাড়া আর কেউ বুড়ো হয় না। গাছেরা পাখিরা প্রতি বছর বার্ধক্যের খোলস ফেলে দিয়ে যৌবনের সাজে সজ্জিত করে নিজেদের। নবমুকুলে সজ্জিত বৃদ্ধ আমগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি মুগ্ধ নেত্রে। ল্যাজ-ঝোলা পাখিটা সমানে ডেকে চলেছে। ওর বয়স কত সে প্রশ্নই মনে জাগছে না, যৌবনসুলভ আনন্দে মেতে উঠেছে—এইটেই এই মুহূর্তে ওর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ডানার কথা মনে হ'ল। ডানাও ফুরিয়ে যাচ্ছে, তার আবির্ভাব তাঁর কল্পলোকে যে উৎসবের সাড়া তুলেছিল, তা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে তুবড়ির মত। ডানা আর তাঁর কবিতার খোরাক যোগাতে পারবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল।

"এবার চলুন হুজুর।"

গাড়োয়ানের আগমনে সহসা নতুন জগতে নীত হলেন তিনি।

১৯

সেদিন মোটরে ভাস্করের সঙ্গে ডানার আর কোন কথা হয় নি। দুজনেরই মন নানা কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু দুজনেই ইতস্তত করছিল। শীতকালে জলের ঘটিটা মাথায় ঢালার আগে অনেকে যেমন ইতস্তত করে, অনেকটা তেমনি। দুজনেই বুঝতে পেরেছিল, কথাটা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন শেষ করতেই হবে। কোথায় শেষ হবে এই অনিশ্চয়তাটাই দুজনকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দোলাচ্ছিল। দুজনের মনে হচ্ছিল, অসাবধানে বেফাঁস কিছু ব'লে

ফেললে সুরটা কেটে যাবে হয়তো। তাই কেউ কিছু বলছিল না। তা ছাড়া, চাপরাসীটা পিছনে ব'সে ছিল।

নিজের বাংলোর কাছাকাছি এসে ভাস্কর বললেন, "এখাহে নাববে, না, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

"পৌঁছেই দাও। আমার কাজ আছে একটু।"

"এত রাতে আবার কি কাজ?"

"পাখিগুলোর খবর নিতে হবে একটু। আজকের ডাকটাও দেখা হয় নি। অমরেশবাবুর বা রত্নাদির চিঠি আসতে পারে।"

"চল, তা হ'লে পৌঁছে দিই। আলোচ্য বিষয়টার আলোচনা কখন করবে?"

"করলেই হবে একদিন। ব্যস্ত কি?"

"আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।"

"কিসের তাড়া?"

"এক মিনিটের জন্য নেবে এস, দেখাচ্ছি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

বাংলোর ভিতর ঢুকেই ডানা বুঝতে পারল, বাড়িতে স্ত্রীলোক নেই কেউ। জিনিসপত্র সবই আছে, কিন্তু সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা নেই। ড্রইংরুমের মাঝখানে একটা বিশ্রী কালো টেবিলের উপর আধ-খোলা স্যুটকেস একটা। ভাস্কর সেইটেই হাঁটকাতে লাগলেন এসে। কাগজপত্র, রুমাল, টাই ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। সুটকেস থেকে একগোছা খাম বার করলেন ভাস্কর বসু।

"এই দেখ। একটা খুলে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

খুলতেই একটি সুশ্রী মেয়ের ফটো বেরিয়ে পড়ল।

"প্রত্যেক খামেই একটা ক'রে ফটো আছে। আরও আসবার সম্ভাবনা আছে। কোথাও কোন জবাব দিই না। কিন্তু কত দিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?"

"আচ্ছা, পরে কথা হবে এ বিষয়ে। আজ আর নয়।"

মুচকি হেসে ডানা বেরিয়ে গেল। বাইরে সে যতটা সপ্রতিভতা দেখাল, মনে মনে কিন্তু ঠিক ততটা সপ্রতিভ সে থাকতে পারল না। হঠাৎ কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ল, আর সেজন্য লজ্জিতও হ'ল মনে মনে।

ভাস্কর তাকে বাড়িতে নামিয়ে রেখে চ'লে গেলেন। ডানা চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কেউ নেই। চাকরটাও নেই। মনে হ'ল যেন অসীম নির্জনতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাকে আবার। আবার নতুন ক'রে নবলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে বুঝি। পুরাতন পরিবেশেই কিন্তু ফিরে আসতে হ'ল পর-মুহূর্তে। চাকরটা এল। কেরোসিন তেল আনতে গিয়েছিল।

"মুন্সী এসেছিল কি?"

"এসেছিল।"

"কিছু ব'লে গেছে?"

"আরও দু একটা পাখি ম'রে গেছে বললে।"

চুপ ক'রে রইল ডানা। সে যদি ভাস্করের সঙ্গে না গিয়ে পক্ষী-নিবাস পরিদর্শন করতে

যেত তা হ'লে যে ওরা বাঁচত তা নয়, কিন্তু তবু ডানা নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গেছে যার উপর তার কোনও হাত নেই। বন্দী পাখিদের স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য তার নেই, অথচ ওই তার চাকরি।

"চা খাবেন মা?"

"কর একটু। পিওন এসেছিল?"

"এসেছিল। একটা চিঠি আছে।"

ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে অনেকটা যেন আরাম বোধ করল। এতক্ষণ যেন রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চিঠি লিখেছিলেন অমরেশবাবু। ডানা খামখানা উল্টে-পাল্টে দেখলে। মনে হ'ল, কাশ্মীর থেকে লিখেছেন. ভাবলে, স্নান সেরে ভাল ক'রে পড়া যাবে।

স্নান শেষ ক'রে চা খেতে খেতে সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যে, অমরেশবাবুর চিঠিখানার কথা মনেই রইল না তার আর। কেন সে অন্যমনস্ক হয়েছে তা নিজেও সে বলতে পারত না। সজ্ঞানে সে কিছুই ভাবছিল না, ভাস্করের কথাও নয়। তার মনটা যেন অন্ধকার ঘরের মত হয়ে ছিল, সচেতনভাবে কিছুই যেন পরিস্ফুট হয়ে ছিল না সেখানে। অন্যমনস্ক হয়ে সে কেবল চায়ের পেয়ালার ছোট ছোট চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে আলো জ্ব'লে উঠল, সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। ভাস্কর আসার পর থেকে কয়েকদিন তাঁর খোঁজ নেওয়া হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিস্ময়কর খবর সে সংগ্রহ করেছে, তা মনে পড়তেই সে উঠে দাঁড়াল। মনে হ'ল, মস্ত বড় একটা কর্তব্য যেন অসমাপ্ত রয়েছে। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের তলায় যে বিশ্বপতি ভট্টাচার্য আত্মগোপন ক'রে আছেন, তার রহস্যটা আবিষ্কার করতেই হবে। প্রাক্তন জমিদার সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেটা জানাও যেন দরকারি মনে হ'ল তার! টর্চ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। চাকরটাকে ব'লে গেল, সে একটু বেড়াতে বেরুচ্ছে, খুব জরুরী দরকারে কেউ যদি আসে, সে যেন অপেক্ষা করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে আসবে।

সন্ন্যাসীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে ডাকলে, "বিশ্বপতিবাবু বাড়ি আছেন?" কোনও উত্তর এল না। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল ডানার। চ'লে গেছেন না কি ভদ্রলোক! আর একবার ডাকলে, কোন সাড়া নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে, কপাটটা খোলা রয়েছে, ঘরের ভিতর কেউ নেই। টর্চের আলোয় শাবলের ডগাটা চক্‌চক্ ক'রে উঠল। সেটা একটা কোণে ঠেসানো ছিল। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর মনে হ'ল, হয়তো চরে কোথাও গেছেন। তিনি সাধারণত কোথায় গিয়ে বসেন তা ডানার জানা ছিল। চরের উপর পায়ে-চলা পথও হয়েছে আজকাল। একটু খুঁজে দেখলে ক্ষতি কি! চরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

চরে ভীষণ অন্ধকার। নিঃশব্দ নয়, বাঙ্ময়। অসংখ্য ঝিল্লী ডাকছে। ঝিল্লীও বোধহয় এক রকম নয়, নানারকম শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে মিশছে ভেকের ডাক, পেচকের কর্কশ চীৎকার, টিট্টিভ পাখিদের ডিড্-হি-ডু-ইট্ (Did-he-do-it)। 'চোখ গেল' পাখিও ডাকছে একটা। গাং চিলদের কলরব শোনা যাচ্ছে। আর একটা কি পাখি মাঝে মাঝে ডাকছে আর থামছে। মনে হচ্ছে, সাপে বুঝি ব্যাঙ ধরেছে—কুঁক্ কুঁক কুঁক, তিন-চারবার ডেকেই থেমে যাচ্ছে। কোন

রকম প্যাঁচা কি? ডানার মনে হচ্ছিল, বিরাট অন্ধকারই যেন নানাভাবে কথা কইছে। দিনে আলোর নানা লীলায় প্রকৃতি যে বার্তা আমাদের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে চায়, অন্ধকারে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শ্রুতিপথে কি সেই বার্তাই পাঠাচ্ছে প্রকৃতি? না, এ অন্য কিছু? অন্ধকারকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে চমকে দেবার চেষ্টা করছিল ডানা। অন্ধকার কিন্তু চমকাচ্ছিল না। তার বিরাট অতিকায় রূপের নিকষে এতটুকু দাগ পড়ছিল না। ক্ষুদ্র আলোর রেখাটাই যেন অপ্রতিভ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিল তার সীমাহীন বিশালতার কাছে। হঠাৎ ডানার মনে হ'ল, যা আমরা অসীম বা অনন্ত ব'লে কল্পনা করি তা কি আলোহীন? আলোয় আমাদের বুদ্ধি দৃষ্টিসীমায় আটকে যায়, আদি এবং অন্ত আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। অন্ধকারে তা পাই না, অন্ধকারই আমাদের মনে অসীমের আভাস জাগিয়ে তোলে। টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে নানারকম এলোমেলো ভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্যমনস্ক হয়ে ডানা এগিয়ে চলেছিল অন্ধকারে। তার ভয় করছিল না, সে জানতে পারছিল না যে, তার মনের নেপথ্যে এক শক্তিবান পুরুষ অমোঘ আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করবার শক্তি তার ছিল না। চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল। গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল, নদীর মৃদু কলধ্বনি শোনা গেল। সে বুঝতে পারল যে, চরের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে, সামনেই নদী। নদীর জলে টর্চ ফেলতেই একদল হাঁস কলরব ক'রে উড়ে গেল। ডানার মনে হ'ল, হাঁসেরা এখনও ফেরে নি নাকি নিজেদের দেশে? ডাক শুনে মনে হ'ল চখা। মনে পড়ল, চখারা অনেকদিন পর্যন্ত এ দেশে থাকে। তারপর মনে হ'ল, হাঁসেদের স্বদেশ ব'লে কিছু আছে কি! সমস্ত পৃথিবীটাই তো তাদের দেশ, যখন যেখানে ভাল লাগে তখন সেখানে থাকে। হিমালয়, রাশিয়া উত্তরমেরু, ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা ওদের কাছে যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। আমরাই কেবল একটা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বাস ক'রে এটা স্বদেশ ওটা বিদেশ, এ আত্মীয় ও পর—এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করি। টর্চের আলোটা এদিকে ওদিকে ফেলে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে যেতে লাগল সে। ছোট-বড় বালির ঢিপি, ঝাউগাছ, মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল দেখা যাচ্ছে। একটা শেয়াল তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর চ'লে গেল। সন্ন্যাসী যেখানটায় সাধারণত বসেন সেখানে উপস্থিত হ'ল সে অবশেষে। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। মনে হ'ল, দূর—অনেক দূরে কে যেন গান গাইছে! সন্ন্যাসী কি? উনি একা ব'সে অনেক সময় গান করেন। এগিয়ে চলল ডানা সেই দিকে। বালি ভেঙে ভেঙে অনেক দূর যেতে হ'ল। গিয়েও কিন্তু সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া গেল না। ডানা টর্চ ফেলে ফেলে নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগল, গানটা গাইছে কে, আর কোথায় ব'সেই বা গাইছে! হঠাৎ দেখতে পেল, নদীতে একটা নৌকা ভেসে চলেছে। নৌকো থেকেই গানটা ভেসে আসছে। গানের লাইনগুলো সুন্দর। এ গান আর কোথাও শুনেছে ব'লে মনে পড়ল না।

স্রোতে তরী ভাসিয়েছি ভাই
নাইক আমার পথের চিনা রে,
ভরসা আছে স্রোতই আমায়
নিয়ে যাবে সাগর-কিনারে।

সন্ন্যাসী আছেন নাকি ওই নৌকোতে? চ'লে যাচ্ছেন এখান থেকে? —এই প্রশ্ন মনে

জাগবামাত্র একটা অপ্রত্যাশিত সত্যের সম্মুখীন হ'ল সে। সন্ন্যাসী যে তার মনে কতখানি স্থান জুড়ে ব'সে আছেন তা সে বুঝতে পারল।

"বিশ্বপতিবাবু—ও সন্ন্যাসী ঠাকুর—।"

চীৎকার ক'রে ডাকল সে একবার। কিন্তু সেই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার নিজের কানেই হাস্যকর শোনাল। নদীর বাঁকে নৌকো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, টর্চ ফেলে ফেলে এইটেই দেখতে লাগল সে দাঁড়িয়ে। গান ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, তার পর আর শোনা গেল না। নৌকোও মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ডানার পা দুটো ব্যথা করছিল, সে ব'সে পড়ল বালির ওপর। অনেকক্ষণ ব'সে রইল চুপ ক'রে। অসীম অন্ধকারের মধ্যে ব'সে ব'সে তার মনে হতে লাগল, নবজন্মের প্রতীক্ষায় সে যেন ব'সে আছে, মাতৃজঠরের অন্ধকারে ভ্রূণ যেমন থাকে। লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীর কণ্ঠে অন্ধকারের ভাষা শুনতে লাগল। মনে পড়ল, সন্ন্যাসী অনেক দিন আগে বলেছিলেন—তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে-কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ডানার মনে হ'ল, অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা হয়তো আছে, কিন্তু সেই অর্থটাই যে ঠিক অর্থ তা কে ব'লে দেবে! তা নির্ণয় করবার মানদণ্ড কি? হঠাৎ একটা শব্দ হ'ল—বুম্-ও-বুম্। চমকে উঠল ডানা। মনে হ'ল কে যেন কথা কইল। টর্চ ফেলেই কিন্তু দেখতে পেলে হুতোম প্যাঁচাটাকে। নদীর উপর ঝুঁকে-পড়া একটা গাছের ডালে ব'সে ছিল, টর্চের আলো পড়তেই উড়ে গেল। নদীর উপর দিয়ে, প্রায় নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, গাংচিলের মত উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্যাঁচাটাকে দেখে হঠাৎ অমরেশবাবুর কথা মনে প'ড়ে গেল। তাঁর কাঁধে উঠে সে একবার একটা প্যাঁচার বাসা দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, অমরেশবাবুর যে চিঠিটা এসেছে সেটা খোলা হয় নি এখনও। আর ব'সে থাকতে পারল না, উঠে বাসার দিকে ফিরতে লাগল। ফিরতে ফিরতে একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল, সে সন্ন্যাসীর খোঁজে এসেছিল কেন? শুধু কি নিছক কৌতূহল? নিছক কৌতূহল কি তাকে এই অন্ধকারের চরের মধ্যে ঘোরাতে পারত? কেন এই আকর্ষণ?

ডানা যখন ফিরল, তখন প্রায় এগারোটা বাজে। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চাকরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে উঠিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে অমরেশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে বসল সে। চাকরটা বললে, খানিকক্ষণ আগে রূপচাঁদবাবুর ঠাকুর এসেছিল, পাখির খাঁচাটা রেখে গেছে।

"খালি খাঁচা?"

"না, পাখিটাও আছে।"

"কোথায় রেখেছ?"

"আপনার শোবার ঘরে।"

ডানা অমরেশবাবুর চিঠিটা পড়তে শুরু করল এবার।

কল্যাণীয়া ডানা,

এখন ভূস্বর্গে এসেছি, সুতরাং লৌকিকতার ছদ্মবেশ খুলে ফেললাম। তোমাকে আর 'আপনি' বলব না, 'তুমি' বলব। এ ব্যাপারে রত্না অনেক আগেই সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ থেকে আমিও হলাম। কাশ্মীরকে যে কেন ভূস্বর্গ বলে তা ব'লে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। আনন্দবাবু একটা কবিতাতেই যা পারতেন, পাতার পর পাতা লিখে গেলেও

আমি তা পারব না। সুতরাং সে চেষ্টাও করব না। ছোট্ট একটি ইংরেজী কথায় কেবল বলব, লাভলি! আমাদের এ কাশ্মীর ভ্রমণে মহত্ত্ব বা রোমাঞ্চকর কিছু নেই। সার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাস্ব্যাণ্ডের মত দুর্গম গিরি-কান্তার পার হয়েও আমরা কাশ্মীরে প্রবেশ করি নি। সার্ ফ্রানসিস্ পিকিং থেকে হাঁটাপথে উনিশ হাজার ফুট উচ্চ তুষারাচ্ছন্ন 'মুস্তাঘ্ পাস' অতিক্রম ক'রে বাল্‌টিস্তানে এসে পৌঁছেছিলেন। পথ চলতে চলতে তাঁকে বিছানা কেতলি প্রভৃতি সব ফেলে দিতে হয়েছিল। তাঁর তাঁবু ছিল না। আকাশের নীচে মাটির উপর শুয়ে থাকতেন তিনি হিমালয়ের বুকের উপর। নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, জুতো পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার মালমসলা ভাগ্যবানদের ভাগ্যেই জোটে। আমার সে রকম ভাগ্য নয়। আমি রেল গাড়ি, মোটর গাড়ি, টোঙ্গা এবং হাউসবোটের সহায়তায় আরামেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি এবং আনন্দবাবু যদি সঙ্গে থাকতে তা হ'লে ভ্রমণটা আরও মনোরম হ'ত। রত্না বড় বেশি গম্ভীর লোক তো, খুব কম কথা বলে। মনে যখন খুব বেশি কথা জ'মে ওঠে, তখন চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা উপচে পড়ে। ভ্রমণকালে ওর চেয়ে আর একটু কম নীরস সঙ্গী থাকলে বেশি জমত। রত্নাও সে কথা কাল বলছিল। রত্নার মুখে তোমার বিপদের কথা শুনে কৌতুক অনুভব করলাম। আশাকরি, বিপদ এতদিনে কেটে গেছে। এখন আমরা শ্রীনগরে একটা বোটহাউসে আছি। যখন সিমলায় ছিলাম তখন সেখানকার দু-চারটে পাখির খবর আনন্দবাবুকে লিখেছিলাম। এখানেও সে সব পাখি আছে। তবে কাল সন্ধ্যার দিকে 'চাক্ চাক্ চাক্ চাওয়াক্' এই শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। ঠিক এ ধরনের পাখির ডাক আগে শুনেছি ব'লে মনে পড়ল না। বেরিয়ে এলাম। দেখি, খাঁচা নিয়ে একটা লোক ব'সে আছে। কি পাখি আছে খাঁচায় জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে—'চকুর'। দেখলাম, পাখিটি এক রকম পাহাড়ী তিতির। চমৎকার দেখতে। সালেম আলির বইয়ে ছবি আছে দেখো। ও-দেশে অনেকে যেমন শখ ক'রে তিতির পোষে, ও-দেশে যেমন তিতিরের লড়াই হয়, এ-দেশেও শুনলাম, চুকরকে নিয়ে ঠিক একই কাণ্ড। চুকরকে কেন্দ্র ক'রে অনেকে টাকা হাত বদল করে এখানে। আমি ভাবছি, এই চুকর আমাদের কাব্যের চকোর নয় তো! চাঁদ বা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ আছে কি না জানি না। খোঁজ করব। তুমি আনন্দবাবুকেও জিজ্ঞাসা ক'রো, কাব্যের চকোরের কোনও বর্ণনা কোথাও তিনি পেয়েছেন কি না। আমার লাইব্রেরিতে গিয়ে অভিধানখানা একবার উল্টে দেখো। যদি কোন খবর পাও জানিও। এখানে আর এক রকম পাখি দেখছি। লালমাথা লাফিং থ্রাশ। সিমলায় যে লাফিং থ্রাশ দেখেছি তা অন্যরকম। তার নাম স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ। এখানকার পাখিদের পুরো পরিচয় এখনও পাই নি তেমন। এই গরমের সময়টা হিমালয়-ভ্রমণের পক্ষে অনুকূল নয়, তবু যখন এসে পড়েছি যতটা পারি দেখে যাব। তবে এখানে কতদিন থাকব তার স্থিরতা নেই। কিছু টাকার যোগাড় হ'লে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। রত্নার মুখে শুনলাম, তুমি আর আনন্দবাবু খুব মন দিয়ে কাজ করছ। আমারও তোমাদের মত কাজ করতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু এক জায়গায় বেশিদিন ভাল লাগে না। মনটা ছটফট করে অন্য কোথাও যাবার জন্যে। হয়তো সব জায়গা দেখা হয়ে গেলে কোথাও মন স্থির ক'রে বসতে পারব, কিন্তু পারব কি? অত টাকা আর সময় কোথা পাব? ডাকের সময় বেশি নেই। সুতরাং এইখানেই শেষ করি। তুমি আর আনন্দবাবু আমার প্রীতি ও নমস্কার নিও। ইতি—

তোমাদের অমরেশ

চিঠি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারে টোকা দিয়ে কপাটটা ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন। মুখে মৃদু হাসি, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

"সিগারেটটা ফেলেই দিয়ে আসি।"

বেরিয়ে গিয়েই ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"কপাটটা বন্ধ ক'রে দেব?"

"কেন, খোলাই থাক্ না।"

"ভেজানো থাক্ তা হ'লে। চাকরটা বাইরে নেই। তাকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি।"

ডানা উঠে দাঁড়াল।

"এত রাত্রে কি দরকার আপনার?"

তার কণ্ঠস্বরে যেন ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিত হ'ল। রূপচাঁদ ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, "বলছি। ভয় পাবার মত কিছু নয়। দু-চার দিনের মধ্যেই চ'লে যাব, তাই বিদায় নিতে এসেছি। তোমার কাছে এটা হয়তো সামান্য ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে এটা অসামান্য। তুমি আমার জীবনের কতখানি—না, থাক্, সস্তা কবিত্ব করব না। তোমার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে দশজনের সামনে মেকি হাসি হেসে ছোট্ট নমস্কার ক'রে তোমার কাছে বিদায় নেওয়া চলে না। এর জন্যে খানিকটা নির্জন নিবিড় সময় চাই। সেই জন্যেই এখন এসেছি। একটু আগেও এসেছিলাম। তুমি তখন ছিলে না। ভয় পেয়ো না, ব'স।"

এর পর না-বসাটা একটু অশোভন। ডানাকে বসতে হ'ল।

"আপনি যে এখন এখানে আসবেন—এ কথা আপনার স্ত্রী জানেন?"

"না। সে জানে আমি এখানে নেই,আপিসের কাজে বাইরে গেছি। তাকে ব'লে গিয়েছিলাম, হলদে পাখিটা আজ সন্ধেবেলা যেন ফেরত পাঠানো হয়। পাঠিয়েছি কি?"

"পাঠিয়েছে। রত্নাদি আপনার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন পাখিটা। ওটা ফেরত দিচ্ছেন কেন?"

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার রত্নাদির চাক্ষুস পরিচয় পর্যন্ত নেই। তিনি হঠাৎ উপহার দিতে গেলেন কেন, তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এই হ'ল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তাঁর ষড়যন্ত্রের ফলে আমাকে এখান থেকে বদলি হতে হ'ল। তিনি গুপ্ত সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে কি যেন ব'লে গেছেন। বদলির অবশ্য সময় হয়েছে আমার, কিন্তু গুপ্ত সাহেব ইচ্ছে করলে আমাকে এখানে আরও কিছুদিন রাখতে পারতেন। কিন্তু তোমার রত্নাদির জন্য সেটা আর হ'ল না। আই হেট দ্যাট ওম্যান। উপহার দেওয়ার ছলে অপমান করেছেন আমাকে তিনি। এসব টাকার গরম ; আর কিছু নয়।...."

সত্য কথাটা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না ডানার। বকুলবালা মানা ক'রে গিয়েছিলেন, তাই চুপ ক'রে থাকতে হ'ল। রূপচাঁদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, চোখ দিয়ে আগুনের ঝলক বেরুচ্ছিল।

"এর সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত একটা। খাঁচাটা কোথায়?"

"ওই খাটের নীচে আছে।"

রূপচাঁদ খাঁচাটা বার করলেন।

"কি করবেন ওটা নিয়ে এখন? পাখিটা পাঠিয়েই দেব তাঁকে।"

"পাখির গলাটা মুচড়ে দেব। রক্তাক্ত মরা পাখিটা পাঠিয়ে দিও। ব'লে দিও, আমি স্বহস্তে ওর গলা মুচড়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আই উইশ আই কুড রিং হার নেক টু।"

রূপচাঁদ সত্যিই খাঁচাটা খুলে খাঁচার ভেতর হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন। ডানা বাধা দিল, তাঁর হাতটা ধ'রে বললে, "ছি ছি, কি করছেন আপনি! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি আপনার?"

ডানার হাতের স্পর্শে সহসা অভিভূত হয়ে পড়লেন রূপচাঁদ। খাঁচার ভিতর থেকে হাতটা বার ক'রে খাঁচাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

"মাথাই খারাপ হয়ে গেছে আমার। তুমিই আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছ।"

ডানা একটু সঙ্কুচিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলে। তার পর নিজের অজ্ঞাতসারে চোখ নীচু ক'রে কোলের উপর হাত দুটি রেখে এমন একটা মোহিনী ভঙ্গীতে ব'সে রইল যে, রূপচাঁদ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবার তার হাত দুটো ধরতে গেলেন। ধ'রেই ফেললেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আমার উপর রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি। জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না তোমার সঙ্গে। আমার বিদায়-মুহূর্তটা অন্তত মধুর করে দাও, সেইটুকুই অন্তত যথেষ্ট মনে করব আমি। তারই স্মৃতি শাশ্বত অমৃতের উৎস হয়ে থাকবে আমার জীবনে। রাগ ক'রো না, স'রে এস।"

ডানা হাতটা ছাড়িয়ে নিল বটে, কিন্তু আর কিছু করল না। উঠে দাঁড়াল না, বাইরে চ'লে গেল না, চাকরটাকেও ডাকল না! সেও কেমন যেন একটু সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। একটা সমর্থ পুরুষের এই আত্মনিবেদন সে যেন উপভোগই করছিল। সে আনতচক্ষে ব'সেই রইল।

রূপচাঁদ বলতে লাগলেন, "তুমি যখন নিতান্ত অসহায় পথের ধারে ব'সে ছিলে, তখন আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। কিন্তু আমার দিকে তুমি একবারও ফিরে চাও নি। তুমি আনন্দমোহনের কবিতার খোরাক জুগিয়েছ, অমরেশবাবুর চাকরি করেছ, ওই লোফার সন্ন্যাসীটাকে পর্যন্ত আমল দিয়েছ,—বঞ্চিত করেছ কেবল আমাকে। বঞ্চিত হয়েই কি চ'লে যেতে হবে? একটুও দয়া করবে না? লোকে ভিক্ষুককেও একটা পয়সা দেয়। আমাকে কিছুই করতে দেবে না তুমি?"

ডানা এইবার যেন হঠাৎ সচেতন হ'ল। বিপদ আসন্ন বুঝে দাঁড়িয়ে উঠল সে?

"আপনাকে তো অনেকবার বলেছি, আপনি যা চাইছেন তা দিতে পারব না। আমি ভদ্রবংশের মেয়ে, ওসব নোংরামির মধ্যে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। আপনি বাড়ি যান।"

"অনেকবার হতাশ হয়ে ফিরেছি, আজ আর ফিরব না। তুমি স্বেচ্ছায় যদি না দাও, জোর ক'রে কেড়ে নেবার শক্তি আমার আছে।"

পর-মুহূর্তেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে ডানাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন তিনি। কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বল্লমহস্তে বকুলবালা প্রবেশ করলেন।

ডানা চীৎকার করছিল—"ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন—"

রূপচাঁদ ছাড়াতে চাইছিলেন না, কিন্তু মাথায় দারুণ আগাত পেয়ে ছাড়তে হ'ল; শুধু তাই

নয়, প'ড়ে গেলেন তিনি। বল্লমের ক্ষত থেকে রক্ত প'ড়ে জামাকাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর।

বকুলবালার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ ওই হলদে পাখিটি। তিনি জানতেন, রূপচাঁদ বাইরে গেছেন, রাত্রে ফিরবেন না। রূপচাঁদের হুকুম অনুসারে পাখিটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাখিটার জন্যে এত মন-কেমন করতে লাগল যে, বল্লম আর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। বল্লমটা এনেছিলেন আত্মরক্ষার্থে কিন্তু সেটা আর্তরক্ষার্থে কাজে লাগল। রূপচাঁদকে দেখে ক্ষেপে গেলেন বকুলবালা। ঈর্ষায় যে নারী একদিন বঁটি দিয়ে এক ছাগশিশুকে হত্যা করেছিল, সে-ই যেন বহুদিন পরে আবির্ভূত হ'ল তাঁর মধ্যে।

"তুমি! তুমি এখানে কেন? তুমি সদরে গিয়েছিলে না?"

রূপচাঁদ নিরুত্তর। বকুলবালা ডানার দিকে সপ্রশ্ন জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, "ব্যাপার কি?"

"ওকেই জিজ্ঞেস করুন। রাত-দুপুরে হঠাৎ এসে উনি যে কাণ্ড করবেন, তা আমি ভাবতেই পারি নি। ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান, ছি-ছি-ছি-ছি!"

ডানা আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বেরিয়ে গেল। চাকরটাকে ডাকল একবার, কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত রূপচাঁদ কোনও কৌশল ক'রে আগে থাকতেই সরিয়ে দিয়েছিল তাকে। ডানা বাইরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার পর এগিয়ে গেল খানিকটা, ঘরের ভিতর আর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। ঘরের ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। দ্রুতপদে ফিরে এসে আবার ঘরে ঢুকল সে। যা দেখল, তা ভয়াবহ। বকুলবালা স্বামীর বুকের উপর ব'সে বাঁ হাতে তাঁর চুলের মুঠি ধ'রে ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত ঘুষি মেরে চলেছেন, আর্তনাদ করছেন রূপচাঁদ, প্রতিরোধ বা প্রতিকার করবার শক্তি নেই।

"উঠুন, উঠুন—ওঁকে নিয়ে বাড়ি যান আপনি। ছি-ছি, কি করছেন?"

বকুলবালা কর্ণপাত করলেন না তার কথায়।

"আমি থানায় খবর দিতে যাচ্ছি তা হ'লে।"

টর্চ এবং হাত-ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল ডানা। আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সত্যি সত্যি থানায় খবর দেবার জন্যে সে বেরোয় নি, থানা যে কোথায় তাই সে জানত না, সে ভয় দেখিয়ে বকুলবালাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল। হয়তো এতেই বকুলবালা নিরস্ত হবেন। কিন্তু হলেন কি-না তা দেখবার ধৈর্য তার আর ছিল না, সে কোথাও ছুটে পালাতে চাইছিল, কিন্তু কোথায় যাবে? সন্ন্যাসী কি ফিরেছেন? টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে সে সন্ন্যাসীর ঘরের দিকেই চলতে লাগল। গিয়ে দেখল, সন্ন্যাসী নেই। ঘরের দ্বার খোলা। হু-হু ক'রে হাওয়া একটা বইছে চর থেকে। ডানা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মনে পড়ল ভাস্করের কথা। রাত একটার পর সদরে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে, সে শুনেছিল। স্টেশনের দিকেই চ'লে গেল সে। মিনিট কুড়ি পরে গাড়িও পেয়ে গেল। গাড়ি যখন ছাড়ছে তখন হঠাৎ নজরে পড়ল, সন্ন্যাসী একটা তোরঙ্গ ঘাড়ে ক'রে ওভারব্রিজে উঠছেন! এখনই সদরের দিক থেকে যে গাড়িটা এল, তাতেই এলেন না কি? সদরে কি জন্যে

গিয়েছিলেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। ডানার একবার ইচ্ছে হ'ল, নেমে পড়ে। কিন্তু তারও উপায় ছিল না। ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। যে কোনও অবস্থাতেই মানুষের মন ক্রমশ প'রিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। বর্মার জঙ্গলে ডাকাতের হাতে প'ড়েও নিতে হয়েছিল। আজকের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটার সঙ্গেও তার মন আপোস ক'রে ফেললে। ট্রেনের কামরায় এক কোণে ব'সে ব'সে ক্রমশ বরং তার মনে হ'ল যে, ঘটনাটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। রূপচাঁদবাবুর কাছ থেকে অন্যরকম আচরণ বরং অপ্রত্যাশিত হ'ত। তাঁর রক্তাক্ত বিধ্বস্ত চেহারাটা চোখের উপর ভেসে উঠল। একটু দুঃখই হ'ল ভদ্রলোকের জন্যে। বকুলবালার কাণ্ড দেখে সে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোন নারীর মধ্যে এ রকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সে আর দেখে নি। হঠাৎ মনে হ'ল, জোয়ান অব আর্ক হয়তো অনেকটা এই রকম ছিল। আর একটা কথা হঠাৎ মনে হ'ল তার। এই ঘটনাটা যদি না ঘটত, তা হ'লে এত শীঘ্র সে কি ভাস্করের কাছে যেত? যেত না। তার সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে সে মনে মনে উদ্‌গ্রীব, তার শোভনতা বজায় রাখবার জন্যেই তাকে আরও কিছুদিন দেরি করতে হ'ত। অশোভন আগ্রহ দেখিয়ে এর শালীনতা ক্ষুণ্ণ করবার প্রবৃত্তি তার হ'ত না। সে প্রবৃত্তি থাকলে ওই ডাকবাংলায় ব'সেই তো সে কথা শেষ ক'রে দিতে পারত। তার নিজের কোনও অভিভাবক নেই, ভাস্করেরও নেই, ভাস্করের আগ্রহ যে অটুট আছে তা-ও সে বুঝতে পেরেছিল ; কিন্তু তবু সে শেষ কথা দেয় নি হয়তো শালীনতার জন্যে কিংবা হয়তো ভাস্করকে আর একটু ভাল ক'রে চেনবার জন্যে, কিংবা—(এ কথাটা মনে হওয়াতে নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সে)—কিংবা হয়তো তার গোপন নারী-সত্তা কামনা করছিল, ও আর একটু খোশামোদ করুক, অত সহজে ধরা দেব কেন! কিন্তু আজকের এই ঘটনাটা ঘটাতে ব্যবধানের প্রাচীরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, শালীনতার সূক্ষ্ম ওড়নাটা উড়ে গেল, তার নিরাশ্রয় মন যে আশ্রয় পাবার জন্যে উন্মুখ হয়েছিল, সেই দিকেই অতি দ্রুতবেগে ছুটতে হ'ল তাকে। সন্ন্যাসী যদি বাসায় থাকতেন, তা হ'লে হয়তো আজই এমন ভাবেই ছুটতে হ'ত না, কিন্তু তিনিও বাসায় ছিলেন না। এটা বিধাতার ইঙ্গিত, না, আকস্মিক যোগাযোগ একটা। তোরঙ্গ-কাঁধে সন্ন্যাসীর ছবিটা ভেসে উঠল মনে। সদরে কেন গিয়েছিলেন উনি? তোরঙ্গ এনেছেন কেন? উঞ্ছবৃত্তিধারীর তোরঙ্গের দরকার কি? ফিরে এসে খোঁজ করতে হবে। চলে যাওয়ার আয়োজন করছেন না কি? সহায়রাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক আছে কি না সেটাও জানতে হবে। ট্রেন হু-হু ক'রে চলেছে, গাড়ির কামরায় কেউ নেই, হু-হু ক'রে হাওয়া ঢুকছে জানলা দিয়ে, বাইরে গাঢ় অন্ধকার, আকাশে অসংখ্য তারা, নিজের মনকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে ব'সে রইল ডানা...হঠাৎ আর একটা কথা মনে হ'ল তার। বিপদে প'ড়ে কবির কাছে তো সে যেতে পারত। গেল না কেন? যাবার কথা মনেই হয় নি। এর কারণ সম্ভবত মন্দাকিনী। এই রাত্রে সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলা যেত না, বললে কেলেঙ্কারির ভয় ছিল। রূপচাঁদ আনন্দমোহনের বন্ধু একজন। আর একটা কারণও ছিল বোধ হয়। কবি বলেছিলেন, যে জোয়ারটা এসেছিল সেটা নেবে যাচ্ছে। যে কবিতাটা দিয়েছিলেন তাতেও ওই ধরনের কথা ছিল। তাঁর কাছে সে এখন অলীক স্বপ্নমাত্র। এ লোকের কাছে বাস্তবের সমস্যা নিয়ে যাওয়া অর্থহীন ; নানারকম ভাবতে ভাবতে চলেছিল ডানা। মনে হচ্ছিল, সে যেন নতুন কোনও দেশে চলেছে, পুরাতন বন্ধু ভাস্করের কাছে নয়।

২০

ডানা একটা রিক্‌শায় চেপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে যখন এসে পৌঁছিল, তখনও ফরসা হয়নি। রিক্‌শাওয়ালা তাকে নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। ডানা দেখল, গেট ভিতর থেকে বন্ধ করা রয়েছে, বাড়িটাও গেট থেকে বেশ একটু দূরে। গেটে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে কেউ যে শুনতে পাবে তা মনে হয় না। কাছে পিঠে কোনও লোক বা চাকরও দেখা গেল না। ডানা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে জ্বেলে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল, ভিতরে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা! পাওয়া গেল না। বাংলোটা দেখা যাচ্ছে, লোকজন কেউ নেই। এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ডানা তখন কাছে-পিঠে অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধান করবার জন্যে এগিয়ে গেল। কাছেই আর একটা বাড়ি ছিল রাস্তার ধারে। সেইটেরই বারান্দার উপর গিয়ে বসল সে। এ বাড়িতেও লোকজনের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যদি কেউ থাকে, ঘুমুচ্ছে তারা নিশ্চয়। ডানা খানিকক্ষণ ব'সেই বুঝতে পারল, এখানে ব'সে থাকা যাবে না। ভয়ঙ্কর মশা। উঠে দাঁড়াল এবং পথেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গাছ, দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ধীরে ধীরে মাথা দোলাচ্ছে, কেউ আবার কথাও কইছে পেচকের ভাষায়। মাঝে মাঝে দুই-একটা গাছের উপর থেকে ফিঙেরও মিষ্টি গান শোনা যাচ্ছে। একটা গাছের উপর খুব আস্তে একটা কোকিল 'কু-উ' ক'রে একবার ডেকেই থেমে গেল। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার লাইন মনে প'ড়ে গেল ডানার—'দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান কুহরে'। এর পরই কিন্তু কাব্যলোক থেকে সহসা তার পতন হ'ল। সামনেই একদল মহিষ! ধীর মন্থর গতিতে চলেছে—একটির পর আর একটি। প্রায় নিঃশব্দেই, পায়ের খুরের শব্দ হচ্ছে শুধু। সর্বশেষ মহিষটির পিঠের উপর ব'সে আছে রাখালটি, হাতে তার প্রকাণ্ড একটা লাঠি। ডানা পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মহিষের দল যখন চ'লে গেল, তখন আবার সে পথ চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর—এক মুরগীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল রাস্তার ধারের একটা ঘর থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডানা। মনে হ'ল মুরগীটা যেন তাকে আর অগ্রসর হতে মানা করছে, সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে কোথাও। মনে পড়ল, অনেক দিন রাত্রি দশটার পর সে একবার পথ ভুলে একটা ব্যাঙ্কের সামনে এসে পড়েছিল। ব্যাঙ্কের প্রহরী চীৎকার ক'রে উঠছিল—হুকুম দার! (Who comes there) '.' এই মুরগীও যেন বলছে—হুকুম দার! ডানা সত্যিই ইতস্তত করতেলাগল, আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না! পরমুহূর্তেই একযোগে অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে ডেকে উঠল, তার এই ইতস্তত ভাব দেখে একযোগে হেসে উঠল যেন একদল তরুণী অন্ধকার যবনিকার আড়াল থেকে। ডানার চেখে পড়ল পূর্বাকাশে উষার অরুণিমা আভাসিত হয়েছে। আর বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে হ'ল না তার। সে ফিরতেলাগল। আবার যখন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলার কাছে ফিরে এল, তখন বেশ আলো হয়েছে। গেট কিন্তু তখনও খোলে নি। যে বারান্দার উপর প্রথমে ব'সে ছিল, সেখানে গিয়েই বসল আবার। অনেকক্ষণ ব'সেই রইল। মনে হতে লাগল, এভাবে কোনও খবর না দিয়ে চ'লে আসাটা ঠিক হয় নি। এও হতে পারে যে, ভাস্কর এখানে নেই, কোনও জরুরী দরকারে আবার বেরুতে হয়েছে তাকে রাত্রে। এইসব ভাবছে, এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। একটি অল্পবয়সী কালো মেয়ে ভাস্করের গেট খুলে বেরিয়ে এল। মেয়েটি কালো, কিন্তু সুশ্রী।

পিঠের উপর লম্বা বেণী দুলছে। ডানার হঠাৎ একটা উপমা মনে হ'ল—'কালভুজঙ্গিনী'। মেয়েটি তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। পরনে একটা ছাপা শাড়ি, গায়ের জামাও ছাপা সিল্কের। খুব ডগডগে রঙ। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ, যেন সমস্ত রাত ঘুমোয় নি। আরও যখন কাছে এল, তখন ডানাকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। ওর বাড়ির বারান্দাতেই সে ব'সে আছে নাকি? দেখা গেল, সত্যিই তাই। মেয়েটি কাছে এসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডানার দিকে চাইতেই ডানা হেসে হাত তুলে নমস্কার করলে।

মেয়েটি উত্তর দিলে ইংরেজীতে। ইংরেজীতেই আলাপ হ'ল।

"গুড মর্নিং। কোন দরকার আছে কি?"

"আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, "আমি নার্স। এইখানেই থাকি।"

"এ বাড়ি আপনার?"

"হ্যাঁ। ভাড়া। আমি বিদেশিনী, এখানে প্র্যাকটিস করবার জন্যে এসেছি।"

"ও! আপনাকে ওই বাড়ির গেট থেকে বেরুতে দেখলাম। মিস্টার বসু কি অসুস্থ না কি?"

আবার মুচকি হাসল মেয়েটি!

"অসুস্থ হয়েই কাল রাত্রে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, বিশেষ কিছু নয়। একটু বেশি 'ড্রিংক' করেছিলেন। কথাটা বলা হয়তো উচিত হ'ল না। কথাটা অনুগ্রহ ক'রে গোপন রাখবেন। আপনি কেন এসেছেন জানতে পারি কি?"

"আমি ওঁর পুরাতন বান্ধবী। দেখা করতে এসেছি।"

"আই সি। উনি ঘুমচ্ছেন এখন। আপনি ভিতরে গিয়ে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে পারেন। এর আগে এসেছিলেন কখনও?"

"একবার এসেছিলাম।"

"আচ্ছা, এক্সকিউজ মি।"

আর কোন কথা না ব'লে মেয়েটি ভিতরে চ'লে গেল। মনে হ'ল, কথার ধরনে এবার যেন একটু উষ্ণতা প্রকাশ পেল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। যে ভেলাটি অবলম্বন ক'রে সে ভাসছিল, সেটাও ডুবে গেল নাকি?

ড্রইং-রুমে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি ডানাকে। চাপরাসীর মারফৎ নামটা পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর বসু বেরিয়ে এলেন।

"এ কি। ডানা! এ যে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য! এখন কি ক'রে এলে?"

"ট্রেনে।"

এর পর কি বলবে ডানা ভেবে পেল না, চুপ ক'রে গেল। এমন অসময়ে কোনও খবর না দিয়ে চ'লে আসার সত্য হেতুটা অকপটে বিবৃত করা সমীচীন হবে ব'লে তার মনে হ'ল না। কিন্তু কি বলবে তাও সে ভেবে আসে নি। চুপ ক'রেই রইল তাই।

"ট্রেনে? তার মানে রাত আড়াইটের সময় এখানে পৌঁছেছ। ব্যাপার কি?"

"কিছুই নয়, এমনি। ইচ্ছে হ'ল চ'লে এলাম।"

"বেশ করেছ। চল, চা খাওয়া যাক। আমাকে আবার এখুনি বেরুতে হবে। একটা গ্রামে দাঙ্গা হয়ে গেছে।"

এবার ডানা যেন একটু আত্মসচেতন হ'ল। কেতা-দুরস্ত ভাষায় বললে, "আমি আসাতে তোমার কর্তব্যে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না আশাকরি।"

"বাধা হবে কেন? তুমিও সঙ্গে থাকবে আমার। আমার নীরস কর্তব্য সরস হয়ে উঠবে তা হ'লে। আর কালকের যে আলোচনাটা মুলতুবি আছে, সেটাও হয়তো সেরে ফেলা যাবে। আমার কাজ খুব বেশি নেই, শুধু একবার যাওয়া দরকার। পুলিস যা করবার ক'রে ফেলেছে এতক্ষণ। এস, চা-পর্বটা সেরে ফেলা যাক। চান করবে না কি?"

"কাপড়চোপড় তো আনি নি। হাত মুখ ধুয়ে নিলেই চলবে।"

"এস তা হ'লে। আমিও কামিয়ে নিই।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক পরে ডাকবাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় একটা ক্যাম্পচেয়ারে আনত-নয়নে ব'সে ছিল ডানা। ভাস্কর বসু পাশেই আর একটা ক্যাম্পচেয়ারে ঠেস দিয়ে কথা বলে চলেছিলেন। তাঁর কথার ধরনে যে সরল আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল, তা ডানার হৃদয়কে স্পর্শ করছিল কি না তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। ডানা নির্বাক হয়ে আনত-নয়নে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বুঝতে পারছিলেন না ব'লে ভাস্করের বক্তব্য যেন আরও আবেগময় হয়ে উঠেছিল।

ভাস্কর বলছিলেন, "তোমাকে বিয়ে করব ব'লেই আমি এতকাল প্রতীক্ষা ক'রে আছি। কেন জানি না, আমার বিশ্বাস ছিল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। বিয়ে করবার অনেক সুযোগ পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি ; কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব—এ কল্পনা কখনও করি নি। তুমি কোনও কথা বলছ না যে? যদি কিছু জানতে চাও আমার বিষয়ে, বল সেটা।"

ডানা হেসে বললে, "যা জানতে ইচ্ছে করছে তা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচও হচ্ছে যে! যাদের বিয়ে করবার সুযোগ তুমি পেয়েছ বা পাচ্ছ, তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি রকম?"

ভাস্করের চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের ছটা লাগল।

"তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। বর্মা থেকে চ'লে আসার পর অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে আমাকে। বর্মা থেকে পালিয়ে এসে আমি মিলিটারিতে যোগ দিয়ে নানা দেশে ঘুরেছি। তার পর বিলেতে পড়াশোনা করেছি। তার পর এই চাকরি। আমি সমর্থ যুবক, দৈহিক ক্ষুধার দাবি আছে, সে দাবি মেটাতে আমি ইতস্ততও করি নি কখনও—হাটে বাজারে হোটেলে রেস্তোরাঁয় যখন যেখানে যেমন জুটেছে। তবে ওগুলো নিতান্ত দৈহিক, সাময়িক ব্যাপার, মনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও অসুখও আমার হয় নি।"

ডানার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল সে।

ভাস্কর আবার বললেন, "ওসব বিষয়ে আমার কুসংস্কার নেই। মানে, তোমারও জীবনে যদি ওসব ঘ'টে থাকে সেটাকে নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লেই আমি মেনে নেব। শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক আমি নই।"

ডানা তবু নীরবে ব'সে রইল। একটা কথাই তার মনে হতে লাগল, রূপচাঁদই নবরূপে দেখা দিয়েছে আবার।

"একেবারে চুপ ক'রে গেলে যে? কোনও কথাই বলছ না?"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "বলবার আর কি আছে! চল, এবার ওঠা যাক।"

"আমার প্রস্তাবটা তা হ'ল—"

"পরে জানাব। এখন চল। এখনি ট্রেন আছে একটা, আমি চ'লে যাই। তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও।"

ডানার মুখের দিকে চেয়ে ভাস্কর আর কিছু বলতে সাহস করলেন না।

২১

ডানা এক একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ব'সে ছিল। ভাবছিল, যা সে এতদিন কামনা করছিল তার সবই হ'ল, রূপচাঁদ শাস্তি পেয়ে তার জীবন থেকে স'রে যাচ্ছেন, কবির কল্পনা-স্রোত অন্য খাতে বইছে—তাকে নিয়ে তিনি আব কবিতা লিখবেন না, তার কলেজের বন্ধু ভাস্কর ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করবার জন্যে সাধাসাধি করছে; কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনি র'য়ে গেল, তার জীবনের সমস্যার সমাধান হ'ল কই? কিছুই তো হ'ল না। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত নিঃস্ব মনে হতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল, আর কেউ না থাক্, সন্ন্যাসী ঠাকুর আছেন। সন্ন্যাসীর নানা কথাই ঘুরে ফিরে জাগতে লাগল মনের ভিতর। মেঘের মত প্রসারিত হতে লাগল নানা আকারে।

বাড়ি এসে যখন পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় তিনটে। দেখল, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ডাকে উঠে বসল সে।

"রূপচাঁদবাবু আর তাঁর স্ত্রী কতক্ষণ ছিলেন কাল?"

"তা তো জানি না মা। আমি এসে দেখলাম, কেউ নেই। পাখিটাও নিয়ে গেছেন।"

"আজ কেউ এসেছিল?"

"একটু আগে ওই গঙ্গার ধারের বাবাজী এসেছিলেন। তিনি একটা বাক্স আর চিঠি রেখে গেছেন।"

"কি বাক্স?"

"ঘরে রেখে দিয়েছি। খুব ভারী। নতুন তোরঙ্গ একটা।"

একটি খামের চিঠি সে ডানার হাতে দিল। চিঠিটা হাতে ক'রে ডানা ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখতে পেল তোরঙ্গটি। এইটেই তো কাঁধে ক'রে কাল আসছিলেন তিনি। চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল সে।

শ্রীমতী ডানা,

আমি এবার চললাম। আর সম্ভবত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার কিছু সম্পত্তি এখানে ছিল, তারই ব্যবস্থা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ হয়ে গেল সব। তুমি বিপন্ন মুখে বার বার আমার কাছে আসতে সাহায্যের জন্য, উপদেশের জন্য। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, নিজেই অসহায়, তোমাকে কি সাহায্য করব তা ভেবেই পেতাম না। অথচ কিছু করবার জন্যও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। তুমি একদিন বলেছিলে যে, কিছু টাকা পেলে নাকি তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই দিনই আমি ভেবেছিলাম যে, এখানে আমার যা কিছু আছে তা তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু দেব বললেই চট ক'রে দেওয়া যায় না। অনেক দিন ধ'রে এর জন্যে আয়োজন করতে হয়েছে। একটা সামান্য শাবল যোগাড় করতেই বেশ কয়েক দিন লেগে গেল। যে ঘরটায় তুমি আছে, আর এই ভাঙা ঘরটা যেখানে আমি আছি—এ দুটোই আমার সম্পত্তি। এর সংলগ্ন কিছু জমিও। ঠিক কত জমি আমার জানা নেই, তুমি পুরাতন দলিল খোঁজ করলেই জানতে পারবে। আমি সদরে গিয়ে আমার এখানকার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে এলাম। পোস্ট-আপিসের টাকাগুলোও তুমি পাবে। এই তোরঙ্গের ভিতর সমস্ত দলিল আছে। আমি সদরের উকিল হরনাথ মল্লিককে আমার 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' দিয়ে এসেছি। তিনি রেজেস্ট্রি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার ক'রে দেবেন। এ ছাড়াও আরও কিছু টাকা তোমাকে দিয়ে গেলাম। মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে লেখা ছিল যে, গঙ্গার ধারের এই প'ড়ো বাড়িটার মেঝেতে এক ঘড়া মোহর আছে। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ নাকি এটা সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন। মোহর আছে কি না দেখবার জন্যেই শাবল সংগ্রহ করতে হ'ল আমাকে। চিঠির নির্দেশ অনুসারে খুঁড়ে দেখলাম, সত্যিই আছে। একটা প্রকাণ্ড তামার ঘড়ায় দু-হাজার মোহর। মোহরগুলো তোমাকে দেবার জন্যে একটা মজবুত তোরঙ্গ কিনতে হ'ল। ওর ভিতর সমস্ত মোহরগুলো, আমার পোষ্ট-আপিসের পাস-বই এবং প্রয়োজনীয় দলিল ও চিঠিপত্র সব রইল। এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব। সমস্ত মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সর্বন্তঃকরণে তোমার মঙ্গল কামনা ক'রে আমি বিদায় নিলাম। ভগবান তোমাকে সুখী করুন। ইতি—

শ্রীবিশ্বপতি ভট্টাচার্য

ডানা স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল।

২২

তিন মাস কেটে গেছে। ঘনঘোর হয়ে নেমেছে বর্ষা। শ্রাবণের নিবিড় সমারোহে আকাশ-বাতাস থমথম করছে। নদী কূলে-কূলে ভরা। সবুজের বান ডেকেছে বনে বনে। চাতক পাখি ডাকছে একটা। সমস্ত সকাল ধ'রে ঘুরে ফিরে ডাকছে, কখনও এ-গাছে কখনও ও-গাছে, কখনও কাছে কখনও দূরে। বিদেশী পাখি, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। কবি পাখিটাকে নিয়েই মেতে আছেন সারা সকাল। দূরবীন দিয়ে দেখে দেখে তাঁর সাধ যেন আর মিটছে না। কালো পাখি, মাথায় ঝুঁটি, ল্যাজটি লম্বা, ল্যাজের ডগায় সাদা সাদা বিন্দু, বুকটি সাদা—এক কথায় অপরূপ। পাখিটা যখন দূরবীনের সীমা ছাড়িয়ে চ'লে গেল তখন কবি কবিতা লিখতে বসলেন। অনেক ভেবে ভেবে আরম্ভ করলেন—

নব জলধর হতে আসিলে কিনা নামিয়া
ওগো ও চাতক পাখি, ওগো মেঘবরণী,
ছায়া-মেঘনার স্রোতে ভাসাইয়া তরণী
একটু না থামিয়া
গাঢ় সবুজের স্রোতে খুঁজিতেছ সরণী
কিছুই না মানিয়া
গাছে গাছে দূরে কাছে কার অভিসারে গো
বল না বাখানিয়া
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্—পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো, পিয়ো
ডাকিছে কাহারে বারে বারে গো।

বাধা পড়ল। পিওন এসে দেখা দিল। একটা খামের উপর অমরেশবাবুর হস্তাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন কবি। তিনি কাশ্মীর থেকে ইয়োরোপ চ'লে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কোনও চিঠিই লেখেন নি ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুললেন। ছোট চিঠি।

প্রীতিভাজনেষু,

অনেক কিছু দেখে দেশে ফিরেছি। এখন আমি লছমনঝোলার একটা ধরমশালায়। বর্ষার সময় এ জায়গা মনোরম নয়। আমি এখানে এসেছি ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের (Verditer Flycatcher) বাসার সন্ধানে। আর একটু আগে এসে পৌঁছতে পারলে ভাল হ'ত। মে-জুনেই ওদের বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। লন্ডনে একজন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। পাহাড়ী পাখির বিষয়ে সে গবেষণা করছে। তারই অনুরোধে ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারের বাসা আর ডিমের সন্ধান করছি এখানে। যদি পাঠাতে পারি খুব খুশী হবেন তিনি। আমাদের সঙ্গে তিনি যে রকম ভদ্র ব্যবহার করেছেন তা অবর্ণনীয়। তিনি সাহায্য না করলে আমরা সমুদ্রের নানা রকম পাখি দেখতেই পেতাম না। অনেক নোট্স আর ফোটো এনেছি। সব দেখাব। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে কাল। পাহাড়ে কিছুদূর উঠে একটা ঝরণার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ডানাকে দেখতে পেলাম। ময়লা একটা গেরুয়া রঙের কাপড় প'রে ঝরণা থেকে জল তুলছে। আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারি নি আমি প্রথমে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, ডানাই। জিজ্ঞেস করলাম, এ কি, তুমি এখানে? সে মৃদু হেসে বললে, আমি আর চাকরি করতে পারলাম না। আনন্দবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি করছ? বললে, এমনিই আছি। বেশ আনন্দেই আছি। নমস্কার। আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে জলের ছোট কলসীটি তুলে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে এসে খবরটা রত্নাকে বললাম। লোকজন পাঠিয়ে খোঁজও করলাম। কিন্তু আর তাকে ধরতে পারি নি। আমরা দুজনেই খুব বিস্মিত হয়েছি। ব্যাপারটা কি হয়েছে জানাবেন। আমরা বোধ হয় মাসখানেক পরে ফিরব। নমস্কার জানবেন। ঠিকানা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম। পত্রপাঠমাত্র উত্তর দেবেন। ইতি—

আপনাদের
অমরেশ

কবি পত্রপাঠমাত্রই উত্তর লিখতে ব'সে গেলেন।—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। আপনাদের কোনও খবর না পেয়ে খুব ভাবছিলাম। শ্রীমতী ডানার আচরণ সত্যই খুব বিস্ময়কর। সে কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে আপনার পক্ষী-নিবাসের সমস্ত পাখিগুলোকেও ছেড়ে দিয়ে গেছে। সে চ'লে যাওয়ার পরদিন তার চাকরটা এসে খবর দিলে যে, মাইজি কাল রাত্রে ফেরেন নি, এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই। রাত্রে তাঁর জন্যে রান্না ক'রে রেখেছিলাম, সে খাবারটা নষ্ট হয়েছে। আবার রাঁধব কি? আমি গিয়ে টেবিলের উপর ছোট একটা চিঠি পেলাম। সেটা হুবহু নকল ক'রে দিচ্ছি।—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, এখানে প'ড়ো বাড়িতে সে সন্ন্যাসী থাকতেন, তাঁর চিঠিটা প'ড়ে দেখলে তোরঙ্গ-রহস্য বুঝতে পারবেন। আমি আর চাকরি করব না, আমিও চললুম এখান থেকে। যাওয়ার আগে পক্ষী-নিবাসের পাখিগুলোকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি, এ অধিকার রত্নাদি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী যে অর্থ আমাকে দিয়ে গেছেন, তা আমি নিলাম না। আমার অনুরোধ—আপনি, অমরেশবাবু আর রূপচাঁদবাবু টাকাটা ভাগ ক'রে নিয়ে নেবেন। আপনাদের তিনজনেরই মুখে একাধিকবার শুনেছি যে, টাকা পেলে আপনারা প্রত্যেকেই নিজেদের আকাশে নাকি আরও ভালভাবে ডানা মেলতে পারবেন। আমারও আগে তাই ধারণা ছিল, এখন আর নেই। তাই টাকাগুলো আপনাদের তিনজনকেই দিয়ে দিলাম। বিশ্বপতি ভট্টাচার্য যে সহায়রাম ভট্টাচার্যের উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর বাড়ি আর জমির যে কোনও সুব্যবস্থা করবার অধিকার আমি অমরেশবাবুকে দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন তার স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার মনে। আপনি ও বউদিদি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। একটি অনুরোধ, আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না, কিংবা পুলিশে খবর দেবেন না। ঘরের চাবি চাকরটার কাছ রইল। টাকাকড়ির ব্যাপার তার কাছ থেকে গোপন রেখেছি। আমার প্রণাম জানাচ্ছি। ইতি আপনাদের ডানা।"

ডানার চিঠির সঙ্গে সন্ন্যাসীর চিঠিও ছিল। সেটা না টুকে এমনিই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ ডাকের বেশি সময় নেই। টুকতে গেলে ডাক পাব না। ওটা হারাবেন না যেন। তোরঙ্গটা তুলে নিজের কাছে এনেছি। মোহরগুলো বড় আয়রন সেফে রেখেছি। আপনি এলে তার পর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আপনারা তাড়াতাড়ি চ'লে আসুন। এখানকার অন্যান্য খবর সব ভাল। খাজনা ভালই আদায় হয়েছে। গ্রামসংস্কারের কাজে লেগেছি। সেটাও ভাল চলেছে। আপনারা উভয়ে আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীআনন্দমোহন

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তার পর তিনি কবিতা লিখলেন—

কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায়
বহ্নিনিশান উড়িয়েছিল যে
আজকে দেখি শ্রাবণ-মেঘে
বৃষ্টি ঝরায় সে।

বৈশাখেতে দোয়েল শ্যামা
বনে বনে যে সুর সেধেছিল
টুনটুনি আর বুলবুলিরা
যে নীড় বেঁধেছিল
চাতক পাখির কণ্ঠে ওগো
তাই কি আজি জল-তরঙ্গে বাজে
ছায়ায় ঢাকা মেঘলা দিনের
নিবিড়তার মাঝে।

একই বাণী, ওগো রসিক,
বলছ তুমি নানান সুরে সুরে,
সামনে যখন বৃষ্টি ঝরে, দেখি
রোদ উঠেছে দূরে।